উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ অক্টোবর ১৯৬৪

প্রকাশক
সলিল কুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
সমীর দাশগুপ্ত
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ
৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১৬৪

আমাদের কথা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ছ বছর আগে "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহ" নামে আমরা একখানা সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করি। তিন বছরের মধ্যেই তার সমস্ত কপি নিঃশেষ হয়ে যায়।

বর্তমান প্রকাশনাটি পূর্বতন প্রকাশনার পুনর্মুদ্রণ নয়, এমনকি, তার পরিবর্ধিত সংস্করণ মাত্রও নয়। পূর্বতন গ্রন্থের কয়েকটি গল্প বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, সামগ্রিক ভাবে এটি একখানা নতুন গ্রন্থ।

পূর্ববর্তী সংকলনে গল্পের সংখ্যা ছিল পঁচিশটি, বর্তমান সংকলনে পঞ্চাশটি। তাছাড়া বর্তমান সংকলনে একটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে—যাতে মানিকবাবুর সাহিত্যিক জীবনের উত্তর-পর্বের সমস্ত প্রতিনিধিত্বমূলক গল্পই এতে স্থান পায়।

আশা করি, মহৎ শিল্পীর পরিণত হস্তের লেখনীপ্রসূত সার্থক গল্পসমূহের এই প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলন পাঠক সমাজে যথোচিত মর্যাদা লাভ করবে।

—প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ' বইটির প্রথম সংস্করণ বহুপূর্বে নিঃশেষিত হলেও নানা কারণে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব হল।

এই সংস্করণে আগের সংস্করণের অনেকগুলি গল্পের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন, মার্কসবাদই মানবতাকে প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক পথ দেখাতে পারে, অতীত কি ছিল, বর্তমান কি হয়েছে এবং কি ভাবে কোন্ ভবিষ্যৎ

আসবে জানাতে পারে। সেজন্যে তিনি সক্রিয়ভাবে মার্কসবাদকে গ্রহণ করলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। এই প্রতীতি এবং সক্রিয়তার পরবর্তী সময়কেই আমরা মানিক সাহিত্যের উত্তরকাল বলে মনে করি।[১]

এই গল্প সংগ্রহে উত্তরকালের সৃষ্টিই প্রাধান্য লাভ করেছে।'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে এই বোধ আকস্মিকতার মধ্যে আসেনি, এসেছে মানবজীবনযন্ত্রণার গভীরতর অনুভবের ফলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বাভাবিক প্রবণতায় এবং সমাজের নীচুতলার মানুষের মধ্যেই সত্য-প্রতীতির ফলে। এই উত্তরণ এবং সার্থকতা উপলব্ধির জন্যই পূর্বকালের পথ বেয়ে উত্তরকালে পৌছতে হয়েছে। সেখানেও ছোট গল্পের শিল্পরীতির যে অবনমন ঘটেনি সেদিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান গল্প সম্ভার সংকলিত হয়েছে। রাজনীতিক সচেতনতায় শিল্পের উৎকর্ষ হ্রাস পায় না, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে তার উজ্জ্বল নিদর্শন। নেতিবাদী জীবন দর্শন দিয়ে শুরু করে বৈজ্ঞানিক ইতিবাদী জীবন প্রত্যয় তার পরিক্রমা।[২]

স্বভাবতই এই সংস্করণের গুরুত্ব অধিক। ক্রমবর্ধমান মানিক-সাহিত্যের জনপ্রিয়তায় এ সংকলন পাঠক সমাজে সমাদৃত হলেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থক।

ডঃ সরোজমোহন মিত্রের উৎসাহ ও সাহায্য না পেলে এই সংকলন প্রকাশ সম্ভব হত না। দ্বিতীয় সংস্করণের গল্পের নির্বাচন, কালানুযায়ী সাজানো, গল্প সংগ্রহ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে তাঁর সহায়তা আমাদের কাছে অপরিহার্য ছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা কমলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করি। এঁদের আন্তরিক সাহায্য ছাড়া বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

প্রকাশক

সূচী

	পৃষ্ঠা
গুপ্তধন	১
প্যাঁক	১৩
কুষ্ঠরোগীর বৌ	২০
যে বাঁচায়	৩৩
বাস	৪০
আজ কাল পরশুর গল্প	৫৭
দুঃশাসনীয়	৬৯
নমুনা	৭৬
গোপাল শাসমল	৮৩
শত্রুমিত্র	৮৭
রাঘব মালাকর	৯১
যাকে ঘুস দিতে হয়	৯৭
মাসীপিসী	১০১
পেট ব্যথা	১০৯
শিল্পী	১১৬
কংক্রীট	১২৩
প্রাণের গুদাম	১৩২
ছেঁড়া	১৪০
খতিয়ান	১৪৮
ছাঁটাই রহস্য	১৫৪
চক্রান্ত	১৬৫
টিচার	১৭৭
একান্নবর্তী	১৮৪
চালক	১৯৩
ছিনিয়ে খায়নি কেন	২০০
ধান	২০৮
দীঘি	২১৬
গায়েন	২২২
ছেলেমানুষি	২২৯
হারাণের নাতজামাই	২৩৭
পারিবারিক	২৪৬
ধর্ম	২৫৩
আপদ	২৫৯
ছোট বকুলপুরের যাত্রী	২৬৩

	পৃষ্ঠা
বাগদীপাড়া দিয়ে	২৭০
মেজাজ	২৭৬
প্রাণাধিক	২৮২
সখী	২৯২
ফেরিওলা	২৯৯
সংঘাত	৩০৬
মহাকর্কট বটিকা	৩১৬
এক বাড়িতে	৩২২
উপদলীয়	৩২৯
এদিক ওদিক	৩৩৩
কলহান্তরিত	৩৪১
চিকিৎসা	৩৪৮
মীমাংসা	৩৫৮
সুবালা	৩৬৪
অসহযোগী	৩৭২
নিরুদ্দেশ	৩৭৬
পাষণ্ড	৩৮১
রক্ত নোনতা	৩৮৮
কালোবাজারের প্রেমের দর	৩৯১
ঢেউ	৩৯৬
বিচার	৪০২
একটি বখাটে ছেলের কাহিনী	৪১১
উপায়	৪১৭
কোন দিকে	৪২৬

গুপ্তধন

বর্ষাকালে তো বটেই, বছরের অন্যসময়েও কুল্পী নদীর মেজাজ কুল্পী বরফের প্রধান গুণবাচক শব্দটার ঠিক বিপরীত বিশেষণের অধিকারী। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে একটা শাখা নদী মজিয়া যাওয়ার পর একা একা সমস্ত জলস্রোতকে বহিতে হওয়ায় নদীটা এরকম গোঁয়ার হইয়া উঠিয়াছিল। হরিখালি এবং তার আশেপাশের কয়েকটা গ্রামও বড় নীচু। তাই, মাইল পাঁচেক লম্বা, সহরের সদর রাস্তার মতো চওড়া এবং একতলা বাড়ির সমান উঁচু একটা বাঁধ দিয়া এখানে কুল্পী নদীকে ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে। বর্ষাকালে বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলে বিস্ময় জাগে। এদিকে ভরানদীর ছোট-বড় ঢেউ বাঁধের গায়ে আছড়াইয়া পড়িতেছে, এদিকে এলোমেলোভাবে ছড়ানো পড়িয়া আছে গ্রামের গাছপালা বাড়িঘর, মাঝখানে দুদিকে দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রসারিত প্রকাণ্ড একটা মেটে সাপের মতো আঁকা বাঁকা নদীর বাঁধ। পূর্ণিমা অমাবস্যায় নদীতে সমুদ্রের জোয়ার আসিবার দৃশ্যটি সবচেয়ে অপরূপ। হাত তিনেক উঁচু ফেনিল জলস্রোতকে ছুটিয়া আসিতে দেখিলে চোখ পলক ফেলা যায় না, প্রকৃতির প্রতি মনে সভয় শ্রদ্ধার আবির্ভাব ঘটে।

ভীমের চোখে কিন্তু দৃশ্যটি দেখিয়া পলক পড়িত বেশী বেশী, দুচোখ তার মিটমিট করিত এবং মনে মনে সভয় শ্রদ্ধার বদলে দেখা দিত একটা হাল্কা ছেলে-মানুষী আনন্দ।

এই রকম খাপছাড়া লোক ছিল হরিখালি-বাসী ভীম।

বেঁটে শীর্ণকায় অকালবৃদ্ধ গোবেচারী ভীমের সঙ্গে গ্রামের কারো যেন বনিবনা হইত না, সকলেই অল্পবিস্তর ভয় করিয়া চলিত তাকে। মানুষকে ঠকাইতে সে ছিল ওস্তাদ। মানুষকে ঠকানো অবশ্য তার ব্যবসা ছিল না, জীবিকা সে অর্জন করিত ন্যায়সঙ্গত ভদ্র উপায়ে কিন্তু নিজের সম্বন্ধে মানুষের মনে অসংখ্য ভুল ধারণার জন্ম দেওয়া, তাঁর কাছে কেউ কিছু লাভের আশা করিলে তাকে হতাশ করা, কেউ ঠকাইতে আসিলে তাকে একেবারে ঘোল খাওয়াইয়া ছাড়া প্রভৃতি কতকগুলি ভারি বিশ্রী স্বভাব ভীমের ছিল। তার চেহারা দেখিয়া কে কল্পনা করিতে পারিত, লাঠিখেলার কৌশলগুলি সে এত ভাল আয়ত্ত করিয়াছে যে মাথায় আসল লাঠিয়ালের মতো বাবরি চুল রাখিবার অধিকার তার ছিল। গরু ছাগলের দুধ বেচিয়া ভীম কোথায় এত টাকা পাইত যাতে গোয়ালপাড়ার অনেকখানি তফাতে কিছু ফাঁকা জমির মধ্যে এগারটি পলাশগাছের আড়ালে সুন্দর একটি গৃহে প্রায় ভদ্রলোকের মতোই স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে পরম সুখে বাস করিতে পারিত, তাও গ্রামের লোক ভাবিয়া পাইত

না। ছোট লোকের মতো সে অজস্র সুখ উপভোগ করিলে কারো কিছু ভাবিবার ছিল না, কিন্তু ভদ্রলোকের মতো সুখ পাইতে তো পয়সা লাগে। সেটা আকাশ হইতে আসে না। তারপর ভীমের ব্যবহার। ছোট্ট মেনি বাঁদরের মতো তার মুখ খিঁচানোর স্বভাবের জন্য সকলের গা জ্বালা করিত। সকলের সঙ্গে ভীম যে সব সময় হাল্কা হাসি-তামাসা আর ছেলেমানুষী কৌতুক করিয়া চোখ মিট মিট করিতে করিতে ফিক ফিক করিয়া হাসিত সেটাকে সকলে মনে করিত নিছক বাঁদরামি। ঘরে ঘরে এত অভাব অভিযোগ, লোকের মনে এত দুঃখ কষ্ট আর সে কিনা এরকম ইয়ার্কি ফাজলামি করিয়া দিন কাটাইবে! নিজের ঘরে সে যা খুশি করুক, লোকের সঙ্গে তামাসা করা কেন? তাও অমন সব কৌশলময় মজাদার তামাসা!

মেজকর্তার মাথা ফাটানোর তামাসার মধ্যে কিন্তু কিছু কৌশল থাকিলেও মজা বেশী ছিল না! ভীম যে কেন মেজকর্তার মাথা ফাটাইয়াছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে মেজকর্তার হুকুমে ভীমের ছ'টা গরুকে সাতবার খোঁয়াড়ে দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া, কেউ বলে ভীমের বড় মেয়ে, তিনপুকুরের কেষ্টর সঙ্গে যার বিবাহ হওয়ায় গাঁ শুদ্ধ লোক চটিয়া গিয়াছে, মেজকর্তা তার মানহানি করিয়াছিলেন বলিয়া। শেষেরটাই সম্ভবতঃ সত্য, কারণ ভীমের বড় মেয়ে আসিতে না বলিলে রাতদুপুরে মেজকর্তা তার বাড়ির পিছনে পলাশগাছের কুঞ্জবনে অভিসারে আসিয়া তাকে যে মাথা ফাটানোর সঙ্গত কারণ ও সুযোগ সরবরাহ করিতেন তা সম্ভব মনে হয় না। তা ছাড়া, নিজের মাথাটা কেউ ফাটাইয়া দিলে সে বিষয়ে প্রকাশ্যভাবে চুপচাপ থাকার মতো মানুষও মেজকর্তা নন।

তবে মেজকর্তার যে মাথাটা ভীম ফাটাইয়া দিয়াছিল সেটাতে যথেষ্ট বুদ্ধি না থাকিলেও তার টাকা ছিল অনেক এবং মানুষের আনুগত্য গ্রামের জমিদারেরই থাকে বেশী। তাই একদিন রাত্রে বাবুদের বাড়ি মস্ত একটা ডাকাতি হইয়া যাওয়ার পর ভীমকে আট বছরের জন্য জেলে যাইতে হইয়াছিল। ডাকাতির কথাটা মিথ্যা নয়। একজন খুন, তিনজন ভয়ানক জখম আর নগদে গয়নায় প্রায় তেইশ হাজার টাকা লুট,—এ ব্যাপারগুলি সত্য সত্যই ঘটিয়াছিল। ভীম যে নিজে ডাকাতি করিতে যায় নাই এটা গ্রামের অনেকে বিশ্বাস করিত, এখনো করে। তবে ডাকাতির সঙ্গে তার অন্যভাবে যোগ ছিল কিনা এ বিষয়ে কেউ নিঃসন্দেহ নয়। ভীমের পক্ষে কিছু অসম্ভব হওয়া যে অসম্ভব—লোকে এখনো এ বিশ্বাস পোষণ করে। মেজকর্তার বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও ভীমের শাস্তি কিন্তু অন্য ডাকাতের কয়েকজনের তুলনায় হইয়াছিল খুব কম। তারা কুড়ি বছরের জন্য দ্বীপান্তরে গেল, ভীম এবং আরও তিনজন ডাকাত মোটে আট বছরের জন্য বাস করিতে গেল দেশেরই নানা জেলে। আট বছরের মধ্যে আবার পুরা একটা বছর মাপ করিয়া সাত বছর পরেই তারা ভীমকে দিল ছাড়িয়া!

ভাদ্র মাসের এক দুপুরে বেলা ভীম ফিরিয়া আসিল গ্রামে। ভীমকে দেখিয়া গ্রামের লোক যেমন আশ্চর্য হইয়া গেল, নিজের বাড়ি ও বাড়ির পিছনের এগারটি পলাশ গাছ একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে দেখিয়া ভীম তার চেয়ে কম

আশ্চর্য হইল না। স্থানটিতে সৃষ্টি হইয়াছে একটি সমতল মাঠের, বাঁশের তৈরী দুজোড়া গোলপোস্ট দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় এখানে এখন ফুটবল খেলা হয়!

চারিদিকে খাঁ খাঁ করিতেছিল ভাদ্র মাসের রোদ। তৃষ্ণা মেটানোর জন্য কাছের একটা পুকুরে যাওয়ায় হাঁদার সঙ্গে ভীমের দেখা হইয়া গেল। হাঁদা তার ভাইপো, কুড়ি বাইশ বছর বয়স, মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়া চুল; অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া একটি মেয়ের বাপ হওয়ার পর হইতে বয়স্ক লোকের মতো গম্ভীর ভারিক্কি চালে চলিতে এবং মাছ ধরিতে ভালবাসে। পুকুরের ঘাট জুড়িয়া মস্ত এক আমগাছের ছায়া পড়িয়াছিল, পুকুরে ছিপ ফেলিয়া হাঁদা সেই ছায়ায় বসিয়া টানিতেছিল বিড়ি। সাত বছর দেখা সাক্ষাৎ না থাকিলেও পরস্পরকে তারা তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল। জেলে সাত বছর ভীমের চুল আধ ইঞ্চির বেশী বাড়িতে পায় নাই। হাঁদার তুলনায় নিজের প্রায় ন্যাড়া মাথাটায় সলজ্জ ভাবে হাত বুলাইয়া ভীম বলিল, 'কিরে হাঁদা!'

হাঁদা ভারিক্কি চাল চালিতে ভুলিয়া গিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল, 'কাকা! কবে ছাড়ান পেলে কাকা?'

ভীম বলিল, 'পরশু তরশু হবে কে জানে! তুই তো মস্ত হয়ে গেছিস হাঁদা, গোঁপ গজিয়েছে তোর!'

অজানাকে জানিবার ভয়ে আপনজনদের সম্বন্ধে হাঁদাকে হঠাৎ সে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না, হাঁদার গোঁপ গজানোর জন্য প্রথমটা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া থাকিবার সুযোগ পাইয়া সে একটু শান্তি বোধ করিল। হাঁদার সমবয়সী একটি ছেলে সে রাখিয়া গিয়াছিল, কে জানে সেও এরকম ঝাঁকড়া চুল রাখিয়াছে কিনা, তারও এরকম গজাইয়াছে কিনা গোঁপ!

তবে এতকাল পরে গ্রামে ফিরিয়া-আত্মীয় পরিজনের সংবাদ জানিবার কৌতূহল শুধু কাল্পনিক ভয়ে বেশীক্ষণ ঠেকাইয়া রাখা চলিবে না। প্রথমে ছেলেটার কথাই ভীম জিজ্ঞাসা করিল। না হাঁদার মতো সে গোঁপ গজানোর সুযোগ পায় নাই, ভীম জেলে যাওয়ার কয়েক মাস পরেই স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। মনটা ভীমের যেন মোচড় খাইয়া গেল। কিছু দুঃসংবাদ শুনিতে হইবে এ আশঙ্কা ভীমের ছিল। তবে প্রথমেই এ ধরনের সংবাদ সে প্রত্যাশা করে নাই। হৃদয়টা পুত্রশোকে গোঁয়ার হইয়া যাওয়ায় বাকী দুঃসংবাদগুলি শুনিবার আতঙ্ক কিন্তু আর তার রহিল না।

একে একে হাঁদা সব সংবাদই দিল। ভীমের বৌ আর ছোট ছেলে মেয়ে দুটি বাঁচিয়াই আছে, তবে ওদের মধ্যে প্রথম দুজন যে বর্তমানে কোথায় আছে হাঁদা ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না। অবশ্য দু'জায়গায় যে ওরা আছে তাতে হাঁদার কোন সন্দেহ নাই। হয় তিনপুকুরে বড় জামাই কেষ্টর কাছে, নয় কালীতলায় ছোট জামাই নবীনের কাছে। হ্যাঁ, কালীতলার বুড়া নবীনের সঙ্গেই ভীমের ছোট মেয়ে রাণীর বিবাহ হইয়াছে।

ভীম জিজ্ঞাসা করিল, 'এ বিয়ে দিল কে?'

হাঁদা হাঁদার মতো বলিল, 'বাবা। বাবুরা চালা কেটে তুলে দেওয়ায় খুড়ীমা তখন আমাদের বাড়িতে ছিল কিনা—'

'নবীন তোর বাপকে কত টাকা পণ দিয়েছিল রে?'

'তা জানি না কাকা।'

'তোরা থাকতে তোর খুড়ী জামাইবাড়ি গিয়ে আছে কেন তাতো জানিস বাবা?'

ভীমের গলার আওয়াজে ঝাঁঝের খোঁজ পাওয়া যায় না, তবু যে তার কথাগুলি ঝাঁঝালো মনে হয়, সেটা সম্ভবতঃ চারিদিকের রোদের ঝাঁঝের জন্য। হাঁদার বয়স হইয়াছে, অন্যায়টা সে এখন বুঝিতে পারে। তবে বাপ-দাদার অন্যায় বলিয়া পুরাপুরি পারে না। গম্ভীর মুখে কৈফিয়ৎ দেওয়ার মতো করিয়া হাঁদা বলিল, 'গাঁ শুদ্ধু লোক শত্তুরতা জুড়ল কি না, তাই দুঃখ কষ্ট সইতে না পেরে—'

ভীম বলিল, 'দুঃখ কষ্ট হবার তো কথা ছিল না বাবা! গাঁ শুদ্ধু লোক শত্তুর হল হল, আপনজনও তো ছিল গাঁয়ে।'

একবার জবাব দিতে না পারিয়া হাঁদা মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া ঝাঁকড়া চুলগুলি পিছনে হটাইয়া দিল।

তারপর ভীমকে হাঁদা তাদের বাড়ি নিয়া গেল। ক্ষুধায় ভীমের শরীর অস্থির করিতেছিল। শোক দুঃখ যদি বা সে কোন রকমে সহিতে পারে ক্ষুধার জ্বালা একেবারেই পারে না। বুড়া নবীনের কাছে যে তার মেয়েকে বিসর্জন দিয়াছে, বিপদের দিনে সে-তার স্ত্রী পুত্রের দিকে ফিরিয়াও তাকায় নাই, ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়াই পেট ভরানোর উদ্দেশ্যে তার বাড়িতে যাওয়া ভীম ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব হইত কি না ভগবান জানেন। হাঁদা দই-চিড়ার ফলারের ব্যবস্থা করিয়া দিলে সে পরম তৃপ্তির সঙ্গেই তাহা ভক্ষণ করিল। মান অভিমান ঘৃণা ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যেন মনের অন্য মনোভাবের রাহাজানির অপরাধে মনের অমানুষিকতার জেলখানায় বাস করিতে গিয়াছে। এ বাড়িতে বিশ্রাম করিতেও সে প্রস্তুত ছিল কিন্তু ইতিপূর্বে বাড়ির কর্তা ফিরিয়া জেলফেরত একটা ডাকাতকে বাড়িতে ডাকিয়া আনার জন্য হাঁদাকে এমন গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল যে, চাঁচের বেড়ার আড়ালে দাঁড়াইয়া কথাগুলি খানিকক্ষণ শুনিবার পর ভীম আস্তে আস্তে এক পা এক পা করিয়া নামিয়া গেল পথে।

পথে চলিতে চলিতে নানা লোকের সঙ্গে দেখা হইতে লাগিল। কেহ কথা বলিল, কেহ বলিল না; যে বলিল তার কথাগুলিও যে মিষ্টি শোনাইল তা বলা চলে না। এমনিই ভীমকে একদিন যারা পছন্দ করিত না, আজ জেলের ছাপ-মারা সেই ভীমকে তারা খাতির করিবে এরকম প্রত্যাশা করাই অন্যায়। ভীমের মুখ দেখিয়া মনে হইল না অন্যায়টা সে করিয়াছে। এতসব বড় বড় আশা আকাঙ্ক্ষা তার সাত বছরে লোপ পাইয়া গিয়াছে যে হরিখালি-বাসী কোন গৃহস্থের খাতির ও সমাদর পাওয়ার মতো তুচ্ছ প্রত্যাশাকে মনে পোষণ করিবার ধৈর্যও হয়ত তার ছিল না। হাঁটিতে হাঁটিতে ভীম গ্রামের প্রান্তভাগে গোস্বামীদের আমবাগানের

একপাশে বাগ্দী পাড়ায় আসিয়া হাজির হইল। এখন অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে, রোদের আর সে রকম তেজ নাই। বাগ্দীপাড়ার সমস্ত স্ত্রী পুরুষেরাই বোধ হয় একটা খোলা চালার তলে জমা হইয়া হৈ চৈ করিতেছিল; ঠিক চালার তলে নয়, যত লোক একত্র হইয়াছে তার সিকি অংশেরও বোধহয় চালার নীচে গোবর-লেপা নীচু ভিটাটুকুতে স্থান সঙ্কুলান হইবে না। কোন একটা উৎসবের জের চলিতেছে তফাতে দাঁড়াইয়াই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিবাহাদি কিছু ঘটিয়া থাকিবে। তাড়ি গেলা যে কবে, অথবা আজ হইতে কখন আরম্ভ হইয়াছিল অনুমান করা অসম্ভব, তবে ইতিমধ্যেই ফলাফলটা ভালভাবেই ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখানে ওখানে নোংরা অকথ্যভাষায় সুরু হইয়াছে ঝগড়া, দু'একজন চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে, দু'একটি স্ত্রীলোকের দিকে তাকানো চলে না। খানিক দূরে দাঁড়াইয়া ভীম অনেকক্ষণ খাপছাড়া দৃশ্যটার দিকে চাহিয়া রহিল।

এই অস্পৃশ্য ছোটজাতের পাড়ায় সে উদ্দেশ্যহীনভাবে আসিয়া পড়ে নাই, এখানে একদিন তার একটি আকর্ষণ ছিল, নিয়মিত যাতায়াতও ছিল। আকর্ষণটির কুটিরে আসিয়া বসিবার অধিকার পাওয়ার জন্য একদিন অবিকল এইরকম একটি উৎসবের খরচাও দিতে হইয়াছিল তাকে। জীবনে প্রথম যেদিন সে চাখিয়া দেখিয়াছিল তাড়ি! কত খাপছাড়া সখই যে তখন ছিল ভীমের। এগারটি পলাশ গাছের আশ্রয়স্থিত তার ভদ্র ও নীতি-সংগত জীবনযাপনের গৃহটির মতো এখানকার অবৈধ জীবন যাপনের সেই কুটিরটিও নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে দেখিয়া ভীমের চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল। এ আঘাতটা যেন তার হৃদয়ের ব্যথা বোধ করা অংশটুকুর সবচেয়ে দুর্বল দিকটাতে ঘা দিয়াছে—যেখানে ঘা লাগিলে অনায়াসে একটুখানি কান্না আসে। কুকী নাম ছিল সেই লম্বা ছিপছিপে কালো ও নোংরা বাগ্দী মেয়েটার এবং তার জন্য ভীমের এত বেশী স্নেহ ছিল যে জেলে তার সাত বছরের নারী-সংক্রান্ত কল্পনাগুলির জন্য কদাচিৎ দ্বিতীয় একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন হইয়াছে।

ভিড়ের ভিতর হইতে একজন টলিতে টলিতে উঠিয়া আসিতেছিল। কাছে আসিলে ভীম তাকে চিনিতে পারিল। হরিখালির প্রসিদ্ধ চোর মধু। সাত বছরে মধু নিজের ছ্যাঁচড়া চোরের উপযুক্ত রোগা চেহারাটা বদলাইয়া সেকেলে ডাকাতের মতো ভীষণ জোয়ান হইয়া না উঠিলে কাছে আসিবার আগেই ভীম তাকে চিনিতে পারিত।

চিনিতে পারিয়া মধু সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বলিল 'পেরণাম, বাবুমশায়। দুটা পয়সা দিবান্?'

বাগ্দীপাড়ার লোকেরা সাধারণতঃ বাবুমশায় বলে না, বলে কর্তা। কুকী কিজন্য তাকে বাবুমশায় বলিত বলা যায় না। সম্বোধনটা তারপর পাড়ার সকলের মধ্যে ছড়াইয়া গিয়াছিল। ভীম বলিল 'দেবরে মধু, নিশ্চয় দেব। এখন তো সঙ্গে পয়সা নেই, রাত্তির বেলা ফের যখন আসব তখন দেব। কুকী কোথায় আছে জানিস মধু?'

মধু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চালার তলে ভিড়ের দিকে একটা হাত প্রসারিত

করিয়া দিয়া বলিল, 'উই হোথায়।'—তারপর সেই হাতটাই নিজের বুকে ঠুকিয়া দিয়া গদগদ কণ্ঠে যোগ দিল, 'কুকী এখন মোর বাবুমশায়, বেন্দাকে পুলিশে লিয়ে গেছে।'

বলিতে বলিতে মধুর মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল, সন্দিগ্ধ চোখে চাহিয়া সে বলিল, 'কুকীর খপর লিচ্ছ যে? ওসব মতলব কোরোনি বাবুমশায়, আমি লিয়েছি কুকীকে বেন্দাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে, কুকীর দিকে নজর দিবেতো—

ভীম শান্তভাবে বলিল, 'তুই ক্ষেপেছিস্ নাকি মধু? কাল নয়তো পরশু আমি গাঁ ছেড়ে চলে যাব, আর আসব না। কুকীর জন্য আমার কিসের মাথাব্যথা রে, আঁ? একটা কাজে এসেছি গাঁয়ে, কাজটা হলেই বাস্ আর একদণ্ড গাঁয়ে রইব না। আর শোন বলি মধু, কাজটা যদি হয় তোদের সবাইকার লাভ হবে, অনেক টাকা পাবি তোরা।'

'কি কাজ বাবুমশায়?'

'রাত্তিরে এসে বলব মধু, এখন নয়। সবাইকে বেশী তাড়ি গিলতে বারণ করিস, তুই নিজেও গিলিস না আর। এক একজন দশ কুড়ি বার কুড়ি টাকা পাবি, কিন্তু আমার কথা না শুনলে সব ফস্কে যাবে তা বলে রাখছি বাপু। কাল যত পারিস, আজ রাতে নয়।'

'দশ কুড়ি বার কুড়ি টাকা দিবে! কি কাজ বলে যাও বাবু—এই বাবুমশায়, শুনে যাও, পায় ধরি তোমার—'

গ্রামের আধা ভদ্র আধা অভদ্র গৃহস্থ ভীমের জন্য বাগ্দী পাড়ার সকলে যেমন ভয় ও শ্রদ্ধা পোষণ করিত, অতিরিক্ত মেলামেশার জন্য নিজেদের মধ্যে তেমনি সহজ ভাবেই তাকে গ্রহণ করিত! প্রয়োজনের সময় তাকে মানিয়া চলিত সকলেই, আবার আড্ডা দেওয়ার সময় প্রায় সাঙ্গাতের মতোই সকলের মধ্যে সে মিশিয়া যাইত। গ্রামের কারো জন্য ভীমের এতটুকু মাথাব্যথা ছিল না, কিন্তু বিপদে আপদে এই অস্পৃশ্য ছোটলোকগুলির সে অনেক উপকার করিয়াছে—বোধ হয় কুকীর জন্য। যে কোন ব্যাপারেই হোক, তার কূট-বুদ্ধির সাহায্য পাইলে বাগ্দীপাড়ার সকলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে চিরদিন।

সাত বছরে স্মৃতি হয়ত মধুর ঝাপ্সা হইয়া আসিয়াছিল, তবু একেবারে ভুলিয়া যাওয়ার মতো মানুষ ভীম নয়। ভীমের মুখে টাকার কথা শুনিয়া মধুর চমক লাগিয়া গেল, ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য সে মুখে মুখেই কতবার যে পায়ে ধরিল ভীমের তার সীমা নাই।

ভীম কিন্তু শুধু বলিল, 'রাতে ঘরে এসে বলব মধু, সবাই থাকিস এখানে। তাড়ি খাস না আর।'

তাড়ির নেশায় আধা বিভ্রান্ত মধু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, ভীম সরু পথটি ধরিয়া জোরে জোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। এক এক ধরনের পাগলামি থাকে মানুষের সোজা কথায় লোকে যাকে বলে ছিট আর শুদ্ধ ভাষায় বলে প্রাকৃতিক

বৈশিষ্ট্য,—যা স্থায়ী কিন্তু অস্থায়ী নেশার চেয়ে জোরালো। পথ চলিতে চলিতে আপন মনে ভীমের মেনি বাঁদরের মতো মুখ খিঁচানো দেখিলে, একদিন তার বাঁদরামিতে গাঁয়ের যত লোক বিরক্ত হইত তারা সকলে আজ অবাক্ হইয়া যাইত। ভীমের খাপছাড়া মনটাতে বড় যন্ত্রণা হইতেছিল। মানুষটা আসলে সে ছিল খুব সরল, কেবল জীবনটাকে সে জিলাপির চেয়েও বাঁকা বলিয়া জানিত বলিয়া হরদম ওরকম বাঁকা ব্যবহার করিত, খাপছাড়া স্বভাবের পরিচয় দিয়া গাঁশুদ্ধ লোককে বিরক্ত করিয়া তুলিত। জেলে সে জীবনের আরও কয়েকটা অতিরিক্ত প্যাঁচের সন্ধান পাইয়াছে। ফলে আরও গভীরতর ও সম্পূর্ণতার বিকাশ হইয়াছে তার প্রকৃতির। এখন সে একা একা নিজের মনে, দর্শক না থাকিলেও, অতুলনীয় কৃতিত্বের সঙ্গে মুখ ভেংচাইতে পারে।

গ্রামের কয়েকটি মাত্র পাকা বাড়ির মধ্যে বাবুদের বাড়িটিই প্রকাণ্ড, তিন তিনটা মহাল আছে বাড়িটার। মুখ ভ্যাংচানোর সাধ মিটিয়া গেলে গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে নদীর ধারে বাঁধটার উপর কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে পাক খাইয়া সূর্যাস্তের সময় ভীম বাবুদের বাড়ির সদর মহলের সামনে বাগানটিতে প্রবেশ করিল। বাগানে একটি কাটালিচাঁপার গাছের তলে আরাম কেদারায় কাত হইয়া মেজকর্তা আরাম করিতেছিলেন। কয়েকটি লুকানো কাটালিচাঁপা সবে ফুটিবার উপক্রম করিয়াছে, তবু স্থানটিতে গাঢ় মোহকরী গন্ধ এমন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে একবার নিশ্বাস টানিয়াই আবেগে ভীমের যেন আবার একটুখানি কান্না আসিবার সম্ভাবনা দেখা দিল। মধু তাকে যেভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিল মেজকর্তাকে তেমনিভাবে প্রণাম জানাইয়া এ ভাবটা ভীম সামলাইয়া নিল অতিকষ্টে।

মেজকর্তা সবিস্ময়ে বলিলেন, 'কে? ভীম? কি চাস্ তুই?'

ভীম জোড়হাতে বলিল, 'বাবু, একটা নিবেদন জানাতে এসেছি, একটা ভিক্ষা চাই বাবু আপনার ঠেঁয়ে। যা হবার তাতো হল, এবার গরিবকে মাপ করে দিন। আমি হলাম গিয়ে আপনার ছিচরণের দাস, আপনি বিরাগ হলে কি আমার রেহাই আছে বাবু? একটা উপায় করে দিন কত্তা যাতে গাঁয়ে একটা ঘরটর বেঁধে---'

মেজকর্তা সিধা হইয়া বসিয়া বলিলেন, 'তোর তো স্পর্ধা কম নয় ভীম! তুই আমার কাছে এসেছিস্ এসব কথা বলতে!'

ভীম কাতর কণ্ঠে বলিল, 'আমি বাবুর চাকর।'

মেজকর্তা তখন একটা হাঁক দিলেন। দুজন চাকর আসিয়া দাঁড়াইতে মেজকর্তা বলিলেন, 'এ হারামজাদাকে ঘাড় ধরে বের ক'রে দে' তো। ব্যাটা আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে এসেছে।—কাল যদি তোকে গ্রামে দেখতে পাই ভীম, জুতো মার্তে মার্তে গ্রাম থেকে দূর করে দেব। পাজী, ডাকাত, হারামজাদা!'

ভীম চলিয়া গেলে আরাম কেদারায় কাত হইয়া মাথার চুলের নিচে লুকানো একটা ফাটার উঁচু চিহ্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে মেজকর্তা লুকানো কাটালিচাঁপা ফুলগুলির গাঢ় গন্ধ মেশানো বাতাস নিশ্বাসে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস যে তিনি কেন ফেলিলেন, সেটা ঠিক বোঝা যায় না।

আজ তিথি ছিল দশমী। ভীম যখন বাগ্দীপাড়ায় ফিরিয়া আসিল তখন চাঁদ উঠিয়াছে কিন্তু ছাড়া ছাড়া মেঘের জন্য ভাল করিয়া জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়িতে পারিতেছে না। কয়েকটা মশাল জ্বালিয়া তখনো সকলে চালার নীচে উৎসব করিতেছিল। শুধু যে কয়েকটি স্ত্রীলোকের দিকে অপরাহ্ণবেলায় তাকানো চলিত না, তারা চলিয়া গিয়াছে। ভীম আশা করিতেছিল কুকীকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু মধু সম্ভবতঃ তাকেও সরাইয়া দিয়াছে।

মধুকে বিশেষভাবে বলিয়া গেলেও তাড়ি গিলিয়া দু'চারজনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ভীম মনে মনে আপশোষ করিতে লাগিল। তবে একটা সান্ত্বনার কথা এই যে পাড়ার বুড়া মোড়ল বিষ্টুও নেশায় চিৎ হইয়া চোখ বুজিয়াছে। বিষ্টুর সম্বন্ধেই ভীমের একটু ভাবনা ছিল,—লোকটা বড় চালাক বিষ্টু, বড় খুঁতখুঁতে তার প্রকৃতি। যে কথা আজ সে সকলকে বলিবে, যে কাজ সকলকে দিয়া করাইয়া নিবে, বুড়া তার মধ্যে হয়ত ভয় ভাবনার অনেক কিছুই আবিষ্কার করিয়া সকলকে দমাইয়া দিত। নেশায় যারা কাবু হইয়া পড়িয়াছিল, তাদের বাদ দিয়া জোয়ান লোকগুলিকে গুনিয়া দেখিতে পাইল সর্বসমেত সাতাশজন আছে। দু'চারজন সরলদেহা স্ত্রীলোকও পাওয়া যাইতে পারে! বাগ্দী মেয়েরা পুরুষের কাজ করিতে অপটু নয়।

একটা চাটাই পাতিয়া ভীমকে বসিতে দেওয়া হইয়াছিল। দশকুড়ি বারো কুড়ি টাকার ইঙ্গিতটা মধু বোধ হয় ইতিমধ্যেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল, ঔৎসুক্য, সন্দেহ ও আশায় বিচলিত গরিব ছোটলোক নারীপুরুষগুলি. ভীমের চারিদিকে ঘেরিয়া আসিল।

ভীম বলিল, 'কেউ গোলমাল করবে না' যা বলব শুনবে নয় তো সব ফস্কে যাবে কিন্তু, গাঁয়ের লোক টের পেলে বিপদ হবে। সবাই চুপ, টুঁ শব্দটি নয়—বাবুদের বাড়ি ডাকাতি করার জন্য সাত বছর জেলে ছিলাম জানিস তো সবাই? বেশ এখন কথা হল, গাঁয়ে আবার আমি ফিরে এলাম কি জন্য? আমার ঘর বাড়ি গেছে, জমিজমা গরু বাছুর গেছে, ছেলে বৌ কেউ গাঁয়ে নেই, গাঁ শুদ্ধ লোক পিছনে লেগেছে,—গাঁয়ে আমি ফুরতি করতে আসিনি বাবু হাঁ!'

মধু বলিতে গেল, 'বাবুমশায়—'

ভীম বলিল, 'তুই থাম মধু। যত গয়না টাকা লুট করেছিলাম আমরা, সব গাঁয়ের এক জায়গায় পুঁতে রেখেছিলাম। সবাই তো ধরা পড়ে জেলে গেলাম, কে আর গয়না টাকাগুলো নিতে আসবে? সব এখনো সেথায় পোঁতা আছে। সবায়ের আগে আমি ছাড়া পেলাম। আজ রাত্তিরে সব খুঁড়ে নিয়ে সরে পড়ব। কিন্তু কি মুস্কিল হয়েছে জানিস মধু, সবাই মিলে মস্ত গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রেখেছিলাম। আমি দুব্বোল মানুষ, একলা খুঁড়ে বার করতে পারব না। আর কি জানিস, ঠিক যেখানে সব পোঁতা হয়েছিল, একটা চিহ্ন ছিল সেখানে, সে চিহ্নটা হারিয়ে গিয়েছে।'

মধু ব্যাকুলভাবে বলিল, 'তবে? তবে কি হবে বাবুমশায়?'

ভীম শান্তভাবে বলিল, 'কি আবার হবে? চিহ্ন না থাক, জায়গাটা তো চিনি।

খানিকটা জায়গা বেশী খঁড়তে হবে, এই মাত্তর। নয় তো তোদের ডাকব কেনরে? তোদের এতগুলো মানুষকে দশকুড়ি করে টাকা দিতে আমার কতগুলো টাকা যাবে বল তো? সাধ করে কেউ তা দেয়? কিন্তু কি করব, আজ রাত্তিরে খুঁড়ে তোলা চাই সব, কাল আরও তিন জনে ছাড়া পাবে।'

বিপিন নামে একজন বলিল, 'দশ লয় বাবুমশায়, বারো কুড়ি বলেছ।'

ভীম বলিল, 'আচ্ছা আচ্ছা তাই দেব—বারো কুড়িই দেব। আগে খুঁড়েই বার কর তো বাক্সটা। সব যদি পাইরে আমি, তোদের বারো কুড়ি করে টাকা দিতে মরব না। কোদাল ফোদাল যা আছে যার ঘরে সব খুঁজে পেতে নিয়ে আয় সবাই, একটু রাত্তির হলে সেথায় নিয়ে যাব। কারো কাছে কথাটি ফাঁস কোরোনি কিন্তু বাবু কেউ, তা হলে সব্বোনাশ হবে।'

মধু কাছে আসিয়া ফিস ফিস করিয়া অনুযোগ করিল, 'এত লোককে কেন বললে বাবুমশায়? বেছে বেছে কজনকে বললে হ'ত?'

ভীম বলিল, 'অনেক লোক চাই মধু, দু'চারজনের কম্মো নয়। রাতারাতি কত খুঁড়তে হবে তুই কি বুঝবি।'

পুলিশের কথা তুলিয়া দু'একজন একটু খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। ভীম তাদের অভয় দিয়া বলিল, 'কিসের পুলিশ?' জেল খেটে আসিনি আমি ও গয়না টাকার জন্য? ওসব এখন আমার সম্পত্তি। কিছু ভয় নেই বাবু তোদের—বিপদ ঘটে তো আমার ঘটবে, তোদের কি?

একে একে কোদাল খন্তা শাবল প্রভৃতি মাটি খুঁড়িবার যন্ত্র আসিয়া হাজির হইতে লাগিল। একজন, নেশাটা তার একটু জোরালো হইয়াছিল, ঘাড়ে করিয়া একটা লাঙল পর্যন্ত নিয়া আসিল। টাকার পরিমাণের কথা ভাবিয়া সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল, সকলকে শান্ত করিয়া রাখিতেই ভীমের বেগ পাইতে হইল বেশী। ক্রমে ক্রমে সব চেয়ে সন্দেহপ্রবণ ভীরু লোকটিরও ভীমের উপর বিশ্বাস জন্মিতেছিল। টাকা ও গয়না পুঁতিয়া রাখার কথাটাতে আশ্চর্যের কি আছে? ডাকাতি হইয়াছিল সত্য, গয়না ও টাকাগুলি কোন এক জায়গায় ডাকাতেরা লুকাইয়া রাখিয়াছিল বৈকি—সব ডাকাতেই তাই করে। তারপর ধরা পড়িয়া ডাকাতেরা যে জেলে গিয়াছিল, ভীম যে সাত বছর জেলে কাটাইয়া ছাড়া পাওয়া মাত্র গ্রামে ছুটিয়া আসিয়াছে, তাও মিথ্যা নয়। সন্দেহ করার কি আছে তবে? আজ রাতারাতি সবাই তারা বড়লোক হইয়া যাইবে।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল, চাঁদটা আকাশের অনেকখানি উঁচুতে উঠিয়া কিছুক্ষণের জন্য চারিদিক জ্যোৎস্নায় ঢাকিয়া দিল, তারপব মেঘ উঠিয়া নামিল বৃষ্টি। ভীম বলিল, 'চ' মধু, এবার আমরা যাই।'

'বিষ্টির মধ্যে?'

'তাইতো ভাল, কেউ দেখতে পাবে না যাবার সময়।'

কারো দেখিতে পাওয়ার সম্ভাবনা বৃষ্টি না নামিলেও খুব বেশী ছিল না। গ্রামের প্রান্তে নদীর কাছাকাছি বাগ্দীপাড়া, সন্ধ্যার পরেই এ অঞ্চল নির্জন হইয়া আসে।

খুঁড়িবার যন্ত্রপাতি কাঁধে করিয়া সাতাশ জন পুরুষ ও পাঁচটি মাঝ বয়সী স্ত্রীলোক কিছু পিছনে চলিতে লাগিল, আগে আগে নদীর দিকে হাঁটিতে হাঁটিতে বৃষ্টিতে ভেজা সত্ত্বেও ভীমের মনটা খুসী হইয়া উঠিল। এর নাম সর্দারি। এমনি ভাবে দল বাঁধিয়া এক একটা মানুষ সংসারে বড় বড় কাজ করে। সে কোথায় নিয়া চলিয়াছে সকলকে এই বর্ষা বাদলের মধ্যে? তার নিজের কাজের জন্য! তার অনেক দিনের স্বপ্ন সফল করার জন্য! আত্মপ্রসাদের অন্যমনস্কতায় জোরে জোরে পা ফেলিয়া হাঁটিতে গিয়া পিছল পথে ভীম একবার একটা আছাড় খাইল। তা হোক। জল মাটির সঙ্গে আজ তার পীরিতির সীমা নাই। বত্রিশজন মানুষ মিলিয়া আজ যে মাটি খুঁড়িয়া তুলিবে, মুঠা ভরিয়া সে মাটি তুলিয়া নিজের মুখে মাখিতেও ভীমের আজ আপত্তি থাকিবে না।

নদীর ধারে বাঁধের উপর উঠিয়া ভীম বাঁধ ধরিয়াই সোজা দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিল। কিছু দূর আগাইয়া বাঁয়ে দেখা দিল ক্ষেত, তারপর ছোটখাট একটা জঙ্গল। আধা জঙ্গল আধা বাগান এটা, আম কাঁটাল পলাশ পিপুল বাবলা প্রভৃতি গাছগুলি বিশৃঙ্খলভাবে গজাইয়া উঠিয়া বাঁধের গা পর্যন্ত ঘেঁষিয়া আসিয়াছে, বড় বড় গাছের ফাঁকগুলিতে শুধু জঙ্গুলে-চারা ঠাসা। আরও খানিকটা আগাইয়া ভীম থামিয়া গেল। এখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশের মেঘ পাতলা হইয়া আসায় একটা অপার্থিব মৃদু সাদাটে আলোয় চারিদিক অস্পষ্টভাবে নজরে পড়িতেছে। সকলের আগে ভীম সাবধানে সঙ্গের নরনারীদের গুণিয়া দেখিল, তারপর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলিল, 'একজন কমল কেন রে? কে পিছনে পড়ে রইল?'

জবাব দিল মধু, বলিল, 'কুকী এসেনি বাবুমশায়, রাস্তায় পড়ে আছে।'

'কুকী আসছিল নাকি? আমি দেখিনি তো!'

'দেখেছ বাবুমশায়, দেখেছ। খন্তা লিয়ে মোটামতো মেয়েলোকটা আসছিল না, সে তো কুকী।'

মধু নাকি অনেক বারণ করিয়াছিল কিন্তু কুকী কথা শোনে নাই, প্রাণপণে তাড়ি গিলিয়াছিল। তারপর আসিতে আসিতে ধপাস্। নাড়া দিয়া হুঁস নাই দেখিয়া রাস্তার ধারে গাছতলার দিকে ঠেলিয়া দিয়া মধু চলিয়া আসিয়াছে।

'বিষ্টিতে হুঁস্ হলে ঘরকে ফিরে যাবে বাবুমশায়।'

সেজন্য ভীম ভাবে না, সে শুধু অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল যে কুকীকে সে চিনিতে পারিল না কেন? খন্তাধারিণী মোটা স্ত্রীলোকটির দিকে তো কতবার তার চোখ পড়িয়াছিল! চিনিতে পারিলে কুকীর সঙ্গে দুচারটা কথা বলিত ভীম। কিন্তু কুকীও কেন তাকে চিনিতে পারে নাই? তার তো চিনিতে কোন বাধা ছিল না! মধুর ভয়ে কি কুকী তার সামনে আগাইয়া আসে নাই, তার সাত বছরের দুর্দশার জন্য বিনাইয়া বিনাইয়া একটু সহানুভূতি জানাইবার চেষ্টা করে নাই, নিজে সে এতকাল কত কষ্ট পাইয়াছে সে কাহিনী বলিবার সাধ দমন করিয়াছে? মেজ-কর্তার সম্মুখ হইতে ভীম অনায়াসে বিষণ্নমুখে উঠিয়া আসিতে পারিয়াছিল, এখন

কিন্তু মধুকে তার মুখ ভ্যাংচাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। অন্তরটা গভীরভাবে নাড়া খাইলে ভীমের মুখের চামড়াই সকলের আগে বিদ্রোহ করে!

বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভীমের দলটির প্রচণ্ড উৎসাহ ও উত্তেজনা মাঝখানে একটু দমিয়া গিয়াছিল, এইখানেই আশে-পাশে কোথাও টাকা ও গয়নাগুলি পোঁতা আছে বুঝিতে পারিয়া এবং তাড়ির নেশায় আজ সকলেরই বুঝিতে পারার প্রক্রিয়াটা একটু কম-বেশি বিশেষ ভাবে সম্পন্ন হইতে থাকায়, সকলে আবার মহোৎসাহে কলরব জুড়িয়া দিল।

ভীম বলিল, 'চুপ্, চুপ্! একদম চুপ সবাই।'

সকলেই আজ ভীমের একান্ত বাধ্য ও অনুগত। মুহূর্তে সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেল। বাঁধের গা ঘেঁষিয়া, পরস্পরের প্রায় ত্রিশ হাত তফাতে দুটি পিপুল গাছ আকাশে মাথা তুলিয়াছিল। সেই গাছ দুটি দেখাইয়া দিয়া ভীম সকলকে বুঝাইয়া বলিল যে এই দুটি গাছের মাঝখানে বাঁধের কোন এক স্থানে তাদের প্রার্থিত গয়না ও টাকা পোঁতা আছে। ঠিক কোনখানে পোঁতা আছে ভীম তা বলিতে পারিবে না, পুঁতিবার সময় তাড়াতাড়ি ছোট একটা পাথর জায়গাটার উপরে চিহ্নস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছিল, পাথরটা যে কোথায় গিয়াছে! কেউ হয়ত সরাইয়া নিয়া গিয়াছে। না, কেউ মাটি খুঁড়িয়া আগেই সব তুলিয়া নিয়া গিয়াছে কারো এ ভয় করার কারণ নাই। কে জানিত যে পাথরটার তলে বিশ বাইশ হাজার টাকার গুপ্তধন পোঁতা আছে? তাছাড়া আগে এখানটা খোঁড়া হইয়া থাকিলে তার চিহ্ন থাকিত, টাকা ও গয়না অনেক নীচে পোঁতা আছে,' অনেক ভিতরের দিকে। বাজে কথায় সময় নষ্ট না করিয়া সকলে বাঁধের এদিকের ঢালুর মাঝামাঝি স্থানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিক, তারপর কোনদিকে কি ভাবে কত দূর পর্যন্ত খুঁড়িয়া চলিতে হইবে, যথাসময়ে ভীম সে নির্দেশ দিবে। প্রাণপণে খাটুক সকলে, সমস্ত আলস্য ভুলিয়া যত তাড়াতাড়ি পারে খুঁড়িয়া চলুক, কেননা, আজ রাত্রির মধ্যেই যেমন করিয়া হোক লোহার বাক্সটা তো আবিষ্কার করা চাই।

সৈন্যদের মতো উচ্চস্তরের নিখুঁত ট্রেনিং কয়েদীরা না পাক, দল বাঁধিয়া ওয়ার্ডারের হুকুমে ওঠাবসা চলাফেরা করার কায়দাটা তারা আয়ত্ত করে। দুঃখের বিষয়, ভীমের দলে জেলের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন কয়েদী কয়েকজন থাকিলেও সমস্ত দলটাকে পরিচালনা করিতে তাকে বেগ পাইতে হইল কম নয়। তবু যতটুকু শৃঙ্খলার সঙ্গে সকলকে সে মাটি খুঁড়িবার কাজে লাগাইয়া দিতে পারিল তাও তার সাত বছর জেলে থাকিবার ফল। নিজেকে একদল কয়েদীর ভার-প্রাপ্ত ওয়ার্ডার কল্পনা করিলে ভীমের আনন্দ হইত সন্দেহ নাই কিন্তু তার অনেক দিনের চিন্তা-পুষ্ট আরও বড়, আরও উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার কাছে এসব কল্পনা এখন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। আকাশ আরও পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। জ্যোৎস্নার তেজ বাড়িয়াছে। বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ভীমের চোখ দুটি মিট মিট করিতে লাগিল। ভীমের চোখে আধা'বন আধা'বাগানটির মধ্যে বিশ্বের রহস্য আসিয়া আজ জমাট বাঁধিয়াছে ভীতিকর সর্বনাশা সম্ভাবনা এবং কারণহীন আতঙ্ক সে সমস্ত মিশিয়া

গড়িয়া উঠিয়াছে প্রত্যেকটি দুরত্বের দেবদেবী ও ভূতপ্রেত, জীবনে শুধু যাদেরই চরম কর্তৃত্ব। এদিকে নদীর জলরাশি ভাটা সুরু হওয়ার সম্ভাবনায় থম থম করিতেছে। এখন তার জল বাড়িবে না। আর কতটুকু উঠিতে পারিলে ঘোলাটে জল বাঁধটা ডিঙ্গাইতে পারিত? দেড় হাত? দুহাত? এবার জল কমিতে আরম্ভ করিবে। সমুদ্রের জলের দেবতা নদীর জল শুষিতে আরম্ভ করিবেন। তা হোক, সে দেবতা ডাকাত নন, কৃপণ নন। শেষ রাত্রে জোয়ারের কৌশলে সমস্ত জল তিনি ফেরত পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম ইঙ্গিতে আসিবে মানুষের বুক সমান উঁচু ফেনিল সশব্দ বন্যা। ততক্ষণে ভীম তার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। বছরের পব বছর ধরিয়া যে মাটির বাঁধ নদীর এই জল রাশিকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, ঝপাঝপ্ শব্দে একত্রিশটি কোদাল শাবল ও খন্তা আজ ভীমের ইঙ্গিতে ক্ষয় করিয়া চলিয়াছে তার অঙ্গ। এখানে বাঁধের ত্রিশ হাতেরও বেশী অংশ হইয়া থাকিবে কয়েক হাত চওড়া মাটির একটা পর্দা, জোয়ারের প্রথম আবির্ভাবে সে পর্দা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। তারপর কে ঠেকাইয়া রাখিবে জোয়ারের ক্রমবর্ধনশীল নদীর দুরন্ত জল-রাশিকে? একবার একটি সঙ্কীর্ণতম প্রবেশ পথ পাইলে নদীর জল দুপাশের বাঁধ ভাঙিয়া ভাঙিয়া নিজের পথ বড় করিয়া নিবে নিজেই। বাঁধের এপাশের নদী গিয়া পৌঁছিবে বাঁধের ওপাশের গ্রামে। মাঠে ঘাটে পথে, বাড়ির উঠানে, ঘরের রোয়াকে ঘরের মেজেতে, চৌকির বিছানায়—কে জানে আরও কত উঁচুতে উঠিবে নদীর জল! বাবুদের বাড়ির দোতালায় পৌঁছিতে পারিবে না এই যা আপশোষ। চোখের পলকে বন্যাটা গিয়া যদি সমস্ত গ্রামকে, বিশতলা জলের নীচে তলাইয়া দিতে পারিত, যদি নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যাইত হরিখালি গ্রাম!

কুকী যদি গাছতলাতেই নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া ঘুমাইয়া থাকে, সে বোধ হয় তবে ডুবিয়া মরিয়া যাইবে। যতখানি জল পৌঁছিবে সেখানে বেহুঁস ঘুমন্ত মানুষকে ডুবানোর পক্ষে তাই যথেষ্ট।

ভীমের মুখটা যেন হঠাৎ বিকৃত হইয়া নদীকে ভেংচাইয়া উঠিল। এ মুদ্রা-দোষটা বড় অবাধ্য।

প্যাঁক

মোটর বললে, প্যাঁক।

হাঁসও বললে, প্যাঁক।

মোটর থামিয়ে মাংসে খেলাম। কেবল রান্না-করা হাঁসের শক্ত মাংসে নয়, শকুন্তলার কাঁচা নরম নিটোল—

মোটরের দুটি হর্ণ যেন। কিন্তু বোবা। বিধাতা কি হর্ণ বাজান নিঃশব্দে?

গাছতলায় কাঁটা-ঝোপের আড়ালে ঝরাপাতা আর মরাফুলের শয্যা—

আর লেখা গেল না। সুশান্তের নাকে গন্ধ লাগিয়াছে চিংড়ী মাছ ভাজার, মনে ধাক্কা লাগিয়াছে আকস্মিক ক্ষোভের। মোটর কোথায়? শকুন্তলা? কোথায় হাঁস? রান্না করা হাঁসের শক্ত মাংস? গাছতলা, কাঁটা-ঝোপ, ঝরাপাতা, মরাফুল? মুখে একটা বিড়ি গোঁজা, হাতে একটা সস্তা কলম, তক্তপোষে একটা ময়লা চাদর, শীতের গোড়ায় ঘর জুড়িয়া একটা বর্ষাকালের ভাপ্‌সা গুমোট।

শূন্য ঘর, সেইজন্যই যেন আসলে যত ছোট তার চেয়েও ছোট মনে হয়।

তবু সব সহ্য হয় সুশান্তের, চোখের উপরে যে পর্দা পড়িয়াছে তাতে সব আড়াল হইয়া থাকে, কিন্তু এই কলম-ধরা শীর্ণ হাতের মুঠায় হর্ণ কই?

একতলার ভাড়াটে শিবচরণের মোটা শক্ত হাতের মুঠা হর্ণ বাজাইয়া বাজাইয়া ক্লান্ত। বেচারী ট্যাক্সি চালায়, অনেকদিনের পুরানো একটা ট্যাক্সি। গাড়িটা তার বৌ-এর চেয়েও পুরানো, বৌ তো সবে তার তৃতীয় সন্তানটির মুখে স্তন দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চিংড়ী মাছ বোধ হয় রাঁধিতেছে শিবচরণের বোন মালতী। সে-ই দুবেলা রান্না করে, কারণ শিবচরণের অন্ন তার দুবেলাই খাইতে হয়, এখনও স্বামী জোটে নাই। মালতীর জন্য সুশান্তের মনে একটু মমতা আছে, সে দুবেলা রান্না করে বলিয়া অথবা এখনও স্বামী জোটে নাই বলিয়া, সুশান্ত ঠিক জানে না। তবে মালতী কাঠির মতো সরু বলিয়া যে নয় তাতে সন্দেহ নাই। কাঠির মতো রোগা হোক, রোগা মেয়েটা ভোগে না। একতলাটা শিবচরণ ভাড়া নিয়াছে বছর দুই, এই দুবছরের মধ্যে মেয়েটা না পড়িয়াছে একদিনের জন্য জ্বরে, না ধরিয়াছে একদিনের জন্য তার মাথা, পুরানো মোটর হুডে আড়াল করা পিছল কলতলায় একদিনের জন্য আছাড় পর্যন্ত সে খায় নাই। মনস্তত্ত্বের খান কয়েক বই পড়িয়া মনের ভাব বিশ্লেষণ করিবার স্বাভাবিক অন্ধ ক্ষমতাটা বজ্রাহত চারার মতো মরিয়া গিয়াছে,

নিজের মনে যে ভাব জাগে নিজেই তার একটা কারণ নিঃসন্দেহে আবিষ্কার করিতে সে আর পারে না, তাই শুধু অনুমান করে যে হয়ত মালতীর মুখের চিরস্থায়ী অতি মৃদু পুলকের ছাপটা তার মমতার কারণ। কিছু নাই মালতীর, তবু যেন কোন একটা কারণে সে কিছু চায় না, আলস্যের মতো অতি জলো একটা আনন্দ দিবারাত্রি বিনামূল্যে উপভোগ করে। কি ভাবে এক চামচ চিনি সংগ্রহ করিয়াছে বেচারী, তাই দিয়া তৈরী করিয়াছে এক পুকুর সরবৎ, ক্রমাগত পান করিয়া যায় তবু ফুরায় না।

দামী প্যাডের উপর সস্তা কলমটা রাখিয়া সুশান্ত ঘরের সম্মুখে রোয়াকে আসিয়া দাঁড়ায়। দেড় হাত চওড়া ত্রিকোণ রোয়াকে, তিনদিকে চারখানা ঘর, একটিতে সুশান্তর মা দুবেলা রাঁধেন, স্বামী-পুত্রকে ভাত বাড়িয়া দেন আর দুবেলা ভাতের হাঁড়ি চাঁছিয়া মাছের কাঁটা বাছিয়া ভাল তরকারী পাত্র পুঁছিয়া স্বামীর থালাতে জড়ো করেন, পেট নাকি তাঁর এই ভাবেই দুবেলা আকণ্ঠ ভরিয়া ফেলা সম্ভব হয়।

সুশান্তের মার এই অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শিবচরণের বৌ জানে। তাই মাঝে মাঝে ঠিক এই সহানুভূতি জানাইতে পাঠাইয়া দেয়। পাঠায় সে অন্য মতলবে, কিন্তু মালতীর মনে হয় কুকুর বিড়ালের মতো থালা বাটি চাটিয়া পেট ভরানোর কৌশলটা শিখিতে পাঠাইয়াছে।

নিজেকে একই দুঃখে দুঃখী মনে করায় সহানুভূতিটা সে জানাইতে পারে আন্তরিক আর গভীর। দুচোখে জল পর্যন্ত আসিয়া পড়ে।

'ওই খেয়ে কি ক'রে বাঁচবেন মাসীমা?'

সুশান্তের মা বাঁ হাতে কপালে করাঘাত করেন।

'কোন সাধ কি মিটবে, কপাল যে পোড়া!'

মালতীর সহানুভূতি আরও গভীর হইয়া আসে। বুকের ভিতর তোলপাড় করে।

'কপাল না পোড়া হলে ছেলে আমার বিগড়ে যায়, তোর মতো লক্ষ্মী মেয়েকে বৌ করতে পারি না! দেবে এবার তোর দাদা তোকে কার হাতে বিলিয়ে, আমার শেষে জুটবে একটা অলক্ষ্মী পেত্নী। আমার অদৃষ্টে সুখ নেই মালতী।'

দুবেলা পেট ভরিয়া ভাত জোটার চেয়ে দরদী ছেলের বৌ থাকাটা বেশী সুখের কিনা মালতী জানে না। তার বিগড়ানো ছেলের হাতেই বোনকে দিবার জন্য শিবচরণ যে ওৎ পাতিয়া আছে, সুশান্তের মাকে কোন কৌশলে এ সংবাদটা দিতে না পারিয়া মনটা খুঁত খুঁত করে মালতীর। একটু ভাবিয়া এতক্ষণের আন্তরিক দরদের সঙ্গে আরও খানিকটা কৃত্রিম দরদ জানায়, দরদ জানানো ছাড়া আর কিছু তো তার করিবার উপায় নাই।

'যা রাঁধেন সব দিয়ে দেন, নিজের জন্যে কিছু রাখেন না। আমি হলে—'

'নেই বাছা নেই, অদৃষ্টে আমার সুখ নেই। ছেলেটা নইলে মানুষ হয় না? তোকে বৌ করে এনে দুটো দিন একটু সুখের মুখ দেখতে পাই না?'

আর সকলের মতো, জীবনযাত্রার মতো, কথাও দুজনের এক সুরে বাঁধা। এক

সময়ে কেবল একটা আপশোষ থাকে, অন্য আপশোষগুলি খাজনা দিয়া রাজার মতো তাকেই করে পুষ্ট।

'চিংড়ি মাছ রাঁধছিলি তুই?'

'হ্যাঁ, এই বড় বড় চিংড়ী মাসীমা, তেরোটাতে প্রায় দু'সের হবে। ভাজতে গিয়ে সব তেল ফুরিয়ে গেল বলে বৌ এমন বকছিল।'

'কত করে সের নিলে?'

'কেনা নয় তো, কে যেন দাদার গাড়িতে ফেলে গিয়েছিল। কার জিনিস কে খায়।'

একটু লজ্জা বোধ করে মালতী, কুড়াইয়া পাওয়া চিংড়ি মাছ, তাও সংখ্যায় তেরটা, ভাগ দেওয়া উচিত ছিল বটে। কিন্তু সুশান্তের মা নিশ্চয় জানেন ভাগ দেওয়া না দেওয়ার মালিক সে নয়? একটু আমতা আমতা করিয়া মালতী বলে, 'একটা মাছ এনে দেব মাসীমা? দিই না, এ্যা?'

ভয়ে বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে। যদি রাজী হইয়া যান সুশান্তের মা, যদি সস্নেহে হাসিয়া বলেন, দিবি অচ্ছো দে! তারপর বৌদি যদি সুশান্তর মাকেও একটা চিংড়ি মাছ ভাগ দিতে রাজী না হয়, তার স্বামীর কুড়াইয়া পাওয়া চিংড়ি মাছ? ভাগাভাগি বৌদি ভালবাসে না। সে মেয়েমানুষ বটে, কিন্তু এবিষয়ে স্বভাবটা দুর্যোধনের মতো।

কারণ-না জানা মমতাটুকুর জন্যই সুশান্তর রোয়াকে দাঁড়ান। খাওয়ার সময় সুশান্তর মাকে সহানুভূতি জানাইয়া ফিরিবার সময় রোয়াকে তাকে না দেখিলে মালতী রাগ করে, এত বেশী রাগ করে যে সেদিন রাত্রে সে আর আসে না। অনেক রাত্রে ট্যাক্সি নিয়া ফিরিয়া আসিয়া বার কয়েক হর্ণটা প্যাঁক প্যাঁক করিয়া শিবচরণ বাড়ির আর পাড়ার অনেকের ঘুম ভাঙায়। মালতী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেয়, ভাত বাড়িয়া দেয়, শিবচরণ শুইয়া পড়িলে নিজেও শোয়, হর্ণের প্যাঁক প্যাঁক শব্দে যাদের ঘুম ভাঙিয়াছিল তাদের মতো আবার সে ঘুমাইয়া পড়ে কিনা ভগবান জানেন, কিন্তু আর উঠিয়া আসে না। দামী প্যাডে সস্তা কলমে আঁচড় কাটিয়া, মাঝে মাঝে একটা দুটা সিগারেটের মেশাল দিয়া বিড়ি টানিয়া, বার বার রোয়াকে গিয়া নীচের অন্ধকার উঠানের দিকে চাহিয়া থাকিয়া রাত্রি জাগাই সুশান্তর সার হয়। কত করিয়া মালতীকে সে বুঝোয়, কত বলে যে অমন মৃদু নিঃশব্দে পদসঞ্চারে মালতী চলাফেরা করে, রোজ কি তার পক্ষে টের পাওয়া সম্ভব সে কখন উপরে আসিয়াছে, দু'একদিন সময় মতো রোয়াকে গিয়া না দাঁড়াইলে তার কি রাগ করা উচিত?

মালতী বুঝিয়াও বোঝে না।

'পায়ের আওয়াজ নাই বা পেলে, আমি ওপরে আসি মাসীমা যখন খেতে বসেন তখন।'

'মা কখন খেতে বসে জানব কি করে?'

'খেয়াল রাখলেই জানা যায়। তোমাদের খাইয়ে তবে মা ফেলা ছড়া যা থাকে নিয়ে—'

আলাপ আলোচনার এদিকটা সুশান্ত এড়াইয়া যায়। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'তুমি কিছু বোঝ না। লিখতে বসলে আমার কি কিছু খেয়াল থাকে না, খেয়াল থাকলে লেখা যায়? নিজে যদি লিখতে তা হলে বুঝতে মানুষের গভীর মনের সুখদুঃখের রূপ দিতে হলে বিশ্বসংসারকে ভুলে যেতে হয়। তুমি বুঝবে না মালতী, বুঝবে না।'

অন্য সকলের মতো জীবনযন্ত্রার ক্ষোভও এক সুরে বাঁধা। ক্ষোভের জ্বালায় মাথার মধ্যে পর্যন্ত ঝিম ঝিম করে, মাথা নাড়িয়া জোর দিয়া সে বলে, 'বুঝবে না, তুমি বুঝবে না মালতী।'

মালতী অবশ্য দরদের সঙ্গেই বলে, মানুষ যা বোঝে না মানুষকে তা বোঝাবার দরকার? কিন্তু মালতী তো বোঝে না এক ধরনের মানুষ আছে জগতে এক ধরনের দরদের সঙ্গে এক ধরনের রূঢ় কথা বলিলে যাদের স্নায়ুগুলি ফাঁসির আসামীর মতো আড়ষ্ট হইয়া যায়—মনে হয় জীবন-কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পৃষ্ঠা আসিয়া গিয়াছে জীবনটার মাঝামাঝি।

আসলে নিন্দাপ্রশংসার কথা নয়, বোঝা না বোঝার প্রশ্ন নয়, অন্য মানুষকে খুন করিয়া ক্রমাগত ফাঁসি কাঠে আত্মহত্যা করিতে গেলে ক্ষোভ জাগিবেই। অনাবৃত বিবর্ণ কাঠের টেবিলে দামী প্যাড পাতিয়া সস্তা কলমের সাহায্যে একটা আন্তর্জাতিক মহাযুদ্ধে যত বাছা বাছা লোক মরে তার চেয়ে বেশী লোক মারিবার ফন্দি আঁটিতে থাকিলে এ বিপদটা অবশ্যম্ভাবী! মাথায় লাঠি মারিয়া এ যন্ত্রণার অবসান করিবার যদি কেউ থাকিত, ছাদটা হুড়মুড় করিয়া মাথায় ভাঙিয়া পড়িবার সম্ভাবনা যদি থাকিত, অন্ততঃ শকুন্তলাকে পাশে নিয়া যারা গাছতলায় ঝোপের আড়ালে ঝরা পাতা আর মরা ফুলের শয্যার উদ্দেশ্যে সত্য সত্যই উধাও হইতে জানে এবং পারে তাদের মধ্যে একজনও যদি সজোরে হর্ণ টিপিয়া বীভৎস প্যাঁক প্যাঁক শব্দে সতর্ক করিয়া দিতে দিতে মার্ডগার্ডের ধাক্কায় বিশ পঁচিশ হাত তফাতে গাছতলায় ঝোপের আড়ালে ঝরা পাতা আর মরা ফুলের শয্যায় ছিটকাইয়া দিত, ক্ষমতা থাকিলে গালাগালি দিবার ছলে সুশান্ত তাকে আশীর্বাদ না করিয়া ছাড়িত না।

মোট কথা, মালতীর ফিরিয়া যাওয়ার সময় রোয়াকে না দাঁড়াইয়া থাকিলে মালতী আর ফিরিয়া আসে না।

সুশান্ত বাবাকে গিয়া বলে, 'মোটর-ড্রাইভিং শিখব বাবা?'

শিবনেত্র হইয়া তামাক টানাটা অনাথবন্ধুর স্বভাব। মুখের দিকে না চাহিলে বোঝা যায় না তার গাম্ভীর্য আসলে জড়বস্তুর প্রাণহীন আলস্যের নকলনবিশী। তবু মানুষটা তো জীবন্ত, রোজ আপিস যাতায়াত করেন। তাই ছেলের প্রস্তাবে থতমত খাইয়া রাগিয়া উঠিতে পারেন।

'যা শেখ গে মোটর-ড্রাইভিং—দূর হয়ে যা।'

মোটর-ড্রাইভিং শিখিবে। ছোটছেলের খেলনার মোটরের মধ্যে যেটুকু বাস্তবতা আছে তার সঙ্গে পরিচয় করিতে যার দম বন্ধ হইয়া আসিবে, সে শিখিবে মোটর-

ড্রাইভিং, সে করিবে মোটর হাঁকাইয়া অর্থোপার্জন। তাছাড়া ভদ্রলোকের ছেলে অর্থোপার্জন করিয়া মোটর হাঁকায়, মোটর হাঁকাইয়া অর্থোপার্জন করে না। কষ্ট করিয়া মোটর-ড্রাইভিং শিখিবার কি দরকার, রিকসা টানুক না সুশান্ত? একই কথা, তাতেও পয়সা আসিবে। অমন পয়সা রোজগারের মুখে আগুন!

রাগে আগুন হইয়া অনাথবন্ধু স্নান করিতে গেলেন, আপিসের বেলাও তখন হয় নাই, সুশান্তর মার আপিসের রান্নাও শেষ হয় নাই। দেহে জল ঢালিলে মনের যে রাগের আগুন নিভিয়া যায়, অনাথবন্ধুর রাগটাও সেই সাধারণ পর্যায়ের। স্নান করিয়া ঠান্ডা হইয়া বসিয়া ছেলেকে তিনি ডাকিলেন।

'কোথায় শিখবি মোটর-ড্রাইভিং?'

'স্কুল আছে, মোটর-ড্রাইভিং-এর সঙ্গে মেক্যানিকাল ট্রেনিংও দেবে, ছয়মাসের কোর্স।'

অনাথবন্ধু আবার থতমত খাইয়া রাগিয়া উঠিলেন।

'মাইনে দিয়ে শিখবি? স্কুলে? তোর যত সব উদ্ভট খেয়াল।'

'তিন মাসের একটা কোর্স আছে বাবা, মাইনে বেশী নয়।'

'না না, ওসব মোটর-ড্রাইভিং শিখতে হবে না। একদিন আলু আনতে দিলে যে পাকা পটল কিনে আনে তার আবার মোটর-ড্রাইভিং। মানুষ চাপা দিয়ে জেলে যাবি তো শেষে।'

আজ সকালেই বাজারে আলু কিনিতে গিয়া সুশান্ত পটল কিনিয়া আনিয়াছিল, পাকা শুকনো পটল। বাপের যুক্তিটা তাই অস্বীকার করা গেল না।

তবে শিবচরণের কাছে শিখিতে বাধা নাই। মোটর চালনায় তালিম দিতে শিবচরণের আগ্রহই দেখা গেল, খুঁত খুঁত করিল সে অন্যদিকে। পথের বাস্তবতার ছাপ মারা কর্কশ মুখের চামড়া খোঁচ করিয়া, কলহ কলরবে মজবুত কণ্ঠস্বরকে ভদ্র করিবার চেষ্টা করিয়া ভয়ে ভয়ে সে বার বার বলিতে লাগিল, চাকরী বাকরী না করিয়া এসব কেন?

'আমি ভাবলাম সখ করে শিখতে চান, নইলে গাড়ি চাল্যান শিখে আপনার দরকারটা কে দাদা, এ্যাঁ? এ কি ভদ্দরলোকের কাজ, এতে কি আর পয়সা আছে!' শিবচরণ ভীত চোখে চাহিয়া থাকে, আহা রোগা দুর্বল বোনটাকে ভদ্রলোকের হাতে দিবার কল্পনা কি তার শেষ হইয়া গেল।

সুশান্ত বলে, 'চাকরীর চেয়ে তো পয়সা বেশী আছে।'

'কে বললে আছে, ওসব আজগুবি কথা মশাই, না জেনে অমন সবাই বলে। এগার বছর এ লাইনে আছি, আমি জানি না ভিতরকার খবর? উপায় থাকলে আমি তো দাদা একটা দিন গাড়ি হাঁকতাম না। আদ্ধেক খাটুনির দাম উঠে না, মানুষ এ লাইনে আসে!'

পরম ক্ষোভের চরম আঘাতে যে ঝোঁক চাপিয়াছে, শিবচরণের উপদেশে সেটা যাইবার নয়। কোনদিন সকালে কোনদিন বিকালে শিবচরণের সঙ্গে সুশান্ত বাহির হইয়া যায়, প্রথম মোটর গাড়ির চড়িবার আরামে গাড়ি চালানর সহজ ধরা বাঁধা

কৌশলগুলিও একরকম কিছুই শেখা হয় না। শিখিবার ঝোঁকটা কিন্তু সমান থাকিয়া যায়। কয়েকদিন পরেই সখটা তার মিটিয়া যাইবে, ভদ্রের স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবার জন্য আর সে আবদার ধরিবে না,—শিবচরণের এই আশাটা কেন সফল হইবে না মনে হয়।

সুশান্ত বলে, 'এমন কি মন্দ রোজগার? বেশ তো আরামের কাজ।'

শিবচরণ বলে, 'শুনুন একটা কথা বলি আপনাকে। এসব কাজের জন্য একটু কাটখোট্টা শক্ত শরীর দরকার হয়, আপনার কি জানেন তেমন জোরাল শরীর তো নয়, মানে ভদ্রলোকের দেহ তো আপনার, এসব কাজ আপনার পোষাবে না।'

শিবচরণ অবশ্য দরদের সঙ্গেই কথাগুলি বলে, কিন্তু মালতীর মতো সেও বোঝে না একধরনের মানুষ আছে জগতে একধরনের দরদ দিয়া একধরনের রূঢ় কথা বলিলে যাদের স্নায়ু ফাঁসির আসামীর মতো উত্তেজিত হইয়া উঠে। আর সে উত্তেজনা কাজে না লাগায় বড় কষ্ট পায়।

এক মাস সুশান্ত ধৈর্য ধরিয়া খেয়াল মাফিক মোটর চালান শেখে। মন দিয়া উৎসাহের সঙ্গে শেখে, কিন্তু এক মাসে অভিজ্ঞতা জন্মে যেন মোটে এক দিনের। পথের বাস্তবতা ধুলোবালি আবর্জনার চেয়ে নোংরা, অসংখ্য মানসিক ব্যাধির বীজাণুতে বোঝাই। শিবচরণের মতো অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন পাকা যোদ্ধাকে সম্মুখে রাখিয়া একরকম দর্শক হিসাবেই সুশান্ত জীবনের এই প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে নামে, তবু এক মাসেই হৃদয় মন ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না—একটা আদর্শ টিঁকে না, একটা থিয়োরি খাটে না, একটা সখ সংস্কার স্থায়ী প্রশ্রয় পায় না, এ কোন জগৎ? সেই বা এতদিন এমন কিসের আড়ালে বাস করিয়াছে যে পথে ভাড়াটে মোটরে ভাড়াটের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ানকে বাঘ ভাল্লুক দৈত্য দানবের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে অবিরাম ছুটিয়া পালানর মতো মনে হয়। তার বাড়িতে পথের বাস্তবতা চিরদিন ছিল, এখনও আছে, পায়ে পায়ে পথের ধুলো যেমন অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, তেমনিভাবে পথের বাস্তবতা মনে মনে প্রতিদিন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, পথের ধুলোর মতো এই বাস্তবতাকেও তাই ঝাঁটাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা দরকার হয়, সকাল সন্ধ্যা ঘর ঝাঁট দিলেও যেমন আনাচে কানাচে পথের ধুলো থাকিয়া যায়, শত ব্যবস্থার মধ্যেও পথের বাস্তবতাও তেমনি আনাচে কানাচে আশ্রয় খুঁজিয়া পায়। তবে চাহিয়া না দেখিলে চোখে পড়ে না। দেখিতে না জানিলে চাহিয়া দেখা যায় না। শুধু অস্বীকার করিয়া যাওয়া চলে।

এক মাসে সুশান্ত এতখানি দার্শনিক জ্ঞান সঞ্চয় করে। প্রশস্ত রাজপথ, আঁকা বাঁকা সরু গলিতে শিবচরণের মোটর চালানর নির্ভয় নিশ্চিন্ত নিপুণতা আজকাল তাকে বড় ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে, সে বুঝিতে পারে এভাবে এ জীবনে এমন নিখুঁত মোটর চালান সে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। এমন কি শিবচরণের হাতে গাড়ির হর্ন যেমন বাজে, তার হাতে কোনদিন সেভাবে বাজিবে না। কতবার কতভাবে

সুশান্ত হর্নটা বাজাইয়া দেখিয়াছে, প্রত্যেকবার মনে হইয়াছে সুর কাটিয়া গেল, আওয়াজটা জমিল না।

তবে একটা যা ব্যাপার ঘটে, সুশান্ত কোনদিন কল্পনা করিতে পারে নাই।

মালতীর মৃদু অসহায় একটানা আনন্দের মধ্যে হঠাৎ সে যেন একদিন ঢেউ-এর আবির্ভাব অনুভব করিতে পারে। জড় পদার্থ ছাড়া যতটুকু প্রাণের অস্তিত্ব আর কিছুর মধ্যেই বোধগম্য হইবার নয়, ততটুকু পুলকের আতিশয্যও মালতীর মধ্যে অসাধারণ। হাত ধরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া মালতী বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, 'এক মাস গাড়ি চালাতে না চালাতে হাতে ফোস্কা পড়ে গেল?'

সুশান্ত কৈফিয়ৎ দিবার ভঙ্গীতে বলে, 'প্রথম প্রথম—'

মালতী অধীর ব্যাকুলতার সঙ্গে বলে, 'পড়ুক, পড়ুক, ফোস্কা পড়াই ভাল—সমস্ত হাতে ফোস্কা পড়ুক।' বলিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে থাকেঃ 'বুঝবে না, বুঝবে না, তুমি বুঝবে না।'

কারণে অকারণে মোটরের হর্ণ বাজাইলেই হাতে চিরদিন ফোস্কা পড়ে না—পথিককে সতর্ক করার জন্য কে তবে হর্ণ বাজাইত, মোটরের জন্য অন্য ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু সুশান্ত স্পষ্ট বুঝিতে পারে, শব্দের অর্থ রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। কাগজে যেভাবেই হর্ণ বাজানর কথা সে লিখুক, শকুন্তলা সঙ্গে সঙ্গে আগের মতো অভদ্রভাবে মনের মধ্যে বিচরণ করিতে ছুটিয়া আসে না। তাকে চেষ্টা করিয়া আনিতে হয়। আনিলেও পরাশরের সত্যবতীর মতো তার জন্য কিছু কিছু কুয়াশা মনের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া রাখিতে হয়।

এক মাস পরে তাই আবার একদিন সুশান্ত সস্তা কলমে কালি ভরে। দামী প্যাডের লেখা পাতাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিতে আরম্ভ করে।

মোটর বললে প্যাঁক।

হাঁসও বললে, প্যাঁক।

মোটর থামিয়ে মাংস খেলাম। হাঁসটার মাংস শক্ত, কিন্তু শকুন্তলা চমৎকার রান্না করে। মাংসের গন্ধে অদূরে গাঁ থেকে গোটা দুই কুকুর এসে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। গাছতলায় কাঁটা ঝোপের আড়ালে ঝরাপাতা আর মরামুকুলের শয্যায় বসে তাদের নিঃশব্দ আবেদন দেখতে দেখতে মনে হল, বিধাতা তো শুধু শকুন্তলার অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই ভাষা দেননি। বোবা কিছু সৃষ্টি করা কি বিধাতার ক্ষমতার বাইরে?

কুষ্ঠরোগীর বৌ

কোন নৈসর্গিক কারণ থাকে কিনা ভগবান জানেন, মাঝে মাঝে মানুষের কথা আশ্চর্য রকম ফলিয়া যায়। সমবেত ইচ্ছাশক্তির মর্যাদা দিবার জন্যও ভগবান বিনিদ্র রজনী যাপন করেন না, মানুষের মর্মাহত অভিশাপের অর্থও জ্বালাময় অক্ষমতা ঘোষণা করার অতিরিক্ত অন্য কিছুই নয়। তবু মাঝে মাঝে প্রতিফল ফলিয়া যায়, বিষাক্ত এবং ভীষণ!

এ কথা কে না জানে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন এবং এ কাজটা বড় স্কেলে করিতে পারার নাম বড়লোক হওয়া? পকেট হইতে চুপি-চুপি হারাইয়া গিয়া যেটি পথের ধারে আবর্জনার তলে আত্মগোপন করিয়া থাকে সেটি ছাড়া নারীর মতো মালিকহীন টাকাও পৃথিবীতে নাই। কম এবং বেশী অর্থোপার্জনের উপায় তাই একেবারে নির্ধারিত হইয়া আছে, কপালের ঘাম আর মস্তিষ্কের শয়তানি। কারো ক্ষতি না করিয়া জগতে নিরীহ ও সাধারণ হইয়া বাঁচিতে চাও, কপালের পাঁচশো ফোঁটা ঘামের বিনিময়ে একটি মুদ্রা উপার্জন কর : সকলে পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্বাদ করিবে। কিন্তু বড়লোক যদি হইতে চাও মানুষকে ঠকাও, সকলের সর্বনাশ কর। তোমার জন্মগ্রহণের আগে পৃথিবীর সমস্ত টাকা মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দখল করিয়া আছে। ছলে বলে কৌশলে যেভাবে পার তাহাদের সিন্দুক খালি করিয়া নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমাও। মানুষ পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিশাপ দিবে।

ধনী হওয়ার এ ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই।

সুতরাং বলিতে হয় যতীনের বাবা অনন্যোপায় হইয়াই অনেকগুলি মানুষের সর্বনাশ করিয়া কিছু টাকা করিয়াছিল। সকলের উপকার করিয়া টাকা করিবার উপায় থাকিলে এমন কাজ সে কখনো করিত না। তাই, জীবনের আনাচে-কানাচে তাহার যে অভিশাপ ও ঈর্ষার বোঝা জমা হইয়াছিল সেজন্য তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা চলে না। তবু সংসারে চিরকাল পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয় হইয়া থাকে এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন বাপের জমা করা টাকাগুলি হাতে পাইয়া ভাল করিয়া ভোগ করিতে পারার আগেই মাত্র আটাশ বছর বয়সে যতীনের হাতে কুষ্ঠরোগের আবির্ভাব ঘটিল।

লোকে যা বলিয়াছিল অবিকল তাই। একেবারে কুষ্ঠব্যাধি।

মহাশ্বেতা একদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল : তোমার আঙুলে কি হয়েছে?

কি জানি। একটা ফুস্কুরির মতো উঠেছিল।

মহাশ্বেতা আঙুলটা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া বলিল: ফুস্কুরি নয়। চারদিকটা লাল হয়েছে।

আঙুলটা কেমন অসাড়-অসাড় লাগছে শ্বেতা।

একটু টিনচার আইডিন ল্যাগিয়ে দেব? নয়তো বলো একটা চুমো খেয়ে দিচ্ছি, এক চুমোতে সেরে যাবে।

আঙুলটি চুম্বন করিয়া মহাশ্বেতা হাসিল।

পুরুষ মানুষের আঙুল তো নয়, উর্বশী মেনকার কাছ থেকে যেন ধার করেছো। বাবা, মানুষের আঙুলের রঙ পর্যন্ত এমন টুকটুকে হয়! রক্ত যেন ফেটে পড়ছে!

আঙুলটি যে-হাতে লাগানো ছিল স্বামীর সেই হাতটি মহাশ্বেতা নিজের গলায় জড়াইয়া দিল। জীবনে যে-কথা সে বহুবার বলিয়াছে আজ আর একবার সেই কথাই বলিল।

এ তোমার ভারি অন্যায় তা জান? তুমি এ্যাতো সুন্দর বলেই তো আমার ধাঁধা লাগে! তোমাকে ভালবাসি, না, তোমার চেহারাকে ভালবাসি বুঝতে পারি না। শুধু কি তাই গো? হুঁ, তবে আর ভাবনা কি ছিল! দিনরাত কি রকম ভাবনায়-ভাবনায় থাকি তোমার হলে টের পেতে। ঈর্ষায় জ্বলে মরি যে!

তারপর আর কিছুকাল বোঝা গেল না। শুধু আঙুলে নয়, যতীনের হাতে দু-তিন জায়গায় তামার পয়সার মতো গোলাকার কয়েকটা তামাটে দাগ যখন দেখা দিল, তখনো নয়। মহাশ্বেতার শুধু মনে হইল, যতীনের শরীরটা বুঝি ভাল যাইতেছে না; গায়ের রঙটা তাহার রক্ত খারাপ হওয়ার জন্য কি রকম নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। একটা টনিক খাওয়া দরকার।

দ্যাখো, তুমি একটা টনিক খাও।

টনিক খেয়ে কি হবে?

আহা, খাও না। শরীরটা যদি একটু সারে!

যতীন টনিক খাইল। কিন্তু টনিকে এ ব্যাধির কিছু হইবার নয়। ক্রমে আরও কয়েকটা আঙুলে তাহার ফুস্কুরি দেখা দিল। শরীরের চামড়া আরও কর্কশ, আরও মরা মরা দেখাইতে লাগিল। চোখের কোল এবং ঠোঁট কেমন একটা অস্বাস্থ্যকর মৃত মাংসের রূপ লইয়া অল্প অল্প ফুলিয়া উঠিল। স্পর্শ অনুভব করিবার শক্তি তাহার ক্ষীণ হইয়া আসিল। চিমটি কাটিলে তাহার যেন আর তেমন ব্যথা বোধ হয় না। দিবারাত্রি একটা ভোঁতা অস্বাস্থ্যকর অনুভূতি তাহাকে বিষণ্ণ ও খিটখিটে করিয়া রাখিল। এবং সকলের আগে যে আঙুলের ছোট একটি ফুস্কুরিতে মহাশ্বেতা চুম্বন করিয়া টিনচার আইডিন লাগাইয়া দিয়াছিল সেই আঙুলেই তাহার পচন ধরিল প্রথম!

ষোল টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন: আপনাকে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি। আপনার কুষ্ঠ হয়েছে।

বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন: টাইপটা খারাপ। একেবারে সেরে উঠতে সময় নেবে।

সেরে তাহলে যাবে ডাক্তারবাবু?

যাবে না? ভয় পান কেন? রোগ যখন হয়েছে সারতেও পারে নিশ্চয়।

এমন করিয়া ডাক্তার কথাগুলি বলিলেন, আশ্বাস দিবার চেষ্টাটা তাহার এত বেশী সুস্পষ্ট হইয়া রহিল যে কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না যতীনের এ মহাব্যাধি কখনো সারিবে না।

একশ' টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন : যতটা সম্ভব লোকালাইজড্ করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। তার বেশী এখন কিছু করা অসম্ভব। জানেন তো রোগটা ছোঁয়াচে, সাবধানে থাকবেন। আপনাকে তো বলাই বাহুল্য যে ছেলেমেয়ে হওয়াটা...বোঝেন না?

বোঝে না? যতীন বোঝে, মহাশ্বেতা বোঝে। কিন্তু ছ'মাস আগে যদি এই বোঝাটা বোঝা যাইত।

মহাশ্বেতা যেন মরিয়া গিয়াছে। অন্যায় অসঙ্গত অপঘাতে অকথ্য যন্ত্রণা পাইয়া সদ্য-সদ্য মরিয়া গিয়াছে। বিমূঢ় আতঙ্কে বিহ্বলের মতো হইয়া সে বলিল: তোমার কুষ্ঠ হয়েছে? ও ভগবান, কুষ্ঠ!

যতীন তখনো মরে নাই, মরিতেছিল। সাধারণ কথার সুর তাল লয় মান সমস্ত বাদ দিয়া সে বলিল: কি পাপে আমার এমন হ'ল শ্বেতা?

তোমার পাপ কেন হবে গো? আমার কপাল।

নিজের বাড়িতে আত্মীয় পরিজনের মধ্যে যতীন হইয়া রহিল অস্পৃশ্য। সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইবার সাধ থাকিলে বাধা অবশ্য কেহই তাহাকে দিতে পারিত না। কিন্তু সে গোপনতা খুঁজিয়া লইল। বাড়ির একটা অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া সেখানে নিজেকে সে নির্বাসিত ও বন্দী করিয়া রাখিল। মহাশ্বেতা ছাড়া আর কাহারো সেদিকে যাইবার হুকুম রহিল না। বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিয়া বাহির হইতে ফিরিয়া গেল, সামনাসামনি মৌখিক সহানুভূতি জানাইবার চেষ্টা করিয়া আত্মীয়স্বজন হইয়া গেল ব্যর্থ। যতীন নিজের পচনধরা দেহকে কারো চোখের সামনে বাহির করিতে রাজী হইল না। নিজের ঘরে সে রেডিও বসাইল, স্তূপাকার বই আনিয়া জমা করিল, ফোন বসাইয়া বাড়ির অন্য অংশ এবং বাহিরের জগতের সঙ্গে একটা অস্পষ্ট চাপা শব্দের সংযোগ স্থাপিত করিয়া লইল। জীবনযাপনের প্রথায় আকস্মিক পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের সীমা পরিসীমা রহিল না।

পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বর্জন করিলেও মহাশ্বেতাকে সে কিন্তু ছাড়িতে পারিল না। নিকটতম আত্মীয়ের দৃষ্টিকে পর্যন্ত পরিহার করিয়া বাঁচিয়া থাকার মতো মনের জোর সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিল বলা যায় না কিন্তু মহাশ্বেতার সম্বন্ধে সে শিশুর মতোই দুর্বলচিত্ত হইয়া রহিল। আপনার সংক্রামক ব্যাধিটিকে আপনার দেহের মধ্যেই সংহত করিয়া রাখিয়া মৃত্যু পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়া চিতার আগুনে ভস্ম করিয়া ফেলিবার যে অনমনীয় প্রতিজ্ঞা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিল, মনে হইল, মহাশ্বেতাকে সে বুঝি তাহার সেই আত্ম-প্রতিশ্রুতির

অন্তর্গত করে নাই। আত্মীয় পর সকলের জন্য সাবধান হইতে গিয়া মহাশ্বেতার বিপদের কথাটা সে ভুলিয়া গিয়াছে। জীবনটা এতকাল ভাগাভাগি করিয়া আসিয়াছে বলিয়া দেহের এই কদর্য রোগের ভাগটাও মহাশ্বেতাকে যদি আজ গ্রহণ করিতে হয়, তাহার যেন কিছুই বলিবার নাই।

স্ত্রীকে সে সর্বদা কাছে ডাকে, সব সময় কাছে রাখিতে চেষ্টা করে। কাছে বসিয়া মহাশ্বেতা তার সঙ্গে কথা বলুক, তাকে বই পড়িয়া শোনাক। রেডিওতে ভাল একটা গান বাজিতেছে, পাশাপাশি বসিয়া গানটা না শুনিলে একা যতীনের শুনিতে ভাল লাগে না। ফোনে সে কার সঙ্গে কথা বলিবে নম্বরটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া কানেকশন্‌ লইয়া রিসিভারটা মহাশ্বেতা তাহার হাতে তুলিয়া দিক। আর তা না হয়ত সে শুধু কাছে বসিয়া থাক, যতীন তাহাকে দেখিবে।

মহাশ্বেতা এসব করে। খানিকটা কল বনিয়া-যাওয়া মানুষের মতো যতীনের নবজাগ্রত সমস্ত খেয়ালের কাছে সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যতীন যা বলে নির্বিকার চিত্তে সে তাহাই পালন করিয়া যায়। যতীনের ইচ্ছাকে কখনো সংশোধিত অথবা পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করে না। তাহার নিরবচ্ছিন্ন স্বামীর কথা শুনিয়া চলিবার রকম দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না তাহার নিজেরও স্নানাহারের প্রয়োজন আছে, সুস্থ মানুষের সঙ্গলাভের প্রযোজন আছে, কিছুক্ষণ আপন মনে একা থাকিবার প্রয়োজন আছে। যতীন খেয়াল করিয়া ছুটি দিলে সে খাইতে যায়, যতীন মনে করাইয়া দিলে বিকালে তাহার একটু বাগানে বেড়ানো হয়। তা না হইলে নিজের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া যতীনের পরিবর্তনশীল ইচ্ছাকে সে অক্লান্ত তৎপরতার সহিত তৃপ্ত করিয়া চলে।

অথচ যাচিয়া সে কিছুই করে না। যতীনের দরকারী সুখসুবিধাগুলির জন্য ধরাবাঁধা যে সব নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে সেগুলি যথারীতি পালিত হয় কিনা এ বিষয়ে সে নজর রাখে কিন্তু যতীনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার জন্য, যতীনকে তাহার নিজের খেয়ালে সৃষ্টি করিয়া লওয়া আনন্দের অতিরিক্ত কিছু দিবার জন্য, স্বকপোলকল্পিত কোন উপায় দিন ও রাত্রির চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মহাশ্বেতা একটিও আবিষ্কার করে না।

তাহাদের সহযোগ রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে।

জীবনের তাহাদের একটি সমবেত গতি ছিল। জীবনের পথে পাশাপাশি চলিবার কতকগুলি রীতি ছিল। সে গতিও এখন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সে-সব রীতিও গেছে বদলাইয়া। পুরানো ভালবাসা, পুরানো প্রীতি, পুরানো কৌতুক নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইয়াছে। বিবাহের চার বছর পরে পরস্পরের সঙ্গে আবার তাদের একটি নবতর সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। পূর্বতন বোঝাপড়াগুলি আগাগোড়া বদলাইয়া ফেলিতে হইয়াছে।

প্রথমদিকে যে মুহ্যমান অবস্থাটি তাহাদের আসিয়াছিল সেটুকু কাটিয়া যাওয়ার আগে আপনা হইতে এমন কতকগুলি পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে—যাহা খেয়াল করিবার অবসরও তাহাদের থাকে নাই। চিকিৎসার বিপুল আয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া রোগী ও সুস্থ মানুষের শয্যা গিয়াছে পৃথক হইয়া। কথা বলিবার

সময় শুধু হাসির কথা বলিবার প্রয়োজন সম্পূর্ণ বাতিল হইয়া গিয়াছে। যার নাম দাম্পত্যালাপ এবং যাহা নয়টির মধ্যে প্রায় সবগুলি উপভোগ্য রসেই সমৃদ্ধ দুটি পৃথক শয্যার মাঝে চিড় খাইয়া তাহা নিঃশব্দে মরিয়া গিয়াছে। দিবারাত্রির মধ্যে একটি চুম্বনও আজ আর পৃথিবীর কোথাও অবশিষ্ট নাই। চোখে-চোখে যে ভাষায় তাহারা কথা বলিত সে ভাষা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। সবটুকু নয়। এখন চোখের দৃষ্টিতে একটি বিহ্বল শঙ্কিত প্রশ্ন তাহারা ফুটাইয়া তুলিতে পারে। চোখে-চোখে চাহিয়া এখন তাহারা শুধু দেখিতে পায় একটা অবিশ্বাস্য অপ্রকাশিত বেদনা এই জিজ্ঞাসায় পরিণত হইয়া আছে ঃ একি হল?

মহাশ্বেতা দিনরাত বোধ হয় এই কথাটাই ভাবে। তাহার ঠোঁট দুটি পরস্পরকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া অহরহ কঠিন হইয়া থাকে, ছোট ছোট নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এক-এক সময় সে শুধু বেশী বাতাসের প্রয়োজনে জোরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে। দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায়, অদৃষ্টকে অভিশাপ দিবার মতো শোনায়।

যতীন অনুযোগ করিয়া বলে ঃ দিনরাত তুমি অমন কর কেন?

মহাশ্বেতা ঠোঁট নাড়িয়া উচ্চারণ করে ঃ কেমন করি? কিছু করি না তো?

যতীন হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলে ঃ এমনিতেই আমি মরে আছি, তারপর তুমিও যদি আমার মনে কষ্ট দাও।—

যতীন ভুলিয়া যায়। ভুলিয়া গিয়া সে মহাশ্বেতার হাত চাপিয়া ধরে। প্রথম দিকে তাহার ঘায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইত, আজকাল আলো ও বাতাস লাগাইবার জন্য খুলিয়া রাখা হয়। ডাক্তার দিনে পাঁচ ছয় বার ধুইয়া যতক্ষণ সম্ভব রোদে ঘাগুলি মেলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ব্যাণ্ডেজ শুধু রাত্রির জন্য।

মহাশ্বেতা তাহার তিনটা চামড়া-তোলা ফাটিয়া যাওয়া আঙুলের দিকে চাহিয়া থাকে। আঙুলগুলি তাহার হাতে লাগিয়া আছে বলিয়া বারেকের জন্যও সে শিহরিয়া ওঠে না। মনে হয় যতীন অনুরোধ করিলে তাহার হাতে কনুই-এর অল্প নীচে টাকার মতো চওড়া যে ক্ষতটি ছোট ছোট রক্তাভ গোটায় উর্বর হইয়া আছে, মহাশ্বেতা সেখানে চুম্বন করিতে পারে।

যতীন হাত সরাইয়া লয়! রাগ করিয়া বলেঃ তুমি আমায় ঘেন্না করছ শ্বেতা?

মহাশ্বেতা একথা অনুমোদন করিবার সুরে রাগিয়া বলে ঃ কখন আবার ঘেন্না করলাম?

তবে অমন করে তাকাও কেন?

কেমন করে তাকাই?

এরকম অবস্থায় এধরনের পাল্টা প্রশ্ন মানুষের সহ্য হয়? যতীন উঠিয়া বারান্দায় গিয়া বেলা বারোটায় কড়া রোদে পাতিয়া-রাখা ঈজিচেয়ারটিতে কাত হইয়া এলাইয়া পড়ে। বৈশাখী সূর্যের এ অম্লান কিরণ ভালমানুষের হয়ত পাঁচ মিনিটের বেশী সহ্য হয় না। কিন্তু যতীনের অনুভব শক্তি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সেই রোদে নিজেকে মেলিয়া রাখিয়া পড়িয়া থাকে। রোদ সরিয়া গেলে ঈজিচেয়ারটাও সে সরাইয়া লইয়া যায়। ডাক্তারের কাছে সে সূর্যালোকের মধ্যে

অদৃশ্য আলোর গুণের কথা শুনিয়াছে। সে আলোককে যতীন প্রাণপণে কাজে লাগায়। অপচয় করিতে পারে না।

খানিক পরে ডাকিয়া বলেঃ এদিকে শোন শ্বেতা!

মহাশ্বেতা আসিলে বলেঃ এইখানে বোসো।

মহাশ্বেতা যতীনের কাছে ছায়ায় বসে। নিকটবর্তী রোদের ঝাঁঝে তাহার ঘর্মাক্ত দেহ শুকাইয়া উঠিয়া জ্বালা করিতে থাকে। কিন্তু সে উঠিয়া যায় না। জ্যোতির্ময়ী পতিব্রতার মতো স্বামীর কাছে বসিয়া ঝিমায়।

যতীন বলেঃ আমার তেষ্টা পেয়েছে।

মহাশ্বেতা তাহাকে জল আনিয়া দেয়।

যতীন বলেঃ আমার আর একটা বালিশ চাই।

মহাশ্বেতা তাহাকে আর একটা বালিশ আনিয়া দেয়।

যতীন বলেঃ এনে দিলেই হ'ল বুঝি? মাথার নীচে দাও!

মহাশ্বেতা বালিশটা তাহার মাথার নীচে দিয়া দেয়।

যতীন রুক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলেঃ কি ভাবছ শুনি।

মহাশ্বেতা বলেঃ কি ভাববো?

বৈশাখী দুপুরটি গুমোটে জমিয়া ওঠে।

রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া মহাশ্বেতা দেখিতে পায় যতীন তার বিছানায় উঠিয়া আসিয়াছে। দেখিয়া মহাশ্বেতা চোখ বোজে। সারারাত্রি আর সে চোখ খোলে না।

এজগতে সবই যখন ভঙ্গুর, মনুষ্যত্বের ভঙ্গুরতায় বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই! মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বভাবও ভাঙ্গে গড়ে। আজ যে রাজা ছিল কাল সে ভিখারী হইলে যদি-বা এইটুকু বোঝা যায় যে লোকটা চিরকাল ভিখারী ছিল না, তার বেশী আর কিছুই বোঝা যায় না।

সঙ্কীর্ণ কারাগারে নিজের বিষাক্ত চিন্তার সঙ্গে দিবারাত্রি আবদ্ধ থাকিয়া যতীন দিনের পর দিন অমানুষ হইয়া উঠিতে লাগিল। বীভৎস রোগটা তাহার না কমিয়া বাড়িয়াই চলিল, আর সুশ্রী রমণীয় চেহারা কুৎসিত হইয়া গেল। বাহিরের এই কদর্যতা তাহার ভিতরেও ছাপ মারিয়া দিল। তার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা একত্র থাকাও মুহ্যমান মহাশ্বেতার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। মেজাজটা যতীনের একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছে। মাথায় রক্ত চলাচলের মধ্যে তাহার কি গোল বাধিয়াছে বলা যায় না, চোখ দুটি মেজাজের সঙ্গে মানাইয়া দিবারাত্রি আরক্ত হইয়া আছে। গলার আওয়াজ তাহার চাপা ও কর্কশ হইয়া উঠিয়াছে, মাথার চুলগুলি অর্ধেকের বেশী উঠিয়া গিয়া পাতলা হইয়া আসিয়াছে। নাকের রঙটা তাহার তামাটে হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মুখের ও দেহের মাংস দেখিলে মনে হয় কত কালের বাসি হইয়া ভিতর হইতে পচন ধরিয়া গাঁজিয়া উঠিয়াছে। কোণঠাসা হিংস্র জন্তুর মতো উগ্র ভীতিকর ব্যবহারে মহাশ্বেতাকে সে সর্বদার জন্য সন্ত্রস্ত রাখিতে সুরু করিয়াছে।

মানুষের স্তরে আর যে তাহার স্থান নাই যতীন তাহা বুঝিতে পারে। মানুষের শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালবাসা পাওয়ার আশা এ-জীবনের মতো তাহার ঘুচিয়া গিয়াছে। সে কাছে আসিতে দেয় না বলিয়া কেহ খোঁজ খবর নেয় না। এই আত্মপ্রবঞ্চনাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে সে রাজী নয়। মহাশ্বেতার নির্বাক ও নির্বিকার আত্ম-সমর্পণকে সে অসাধারণ ঘৃণার অস্বাভাবিক প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে। মানুষকে দিবার যতীনের আর কিছুই নাই। সে তাই মানুষের উপর রাগিয়াছে। সে তাই স্বার্থপর হইতে শিখিয়াছে। ব্যথা পাইয়াছে বলিয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে সে কুণ্ঠিত নয়।

নাগাল সে পায় শুধু মহাশ্বেতার। মহাশ্বেতাকেই তাহার ব্যাধি ও ব্যাধিগ্রস্ত মনের ভার বহন করিতে হয়।

সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তার অবসন্ন শিথিল ভাবটাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। মনে হয়, আত্মরক্ষার ঘুমন্ত প্রবৃত্তিগুলি আর তাহার ঘুমাইয়া নাই। এবার সে একটু বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। চিরটাকাল সহমরণে যাইবে না।

যতীনকে সে বলেঃ কোথাও যাবে?

যতীন বলেঃ না।

সমুদ্রের জল লাগলে হয়তো কমত।

যতীন কুটিল সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলেঃ কমত? তোমার মাথা হ'ত! ডাক্তার ওকথা বলেনি।

মহাশ্বেতা রাগ করিয়া বলেঃ ডাক্তারের কথা শুনে তো সবই হচ্ছে।

খানিক পরে সে আবার বলেঃ ঠাকুর দেবতার কাছে একবার হত্যা দিয়ে দেখলে হ'ত। হয়ত প্রত্যাদেশটেশ কিছু পেতে।

যতীন আরক্ত চোখে মহাশ্বেতার সুস্থ সবল দেহটির দিকে চাহিয়া থাকে।

নিজের ছেলে খেয়ে ঠাকুর দেবতায় অত ভক্তি কেন? প্রত্যাদেশ! তোমার মতো পাপিষ্ঠার স্বামীকে ঠাকুর প্রত্যাদেশ দেন না।

ব্যাপারটা মাসখানেকের পুরানো। যতীন ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনিয়াছে। কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায় সে বিশ্বাস করে নাই। মহাশ্বেতাকে সন্দেহ করিয়াছে, সন্দেহটা মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে করিতে নিজের তাহাতে প্রত্যয় জন্মাইয়াছে এবং উগ্র উত্তেজনায় একটা পুরাদিন পাগল হইয়া থাকিয়াছে।

মহাশ্বেতা কিছু প্রকাশ করে না। জেরার জবাবে এমন সব কথা বলে যে যতীন বিশ্বাস করিতে পারে না। জোড়াতালি দিবার চেষ্টাটা তহার ধরা পড়িয়া যায়। তাছাড়া মহাশ্বেতা এমন ভাব দেখায় যেন এটা সম্পূর্ণভাবে তাহারই ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা। এমনও যদি হয় যে এ ব্যাপারে তাহার হাত ছিল, দৈবের চেয়ে সেই বেশী দায়ী, বলিবার অধিকার যতীনের নাই। সে তাহার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা তুলিয়া অনর্থক উদ্বিগ্ন হইতেছে। মহাশ্বেতার কপালে দুঃখ ছিল, সব দিক দিয়া বঞ্চিত হওয়ার বিধিলিপি ছিল, সে দুঃখ পাইয়াছে, বঞ্চিত হইয়াছে। যতীনের কী? সে কেন ব্যস্ত হয়?

তার স্বামী বলিয়া যতীন দেবতার প্রত্যাদেশও পাইবে না। একথাটা মহাশ্বেতার সহ্য হয় না। সে বলেঃ ছেলে-ছেলে করে তো মরছ। গুণে জেনেছ ছেলে?

যতীনের চোখে প্রত্যাদেশকারীর দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে।

ছেলে নয়? ওরা যে বলল ছেলে?

আমার চেয়ে ওরা যে বেশী জানে!

যতীন তখন আর কিছু বলে না। চুপ-চাপ ভাবিতে থাকে। পরদিন দুপুরে যতীনের রোদটুকু হরণ করিয়া আকাশ ভরিয়া মেঘ জমিলে মহাশ্বেতাকে কাছে, খুব কাছে আহ্বান করে। বাহিরে ব্যাকুল বর্ষণ সুরু হইলে হঠাৎ সে বহুদিনের ভুলিয়া যাওয়া অভিমানের সুরে বলেঃ মেয়ের বুঝি দাম নেই?

মহাশ্বেতা অবাক হইয়া বলেঃ তুমি এখনো সেকথা ভাবছ।

যতীন বলেঃ কি করেছিলে? গলা-টিপে তুমি তাকে মারতে পারনি শ্বেতা। না, তাও পেরেছিলে?

মহাশ্বেতা বলেঃ আবোল-তাবোল কথার কত জবাব দেব? যা বোঝো না তাই নিয়ে কেবল বকবক করবে। বেঁচে থাকলে কত দুঃখ পেত ভেবে আমি মন ঠান্ডা করেছি। তুমি পার না?—কি বৃষ্টিটাই নাবল। দেখি একটু!

মহাশ্বেতা উঠিয়া গিয়া জানালায় দাঁড়ায়। বাহিরে অবিশ্রান্ত জল পড়ে আর ঘরে যতীন অবিরত গাল দেয়। মহাশ্বেতা চোখ দিয়া বর্ষা দ্যাখে আর কান দিয়া স্বামীর কথা শোনে। যতীন যখন বলিতে থাকে যে একাজ যে মেয়েমানুষ করিতে পারে সে যে আর কোন অন্যায় করিতে পারে না, একথা স্বয়ং ভগবান বলিলেও সে বিশ্বাস করিবে না, তখন মহাশ্বেতা একটু হাসে।

একদিন তাহাদের এই কথোপকথন হইয়াছিলঃ

কি পাপে আমার এমন হ'ল শ্বেতা?

তোমার পাপ কেন হবে? আমার কপাল।

আজ কথা বলিবার ধারা উল্টিয়া গিয়াছে। যতীন আজ প্রাণপণে চেঁচাইয়া বলেঃ তোমার পাপে আমার এমন দশা হয়েছে, ছেলেখেকো রাক্ষসী। তুমি মরতে পারনি? না, সাধ-আহ্লাদ এখনো মেটেনি? এখনো বুঝি একজন খুব ভালবাসছে!

এই সন্দেহটা এখন যতীনের আক্রমণ করার প্রধান অস্ত্রে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মহাশ্বেতার মুখ দেখিলে কারো একথা মনে হওয়া উচিত নয় যে সে সুখে আছে। যতীনের দেখিবার ভঙ্গী ভিন্ন। মহাশ্বেতার মুখের ম্লানিমা তার চোখে রূপৈশ্বর্যের মতো লাগে, ওর চোখের ফাঁকা দৃষ্টি যে আজকাল শ্রান্তিতে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে সেটা তার মনে হয় পরিতৃপ্তি। ওর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা যতীনের কাছে হইয়া উঠিয়াছে সাজসজ্জা। তার দৃষ্টির আড়ালে ওর নেপথ্য জীবনটির পরিসর বাড়াইয়া তোলা যতীনের কাছে গভীর সন্দেহের ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাকে একা ফেলিয়া সমস্ত দুপুরটা সে কাটায় কোথায়? অন্য ঘরে বিশ্রাম করে? যতীন বিশ্বাস করে না। বিশ্রামের জন্য অন্য ঘরেরই যদি প্রয়োজন যতীনের পাশের ঘরখানা কি দোষ করিয়াছে। নির্জন দুপুরে নীচের তলায় কোণার একটা ঘর ছাড়া ওর

বিশ্রাম করা হয় না, বাহির হইতে যে ঘরে সকলের অগোচরে মানুষ আসা যাওয়া করিতে পারে?

অত বোকা নই আমি, বুঝলে?

পাল্টা প্রশ্ন করার অভ্যেসটা মহাশ্বেতার এখনো একেবারে যায় নাই। সে বলেঃ তোমাকে বোকা কে বলেছে?

যতীন গোঁ ধরিয়া বলেঃ ওসব চলবে না। আমার বাড়িতে বসে ওসব তোমার চলবে না, এই তোমাকে আমি বলে দিলাম! এখনো মরি নি আমি!

কি সব বলছ?

বলছি তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। ওরে বাপরে, চান্দিক দিয়ে আমার একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেল যে।

যতীন হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। মহাশ্বেতা ছবির মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার বিকৃত ক্রন্দন চাহিয়া দ্যাখে। যতীনের আকুলতা যত তীব্র হইয়া ওঠে সে যেন ততই শান্ত হইয়া যায়। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে তাহার চোখে পলক পড়ে, ঘরের দেওয়ালে ঝাপসা ছবিগুলি মন্থরগতিতে তাহার চারিদিকে পাক খায়। বাহিরের শব্দগুলি তাহার কানে আসিয়া বাজিতে থাকে, সে একটু একটু করিয়া তাহা অনুভব করে। তাহার মনে হয়, কে যেন কোথায় কাঁদিতেছে।

পাগলামী মহাশ্বেতারও আসিয়াছে বৈকি! তাহা অপরিহার্য। সাধারণ অবস্থায় মানুষ যাহা করে না সে সব করার নাম পাগলামী। সাধারণ অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে যাহার জীবন, ওসব তাহাকে করিতে হয়। মস্তিষ্কের কতগুলি অভিনব অভ্যাস জন্মিয়া যায়। বন্ধুকে কারো মনে হয় শত্রু, প্রিয়কে কারো মনে হয় অপ্রিয়, জীবনকে কারো মনে হয়, সীমোত্তলিত কৌতুক। দুঃখ দেখিলে কেহ কাঁদিয়াই মরিয়া যায়, কেহ উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবে বিকালে চা পান করা হয় নাই বলিয়া মাথাটা ঝিম ঝিম করিতেছে, আকাশে কি আশ্চর্য একটা পাখী উড়িয়া গেল?

মহাশ্বেতা রাত্রে এ ঘরে থাকে না। পাশের ঘরে সে বিছানা পাতে। যতীন প্রশ্ন করে, কেন? সে মুখে কিছু বলে না, ঘরে ঢুকিয়া খিল তুলিয়া দিয়া সমস্ত রাত্রি জবাবটা সুস্পষ্ট করিয়া রাখে।

যতীন রুদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বলেঃ রিভলবারে গুলি ভরে রাখলাম। আজ সকালে ঘর থেকে বেরুলেই তোমাকে গুলি করব।

বলেঃ এ অপমান সহ্য হয় না শ্বেতা! তুমি আমাকে এমন করে ঘেন্না করবে?

এ ঘরে নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত যতীন জাগিয়া থাকে, ও ঘরে মহাশ্বেতা শূন্য বিছানায় নিস্পন্দ অনুসন্ধানে জীবনের অবলম্বন খোঁজে। কত কথা সে ভাবিবার চেষ্টা করে কিন্তু ভাবিতে পারে না, কত কথা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারে না; সব গোলমাল হইয়া যায়। কুমারী জীবনের স্মৃতি একটা অচিন্তনীয় অনুভূতির মতো মস্তিষ্কের বাহিরে-বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, বিবাহের পর যে চারটা বছর যতীন সুস্থ ছিল, সুরূপ ছিল, সে সময়ের কথাটা ভাবিতে আরম্ভ করা মাত্র মহাশ্বেতার চিন্তাশক্তি অসাড় হইয়া যায়। জীবনের সেই আদিম নিষ্পাপ উৎসব হইতে সে

একেবারে উপস্থিত হয় যতীনের গলিত দেহ ও বিকৃত জীবনকে কেন্দ্র করা পচা ভাপসানো জীবনে, যেখানে একটি নবজাত শিশু, একটি পরিপুষ্ট বিস্ময়, জন্মিয়া মরিয়া যায়। বার-বার জন্মিয়া বার-বার মরিয়া যায়।

যতীনের মনে যত আলো ছিল সব নিভিয়া গিয়াছে। গাঢ় অন্ধকারে তাহার মনে এককালীন হাস্যকর কত কুসংস্কারের যে জন্ম হইয়াছে, সংখ্যা হয় না। কয়েক দিন ভাবিয়াই প্রত্যাদেশে তাহার অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে। দেবতা একদিন যার কাছে ছিল অলস কল্পনা, ধর্ম ছিল বার্দ্ধক্যের ক্ষতিপূরণ, জ্ঞান ছিল অনমনীয় যুক্তি, আজ সে আশা করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেবতার যদি দয়া হয়, হয়ত আবার সুস্থ হইয়া ওঠার পথ দেবতাই তাহাকে বলিয়া দিবেন।

কিন্তু কোন্ দেবতা? তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, কামাখ্যা, কোথায় তাহার প্রত্যাদেশ আসিবে?

যতীন নিজে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না, মহাশ্বেতাকে সে পরামর্শ করিতে ডাকে। কোথায় গিয়ে হত্যে দেওয়া ভাল শ্বেতা?

মহাশ্বেতা সব দূরবর্তী একটি পীঠস্থানের নাম স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলেঃ কামাখ্যায় যাও।

আমি যাব? যতীন স্তম্ভিত হইয়া যায়ঃ এ অবস্থায় আমি কি করে যাব?

মহাশ্বেতা বলেঃ কে যাবে তবে?

কেন তুমি যাবে? স্বামীর অসুখ হলে স্ত্রী গিয়েই হত্যে দেয়, প্রত্যাদেশ নিয়ে আসে।

মহাশ্বেতা বলেঃ আমি? আমি গেলে প্রত্যাদেশ পাব না। ঠাকুর-দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই।

বিশ্বাস নেই? মন্তব্যটা যতীনের অবিশ্বাস্য মনে হয়।

একফোঁটাও নয়। হত্যে দেবার কথা ভাবলে আমার হাসি আসে।

যতীন রাগিয়া ওঠে।

তা পাবে না? হাসি তো পাবেই! হাসি নিয়েই যে মেতে আছ। এদিকে স্বামী মরছে, ওদিকে আরেকজনের সঙ্গে হাসির হর্‌রা চলছে। আমি কিছু বুঝি না ভেবেছ!

মহাশ্বেতা বলেঃ কার সঙ্গে হাসির হর্‌রা চলছে?

তাই যদি জানব তুমি তবে এখনো এ বাড়িতে আছ কি করে? যতীন পচন-ধরা নাক দিয়া সশব্দে নিশ্বাস গ্রহণ করে, গলিত আঙুলগুলি মহাশ্বেতার চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া আর্ত্তনাদের মতো বলিতে থাকেঃ ভেবো না, ভেবো না, তোমার হবে! আমার চেয়ে আরও ভয়ানক হবে। এত পাপ কারো সয় না!

হিংস্র ক্রোধের বশে যতীন আঙুলের ক্ষতগুলি মহাশ্বেতার হাতে জোরে ঘষিয়া দেয়। আগুন দিয়া আগুন ধরানোর মতো সংক্রামক ব্যাধিটাকে সে যেন মহাশ্বেতার দেহে চালান করিয়া দিয়াছে এমনি একটা উগ্র আনন্দে অভিভূত হইয়া বলেঃ ধরল

বলে, তোমাকেও ধরল বলে! আমাকে ঘেন্না করার শাস্তি তোমার জুটল বলে। আর দেরী নেই।

এই অভিশাপ দেওয়ার পর মহাশ্বেতা যতীনকে একরকম ত্যাগ করিল। সেবা সে প্রায় বন্ধ করিয়া আনিয়াছিল, এবার কাছে আসাও কমাইয়া দিল। সকালে একবার যদি কিছুক্ষণের জন্য আসিয়া যতীনকে সে দেখিয়া যায়, সারাদিন আর তাহার দেখা মেলে না। রাত্রে শোয়ার আগে একবার শুধু উঁকি দিয়া যায়। মুহূর্তের জন্য। পরিহাসের মতো।

যতীন ক্ষেপিয়া উঠিয়া মহাশ্বেতাকে শেষ পর্যন্ত বাড়ি হইতেই তাড়াইয়া দিত কিনা বলা যায় না, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে সে নিজেই প্রত্যাদেশ আনিতে কামাখ্যায় চলিয়া গেল। যতীনের পীড়াপীড়িতে, ক্রুদ্ধ আদেশ ও সকরুণ মিনতিতে, মহাশ্বেতা সঙ্গে যাইতে রাজী হইয়াছিল। কিন্তু যাত্রা করার সময় তাহাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। যতীনের এক পিসি বলিলঃ মহাশ্বেতা কালীঘাটে গিয়াছে। যতীনের চাকরকে সঙ্গে করিয়া যতীনের মোটরে এই খানিক আগে মহাশ্বেতা কালীঘাটে চলিয়া গিয়াছে।

গোড়াপত্তন কালীঘাটেই হইয়াছিল। মহাশ্বেতা যে যতীনকে বলিয়াছিল, ঠাকুর দেবতায় সে বিশ্বাস করে না একথাটা তাহার সত্য নয়! সত্য হইলে যতীনের কামাখ্যা যাওয়ার দিন অতটাকা খরচ করিয়া সে পূজা দিত না, একথালা পয়সা ভিখারীদের বিতরণ করিত না।

এ কাজটা মহাশ্বেতা নিজেই করিয়াছিল। মন্দিরে ঢুকিবার পথে দুদিকে সারি দিয়া ভিখারি বসিয়াছিল। চাকর আর মোটরচালকের হাতে পয়সার ধামাটা তুলিয়া দিয়া আগে আগে চলিতে চলিতে মহাশ্বেতা দুদিকে মুঠা-মুঠা পয়সা বিলাইতেছিল। সে হইয়াছিল এক মহাসমারোহের ব্যাপার। শুধু ভিখারী নয়, ভিক্ষা দেওয়া দেখিতে রাস্তায় লোক জমা হইয়া গিয়াছিল অনেক।

ভিখারীদের মধ্যে কুষ্ঠরোগীও ছিল বৈকি! হাতে পায়ে কারো ছিল চট বাঁধা, কারো নাক গলিয়া গিয়া একটা গহ্বরে পরিণত হইয়াছিল, কারো সমস্ত মুখের ফাঁপান মাংস বড় বড় গোটায় ভরিয়াছিল, কারো কব্জির কাছ হইতে দুটি হাত বহুকাল আগে খসিয়া গিয়া ঘা শুকাইয়া হইয়াছিল মসৃণ। এদের পয়সা দিবার সময় মহাশ্বেতার একটি মুষ্টিতে কুলায় নাই! এদের দিয়া এক ধামা পয়সায় কুলানো যায় নাই।

বাড়ি ফিরিয়া সেই দিন বিকালে মহাশ্বেতা কুষ্ঠাশ্রম খুলিয়াছে।

চাকর সেদিন পথ হইতে পাঁচজন ভিখারীকে ধরিয়া আনিয়াছিল। তাদের মধ্যে দু'জন হাজার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের লোভেও এখানে থাকিতে রাজী হয় নাই। বাকী তিনজন সেই হইতে আরাম করিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে। খায়-দায়-ঘুমায় আর মহাশ্বেতাকে ক্ষণে ক্ষণে ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করায়, আর তাহাদের কাজ নাই। সাতদিনের মধ্যে মহাশ্বেতার আশ্রমবাসীদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে একুশজন।

আত্মীয়-স্বজন সকলকে সে ভিন্ন বাড়িতে স্থানান্তরিত করিয়াছে। মাহিনা-করা কয়েকজন চাকর দাসী মেথর আর বাড়ি-ভরা কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে সে এখানে বাস করে একা। সকালে বিকালে এদের দেখিয়া যাওয়ার জন্য সে একজন ডাক্তার ঠিক করিয়াছে। দু'জন অভিজ্ঞ নার্সের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

ডাক্তার বলিযাছেঃ এখানে আপনাকে কুষ্ঠাশ্রম খুলতে দেবে না।

কেন?

শহরের মাঝখানে এ ধরনের আশ্রম কি খুলতে দেয়?

মহাশ্বেতা আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছেঃ ওরা তো শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি বাড়ির মধ্যে ভরে বিপদ আরও কমিয়েছি।

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিয়াছেঃ তবু দেবে না। তবে কি জানেন, এসব হ'ল সৎকাজ। সহজে কেউ বাধা দিতে চায় না। পাড়ার লোকে নালিশ করবে, সে নালিশের তদ্বির হবে, তারপর আপনার কাছে নোটিশ আসবে। তখন দু'মাস আপনি চুপ করে থাকতে পারবেন। ফের আর একটা নোটিশ এলে তখন ধীরে সুস্থে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবেন।

ডাক্তারের এত কথার জবাবে মহাশ্বেতা বলিয়াছেঃ কুষ্ঠ কি ভয়ানক রোগ ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার তাহার বিপুল অভিজ্ঞতায় আবার অল্প একটু হাসিয়াছেঃ এরকম কত রোগ সংসারে আছে।, মানুষকে একেবারে নষ্ট করে দেয়, বংশের রক্তধারার সঙ্গে পুরুষানুক্রমে মিশে থাকে এমন রোগ একটা নয়, মিসেস দত্ত।

বংশ! পুরুষানুক্রম! কে জানে ডাক্তার কতখানি টের পাইয়াছিল? যতীন শুধু সন্দেহ করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, ভাবিয়াছিল তাকেই মহাশ্বেতা বঞ্চনা করিয়াছে। ডাক্তার জানিয়াও নির্বিকার হইয়া আছে। হয়ত মনে-মনে ডাক্তার সমর্থনও করে। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে একটু পার্থক্য থাকিবেই।

নার্স ঠিক হওয়ার আগেই যতীন ফিরিয়া আসিল। সে ঠিক প্রত্যাদেশ পায় নাই, কেমন একটা স্বপ্ন দেখিয়াছে যে কুন্ড হইতে একটি সাদা ফুল আনিয়া মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে সে নিরোগ হইতে পারে। বাড়ি ফেরার আগেই যতীন মাদুলি ধারণ করিয়াছে।

বাড়ির ব্যাপার দেখিয়া তাহার চমক লাগিয়া গেল।

এসব কি করেছ শ্বেতা?

মহাশ্বেতার মন অনেকটা শান্ত হইয়া আসায় বুদ্ধিটাও তাহার বেশ পরিষ্কার ছিল। সে বলিলঃ তোমার কল্যাণের জন্যই করেছি। কালীঘাটে একজন সন্ন্যাসীর দেখা পেলাম, অমন তেজালো সন্ন্যাসী আমি জীবনে কখনো দেখিনি। চোখ যেন আগুনের মতো আলো দিচ্ছে। তিনি বললেন, কুষ্ঠাশ্রম কর, তোর স্বামী ভাল হয়ে যাবে।

মাদুলি ধারণের প্রভাব তখনও যতীনের মনে প্রবল হইয়া আছে। সে অভিভূত হইয়া বলিলঃ সত্যি?

তোমার কাছে মিছে বলছি? তুমি সে সন্ন্যাসীকে দ্যাখোনি। দেখলে তোমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠত! আমাকে কথাগুলি বলে কোনদিকে যে চলে গেলেন কিছুই বুঝতে পারলাম না।

যতীন আপশোষ করিয়া বলিলঃ একটা ওষুধ-টষুধ যদি চেয়ে নিতে শ্বেতা!

বাড়ির যে অংশ যতীনের ছিল সে আবার সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। মাদুলি আর সন্ন্যাসীর ভরসায় মেজাজটা সে অনেকখানি নরম করিয়াই রাখিল।

কিন্তু মহাশ্বেতা কাছে ভেড়ে না। কামাখ্যা যাওয়ার আগে যেমন ছিল তেমনি দূরে দূরে থাকে। কুষ্ঠাশ্রম লইয়া সে মাতিয়া উঠিয়াছে। একুশটি অধিবাসীর সংখ্যা পঁচিশে পৌঁছিলে তার যেন আনন্দের সীমা থাকে না। দিবারাত্রি সে পথে-কুড়ানো এই বিকৃত গলিত মানুষগুলির সেবা করে। মায়ের মতো তাহার মমতা, মায়ের মতো তাহার সেবা। এই পঁচিশটি অসুস্থ পচা পাঁজর দিয়া যেন তাহার বুক তৈরী হইয়াছে, তার হৃদয়ের সবটুকু উষ্ণতা ওরা পায়।

যতীন একদিন কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলঃ তুমি খালি ওদের সেবা কর শ্বেতা। আমার দিকে তাকিয়েও দ্যাখো না।

মহাশ্বেতা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু বলিতে পারিল না।

সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠরোগাক্রান্তগুলিকে ভালবাসে।

এতে জটিল মনোবিজ্ঞান নাই! সহজ যুক্তির অনায়াসবোধ্য কথা।

মহাশ্বেতা দেবী তো নয়? সে শুধু কুষ্ঠরোগীর বৌ।

যে বাঁচায়

দশ বছর পরে মাধব দেশের গাঁয়ে ফিরল। রিলিফ ওয়ার্ক চালাবার জন্য। গাঁয়ের নাম বাণ্গাতলা। গাঁয়ের গৌরব ধনঞ্জয় সরকার। কলকাতায় ব্যবসা করে বড়লোক হয়ে তিনি বাণ্গাতলাকে ধন্য করেছেন। প্রতি বছর তিনি একবার গাঁয়ে আসেন, সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে এবং একদিনের জন্য। বাণ্গাতলা ও আশে-পাশের আরও কয়েকটা গাঁয়ের লোক তাঁকে অজস্র সম্মান দেয়। দু-চারশো টাকা দান করে তিনি ফিরে যান। সম্মানের বিনিময় নয়, এমনি। সম্মান তাঁর পাওনাই আছে। বাণ্গাতলায় যে অবৈতনিক বিদ্যা, দাতব্য চিকিৎসা, টিউব ওয়েলের জল ইত্যাদি পাওয়া যায় সে সব সরকার মশায়েরই কীর্তি।

তাঁরই আফিসে মাধব চাকরি করে। নির্ভরযোগ্য হাসিখুশি ভালোমানুষ, গুছিয়ে কাজ করতে পারে এবং কাজ করিয়ে নিতে জানে। আদর্শবাদী অথচ বেশ হিসেবী। প্রচুর বিষয় ও ট্যাক্ট আছে। মাঝে মাঝে বই পড়ার সখ চাপে, আবার কেটে যায়। স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসে। ছেলেটিকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে আদর করে অবর্ণনীয় সুখ পায়। ধনঞ্জয় তাকে পছন্দ করেন এবং দেড়শো টাকা মাইনে দেন।

বাণ্গাতলায় লোকে না খেয়ে মরছে শুনে ধনঞ্জয়ের ভাবনা হয়েছিল। গাঁয়ের লোকের ভালোমন্দের দায়িত্ব তো তাঁর। গাঁয়ের একত্রিশ জনকে তিনি সম্প্রতি আপিসে কাজ দিয়েছেন। ধনঞ্জয় নিজেই যে ফাঁপা ছিলেন তা নয়, তাঁর জানাশোনা আরও অনেকে ফুলে ঢোল হয়ে যাচ্ছিল। লোকের প্রয়োজনও বেড়েছিল সেই অনুপাতে—আপিসে, কারখানায় এবং মফঃস্বলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এটা ওটা গড়ে তোলবার স্থানে। শুধু বাণ্গাতলা নয়, আশে পাশের আরও কতকগুলি গাঁয়ের হাজার খানেক লোককে কাজ দেবার সাধ ধনঞ্জয়ের ছিল। কোশপুরে মস্ত কাজ হচ্ছিল, সকলকে তিনি সেখানে পাঠিয়ে দিতেন। সবাই খাওয়া পেত, থাকার ঘর পেত, মজুরি পেত—তিনটিই ভালো পেত। কিন্তু ইচ্ছাটা প্রকাশ পাওয়ায় গাঁয়ে গাঁয়ে তাঁর নামে কুৎসা রটে গেল, তিনি নাকি কুলি চালানের দালালি নিয়েছেন। যত চাষী মজুর হতে রাজী ছিল তাদের একজনকেও তিনি তাই কাজ দেননি। নিন্দেটা তাতে প্রমাণ হয়ে যেত! তারপরে ধনঞ্জয় স্থির করেছেন বাণ্গাতলায় দুঃস্থদের খাদ্য বিতরণ করবেন। না করে উপায়ও তাঁর ছিল না। নানা দিক থেকে চাপ পড়ছিল। তার মতো বড়লোক অনেকে বিতরণ করছে, এ একটা চাপ। কনট্রাক্ট দেবার কর্তারা ইঙ্গিত করেছেন, সে আরেকটা চাপ। বাণ্গাতলা হিতৈষিণী সমিতি (প্রেসিডেন্ট—ধনঞ্জয় সরকার) গাঁয়ের লোকের প্রত্যাশাকে আবেদন নিবেদনের রূপ দিচ্ছে, সেও চাপ।

তাছাড়া পূর্বোক্ত কুৎসাটির প্রতিকার করার বাসনার চাপ এবং হৃদয় নামক অঙ্গটির দয়াদাক্ষিণ্য ও উদারতার চাপ তো আছেই।

কাজের ভারটা তিনি দিয়েছেন মাধবকে; সেই সঙ্গে দরকারী উপদেশও দিয়েছেন। মাধবকে বেশি বলা বাহুল্য, কি ভাবে কি করতে হবে তার পলিসিটা বাৎলে দিলেই সে সব সমঝে নেয়। মাধবের নীতিজ্ঞান অতি তীক্ষ্ন।

'একটু সামলে চোলো হে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কলকাতায় লোকারণ্য কেন? ফুটপাতে মানুষ মরতে আসছে কেন? কলকাতায় খবর আছে। বেশি খেতে দিলে চাদ্দিকে লোক বাঙ্গাতলায় হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সামলাতে পারবে না। কি অবস্থা।'

'ছোট কাপের মাপে দেব ভাবছি। বেশি সইতেও পারবে না, পেট খারাপ হয়ে যাবে।'

'অন্নই আসল জীবন। ব্যঞ্জন নয় স্বাদ গন্ধ নয়।'

'নিশ্চয়ই। ভিক্ষের চালের আবার কাঁড়া-আঁকাড়া।'

'এমন অবস্থা আর হয়নি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কোথা লাগে। ভালো কথা মাধব, অক্ষয়ের বোনটা নাকি নিখোঁজ হয়েছে?'

'নিখোঁজ মানে ওই আর কি যা হয় বুঝলেন না?'

'তা, দোষ কি করে দি? যুবতী মেয়ের খিদে একটু বেশিই হয়। আহা, এদিকে খিদের জ্বালা, ওদিকে বদলোকের প্রলোভন, যুবতী মেয়ে তো যতই হোক! গাঁয়ের কেউ ওকে দুটি খেতে দিতে পারল না? ভদ্রঘরের বাড়ন্ত যুবতী মেয়ে চাইতে পারে না বলে কি দিতে নেই? ছি ছি! এ গাঁয়ের কলঙ্ক, আমার কলঙ্ক। বিপাকে পড়লেও ভদ্রঘরে ভিক্ষে নেবে না। লুকিয়ে কিছু কিছু চাল ডাল ঘরে দিয়ে এলে ওদের, মানটাও বাঁচে, প্রাণটাও বাঁচে।'

'তা দিতে হবে বৈকি!'

'আমার দোষ নেই। অক্ষয়ের বিধবা মা আর যুবতী বোনটা যে গাঁয়ে পড়ে আছে কেউ আমায় জানায় নি। তবু আমিই দোষী। জেল থেকে বেরিয়ে অক্ষয় ভাববে কি না বলো যে সরকার মশায় থাকতে তার এই সর্বনাশ হল?'

'তা ঠিক। দেখি কি করতে পারি।'

স্টেশনে ভিড় করেছিল একদল নরনারী যাদের দেখলেই মরণাপন্ন ভাবের কথা মনে পড়ে যায়। মাধব তাদের জন্য কলকাতা থেকে চাল ডাল আটা ময়দা নিয়ে আসছে খবর শুনে তারা স্টেশনে ছুটে এসেছে। না, ঠিক ছুটে তারা আসে নি, ধীরে ধীরে হেঁটেই এসেছে। বাঙ্গাতলা থেকে স্টেশনে মোট তিন মাইল পথ, দশ পনের মাইল হলেও তারা আসত। কারণ, দান এগিয়ে গিয়ে সবার আগে নিতে হয়, নইলে ফুরিয়ে যায়। জগতে চিরকাল চাওয়ার তুলনায় দান কম পড়ে এসেছে, সবার আগে হাত পাতবার প্রয়োজনটা তাই সবাই জানে।

বেলা তিনটের গাড়ি পৌঁছল সন্ধ্যা সাতটায়। স্টেশনের গ্রাম্যতা তখন অন্ধকারের

রূপ নিচ্ছে। লোক দেখে মাধব প্রথমে ভেবেছিল, সরকার মশায় আসবে শুনে সবাই বুঝি তাকে অভ্যর্থনা করতে এসে ভিড় জমিয়েছে, তার পর আসল ব্যাপার টের পেয়ে তার একটু উল্লাস ও গুরুত্ববোধ জাগল। কারণ যাই থাক, তারই প্রতীক্ষায় এতগুলি লোক জমা হয়েছে এ চিন্তা মানুষকে উল্লাস দেবেই, নয়তো কোনো চাপ-রাসী কোনোদিন খাতির পেয়ে খুশী হত না। গুরুত্ববোধ জাগল দায়িত্বের হদিস পেয়ে। এদের প্রত্যাশা যে কত অধীর এই ভিড় তাব প্রমাণ। তাকে কারবার করতে হবে এদের নিয়েই।

মাধবের সঙ্গে শুধু বিছানা আর সুটকেস নামতে দেখে জনতা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সেই নৈঃশব্দ উপলব্ধি করে মাধবের গা ছমছম করতে লাগল। খালি হাতে স্টেশনে নেমে সে যেন হৃদয় মনের এক বিরাট অভিযানকে বিপথে চালিয়ে দিয়েছে; পাক দিয়ে এসে সেটা রক্তমাংসের আক্রমণে পরিণত হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

হেডমাস্টার ভূপতি চক্রবর্তী বললেন, 'আপনি ওদের একটু বুঝিয়ে বলুন। আমি বলেছিলাম বিশ্বাস করে নি।'

মাধব কি আর করে, দুবার খুক্ খুক্ করে কেশে নিয়ে চিৎকার আরম্ভ করলঃ সকলে শোন—

সকলে শুনল। সেই ভয়ানক স্তব্ধতা ভেঙে গেল। উন্মুখ ভিক্ষুক বোধ হয় মরে গেলেও আশ্বাসের মন্ত্রে বেঁচে ওঠে! নয়তো পৃথিবীতে এত মানুষ আজও বেঁচে আছে কেন? ভিড় যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সশব্দ উত্তেজনায় জীবনের গুঞ্জন তুলে গাঁয়ের দিকে রওনা হল। আজ আসেনি কিন্তু তাদের জন্য অন্ন আসবে। খেতে তারা পাবেই। স্বয়ং ধনঞ্জয় সরকার তাদের সকলকে খাওয়াবেন। স্টেশনে আসা তাদের সার্থক হয়েছে। ঝোপে আর গাছে ছড়ানো জোনাকিগুলি যেন টেপা টেপা সংকেতে সায় দিতে লাগল।

স্কুলের ঘরে মাধবের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্কুল আজ মাস দুই বন্ধ আছে। ছেলে হয় না বলে ধনঞ্জয় পুজোর ছুটি পর্যন্ত স্কুল বন্ধ রাখবার হুকুম দিয়েছিলেন। স্কুলের লাগাও হেড মাস্টারের বাড়ি মাধবের জন্য তিনি খাওয়ার আয়োজনটা করে-ছিলেন ভালোই। হেডমাস্টারের স্ত্রী নিজে পরিবেশন করে তাকে খাওয়ালেন, পান এনে দিল তার মেয়ে। অতিথিকে ঘরের লোক করে নেওয়াটা গ্রাম্য ব্যবহার। তবে এক্ষেত্রে সেটা একটু খাতির করায় দাঁড়িয়ে গেল। স্কুলের মাস্টারদের বেতন এক পয়সা বাড়ান হয়নি, এই দুর্দিনে তাদের দিন চলে না। এদিকে মাধব ধনঞ্জয়কে একটু বললেই এ অবস্থার প্রতিকার হতে পারে। এটুকু উহ্য থাকলে ভূপতির বাড়ির পারি-বারিক আদর যত্নে মাধব মুগ্ধ হয়ে যেতে পারত।

স্কুলের কেরানি শ্যামল এ বাড়িতেই থাকে। খাওয়াদাওয়ার পর আড়াল থেকে স্বার্থের কথাটা সেই সামনে টেনে আনল। শ্যামলের বয়স ত্রিশের নিচে, অজীর্ণের চেহারা। বিনিয়ে বিনিয়ে শোকের শোভাযাত্রার মতো কথা বলে।

'আমাদের দিকে একটু না তাকালে আমরা তো আর বাঁচি না মাধববাবু। বাবুর আপিসের পিয়ন পর্যন্ত রেশন পাচ্ছে, আমরা ইদিকে—' শ্যামল প্রায় কখনোই মুখের

কথা শেষ করে না। যেটুকু বলা হলে বক্তব্য বোঝা যায় সেইটুকু বলেই সে সার্থক হাসির ভঙ্গিতে নীরবতার জের টানে।

মাধব হেসে বলল, 'আপনারা তো সুখে আছেন মশায়। ছুটিও ভোগ করছেন, মাইনেও পাচ্ছেন।'

ভূপতি বিমর্ষভাবে বললেন, 'সরকার মশায় হঠাৎ যে কেন স্কুলটা বন্ধ করলেন। প্রায় নব্বুইটি ছেলে অ্যাটেন্ড করছিল—'

'নব্বুই? বলেন কি স্যার।' মাধবের পান চিবানো বন্ধ হয়ে গেল। 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি নিজে অ্যাটেন্ডান্স রেজিস্টার দেখে অ্যাভারেজ করে পাঠিয়েছি। বাবু বুঝি বিশ্বাস করেননি?' ভূপতি শঙ্কিত ভাবে প্রশ্ন করলেন।

আবার পান চিবোতে আরম্ভ করে মাধব বলল, 'বিশ্বাস অবিশ্বাস জানি না মাস্টার মশায়। বাবুকে জানেন তো. কখন কি খেয়াল চাপে কেউ টেরও পায় না। উনি রসিক পিয়নকে পাঠিয়েছিলেন ছেলে গুণতে। ও ব্যাটা এক নম্বর ধূর্ত। গিয়ে বলে কি, নিমতলায় গামছা কাঁধে ঠায় বসে থেকে এক এক করে গুণে দেখেছে, তেত্রিশটি ছেলে স্কুলে এল।'

শ্যামল হাত কচলাতে লাগল। ভূপতি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সেদিন--সেদিন হয় তো কিছু কম ছিল। মানে, কি জানেন, মেলা-টেলা থাকলে ছেলেরা আসে না।'

স্কুলের ঘরে শুতে গিয়ে ধনঞ্জয়ের আশ্চর্য উদারতার কথা ভাবতে ভাবতেই মাধব সে রাত্রে ঘুমোল। তাকে পর্যন্ত ধনঞ্জয় জানাননি যে ভূপতি ছেলের সংখ্যা বাড়িয়ে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছিলেন, মিথ্যাটা তিনি ধরে ফেলেছেন! মিথ্যাকে তিনি মিথ্যা বলে গ্রহণ করেননি, ভূপতির প্রবঞ্চনা ক্ষমা করেছেন, চেপে গেছেন। এদের আতঙ্ক তিনি টের পেয়েছিলেন। স্কুল বন্ধ হলে মাইনেও বন্ধ হয়ে যাবে ভেবে মরিয়া হয়ে ভূপতি অন্যায়টা করে ফেলেছেন অনুমান করে রাগ হওয়ার বদলে তাঁর অনুকম্পা জেগেছে। কী মহৎ তিনি! ফিরে গিয়ে সর্বাগ্রে মাধব তাঁর পদধূলি গ্রহণ করবে। তিনি যে জেনেছেন একথা জানিয়ে ভূপতিকে লজ্জা দেবার স্বাভাবিক ইচ্ছাটা পর্যন্ত দমন করার মহত্ত্বেই ধনঞ্জয় মাধবের কাছে দেবতার চেয়ে বড়ো হয়ে যান। ভক্তির উত্তাপে মাধবের মোহ ঘন আঠালো হয়ে আসে।

দুঃস্বপ্ন দেখে রাত্রে তার দুবার ঘুম ভেঙে গেল। দুবারই শেয়ালের ডাক শুনে প্রায় আধঘণ্টা করে সে জেগে রইল।

সকালে চা খেতে গিয়ে দিনের আলোয় মাধবের খেয়াল হল ধনঞ্জয় যাদের যুবতী বলেন ভূপতির মেয়েটি সেই পর্যায়ে পড়ে। এক মুহূর্তের জন্য, শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য মাধবের মনটা একটু খিঁচড়ে গেল। এর জন্যই কি ভূপতির প্রতি ধনঞ্জয়ের এত দয়া? স্বাদগন্ধহীন গেঁয়ো চা-টুকু গিলতে গিলতেই মানসিক বিশ্বাসঘাতকতার প্রক্রিয়াটি সে সামলে নিল। ওসব দোষ ধনঞ্জয়ের নেই। তিনি শুধু অধ্যবসায়ী কৃতী পুরুষ নন, চরিত্রবানও বটে। তাঁর শত্রুও একথা স্বীকার করবে। ভূপতির মেয়েকে হয় তো তিনি কোনোদিন চোখেও দেখেননি। হয় তো শুধু শুনেছেন

যে ভূপতির একটি যুবতী মেয়ে আছে। যাদের বাড়িতে যুবতী বোন বা মেয়ে আছে তাদের ধনঞ্জয় একটু প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। চাকরি দেবার সময় প্রত্যেকের পরিবারের খবর তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেন। কন্যাদায়গ্রস্ত কেউ কোনোদিন তাঁর কাছে এসে খালি হাতে ফিরে যায়নি। মাধব জানে, ধনঞ্জয়ের এই সদাজাগ্রত সহানুভূতি সূর্যের আলোর মতো নির্মল। যুবতী মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর কোন দুর্বলতা নেই, তাঁর সবটুকু সহানুভূতি শুধু যুবতী মেয়ের বাপ ভায়ের জন্য।

'অক্ষয়ের বোনটার খবর জানেন মাস্টার মশায়? নলিনীর?'

'সে সদরে আছে।'

'সদরে নাকি! শুনছিলাম একেবারে নিখোঁজ?'

'না, সদরে নৃসিংহবাবুর রিলিফ ওয়ার্ক করছে।'

'বটে? তবে যে শুনলাম নৃসিংহবাবুর ছেলেটার সঙ্গে পালিয়ে গেছে খেতে না পেয়ে?'

'ঠিক পালিয়ে যায়নি, চলে গেছে। বলা হল অনেক, কারো কথা শুনলো না। ওর মা তো ওকে গাল দিয়ে কিছু রাখেনি। শিববাবু, ভোলা নন্দী এঁরা সবাই কিছু টাকা সাহায্য দিতে চাইলেন, সরকার মশায়কে বলে সব ঠিক করে দেওয়া হবে জানানো হল, ও তা গ্রাহ্যও করল না। খালি বলতে লাগল, "যান্, যান, আপনারা যান্।" মাকে ফেলেই চলে গেল।' শেষ কথাটায় মাধব মুচকে হাসতে থাকে। ওটা যেন বলাই বাহুল্য ছিল।

শ্যামল বলে, 'সে এক কাণ্ড মাধববাবু। মা টেনে হিঁচড়ে মেয়েকে আটকাতে চায়, মেয়ে টেনে নিয়ে যেতে চায় মাকে। বুড়ী কেন গায়ের জোরে পারবে অমন জোয়ান মেয়ের সঙ্গে! টানতে টানতে বেলতলা তক্ নিয়ে গেছ্‌ল। বুড়ী তখন হাঁউমাউ করে চেঁচাতে লাগল। আমরা মেয়েটাকে ধমকে ছাড়িয়ে দিলাম।'

ভূপতির মেয়ের মুখখানা বিবর্ণ ম্লান দেখাচ্ছিল। তিনবার সে ঘরে এসেছে গেছে। এসব কথা শুনে সে যেন সইতে পারছে না, থাকতেও পারছে না—না শুনে। হঠাৎ সে বলল, 'নলিনী আমায় চিঠি লিখেছে বাবা। পাঁচটা টাকা পাঠিয়েছে ওর মার জন্য।'

ভূপতি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আন্ তো চিঠিটা দেখি কি লিখেছে।' চিঠিখানা প্রথমে দেখল মাধব, সে উপস্থিত থাকতে প্রথম কিছু করার অধিকার আর কারো থাকতে পারে না। মস্ত লম্বা চিঠি মনকে ঢেলে দেবার সব চেয়ে উপযোগী ব্যক্তিগত সস্তা ভুল ভাষায় লেখা বলে স্পষ্ট পরিষ্কার মানেতে আগাগোড়া ঠাসা। সবাই কি ভাবছে আর তার কি হবে ভেবে নলিনীর কান্না পাচ্ছে। বাগাতলায় পড়ে থেকে মরে গেলেই তার ভালো ছিল। নলিনী আর বাঁচতে চায় না, কিন্তু বেশ আছে সে দিন-রাত খাটতে খাটতে মরে যাওয়ার মতো কাজের মধ্যে, তবে কিনা বুক ফেটে যায় মানুষের দুর্দশা দেখলে। নলিনীর দাদা তাকে বলত যে ভিক্ষে করা আর ভিক্ষে দেওয়া দুটোই সমান পাপ। কারো কাছে ভিক্ষে নেবে না বলেই তো সে চলে গেছে, ভিক্ষে

নেবেও না, ভিক্ষে দেবেও না। তবে ভিক্ষে দেওয়ার কাজ যে সে করছে সেটা ভিন্ন। নিজে তো আর সে ভিক্ষে দিচ্ছে না, সে শুধু কাজ করছে। কাজ তো তাকে করতে হবে, তাই সে কাজ করছে। কি কাজ করতে হচ্ছে তা সে ভাবতে যাবে কেন? মানে, নলিনী শুধু কাজটাই করছে আর কিছু নয়। যাদের সে খেতে দিচ্ছে ইচ্ছে করে দিচ্ছে না। ক্ষমতা থাকলে সে কিছুতেই দিত না। সবাই মরলেও দিত না। দাদার কথা নলিনী পালন করছে।

চিঠি পড়ে বোঝা যায় এই কথাটা বুঝিয়ে লিখতে নলিনী বেশ ফাঁপরে পড়েছিল। দু লাইনেই তার বক্তব্য স্পষ্ট হয়েছে কিন্তু সেটা তার বোধগম্য হয়নি। সম্ভব বলে ভাবতেও পারেনি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে লিখেও তার মনে সন্দেহ রয়ে গেছে যে মনের আদর্শ মনে রেখে কাজের জন্য কাজ করার নীতিকথাটা সে বুঝিয়ে বলতে পেরেছে কিনা এবং ভূপতির মেয়ে বুঝবে কি না।

চিঠি পড়ে মাধব বা ভূপতি কেউ কোনো মন্তব্য করল না। শ্যামল টেনে টেনে বলল, 'ফাজিল মেয়ে। যেমন ভাই তার তেমনি বোন। ভর্তি হতে চায়নি আমাদের এই স্কুলে? এ যেন মেয়ে স্কুল, ধেড়ে মেয়ে নিলেই হল। বলে কিনা মেয়েদের একটা সেকশান করুন। ওর হুকুমে মেয়েদের সেকসান খোলা হবে! ছেলেদের স্কুলেই ছেলে হচ্ছে না—'

'আমার চিঠি দিন!' ভূপতির মেয়ে ফোঁস করে উঠে শ্যামলের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিল।—'আপনি তো যেচে পড়াতে চেয়েছিলেন ওকে। রোজ গিয়ে পড়িয়ে আসবেন বলেছিলেন।'

ভূপতি শ্যামলের হয়ে অপরাধীর মতো বললেন, 'লেখা পড়া শেখার খুব ঝোঁক আছে মেয়েটার। বড় উত্যক্ত করে তুলেছিল। শেষে কি আর করি, আমার মেয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে পড়াতাম।' ভূপতি একটা নিশ্বাস ফেললেন, 'আর মেয়েদের লেখাপড়া শেখা। ছেলেরাই এডুকেশন পাচ্ছে না, মেয়েরা কি করবে এডুকেশন দিয়ে?'

মাধব বলল, 'দাঁড়ান, মেয়েদের একটা স্কুল খুলিয়ে দিচ্ছি।'

ভূপতি চমকে গেলেন। শ্যামল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। চলে যেতে যেতে ভূপতির মেয়ে থমকে দাঁড়াল।

'সরকার মশায় রাজী হবেন? কিন্তু মেয়ে তো বেশি হবে না।'

'দশটি মেয়ে তো হবে? তাই ঢের।'

ধনঞ্জয়ের ছোঁয়াচ লেগে লেগে মাধবের কি হয়েছে, হঠাৎ সৎকর্মের অদম্য প্রেরণা জাগে। মেয়ে স্কুল খোলবার চিন্তায় সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তাকে যে কমিটি গড়ে ভলাণ্টিয়ার জোগাড় করে, সাপ্লাই-এর ব্যবস্থা ঠিক করে, স্কুলের একটা অংশ ঘিরে এবং আরও বহু হাঙ্গামা করে অন্নসত্র খুলতে হবে সে ভাবনা প্রায় চাপা পড়ে গেল তখনকার মতো। ধনঞ্জয় রাজী হবেন। খুব সহজেই মাধব তাঁকে মেয়ে স্কুল খুলতে রাজী করাতে পারবে। পড়ানোর কাজ দিয়ে তিন চার জন যুবতী মেয়ের উপকার করার সুযোগ ধনঞ্জয় ছাড়বেন না।

মাধবের কাছে এই নতুন পরিকল্পনা পেয়ে তিনি খুশী হবেন। ধনঞ্জয় খুশি হলে মাধবের হবে সুখ।

বাঙ্গাতলা হিতৈষিণী সভার কয়েকজন মাতব্বর সভ্য এবং স্কুলের অন্য মাস্টাররা এসে পড়ায় মাধবকে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় রত হতে হল। মনটা তার একটু আনমনা হয়ে রইল।

গাঁয়ের চারদিক ঘুরে আসবার ইচ্ছা মাধবের ছিল। দুপুরের বিশ্রাম করে বিকালের দিকে ভূপতি, শ্যামল এবং আরও দুজন হিতৈষিণী সভ্যের সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল। যাবার আগে ভূপতির মেয়ের কাছ থেকে নলিনীর মার পাঁচটা টাকা চেয়ে নিল। নিজেই সে টাকাটা পেঁাছে দিয়ে আসবে।

'আর গোটা তিনেক টাকা দিয়ে আট টাকা করে দেব। বলবখন মেয়েই সব টাকা পাঠিয়েছে।'

'ভালোই তো।'

মুখে সায় দিলেও সকলে একটু শঙ্কিত হলেন। আট টাকাকে বারো চোদ্দ টাকা করতে মাধব আবার চাঁদা না চেয়ে বসে। মাধব সিনেমার স্বাদ পাচ্ছিল। গোপনে পাঁচ টাকাকে আট টাকা করে মা'র হাতে তুলে দিয়ে বলা তার মেয়ে পাঠিয়েছে!

'ছেলেবেলা খুব আদর করতেন। কত মোয়া আর তিলুড়ি যে খেয়েছি! হ্যাঁ, চন্দ্রপুলিও খাওয়াতেন। এখনো জিভে স্বাদ লেগে আছে মনে হয়। কি কপাল দেখুন মানুষের, উপযুক্ত ছেলে থাকতে কেউ দেখবার নেই।'

সকলে একটু অস্বস্তি বোধ করছে বোঝা গেল। নলিনীর মার উপযুক্ত ছেলে যে থেকেও নেই, এটা বড় খাপছাড়া সত্য।

ধনঞ্জয় দাতব্য ঔষধালয়ের কিছু দূরে নন্দীদের বাড়ির কাছে নলিনীর মার বাড়ি। ঘর তিনখানা ভাঙাচোরা, উঠোনে শুকনো পাতা ছড়ানো। বাড়ির কাছাকাছি যেতেই একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ নাকে লাগছিল ; উঠোনে পা দিতে গন্ধটা ঘন ও গাঢ় হয়ে উঠল।

দক্ষিণের ঘরে দরজা খোলা। পায়ের শব্দে একটা শেয়াল খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের কানাচ দিয়ে ডোবার পাশে বাঁশ বনে চলে গেল।

বাস

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাঁধানো পাথুরে রাস্তার খানিক তফাতে আসল খড়পা গ্রাম। গ্রামটি ছোট, কিন্তু তারই একটি শাখা রাস্তার দু'পাশে গড়ে উঠেছে। কয়েকটি ঘর-বাড়ি, দোকান ও আড়ত। এদিকে তেইশ মাইল দূরে সদর শহর, ওদিকে সতর মাইল দূরে মহকুমা শহর। ছোট বড় দুটি শহরের মধ্যে একটি বাস যাতায়াত করে। সদর থেকে সকালে যায় মহকুমায়, মহকুমা থেকে বিকালে ফেরে সদরে। যাত্রীরা অধিকাংশই সদর ও মহকুমায় আসা যাওয়া করে মামলার খাতিরে। কোর্ট বন্ধ থাকলে বাসও সেদিন বন্ধ থাকে।

খড়পায় বাস থামে এবং জল নেয়। যাত্রীরা গজেন ও রাজেনের দোকানে ভাগাভাগি করে খাবার কেনে, জগতের চায়ের দোকানে চা পান করে। রঘুনাথের দোকানে খড়পার বিখ্যাত তাঁতের কাপড়-গামছা দর করে। মধু মাইতির পান বিড়ির দোকানের পান বিড়ি কেনে—কেউ কেউ সস্তা সিগারেট। দোকান আরও কয়েকটি আছে, ঘনশ্যাম দাসের একধারে মণিহারী, মুদিখানা ও লোহার জিনিসের দোকান, নিতাই সামন্তের বাসনের দোকান, রঘুসামন্তের কামারখানা আর ধনেশ সাহার ধান চালের আড়ত। আড়তে ধান প্রায় থাকেই না, দুচার বস্তা চাল কেবল মজুত দেখা যায়। কে যে কখন সে দুচার বস্তা চাল কিনে নিয়ে যায় এবং কোথা থেকে আবার দুচার বস্তা চাল আড়তে আসে, খড়পার সকলেই তা জানে কিন্তু বলার অধিকার নেই জেনে উচ্চবাচ্য করে না।

উপাধিহীন ডাক্তার দণ্ডধারী মাইতির ছোট একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকানও এখানে আছে। আড়াই হাত উঁচু ও দেড় হাত চওড়া একটি নীল নীল কাঁচ লাগানো আলমারিতে ওষুধ এবং সেই অনুপাতে একটি ছোট পালিশহীন কাঠের টেবিলের সামনে টুলে উপবিষ্ট স্বয়ং ডাক্তার দণ্ডধারী মাইতি, টেবিলে দুখানা পাতা এবড়ানো বই, হিসাবের খাতা, কাঠের দোয়াতদান ও বুক পরীক্ষার একনলা যন্ত্র। এখানকার সবচেয়ে নতুন এই ডাক্তারী দোকানটি সবচেয়ে প্রাচীন মনে হয়।

ডাক্তার মাইতির পসার আছে। তার ওষুধের দাম কম, ভিজিটের টাকা কম অথচ চিকিৎসা আশ্চর্য ফলপ্রদ। পাঁচ দশ মাইল দূরের গাঁ থেকেও তাকে ডাকতে আসে। তবু, দণ্ডধারীর মক্কেলের সংখ্যা বেশী বলা যায় না। এ অঞ্চলে বসতি বড় কম। গাঁগুলি সব দূরে দূরে। সাঁওতালদের বস্তি বাদ দিয়ে খড়পার দশ মাইলের মধ্যে পনেরটির বেশি গ্রাম আছে কিনা সন্দেহ। এই সব গ্রামের কোনোটি আবার দশ বারোটি গৃহস্থের ঘর বাড়ি নিয়েই সম্পূর্ণ।

খড়পার পশ্চিমে কয়েক মাইল দূরে শাল বন। বনের বহিঃরেখা দক্ষিণ দিকে ক্রমে ক্রমে বাঁক নিয়েছে পূবে এবং উত্তর দিকে ক্রমে ক্রমে বাঁক নিয়েছে পশ্চিমে। উত্তরে গাঁয়ের কাছাকাছি যে শাল তরুরেখা চোখে পড়ে সেটা বন নয়, একশো গজের চেয়েও অগভীর এলোমেলো শাল গাছের লম্বা একটা ফাঁকি। ওপাশে ফাঁকা মাঠ আর ক্ষেত আছে, মাইল খানেকের মধ্যে বাদুসী গাঁ, যেখানকার 'বাবরসা' কয়েক বছর আগেও মুখে দিলে গলে যেত। বাদুসী থেকে পূবে এক ক্রোশ দূরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার প্রথম বাঁক চোখে পড়ে, খড়পায় যা অদৃশ্য। ওই বাঁক থেকে রাস্তাটি সাপের মতো এঁকেবেঁকে গিয়েছে মহকুমার দিকে। পূবের শাল বনও বড় বা খাঁটি বন নয়। রাস্তা থেকে অনেকটা দূরেও বটে। বনের মতো শাল বন শুধু পশ্চিমে। খড়পা পার হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে বাস এই বনে প্রবেশ করে, সাত আট মাইল গিয়ে বনের অপর প্রান্ত পাওয়া যায়। এতখানি পথের গা ঘেঁষে দুপাশে থাকে শুধু শাল—সিধা, নিশ্চল, ভূমি-প্রোথিত উদ্ভিদ সেনার বিরাট বাহিনীর মতো।

খড়পায় এখন সূর্যাস্ত ঘটছে।

সূর্য শালবনের আড়ালে গেলে রোদ ফুরিয়ে শুধু আলো থাকে, দিগন্তের আড়ালে যাবার সময় আকাশকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। স্থানীয় লোকে বলে, সূর্যের নাকি একবার ক্রোধ হয়েছিল। আকাশে বাতাসে লেগেছিল আগুন, মাটি পাথর পুড়ে গিয়েছিল। সব দেবতারও যিনি দেবতা তিনি সূর্যদেবের ক্রোধ শান্ত করলেন।

সূর্য। হে বিষ্ণু, হে জগৎপতি, আমার ক্রোধ সত্য।

বিষ্ণু। তোমার ক্রোধ সত্য।

সূর্য। ক্রোধ ত্যাগ করলে আমি সত্যভ্রষ্ট হব। আমি নিভে যাব।

বিষ্ণু। হে সূর্য, তুমি সত্য রক্ষা কর। দুই বিন্দু ক্রোধ দুই দিবাভাগে সঞ্চিত কর। ক্রোধে তোমার উদয় হোক, ক্রোধে তুমি অস্ত যাও।

সূর্যের সেই ক্রোধে এখানকার মাটি পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে—উর্বর অকৃপণ মাটি। বর্ষার প্রথম জলধারা মাটিকে নরম করে দিলে তবে এ মাটিতে লাঙলের ফলা বসে, বর্ষায় সরল হলে তবে এ মাটিতে বীজ বেঁচে থাকে, অংকুরিত হয়; তারপরেও বর্ষার কৃপাতেই অংকুর বড় হয়ে ফসল ফলায়। কতবার বর্ষার খেয়ালে মানুষকে মাঠে বীজ ছড়াতে হয়েছে দুবার তিনবার—আধহাত উঁচু চারা, ফসল ধরবার আগের চারা কতবার ঝলসে পুড়ে গেছে। বর্ষার খেয়াল খানিকটা বনের বৃষ্টি সামলে নেয়—কিন্তু বন দিন দিন ছোট হচ্ছে, আগের মতো আর তার ক্ষমতা নেই। বনের গা ঘেঁষা আর বনের ভিতরের জমি শুধু বনের প্রচুর স্নেহ আজও পায়।

এবার খড়পাকে বর্ষা ফেলেছে বিপদে। অসময়ে একটু দেখা দিয়েই কোথায় কোন দেশে যে চলে গেল এবারের বর্ষা, সময় পার হয়ে আবার অসময় হল, তবু তার দেখা নেই। এবার আসুক বর্ষা। আজ না আসে, কাল আসুক। শেষ বেলায় এক প্রান্ত ধূসর করে বিদ্যুতের চমক দিতে দিতে বাতাসের বল্গা ধরে মহাসমারোহে আকাশ ছেয়ে আসুক। ওগো মা কুণ্ডেশ্বরী—আসুক। নইলে যে বড় বিপদ হবে গো মা।

একদিন একরাত উপোসী থেকে তোমায় পাঁচ পয়সার ভোগ দেব মা—আসুক।

গরু মহিষ নিয়ে গোবর্ধন বাড়ি ফিরছিল। ছেলেটা মহিষের পিঠে চেপে বসেছে। গোবর্ধনেরও দুটি মহিষের রঙ বাদামী ধাঁচের, অর্জুনের মহিষগুলির মতো নিকষ কালো নয়। হাড়পাঁজরা সব গোনা যায় তার দুটি মহিষের পিঠের উঁচু হাড়টার ওপর বসে ছেলেটা কি আরাম ভোগ করছে কে জানে! তিনটি গরু। আর বলদ দুটিও তার কঙ্কালসার, তবু জমকালো চেহারার জন্য মহিষ দুটির শীর্ণতা বেশি চোখে পড়ে। কি প্রকাণ্ড পালান তার ওই দুব্‌বার, দুদিন ভালো করে খাওয়াতে পারলে কি দুধটাই ও দেয়। খেয়ে যেন ও নিজের দেহ পুষ্ট করে না, দুধে পরিণত করে তার জন্য পালান ফুলিয়ে রাখে। তার ছেলেকে পিঠে নিয়ে ধীরে মন্থরগতিতে দুব্‌বাকে গাঁয়ের দিকে চলতে দেখে এক সময় গোবর্ধনের বুক বা মন কোথায় যেন বেশ জ্বালা করে।

মনটা গোবর্ধনের ভালো ছিল না। চোখে জল আসবে টের পেয়ে জোর গলা খাঁকারি দিয়ে সে গরু মহিষকে তাড়া দেয়—টকাস্‌ টকস্‌ হেই—ই! চচঃ, চচঃ।

রাস্তার ধারে তৃণহীন শক্ত মাঠ। প্রতি পদক্ষেপে যেন ফিরে আঘাত করে। রাস্তায় উঠে গোবর্ধন একটু আশ্চর্য হয়ে গেল।

বিকালে বাসের প্রতীক্ষায় পথপ্রান্তের খড়পা যেমন চঞ্চল হয়ে থাকে, এখনো তেমনি চঞ্চল হয়ে আছে। চঞ্চল এবং উদগ্রীব হয়ে আছে।

'কি ব্যাপার গ'?

'বাস এসেনি।'

'এসেনি? না?'

'উঁহুক। সদরে না গেলি মোর চলবে নি কি না, শালার বাস তাই আজ এসবেনি তো মোকে লিয়ে যেতে?'

পুঁটলি হাতে শ্রীধন পাল অনেকক্ষণ হল অস্থির হয়ে এদিক ওদিক চলা-ফেরা করছে। পুব-দিকে যতদূর রাস্তা দেখা যায় তাকিয়ে থাকছে, জগতের চায়ের দোকানের সামনে বেঞ্চিটায় ধপ করে বসে বিড়ি ধরাচ্ছে এবং কয়েক মিনিট পরেই আবার উঠে অস্থির হচ্ছে। কাল তার মস্ত মোকদ্দমা আছে সদরে। সদরে পৌঁছতে না পারলে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। দেড়শো দুশো টাকার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

গোবর্ধনের গরুর গাড়ি ঠিক নেই, চাকা মেরামত করতে হবে। বলদ আছে। গাড়ি একটা হয় তো ভাড়া যেতে পারে।

'বাস না এসে তো মোর গাড়িতে যেও খন! খেয়ে লিয়ে রওনা দিলে—'

গোবর্ধনের প্রস্তাবে শ্রীধনের মুখে ভেংচি দেখা দিল। 'গরুর গাড়িতে? দুপুর রাতে বন পেরিয়ে লিয়ে যাবি তোর গরুর গাড়িতে? রাতে কটা বাঘ রাস্তায় হাওয়া খেয়ে বেড়ায় জানিস?'

নটবর ঠাকুর মৃদু হেসে বললে, 'গন্ডা তিনেক, আর কত!'

দণ্ডধারী ডাক্তারের ভাগ্নে পাশ দিয়ে আসল খড়পার দিকে যাচ্ছিল, বলে গেল, 'বাঘগুলোও হন্যে হয়ে আছে। একটা মানুষে আগে ওদের চারবেলা পেট ভরত,

এখন একবেলা আধপেটা হয়। দীন্দ সেদিন বাঘ দেখে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল, বাঘ তাকে দ্চারবার শংকে গর্জন করে চলে গেল। হাড় চামড়া বাঘ খায় না।'

পেটের কথায়, খাওয়ার কথায়, ক্ষুধার কথায় গোবর্ধনের হঠাৎ মনে পড়ে গেছে। প্রকাণ্ড একটা কুমড়ো কাল সে নামিয়েছিল, গাঁয়ের কেউ ভালো দর দেয়নি। নটবর ব্রাহ্মণত্বের দাবিতে কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। দশ পয়সা বাকী দামে। বাসের যাত্রীদের কারো কাছে হয়তো কুমড়োটা বেচা যেতে পারে। অবশ্য বাস যদি আসে। কেউ কি জানে না কি হয়েছে বাসের, কেন বাস এখনো আসেনি আজ?

দেখা গেল এ খবরটা সকলেই জানে। সেন সাহেব সদরে ফিরবার পথে দয়া করে তাঁর গাড়ি থামিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেছেন যে বাস বিগড়ে গেছে, আসতে দেরি হবে। কি রকম বিগড়ানো বিগড়েছে বাস? কত দেরি হওয়া সম্ভব বাসের আসতে? এসব খবর সেন সাহেব দেননি। খংটিনাটি বিবরণের জন্য ম্যাজিস্টেট্র সাহেবকে পীড়ন করার ভরসাও অনেকের ছিল না। কেবল ডাক্তার দণ্ডধারী আর গজেন সাহস করে দ্জনে প্রায় এক সঙ্গেই এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করতে গিয়েছিল।

দণ্ডধারী আরম্ভ করেছিল, 'সার—'

গজেন আরম্ভ করেছিল, 'হুজুর—'

তখন হুস করে বেরিয়ে গিয়েছিল সেন সাহেবের গাড়ি। শ্রীধন যদি তখন এখনকার মতো মরিয়া হয়ে থাকতো, সে হয় তো সেন সাহেবের কাছ থেকে বাস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আদায় করে ছাড়ত। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে ঘাঁটাতে শ্রীধনও কম বিমুখ নয়। তবে, স্বার্থ মানুষকে শক্ত করে, বিপদ সাহস যোগায়। তাছাড়া গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সেলাম করে বাস সম্পর্কে একটু বিশদ বিবরণ জানতে চাইলে তার উপর দিয়ে মিঃ সেন গাড়ি চালিয়ে দিতে পারতেন না। সে দিনকাল যে আর নেই, শ্রীধনের পর্যন্ত তাতে বিশ্বাস জন্মেছে।

বাস কখন আসবে কেউ বলতে পারে না। তবে শেষ পর্যন্ত এসে যে পৌঁছবে তাতে অনেকেরই সন্দেহ নেই। সেন সাহেব স্পষ্টই বলে গেছেন বাস আসবে—দেরি করে আসবে। বাস কি না এসে পারে কুমড়ো বিক্রীর আগ্রহে গোবর্ধনের মনে হল, বাস আসবে। বাড়ি গিয়ে কুমড়োটা এনে রাখা ভালো। কখন বাস এসে পড়বে কে জানে! গরু মহিষ তার তখন ঘরে চলে গেছে। গোবর্ধন তাড়াতাড়ি বড় রাস্তা ছেড়ে গাঁয়ে যাবার সরু মাটির পথে নেমে গেল। গাঁয়ের কোন ঘরেই এখনো আলো জ্বলেনি। কয়েক মুহূর্তের জন্য যে সন্ধ্যাদীপ জেলে আবার নিভিয়ে দেওয়া হয় ঘরে ঘরে তেলের অভাবের জন্য সে দীপগুলির আর জ্বলে উঠতে বেশী দেরি নেই, দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে।

প্রতিদিনের মতো শ্রীমন্ত সহায় পুরানো মন্দিরের সিঁড়িতে এসে বসেছে। প্রাচীন বিষ্ণু মন্দির, এদিকে এরকম বহু মন্দির দেখা যায়। খড়পার মন্দিরের পাথরে ফাটল ধরে আজ পর্যন্ত একটিও আগাছা গজায়নি। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে কোথা থেকে এক সন্ন্যাসিনী এসে বিষ্ণুহীন মন্দিরে কুণ্ডেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। বৈষ্ণব যুগে বিষ্ণুর জন্য নির্মিত মন্দিরটি সেই থেকে সিঁদুর ঢাকা কুণ্ডেশ্বরী

দখল করে আছেন। এ সময় মন্দিরের সিঁড়িতে বসে প্রতিদিন শ্রীমন্ত সহায় গাঁয়ের লোককে আশ্চর্য সব কথা শোনায়। মানুষের আগের কথা, মাঝের কথা, আজের কথা, জমির কথা, চাষীর কথা, কলের কথা, কুলির কথা, টাকা এবং গরীব ও বড়লোকের কথা। কখনো অনর্গল বলে বোঝা যায় না। কখনো উদাস কণ্ঠে, কখনো মৃদু মৃদু রহস্যের সুরে বলে—কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না, শ্রোতাদের মনে গভীর অস্বস্তি জাগে।

কখনো একেবারে তাদের ভাষায় সে বলে, তারা বুঝে শুনে থ' বনে যায়। সমাজ সংসার সব মিছে? ভাঙতে হবে গড়তে হবে? টাকার খেলা ফক্কিকার, লুটলে অনেক থাকে, নইলে থাকে না? বড় লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভগবানের শাস্ত্রে বে-আইনী—সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার তাদের যারা গরিব?

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে শ্রীমন্ত সহায় বলে, 'উহু, তোমাদের এ সব বলা তো উচিত হচ্ছে না! গাঁ ছেড়ে বাইরে যাওয়া বারণ, ঘর থেকে বেরুতে পাব না শেষে! রামাবতার আবার সব শুনলো।'

থানার রামাবতার সোৎসাহে বলে, 'ঠিক বাত হ্যায়, গরীবকা লোহু পিনেসে ধনী বনতা, নেহি তো নেহি বনতা। জওহরলালজী তো—'

'একটা গান শোন রামাবতার।' বলেই শ্রীমন্ত সহায় গলা ছেড়ে হিন্দী গান ধরে দেয়।

আধ ঘণ্টা পরেই হয় তো দেখা যায় শ্রীমন্ত সহায় ডাক্তারখনায় বসে ওষুধ-পত্রের হিসাব দেখছে, ভিজিটের টাকার বখরা নিয়ে মৃদু কোমল সুরে দণ্ডধারী মামার সঙ্গে কলহ করছে, আর নয় তো পরিদর্শন করছে তার যে কাঠ চালান যাবে তার ব্যবস্থা। ওষুধের দোকানের আসল মালিক শ্রীমন্ত সহায়, দণ্ডধারীর পসারও দাঁড়িয়েছে তারই জন্য।

গোড়াতেই একটা বখরার ব্যবস্থা স্থির হয়েছিল। খুব সহজ ব্যবস্থা—

দোকানের লাভ আর ডাক্তারির আয় যত হবে সেটা দুজনের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে আধা আধি। যতদিন এই উপার্জনে দুই ছেলে তিন মেয়ে এবং বৌ আর শালীকে নিয়ে তার প্রকাণ্ড সংসারের খরচ না চলে, শ্রীমন্ত সহায় কিছু কিছু সাহায্য করবে। আয়ের ভাগ ছাড়বে না এক পয়সা, কিন্তু সাহায্য করবে। ভাগের দশ গুণ দিতে হলেও সাহায্য করবে।

কারণ, ব্যবসাতে কে কার ভাগ্নে, কে কার মামা! মামা হয়ে খেতে পাচ্ছ না, ভাগ্নের সাহায্য নাও! দুবেলা আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকো সেই সাহায্য নিয়ে, ব্যবসাতে পাওনার বেশি আধলাটি পাবে না।

'রাজা হয়ে বেঁচে থাক বাবা'! বলে ভাগ্নেকে জড়িয়ে ধরে সেদিন, বছর চারেক আগে, কৃতজ্ঞতায় দণ্ডধারী কেঁদে ফেলেছিল। ডাক্তারির আয়টা বেশ ভালো রকম হওয়ায় আজকাল বখরার ব্যবস্থা নিয়ে সে খুঁত খুঁত করে।

বলে, 'রুগী দেখার পয়সাতে তোর বখরা কিসের? তুই যাস রুগী দেখতে? তিন ক্রোশ পথ হেঁটে আমি দেখব রুগী—'

শ্রীমন্ত সহায় বলে, 'সব রুগী আমার মামা। তুমি শুধু দেখতে গিয়ে ভিজিট নিয়ে এস।'

গোবর্ধনকে দুর্বোধ্য রহস্যের কথা শোনাতে শ্রীমন্ত সহায় বড় ভালোবাসে। গোবর্ধন বোকা মানুষ, কিছু বোঝে না, কিন্তু অনুভূতি দিয়ে কি যেন আঁচ করে সে বিহ্বল হয়ে যায়। সেই বিহ্বলতা স্পর্শ করে এদিক ওদিক সেদিক থেকে আঘাত পাওয়া শ্রীমন্ত সহায়ের আঁকাবাঁকা মন। শ্রীমন্ত সহায়ের মনগড়া দর্শন, আকাশ পৃথিবী সূর্যচন্দ্র তারায় জড়ানো তার আবেগ, জীবন মরণ সুখ দুঃখ ব্যথা বন্ধন মুক্তিকে আশ্রয় করা তার উদাস, মৃদু গম্ভীর গলার আওয়াজ সমস্ত মিলে গোবর্ধনের হৃদয়কে আকুলি-ব্যাকুলি করিয়ে ছাড়ে।

আজ বাস-এর গোলমালে কেউ আসেনি। বুড়ো শশীধর শুধু অনেক তফাতে বসেছে —সে কিছু শোনে না, শুনতে পারে না। নটবরের বিধবা বোন মন্দিরে আলো জেবলে রেখে গেছে, নটবর এক সময়ে এসে ঘণ্টা নেড়ে দিয়ে যাবে। মন্দিরে আজকাল এক ছটাক চালও হয় না। একবেলা—চার পাঁচটা সরা দিলেও নয়। গোবর্ধনকে দেখে শ্রীমন্ত সহায় ডাক দিল। কাছে গিয়ে গোবর্ধন বলল, 'বসবার সময় নেই গো নায়েক মশায়। বাস এলে কুমড়োটা বেচব।'

'কোথা তোর বাস? বোস। ভালো করে নজর রাখ দিকি গোবর্ধন, ঠিক কখন বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যা লাগে বলতে হবে তোকে।'

'খিদে পেয়েছে নায়েক মশায়।'

'খিদে পেলেই খাস বুঝি তুই? রাজা মহারাজা হলি কবে থেকে? এ গাঁয়ে কেউ আর খিদে পেলে খায় না গোবর্ধন-তুই আর আমি ছাড়া। দুবেলা আধপেটা খাস? তবে তুইও বাদ গেলি। আমি চারবেলা খাই, পেট ভরে খাই, রাজভোগ খাই! বৌটা এলে সেও খাবে। সবার খিদে সয়, আমার কেন সয় না বল তো? খিদেয় আমার পেট জবলে না, মাথার মধ্যে আগুন জবলে ওঠে।' শ্রীমন্ত সহায় হাসল, 'যা বাবা, যা। গাঁয়ে আটক আছি, তাই না তোদের ডেকে দুটো কথা কই!'

সত্যই বড় খিদে পেয়েছিল গোবর্ধনের। কিছু না খেয়ে কুমড়োটা নিয়ে রাস্তার ধারে অপেক্ষা করা যাবে না, শেষ পর্যন্ত বাস হয় তো আসবে অনেক দেরিতে।

খাওয়ার তাগিদ শুনে কিন্তু তার বৌ গুণমতী মাথা নাড়ল—'সন্দে লাগুক, বাতিটে জবালি। সবুর কর খানিক।'

'মুড়ি দে দুটি।'

'কান্ডজ্ঞানটি খুইয়েছো একদম। বাতিটে জবালি। আগে এসতে পারলেনিকো একটুকু?'

'বাতি জবাল।'

'সন্দে হোক?'

গোবর্ধনকে সায় দিতে হল। সন্ধ্যাকে হতে না দিয়ে সত্যই এখন আর বাতি জবালা যায় না। দিন শেষ হয়ে গেছে কিন্তু সন্ধ্যা এখনো হয়নি। অথচ ইচ্ছে করলেই সে অনেক আগেই বাড়ি ফিরতে পারত। বাস আসেনি, আসতে দেরি হবে

শুনেই সোজা বাড়ি চলে এলেই হত। কিন্তু কোনো একটা ব্যাপার বুঝে মনের মধ্যে গুছিয়ে নিতে যেন তার জন্ম কেটে যায়। তাড়াতাড়ি করার তাগিদ বোধ করেও সে ঢিমে তালে কাজ করে যায় চিরদিন—শ্রীমন্ত সহায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে যাবার বদলে দাঁড়িয়ে খানিক আলাপ করে আসা। এমনি করে সব তার পণ্ড হয়ে গেল—সব মনটা খিঁচড়ে যায় গোবর্ধনের। সে ভাবে, কুমড়ো নিয়ে যেতে যেতে বাসটা এসে চলে যাবে নিশ্চয়, চিরদিন এমনি ঘটনাই তো ঘটে এসেছে তার জীবনে! না! খিদে মেটাবার জন্য দুদণ্ডও সে দাঁড়াবে না বাড়িতে।

ছেলের হাতে রাস্তায় দুটি মুড়ি পাঠিয়ে দিতে বলে কুমড়োটি সে বার করতে যাবে, গুণমতী তাতেও বাধা দিল। বাতি জ্বালার আগে ঘর থেকে এখন কুটোটি সে বার করতে দেবে না।

'ধুত্তোর বাতি জ্বালা!' পনের সের ওজনের মস্ত কুমড়োটি কাঁধে তুলে গোবর্ধন বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে গুণমতী কাতর হয়ে বলল, 'ওগো, যেওনি তুমি, যেওনি। কেউ কুমড়ো কিনবেনি তুমার, সবুর করে যাও।'

গুণমতীর শরীর ছিপছিপে, গলাও বাঁশির মতো সরু। কাতর হলে ভারী মিহি আর মিষ্টি শোনায়। পেটের জ্বালায় কাতর হয়ে না থাকলে গোবর্ধন হয় তো রাগ করত না, কুমড়ো নিয়ে অসময়ে ঘরের বাইরে যাবার সাহসও খুঁজে পেত না।

'কিনবেনি তো কিনবেনি। নালায় ফিঁকে দিয়ে চলে এসব।'

এই বলে কাঁধে নিটোল কুমড়োটি বাগিয়ে ধরতে গিয়ে গোবর্ধনের হাত পড়ল গর্তে। অঙ্গনে নামিয়ে রেখে সে তাকিয়ে রইল কুমড়োটির দিকে। এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত চার আঙুল চওড়া একটি ফালি কুমড়ো থেকে কে কেটে নিয়েছে।

এক চড়েই গুণমতী কেঁদে ফেলল—ডুকরে নয় ফোঁস ফোঁসিয়ে। শুধু কাঁদল না, বিনিয়ে বিনিয়ে নিজের পক্ষ সমর্থনও করতে চলল সেই সঙ্গে। গোবর্ধন যে বলেছিল কুমড়োটা সে বেচবে না! লোকের কিপ্টেপণাকে গাল দিতে দিতে জোর গলায় সে যে বলেছিল কুমড়োটা ঘরে পচাবে তবু বেচবে না! তাই শুনে গুণমতী যদি এক ফালি কেটেই নিয়ে থাকে আর রাণীকে এক রত্তি একটু দিয়ে, তরকারী রেঁধে থাকে গোবর্ধনের জন্য কি এমন ঘাটতি হয়েছে তার যে তাকে চড় মারবে গোবর্ধন!

গোবর্ধন কুমড়ো নিয়ে বেরিয়ে যাবার পরেই তার কান্না থেমে গেল। কান্না যে শেষ হয়ে গেল তা নয় তোলা রইল। গোবর্ধন ফিরে এলে, ঘরে সংসারের সব কাজ চুকে গেলে গোবর্ধনের তামাক টানা শেষ হলে সময় বুঝে সে আবার একটু কাঁদবে। দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে নিজের মনে নিজের অদেষ্টকে গাল দিয়ে দুকথা বলতে আরম্ভ করলেই বুক ঠেলে তার কান্না আসবে।

গোবর্ধন বলবে, ইদিকে আয় নানুর মা।

সে ফুঁপিয়ে বলবে, ন্যাকামি কোরোনি বলছি, ভাল হবেনি কিন্তু হাঁ! গোবর্ধন আরও নরম হয়ে তাকে সাধবে। আরপর—

কিন্তু যেমন সে ভাবছে তেমন ঘটবে কি—তাদের চিরদিনের রাগ সোহাগের এক ঘটনা? শরীরটা তার শুকিয়ে গেছে ঢের, ঘুমের মতো কেমন একটা ঝিম ধরা

ভাব সদাই যেন জড়িয়ে ধরে আছে। গোবর্ধনও কেমন হয়ে গেছে, অসহায়ের মতো কেমন দিশেহারা ভাবে চায়। আহা, পাঁজরাগুলো বেরিয়ে গেছে জোয়ান মানুষটার।

কোথা থেকে রাণী এসে বলল, 'মিনষে বড় গোঁয়ার দিদি, নয়? কী চড়টা মারলে!'

গুণমতী চটে বলল, 'তোর মুখ বড় মন্দ রাণী। সোয়ামী লিতে চায় না, তুই কি করে জানবি সোহাগ কেমন ধারা হয়।'

বন্ধুর বিরাগে থতমত খেয়ে রাণী বলল, 'মারলে নাকি সোহাগ হয়!' গুণমতী মুচকে হাসল—'মারলে? মারবে কেনে লো বোকা ছুঁড়ি। গালটা টিপে দিয়েছে এমনি করে।'

গুণমতীর গাল টিপুনিতে বড় ব্যথা লাগল রাণীর, টনটনে ব্যথা। গুণমতীর ভাব দেখে যে কথা চেপে যাবে ভেবেছিল, সে কথাটা না বলে সে থাকতে পারল না, 'অত কান্না হচ্ছিল কেনে শুনি তবে?' 'ওমা! সোয়ামির সোহাগে কান্না এসবে নি?'

নিতাই সাহার বাসনের দোকানের সামনে ছোট রোয়াকটির এক পাশে কুমড়োটি নামিয়ে গোবর্ধন বাস আর ছেলের প্রতীক্ষায় বসে থাকে। গুণমতী সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বাললেই নানু তার মুড়ি আর গুড় নিয়ে আসবে। কি ভয়ানক খিদে তার পেয়েছে জেনে নানুকে পাঠাতে এক মুহূর্ত দেরী করবে না গুণমতী।

চারদিকে অন্ধকার হয়ে আসে। কদিন আগে পূর্ণিমা গেছে, চাঁদ আজ উঠবে একটু দেরিতে। দোকানগুলিতে একে একে আলো জ্বলে ওঠে—লণ্ঠন, প্রদীপ আর কুপি।

নিতাই সাহা আনমনেই শুধোয়, 'চোদ্দ পয়সায় দিবি? আধখানা ত কেটেই লিয়েছিস।'

গোবর্ধন সংক্ষেপে বলে, 'না'।

বাস সম্বন্ধে সকলের মনে একটু হতাশা দেখা দিয়েছে। এখন বাস এলেও বেশীক্ষণ থামবে না, আরোহীরা ঘুরে ফিরে দরদস্তুর করে সদরের চেয়ে সস্তায় কিছু কিনতে সময় পাবে না। তারা খিদে আর চায়ের তৃষ্ণায় কাতর হয়ে থাকবে, চা আর খাবার খাওয়া ছাড়া কোনো দিকে নজর দেবার অবকাশ কি তারা পাবে! গোবর্ধনের রাগ পর্দায় পর্দায় চড়তে থাকে। একটা চড়, শুধু একটা চড়ের জন্য গুণমতী তাকে দুটি মুড়ি পাঠাল না? রাগটা মনের মধ্যে পাক খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত প্রায় অভিমানেই দাঁড়িয়ে যায় গোবর্ধনের। রাগের মতো অভিমানও শাস্তি দিতে চায় কিনা, তাই বাড়ি ফিরে আরও কয়েকটা চড়চাপড় বসিয়ে দেবার বদলে না খেয়ে থেকে গুণমতীকে শাস্তি দেবার কল্পনায় সে বিশেষ কোনো তফাত খুঁজে পায় না। তাছাড়া তার অভিজ্ঞতা আছে। চড়চাপড়ের চেয়ে শেষের শাস্তিটাই জোরালো হয়। চড় মারলে গুণমতী শুধু কাঁদে, রাগ করে উপোস দিলে মাথা কপাল খুঁড়তে আরম্ভ করে।

গোবর্ধন ভাবে, জগতের কাছে দুপয়সার চা খেয়ে চাঙা হওয়া যাক্। ছ'-সাত মাস আগে কারা যেন এসে চায়ের আশ্চর্য গুণের কথা তাদের জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর দু-একবার খিদের সময়—মাঠে খাটবার সময় যে খিদে শরীর ভেঙে আনে

আর মাথা ঝিম ঝিম করায়—মুড়ি চিড়ার বদলে কাঁচের প্লাসে চা খেয়ে দেখেছে। মন্ত্রবলে যেন খিদে মরে যায়, সারা দেহ চাঙা হয়ে ওঠে। কেবল একটা আক্ষেপ থেকে যায়—তৃষ্ণার। মনে হয় সমস্ত শরীর, সমস্ত শরীরের ভেতরটা যেন হাত পা আছড়ে মুর্ছা যাচ্ছে! আধ ঘটি জল খেয়ে একটু বিশ্রাম করলেই সেটা সেরে যায়। অনেকক্ষণ খিদে পায় না, সর্বনেশে খিদে!

জগতকে গোবর্ধন দুধ জোগায়, দেনা-পাওনার হিসাব আছে। চাইতেই চা পাওয়া গেল, আর এক পয়সার ছোলাভাজা। একদিকে কাঁচ বসানো টিনের পাত্রে নোনতা মিষ্টি বিস্কুটগুলি চিরদিন গোবর্ধনকে আকর্ষণ করে। কিন্তু বিস্কুট তার কপালে জোটে না। কয়েকবার একখানা করে কিনেছিল, খেতে পারেনি। নানু রোজ বিস্কুটের পয়সার জন্য বায়না ধরে কাঁদে। নিজের জন্য বিস্কুট কিনে কোণা ভেঙে একটু শুধু স্বাদ গ্রহণ করে নানুর জন্য তুলে রাখতে গোবর্ধন কোনোদিন এতটুকু মজা পায় না, তবু তার কেনা বিস্কুট শেষ পর্যন্ত নানুর পেটেই যায়। তার একগাল হাসি আর ভাবভঙ্গির খুশি খুশি ভাবটা জগৎ সংসারের ওপর গোবর্ধনকে চটিয়ে দেয়। একবার সে দুখানা বিস্কুট কিনেছিল একসঙ্গে. ভাগ্যকে পরাস্ত করবে বলে। কিন্তু হায় রে কপাল গোবর্ধনের, বিস্কুট সম্পর্কে যার কথা কোনো দিন তার মনে আসেনি, সেদিন তারই কথা স্পষ্ট মনে পড়ে গেল—গুণমতী বোধ হয় জীবনে কখনো বিস্কুটের স্বাদ পায়নি।

কতদিক থেকে এমনি ধারা কত চাপ যে ঠেসে ধরে রেখেছে গোবর্ধনের মনকে! আজকের মতো যাতনাময় ক্ষুধায়, প্রতিদিনের অপরিতৃপ্ত ক্ষুধায়, সেই চাপগুলি সে স্পষ্ট অনুভব করে। বহুক্ষণ নিঃসঙ্গ থাকলে তার যখন ঝিম ধরে যায় তখন মনে হয়, পায়ের তলায় শক্ত মাটি ছেড়ে খানিকটা উপরে উঠে সে যেন নিরালম্ব হয়ে ঝুলছে, দড়াম করে পড়ল বলে।

গোবর্ধনের অনেক আগে থেকে জলভরা বালতি নিয়ে অপেক্ষা করছে নিবারণ। তার অপেক্ষা করাটা যেন ছট্‌ফটানোর সামিল। হঠাৎ উঠে ঘর চলে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে দশ পনের মিনিটের মধ্যে। বাড়িতে তার একমাত্র বোনটি ছাড়া সকলের অসুখ। বৌ ছেলে আর ভায়ের গা-হাত-পা ফুলে জ্বর হয়েছে, দণ্ডধারী দেখে বলেছে যে এটা ভালো চাল একদম না খাওয়া আর খারাপ চাল একটুখানি করে খাওয়ার ফল। অনাহারের বদলে খাঁটি সব্জী আর ফ্যানের বদলে দুটি ভাত খেলেই সেরে যাবে। বুড়ী ঠাকুমার বয়সের ব্যারামটা হঠাৎ খারাপের দিকে চলতে সুরু করেছে। ঠাকুমা মরবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আরেকজন কাউকে সে পাছে সঙ্গে নিয়ে যায়, এই হয়েছে নিবারণের ভয়। বারবার সে তাই ঘরে ছুটে যাচ্ছে। আবার এদিকে বাসের ড্রাইভার তার জন্য সের তিনেক চাল আনবে, ঘরেও তার তাই মন টিঁকছে না। নইলে, বালতি ভরা জল রয়েছে, একটা দিন কি তার হাজির না থাকলে চলে না!

'তোমার কি দাদা, যখন খুশি কুমড়োটি লিয়ে ঘরে যাবে। মোকে ঠায় বসি থাকতি হবে যতখন না শালার বাস এসে।'

'এসবে। ইবারে এসবে।'

কিন্তু বাস আসে না। রাত বেড়ে চলে। গাঁয়ে কখন রাত দুপুর হয় বাসের কি জানা নেই? আলাপ বিলাপের শব্দ চারিদিকে ঝিমিয়ে আসে। দু-একটি দোকান বন্ধ হয়ে যায়, অসময়ের বাসের সঙ্গে এদের স্বার্থ তেমনভাবে জড়িত নয়। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে নিবারণের মাথাটা ধীরে ধীরে বুকে নেমে আসে, এবং তার গলায় সুরু হয় শ্লেষ্মার একটা অদ্ভুত ঘড়ঘড় আওয়াজ। গোবর্ধনেরও ঘুম পায়। শ্রীধন বলে, 'অ গবর্ধন, এ যে খিদে পেয়ে গেল দস্তুরমত। বাড়ি থেকে চট করে খাওয়াটা সেরে আসি। বাস যদি এসে পড়ে ড্রাইভারকে এই চার গণ্ডা পয়সা দিয়ে একটু দাঁড়াতে বলিস বাবা।'

'আজ্ঞে, বলব।'

'শব্দ শুনেই ছুটে আসব। তবে কি জানিস, মোটাসোটা মানুষ অত ছুটতে পারিনে।'

শ্রীধন মাইতি চলে গেলে গোবর্ধন ঝিমোতে ঝিমোতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ কানের কাছে একটা উৎকট সোরগোলে সে সজাগ হয়ে ওঠে। আরেকটু পরে সে ভালো করে ঘুমিয়ে পড়ার পর সোরগোলটা আরম্ভ হলে গোবর্ধন নিশ্চয় দাওয়া থেকে নিচে পড়ে যেতো।

কুকুরের লড়াই।

১৪

গজেনের খাবারের দোকানের সামনে দুটো কুকুর সর্বদা পড়ে থাকে--তিনকু আর ভুলি। বাস তারা করে গজেনের বাড়িতেই, গজেন দোকান খুলতে এলে সঙ্গে আসে, আবার দোকান বন্ধ হলে গজেনের সঙ্গে ফিরে যায়। কেবল দোকানের ফেলনা ঘিয়ের খাবার খেয়েই বেঁচে থাকে না বলে দুজনের সব লোম খসে যায়নি। ঘন লোম একটু পাতলা হয়েছে আর দু-একটা ছোটখাট টাক পড়েছে এখানে ওখানে। তিনকুর চেহারা বেশ জমকালো, গম্ভীর গোমড়া মুখ, মাঝবয়সী জোয়ান মন্দ কুকুর। তার কাছে রোগা ছোটখাটো ভুলিকে কেমন বেমানান দেখায়। বয়সে কিন্তু ভুলি তিনকুর চেয়ে বড়ই হবে। তেজ কিন্তু তার কম নয়; মাঝে মাঝে তার দাঁত খিঁচুনিতেই তিনকুকে বিনা প্রতিবাদে তফাতে সরে যেতে দেখা যায়।

গত বছর পাঁচটি বাচ্চা হয়েছিল। শরীরটা ভালো ছিল না ভুলির, পাঁচটিকে বাঁচাতে পারবে না জেনে দুটিকে বেছে নিয়ে মাই না দিয়ে নিজেই সে মেরে ফেলেছিল। একটি খেয়েছিল শেয়ালে, একটি মরেছিল দুর্বোধ্য রোগে এবং অন্যটিকে চেয়ে নিয়ে নানু গলায় দড়ি বেঁধে টেনে টেনে বেড়িয়েই শেষ করে দিয়েছিল। বর্ষা ঋতুর আসন্ন আবির্ভাব ওদের দুজনকেই একটু চঞ্চল ও জীবন্ত করে তুলেছে। দোকানের সামনে চুপচাপ পড়ে থেকে সারাক্ষণ ওরা শুধু জিভ বার করে হাঁপায় না।

খানিক আগেও গোবর্ধন. ওদের ছুটোছুটি লাফালাফি খেলা দেখেছে, লড়ায়ের অভিনয়ে ভুলির আদরের কামড়ে তিনকুকে হার মেনে শূন্যে চার পা তুলে চিৎ হয়ে পড়তে দেখেছে।

গোবর্ধনের কালোও যে বর্ষা ঋতুর তাগিদে বসন্ত ব্যাকুল মানুষের মতো চঞ্চল হয়ে সঙ্গিনীর খোঁজে বেরিয়ে পড়বে, কে তা জানত। তিনকুর সঙ্গে তার বেঁধেছে লড়াই এবং দুজনকে ঘিরে চারিদিকে পাক দিতে দিতে তীব্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার জুড়েছে ভুলি। তিন দফা লড়ায়ের পর কালোকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যেতে দেখে গোবর্ধনের মনটা বিগড়ে গেল। কালোর সম্বন্ধে সে একান্ত উদাসীন, তার আস্তাকুঁড় ঘেঁটে আর মাটির খোলায় গুণমতীর দেওয়া একমুঠো ভাত খেয়ে কালো বেঁচে থাকে আর উঠানের কাঁঠাল গাছটার নিচে সারাদিন বিশ্রাম করে। রাত্রে হয়তো দাওয়ায় উঠে শোয়, কেউ টের পায় না। লেজ নাড়তে নাড়তে কখনো কাছে এলে গোবর্ধন তাকে দূর দূর করে ভাগিয়েই দিয়েছে চিরদিন। তবু আজ কালোর পরাজয়ে কেমন একটা অপমান বোধ ভেতরে কামড়াতে থাকে। গজেনের লোম ওঠা বুড়ো কুকুরের কাছে তার চিকন কালো কুকুর হেরে গেল।

তারপর আর তো ঘুম আসে না গোবর্ধনের। জীবনের সমস্ত সঞ্চিত ক্ষোভ আর নালিশ যেন এক সঙ্গে পাক দিয়ে উঠে তার কণ্ঠ রোধ করে দিতে চায়। সেও প্রায় জগতের ছোট-বড় আপন-পর সকলের জিদের কাছে এতকাল হার মেনেছে, তার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে কুঁকড়ে দিয়েছে সবাই মিলে। অপরাজেয় বিরাট দৈত্যের মতো একটা অদৃশ্য শত্রুর সান্নিধ্য গোবর্ধন স্পষ্ট অনুভব করে।

এদিকে ততক্ষণে শুরু হয়েছে ওষুধের দোকানে মানুষের লড়াই। দণ্ডধারী ও শ্রীমন্ত সহায়ের দৈনন্দিন কথা কাটাকাটি আজ প্রচণ্ড কলহে পরিণত হয়েছে। শ্রীমন্ত সহায় চিরদিন কড়া কথাও আস্তে বলে, গলা চড়ায় না। গলা ছেড়ে আজ সে মামাকে গাল দিচ্ছে শুনে গোবর্ধন আশ্চর্য হয়ে গেল। তারপর যে কাণ্ড করল শ্রীমন্ত সহায়, দেখে শুনে তাক লেগে গেল গোবর্ধনের। গর্জন করতে করতে দণ্ডধারীকে টেনে হিঁচড়ে দোকানের বাইরে এনে সজোরে এক ধাক্কা দিল। দণ্ডধারী একেবারে আছড়ে পড়ল বাঁধানো পাথুরে রাস্তার ধুলোয়।

আলো নিভিয়ে দোকানের দরজা বন্ধ করতে করতে শ্রীমন্ত সহায় বলল, 'আর ঢুকো না মোর দোকানে তুমি। যেখানে খুশি ডাক্তারী করে বড়লোক হওগে যাও। একটি পয়সা ভাগ চাইব না।' দণ্ডধারী তখনও রাস্তা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়নি। সামনে পা ছড়িয়ে এপাশে রাস্তায় দুহাতে ভর দিয়ে পিছনে হেলে সে বোধ হয় রাগ আর ব্যথা সামলে নিচ্ছিল। ক্রুদ্ধ আর্তনাদের মতো উদ্ভট সুরে সে জবাব দিল, 'মারলি! গুরুজনকে মারলি! সর্বনাশ হবে তোর, ঘরে তোর মড়ক লাগবে। তখন যদি পায়ে ধরে এসে কাঁদিস, মাথা কপাল কুটিস চিকিচ্ছের জন্যে—তুই মরবি, মা ছেতলার কিরপা হয়ে একুশ দিন ভুগে মরবি।'

এতক্ষণে সকলে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। পুবে সদ্যোত্থিত ম্লান নিষ্প্রভ চাঁদের আবছা আলোয় দণ্ডধারীকে রাস্তায় পড়ে তীক্ষ্ণ চড়া কান্নার সুরে অভিশাপ দিতে

শুনে দু'চারজনে শিউরে উঠল। এ বছর চারিদিকে বেশ ভালো করেই বসন্ত রোগের আবির্ভাব ঘটেছিল, এখন একটু নরম পড়েছে। দণ্ডধারীর অভিশাপ হয়তো ফলেই যাবে। গাঁয়ের এক প্রান্তে একটু তফাতে ফচ্‌কের মাসী এই রোগে সেদিন চিতায় উঠেছে—ফচ্‌কে আর শ্রীমন্ত সহায় শুধু দুজনের কাঁধে একটা বাঁশে বাঁধা হয়ে ঝুলতে ঝুলতে গিয়ে উঠেছে চিতায়। শ্রীমন্ত সহায় কত ছোঁয়াছুঁয়ি করেছিল ফচ্‌কের মাসীকে। তার অবশ্যম্ভাবী ফলটা গুরুজনের অভিশাপের তাগিদে দু-চার দিনের মধ্যেই নির্ঘাৎ ফলে যাবে নিশ্চয়।

শ্রীমন্ত সহায় এগিয়ে এসে বলল, 'বড্ড লেগেছে নাকি মামা? ওঠ, বাড়ি যাও।'

ধীরে ধীরে দণ্ডধারীকে ধরে তুলে সে দাঁড় করিয়ে দিল। এ কাজটা এতক্ষণ অন্য কারুর করাই উচিত ছিল বটে, কিন্তু উচিত কাজ কি সব সময় করতে পারে মানুষে? শ্রীমন্ত সহায় রাগ করতে পারে এ ভয়তো ছিলই, তাছাড়া একটু শুধু অপেক্ষা করছিল সকলে, তারপর কি ঘটে দেখবার জন্য। মামাকে যে ঘাড় ধরে রাস্তায় আছড়ে ফেলতে পারে, অভিশাপ শুনে তার পক্ষে তেড়ে এসে আরও দু-চার ঘা বসিয়ে দেওয়া বিচিত্র কি।

শ্রীমন্ত সহায়ের নতুন ধরনের কথা ও ব্যবহারে দণ্ডধারীও একটু ভড়কে গিয়েছিল। হাত ছাড়িয়ে হন হন করে খানিকটা তফাতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে ভাগ্নেকে পাজী, বজ্জাত, বেজন্মা চণ্ডাল প্রভৃতি কতগুলি বাছা বাছা গাল শুনিয়ে গাল দিতে দিতেই আবার হন হন করে ফাঁকা পথে নেমে বাড়ির দিকে চলে গেল।

শ্রীমন্ত সহায় সকলকে শুনিয়ে বলল, 'চারটে গাঁ ঘুরে আজ চার টাকা পেয়েছে। কাল পেইছিল দেড়টাকা। বললাম, কালকের বার গণ্ডা পয়সা যদি না দিলে তো নাই দিলে মামা, আজকের দুটো টাকা দাও। বলে কিনা, মোর পাওনা নেই!—বাপের শালা কুথাকার। দূর করে দিলাম দোকান থেকে। কদ্দিন ভণ্ডামি সয় বলো? ওটা কি ডাক্তার, আমি একটা চটি বই কিনে দিইছি, তাই পড়ে ডাক্তারি করে, আবার আমারি মুখের পর চোটপাট। পাওনা নেই! মোর সব কিছু—মোর পাওনা নেই!'

চায়ের দোকানে গিয়ে সে লোহার চেয়ারটা দখল করে বসল, হাঁক দিয়ে বলল, 'এক কাপ চা দে দিকি বাবা কে আছিস। দুধ মিষ্টি দিস্ বাবা একটুখানি, তেতো না লাগে।'

ধীরে সুস্থে চা পান করে বিড়ির বদলে এক পয়সার একটা সিগারেট কিনে সবে সে ধরিয়েছে, দূরে দেখা গেল বাসের আলো। বাসেরই আলো। মোটর গাড়ির আলো আরও নিচে থাকে।

গোবর্ধন উঠে দাঁড়িয়ে কুমড়োটা তুলে নিল কাঁধে আর নিবারণ গিয়ে দাঁড়াল তার জলভরা বালতির কাছে। জগৎ চা-ভরা পাত্রটি উনানে তুলে দিল আর দোকানের ঘুমন্ত ছোকরাটাকে এক গাঁট্টায় জাগিয়ে দিল আধো কান্নায়। কয়েকটি মিটমিটে আলো জ্বালা স্তব্ধ ঘুমন্ত পুরী যেন মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল। সন্ধ্যাবেলার

মতো লোক নেই, বহু লোক চলে গেছে, কিন্তু অবশিষ্ট কয়েকজনের অতিরিক্ত উত্তেজনা সে অভাব পূরণ করে দিল।

বাসের দৃষ্টিগোচর চোখের দিকে পিছনে করে দাঁড়িয়ে শ্রীমন্ত সহায় তখন অনিচ্ছুক শ্রোতা গোবর্ধনকে বলছে, 'গাঁ থেকে বেরুতে পারি না, তাই না শ্বশুরের এত জোর। পাঁচদিন আগে পৌঁছে দিয়ে যাবার কথা আজও এলো না। তাই না বলছিলাম মামাকে, আজকের বাসে এলো তো এলো, না এলে কাল তুমি গিয়ে নিয়ে এসবে। তা মামা বলে উঁহু, সেটা নিয়ম নয়। মামাশ্বশুর একলাটি ভাগ্নে বৌকে নিয়ে এসবে কি করে, মামাশ্বশুরের ছায়া দেখতে নেই ভাগ্নে-বৌয়ের? শুনলি? এমনি করে রসাতলে যাচ্ছে দেশটা। একবারটি এসে নিক। কি করব জানিস? একটা গোটা দিন রাত বৌ আর মামাটাকে এক ঘরে কুলুপ দিয়ে রেখে দেব।'

সর্বাঙ্গে আওয়াজ করতে করতে পুরানো বাস এসে দাঁড়াল। ক্ষুধার্ত যাত্রীরা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল চা ও খাবারের দোকানে। ড্রাইভার ঈশ্বর এবং ক্লিনার ও কণ্ডাক্টর পটল পর্যন্ত নেমে গেল চা খেতে। নিবারণ গাড়িতে জল দিতে গিয়েছে, ঈশ্বর চেঁচিয়ে বলল, 'আরে ও নিবারণ, জল দিসনি।'

নিবারণ বিস্মিত হল, প্রতিবাদ করল না। কাছে গিয়ে বলল, 'চাল কটা দেন ঈশ্বরবাবু, ঘর গিয়ে দুটি রাঁধি।'

'মোদের জন্য রাঁধবি না?' ঈশ্বর নির্বিকারচিত্তে হাসল, 'না, তোর ঘরে আবার রুগী সব কটা। চাল কিন্তু মোটে দেড়সের মিলেছে ভাই।'

মৃত্যুর নিমীলনের বদলে জীবনের বিস্ফোরণে দুচোখ প্রায় গোলাকার হল। নিবারণের কথায় সে বলল, 'দেড় সের?'

'দাম চড়ে গেছে ভাই।' চায়ে চুমুক দিয়ে ঈশ্বর গলা নামাল, 'বাবুকে বলেছি, সেন সাহেবকে ধরে কিছু চাল সস্তায় পাইয়ে দিতে। পেলে পাঁচ-দশ সের দেব তোকে।'

এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে শ্রীধন মাইতি এসে পড়ল। বাস একেবারে খালি দেখে বিস্ময় ও আনন্দে তার ভরা পেট মোচড় দিয়ে উঠল। এভাবে বাস খালি করে এক সঙ্গে নেমে যায় না মেয়ে পুরুষ সবাই; তবে নেমেছে যখন ও বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তাড়াতাড়ি উঠে জায়গা দখল করে নিয়ে আরাম করে বসাই ভালো।

ঈশ্বর চায়ের দোকান থেকে হাঁক দিয়ে বলল 'আরে ও মশায়! ওটা করছেন কি? বাস আজ যাবেনি।'

'যাবে নি কি হে? এলো তো যাবে নি কেনে?'

'বাসের গোসা হয়েছে। এক পা নড়বেনি।'

'আমার সাথে ফাজলামি করবিনি তুই বেয়াদব কুথাকার।'

ঈশ্বর নির্বিকারচিত্তে দুহাত দুদিকে কাত করে উদাসভাবে বলল, 'তবে চালিয়ে নিয়ে যান আপনি। বাজারের মোড়ে নিয়ে যাবেন। বাবু খুশি হবে।'

এবার উৎকণ্ঠায় কাতর হয়ে শ্রীধনকে নামতে হল। কাল তার মোকদ্দমা সদরে,

দেরি করে বাস যদি বা এলো, সে বাস যাবে না, গোবর্ধন এদিক ওদিক কুমড়ো বিক্রীর চেষ্টায় ঘুরছিল। কিন্তু এত রাত্রে এ অবস্থায় কুমড়োর দিকে আর তাকাবে কে! বাস ভর্তি লোক এখানে আজ আটকে পড়েছে, কোথায় খাবে কোথায় শোবে কি করবে কিছুই তারা জানে না। তবে শুধু এইটুকু ভরসা যে যেমন হোক একটা গ্রামে এসে বাসটা থেমেছে। মুড়ি চিড়ে খাবারটাবার কিছু খেয়ে আশ্রয় চাইলে কেউ অস্বীকার করবে না। মাথা গুঁজে কাটাবার জায়গা সবাই দেবে।

শ্রীধন গোবার্ধনকে শুধোল, 'বাস যাবে না কেন রে?'

কি বিগড়েছে কে জানে?

শ্রীধন চায়ের দোকানে এগিয়ে গেল। খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল, তুমি ঈশ্বর ড্রাইভার না?'

ঈশ্বর তাকে চিনেছিল অনেকক্ষণ। দেহখানি দূর থেকে দেখলেই শ্রীধনকে চেনা যায়। এতক্ষণে ভদ্রতা করে বলল, মাইতি মশায় যে! আমি ভাবলাম, কে না কে হবে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে। বসেন মাইতি মশায়, বসেন।'

'বাস নিয়ে যাবে না কেন হে? অ্যাদ্দুর এসে এখানে বাসটা ফেলে রাখা—'

'আজও তেল নেই এক ফোঁটা।'

এখানকার কেউ তো জানতই না বাস কেন খড়পায় এসে আটকে গেল, যাত্রীরাও অনেকেই ভালো করে জানত না। সকলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে কারণটা ঈশ্বরের মুখে শুনল। সেন সাহেবের তেল কম পড়ায় দু গ্যালন তেল ধার চেয়েছিলেন। সেন সাহেবের ড্রাইভার বাসের তেল পাম্প করে সাহেবের গাড়ি চালান দিতে লাগল; সেন সাহেব দাঁড়িয়ে রইলেন সামনে। সব নিয়ো না হে!' সেন সাহেব বললেন।

'না হুজুর। বহুত তেল হ্যায়।' বল্লে তাঁর ড্রাইভার।

গাড়ির ইঞ্জিন তখন মেরামত হচ্ছে। ঈশ্বর কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়েছিল তেল চালানর কাছে। পাম্পে যখন আর তেল ওঠে না তখন দুগ্যালন তেল ধার নেওয়া শেষ হল।

'তুমি কিছু বললে না সাহেবকে? বললেই তিনি সদর পর্যন্ত পেঁৗছবার তেল নিশ্চয় ফেরত দিতেন। বাসভরা এতগুলো লোক—'

ঈশ্বর মাথাটা কাত করে প্রায় ঘাড়ে ঠেকিয়ে সায় দিল 'বল্লে, দিত। একবার ভেবেছিলাম বলি। বাবুর কথা ভেবে সামলে গেলাম। দোষ আমারই কি না। আলগা টিনে তিন চার গ্যালন তেল মোদের রাখতে হয়। একটা টিনে খানিকটা তেল মোটে ছিল। বাবুকে বলতে হবে, টিনের তেলও সাহেব লিয়েছেন।'

একজন বলল, 'সাহেব যদি না বলে?'

ঈশ্বর অবাক হয়ে বক্তার নিরীহ গোবেচারী মুখখানার দিকে খানিক চেয়ে বলল, 'সাহেব না বলবে! কে জিজ্ঞেস করতে যাবে সাহেবকে? একি আদালত পেয়েছে না কি? বাবু যখন বিশ বস্তার জায়গায় দুশো বস্তা চাল গায়েব করবে, সাহেব কি তখন শুধোতে যাবে, না কাউকে শুধোতে দেবে?'

শ্রীধন আগাগোড়া ঠোঁট কামড়ে বিরক্তি জানিয়ে ইসারা করছিল, ঈশ্বর থামাল

না দেখে এবার রুক্ষস্বরে বলল, 'এসব কথা যে ফাঁকা করে বেড়াচ্ছ ঈশ্বর—'

'বাবুর হুকুম আছে।'

হেঁ?

'আরে বাবা, সোজা বোঝে না কেউ? সেন সাহেব বড় ঠ্যাটা। বাবু ওকে সরাতে চান।

শ্রীমন্ত সহায় একটা চেয়ারে উঠে দাঁড়াল।

'মশায়েরা, দয়া করে আমার দুটো কথা শুনুন। আমার কিছু বলার হুকুম নেই। মুখ একদম সিল করা। তবে কিনা এ অবস্থায় দুটো কথা না বলে কি থাকতে পারি? মোদের গাঁয়ের এসে আপনারা আটক পড়েছেন। অতিথি হয়ে পড়েছেন আমাদের। তা আগের্র দিনের মতো অতিথি সৎকারের সাধ্য গাঁয়ের নেই। আপনারা সব জানেন। গাঁ থেকে দুটি খিচুড়ি রেঁধে দিলে কি গ্রহণ করবেন? ঘরে ঘরে ভাগ হয়ে তারপর রাতটা আপনারা একটু কষ্ট করে কাটিয়ে দেবেন। আমার ঘর খালি—একদম খালি। কেউ নেই আমার বাড়িতে। সাত আটজন আমার বাড়িতেই থাকতে পারবেন।'

ঈশ্বর ব্যঙ্গ করে শুধোল, 'আপনার গাঁয়ে কত চালডাল আছে মশায়?' চেয়ার থেকে নেমে শ্রীমন্ত সহায় সোজা ঈশ্বরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘুঁষি মারার জন্য ডান হাতের মুষ্টি তার তৈরি হয়ে আছে। ঈশ্বরের ব্যঙ্গকে ভেংচি দিয়ে সে বলল 'তোমার তা দিয়ে দরকার কি মশায়?'

ঈশ্বরও উঠে দাঁড়াল। মুষ্টি বাগিয়ে বলল, 'দরকার আছে বৈকি! তুমি তো গাঁয়ের দশটা বাড়ির চালডাল নিয়ে এতগুলো লোককে ভোজ দেবে—কাল উনানে হাঁড়ি চড়বে না দশটা বাড়িতে। আমি মুফতে চালডাল জোগাড় করে দেব। বুঝলে মশায় দরকারটা এতক্ষণে?'

'কে দেবে মুফাতে চাল ডাল?

ঈশ্বর ধনেশ সাহাকে সম্বোধন করে বলল, "সা মশায় দরকার মতো চালডালটা আপনিই দেন আজকেব মতো।'

ধনেশ কিছু বলার আগেই শ্রীমন্ত সহায় মাথা নেড়ে বলল 'না মশায় খাতিরের চালডাল আমরা খাইনে। পরিবার এসবে বলে কিছু চাল রেখেছি ঘরে তা পরিবার এখন এসবেনি। আমার ঘরের চাল ডালই ঢের হবে। খিচুড়ি হবে আর কুমড়ো ভাজা হবে। দে তো তোর কুমড়োটা গেবর্ধন—'

গোবর্ধনের হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল—পনের সেরি কুমড়োর ভার এতখানি সময়ে বড় সহজ দাঁড়ায় না। শ্রীমন্ত টানতেই কুমড়োটা মাটিতে পড়ে কয়েক খণ্ডে ভাগ হয়ে গেল।

শ্রীমন্ত সহায় যেন আরও উৎসাহিত হয়ে বলল, 'বাপ, এযে বিরাট কুমড়ো তোমার গোবর্ধন! যাক্ যাক্ ওটাতো কাটতেই হত। একটা ঝোড়ায় তুলে ঘরে দিয়ে আয় দিকি পঞ্চু। তোমাকে দেড়সের—আচ্ছা দুসের চাল দেব গোবর্ধন—কুমড়োটার দাম।'

ঈশ্বর মুচকে হেসে বলল, 'আপনি মহৎ লোক মশায়, তাতে সন্দ নেই। ঠকিয়ে যারা প্রাণে মারছে তাদের ঠেঁয়ে দুটি চাল বাগিয়ে নিতে অভিমানে আপনার মরণ হয়।'

ধনেশ সাহা দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলল 'কার কথা বলছ? কে ঠকায়? কারা প্রাণে মারছে শুনি?

জবাব না দিয়ে ঈশ্বর বাসটি রাস্তা থেকে সরিয়ে রাখতে গেল। ওষুধের দোকানের পাশে রাস্তার সঙ্গে সমতল খানিকটা জায়গা ছিল। পটল হাতল ঘুরিয়ে ষ্টার্ট দিয়ে সরে যেতেই ঈশ্বর বাস চালিয়ে দিল, পরক্ষণে তীক্ষ্ণ আর্তনাদে খড়পার আকাশ গেল চিরে। দুটি প্রাণীর আর্তনাদ। গোবর্ধনের কালো একবার আর্তনাদ করেই সামনের চাকায় পিষে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, পিছনের চাকায় লেগে ভুলির পিছনের দুটি পা ভেঙে গেছে। একটানা আর্তনাদ করতে করতে ভুলি সামনের পা দুটির সাহায্যে দেহটাকে কোনোমতে টেনে নিয়ে যেতে লাগল জগতের দোকানের সামনে।

গাড়িটা যথাস্থানে রেখে ঈশ্বর ফিরে এলে জগত, তাকে কটু গাল দিল। গোবর্ধন প্রায় আর্তনাদ করেই বলল, 'তোর কি চোখ নেই? অরে অ খুনে ব্যাটা, তোকে কি চোখ দ্যায় নি ভগ্‌বান!'

ঈশ্বর কারো কথার জবাব দিল না, পটলকে ধরে আথালি পাথালি মারতে আরম্ভ করল।

'শুয়ার বাচ্চা, চোখ নেই তোর? বলতে পারলি নি মোকে? ইঞ্জিন ঘেঁসে ওরা ছিল, মোর সেথা নজর যায়?'

শ্রীমন্ত সহায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'রাখো তোমাদের ঝগড়া। এটার কি করা যায়। কোলে করে গাঁয়ে লিয়ে যাই?'

ঈশ্বর বলল 'ও বাঁচবে না।'

শ্রীমন্ত সহায় হঠাৎ যেন কাবু হয়ে গেছে। ভিজে গলায় বলল, 'তবু একটা দুটো দিন যা বাঁচবে—'

বাসে স্টার্ট দেবার হাতলটা নিয়ে ঈশ্বরকে এগিয়ে আসতে দেখে সে থেমে গেল। জগৎ চিৎকার করে উঠল, 'খপর্দার! তুমি আমার কুকুরের গায়ে হাত দিও না।'

মোটা খন্তি হাতে জগৎ ঈশ্বরকে মারতে আসছিল, শ্রীমন্তসহায় তাকে জড়িয়ে ধরে আটকে রাখল। লোহার হাতলের একটি-মাত্র আঘাতে ভুলির আর্তনাদ একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে সে গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'এই ঠিক হয়েছে ভাই।'

খন্তি কেড়ে জগতকে শান্ত করে আবার সে বলল 'জানি সব, ভুলে থাকি। গাঁয়ের বাইরে যাওয়া বারণ। কাঠপোড়া যত শুকনো গাঁ হোক ভাই, বাঙলা দেশের গাঁ। রসে একদম টইটুম্বুর। একটা মোটে মামী মশায়—পরিবারটিকে শ্বশুরব্যাটা পাঠাই পাঠাই করে পাঠাচ্ছে না—একটা মামীর স্নেহ লেগে লেগে মনটা আঠার মত চটচটে হয়ে গেছে, কি বলব আপনাকে।'

শ্রীমন্ত সহায় সকলকে ডেকে নিয়ে বাড়িতে বসিয়ে দণ্ডধারীর বাড়ির কাছে

গিয়ে একবার শুধু ডেকেছে, মামী বেরিয়ে এসে দেহের মতো মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কজন খাবে র‍্যা ছিমন্ত?'

কজন খাবে? সেটাতো হিসাব করেনি শ্রীমন্ত সহায়। মামী চটে বললেন, 'কজন খাবে না জানলে কি করে রাঁধব শুনি? দশজনের কম পড়াটা ভালো, না দশজনেরটা নষ্ট হওয়া ভালো? কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কি মামাকে তুই মারতে পারিস।'

ঈশ্বর মনে মনে হিসাব কর্বছিল।

"আজ্ঞে, আমরা একুশ জনা খাব। উনিশ প্যাসেঞ্জার আর আমরা দুজন। তারপর ছিমন্তবাবু আছেন'—

শ্রীমন্ত সহায় যোগ দিল, 'গোবর্ধনও খাবে। ওর কুমড়োটা নেওয়া হল, ওকে দিতে হবে।'

মামী তার বিধবা বোনকে নিয়ে অল্প দূরে শ্রীমন্ত সহায়ের বাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন। উঠানের বড় চুলোটায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল, উনানে একটা প্রকাণ্ড হাঁড়ি চাপানো হল। শ্রীমন্ত সহায়ের বাপের আমলের হাঁড়ি। দশ বছর বাদে হাঁড়িটা শুধু ধুয়ে নেওয়া হয়েছে, মেজে ঘসে নেবার সময় কোথায়!

না ডাকলেও গাঁ থেকে খিচুড়ি খেতে এল গাঁয়ের প্রায় তিনভাগ লোক, মেয়ে এবং পুরুষ তার মধ্যে কয়েকজন শুধু ভাণ করে বলল যে তারা শুধু ব্যাপারখানা দেখতে এসেছে। বাকী সকলে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল। কারো কারো মাথাটা শুধু নিচু হয়ে রইল আগাগোড়া। ঈশ্বর চুপি চুপি শ্রীমন্ত সহায়কে বলল, 'পেট ভরে খাওয়া কি সইবে এদের? কাল সব কটার না অসুখ করে।

পেট ভরে খিচুড়ি খেল গোবর্ধন, তার কুমড়ো ভাজা দিয়ে। বহুকাল একবারও এমন পেটভরে খাওয়া তার জোটেনি। শরীরটা ক্রমে অবশ থেকে অবশতর হয়ে আসতে লাগল। সকলের শোবার ব্যবস্থা করার কাজটাতে ফাঁকি দিয়ে সে বাড়ি ফিরে গেল। ভরা পেট, অলস দেহ, ঘুমের আবেশ কিছুতেই কিন্তু তার মনে একটি কাঁটার খচখচানি বন্ধ করতে পারল না। গুণমতী গুড় মুড়ি পাঠায়নি। একবেলা সে আধপেটা ভাত খায়, ঘরে কিছু মুড়ি থাকলেও গুণমতী একমুঠো তার স্বামীকে পাঠায়নি!

'মুড়ি পাঠাস নি যে?'

'পাঠাই নি! মিন্সে বলে কি গো! নানুকে দিয়ে পাঠালাম যে?

নানুকে দিয়ে গুণমতী তবে মুড়ি পাঠিয়েছিল? পেটের জ্বালায় নানুই সেটা খেয়ে ফেলেছে? অসংখ্যবার ক্ষুধার জ্বালা সয়ে সয়ে জ্বালাটা ভুলে যাবার অভ্যাস ক্রমে গেছে গোবর্ধনের। আজ সন্ধ্যার অসহ্য জ্বালাটাও সে ভুলে গিয়েছিল। তার শুধু জ্বালা ছিল অভিমানের। সেটা মিটে যেতে গোবর্ধন গভীর তৃপ্তি বোধ করল।

ঘুম আসতে কিন্তু তার দেরি হল অনেক। কতকাল পরে পেটভরা খাওয়া! চোখ বুজে ঝিম ধরে পড়ে থাকলেও একটু চেতনা তার সজাগ হয়েই রইল।

আজ কাল পরশুর গল্প

মানসুকিয়ার আকাশ বেয়ে সূর্য উঠেছে মাঝামাঝি। নিজের রাঁধা ভাত আর শোল মাছের ঝাল খেতে বসেছে রামপদ ভাঙা ঘরের দাওয়ায়। চালার খড় পুরানো পচাটে আর দেয়াল শুধু মাটির। চালা আর দেয়াল তাই টিঁকে আছে, ছ'মাসের সুযোগেও কেউ হাত দেয়নি। আর সব গেছে, বেড়া খুঁটি মাচা তক্তা—মাটির হাঁড়িকলসিগুলি পর্যন্ত। খুঁটির অভাবে দাওযাব চালাটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কাত হয়ে। চালাটা কেশব আব তোলেনি। কার জন্য তুলবে? দাওয়ার দু'পাশ দিয়ে মাথা নীচু করে ভেতরে আসা-যাওয়া চলে। অন্ধকার হয়েছে, হোক।

হুমড়ি খেয়ে কাত-হয়ে-পড়া চালার নীচে আঁধার দাওয়ায় নিজের রাঁধা শোলের ঝাল দিয়ে ভাত খেতে বসেছে রামপদ, ওদিকে খালের ঘাটে নৌকা থেকে নেমেছে তিনটি মেয়েছেলে আর আব একটি ছেলে।

এদের মধ্যে একজন রামপদ'র বৌ মুক্তা। তার মাথায় রীতিমতো কপাল-ঢাকা ঘোমটা। সুরমার ঘোমটা সীঁথির সিঁদুরের রেখাটুকুও ঢাকেনি ভালো করে। এতে আর শাড়ি-পরার ভঙ্গিতে আর চলনফিরন-বলনের তফাতে টের পাওয়া যায় মুক্তা চাষা-ভুষো গেরস্থঘরের বৌ, অন্য দু'জন শহুরে ভদ্রঘরের মেয়ে বৌ, যারা বাইরে বেরোয়, কাজ করে, অকাজ কি সুকাজ তা নিয়ে দেশ জুড়ে মতভেদ। নইলে, শাড়িখানা বুঝি দামীই হবে আর মিহিই হবে মুক্তার, সাধনা আর সুরমার কাপড়ের চেয়ে। এর চেয়ে কমদামী ময়লা শাড়ি মুক্তার নেই। নইলে তাই পরে সে গাঁয়ে ফিরত।

তার বুক কাঁপছে, গা কাঁপছে, মুখ শুকিয়ে গেছে। মোটা চট মুড়ি দিয়ে বস্তা হয়ে আসতে পারলে বাঁচত, মানুষ যাতে চিনতে না পারে।

চিনতে পারা হয়তো কিছু কঠিন হত। কিন্তু মানসুকিয়ার কে না জানে মুক্তা আজ গাঁয়ে ফিরছে। বাবুরা আর মাঠাকরুণেরা রামপদ'র বৌকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে এনে দিচ্ছে রামপদ'র ঘরে।

চারটি বাঁশের খুঁটির ওপরে হোগলার একটু ছাউনি—গগনের পানবিড়ির দোকান। পিছনের বড় গাছটার ডালপালার ছায়া এখন চওড়া করেছে হোগলার ছায়া। গাছের গুঁড়িটা প্রায় নালার মধ্যে ও পাশের ধার ঘেঁষে, নইলে গুঁড়ি ঘেঁষে বসতে পারলে হোগলার ছাউনিটুকুও গগনের তুলতে হত না।

ক'জন ঝিমুচ্ছিল বাঁচবার চেষ্টার কষ্টে, খানিকটা তারা সজীব হয়ে ওঠে।

বুড়ো সুদাসের চোয়ালের হাড় প্রকান্ড, এমন ভাবে ঠেলে বেরিয়েছে যে পাঁজরের হাড় না গুনে ওখানে নজর আটকে যায়।

'রামের বৌটা তবে এল?'

'তাই তো দেখি।' নিকুঞ্জ বলে, তার আধ-পোড়া বিড়িটা এই বিশেষ উপলক্ষে ধরিয়ে ফেলবে কিনা ভাবতে ভাবতে। এক পয়সার চারটে বিড়ি কিনেছিল কাল। আধখানা আছে।

ঘনশ্যামের টিনের চালার আড়ত থেকে গোকুল চার জনের ঠিক সামনে দিয়ে রাস্তা পেরোবার ছলে ঘনিষ্ঠ দর্শনের পুলক লাভ করে এদের সঙ্গে এস দাঁড়ায়।

গদার বৌ মারা গেছে ও-বছর। ওরা খানিকটা গাঁয়ের দিকে এগিয়ে গেলে সে মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'রাম নেবে ওকে?'

'না নেবে তো না নেবে। ওর বয়ে গেল।' যোয়ান গোকুল বলে, ঘনশ্যামের আড়তে কাজ করে মোটামুটি পেট ভরে খেতে পাওয়ার তেজে।

সুদাস কেমন হতাশার সুরে বলে, 'উচিত তো না ঘরে নেয়া।'

গোকুলকে সে ধমক দেয় না, 'তুই থাম ছোঁড়া বলে।' তীব্র কুৎসিত মন্তব্য করে না মুক্তাকে ফিরিয়ে নেবার কল্পনারও বিরুদ্ধে! গোকুলের কথাতেই যেন প্রকারান্তরে সায় দিয়ে যোগ দেয়, ফিরবার কি দরকার ছিল ছুঁড়ির?

গোকুল ইয়ার্কি দিয়ে কথাটা বলেছিল। কিন্তু ইয়ার্কিতেও বাস্তব যুক্তি টোল খায় না, হাল্কা হয় না।

ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া-জড়ানো কঙ্কাল ছিল মুক্তা। সকলের মতো সুদাসেরও চোখে পড়েছে মুক্তার শাড়িখানা। সকলের মতো সে-ও টের পেয়েছে মুক্তার দেহটি আজ বেশ পরিপুষ্ট।

আঁকাবাঁকা রাস্তা, এপাড়া ওপাড়া হয়ে, পুকুর ডোবা বাঁশবন আমবাগান গাছ-পালা জঙ্গলে শান্ত। মুক্তা চেনে সংক্ষেপ পথ। যতটা পারা যায় বসতি এড়িয়ে চলতে আরও সে পথ সংক্ষেপ করে প্রায় অগম্য জঙ্গল মাঠ বাগানে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। তবু গাঁ তো অরণ্য হয়নি, পাড়া পেরোতে হয়, ঘন বসতি কোনটা, কোনটা ছড়ানো। ভদ্রমানুষেরা তাকায় একটু উদাসীন ভাবে, যারা গুজব শুনেছে তারাও, শুধু ভুরুগুলি তাদের একটু কুঁচকে যায় সকৌতুক কৌতূহলে। চাষা-ভুষোদের কমবয়সী মেয়ে-বৌরা বেড়ার আড়াল থেকে উঁকি দেয়, উত্তেজিত ফিসফিসানি কথার আওয়াজ বেশ খানিকটা দূর পর্যন্তই পৌঁছয়। বয়স্কারা প্রকাশ্যে এগিয়ে যায় পথের ধারে, কেউ কেউ মুক্তাকে কথা শোনায় খোঁচা-দেওয়া ছ্যাঁকা-লাগানো কথা। কেউ চুপ করে থাকে, কেমন একটা দরদ বোধ করে, বাছার কচি ছেলেটা মরেছে, কোথায় না জানি বাছা কত লাঞ্ছনা কত উৎপীড়ন সয়েছে ভেবে।

মধু কামারের বৌ গিরির মা একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকায় তার মস্ত ফোলা-ফাঁপা শরীর নিয়ে। মধু কামার নিরুদ্দেশ হয়েছে বছরখানেক, কিছুদিন আগে গিরিও উধাও হয়ে গেছে।

'ক্যান লা মাগি?' গিরির মা মুক্তাকে শুধোতে থাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কুৎসিত গালাগালি দিয়ে দিয়ে, 'ক্যান ফিরেছিস গাঁয়ে, বুকের কি পাটা নিয়ে? ঝেঁটিয়ে তাড়াব তোকে। দূর-অ দূর-অ! যা।'

হাঁপাতে হাঁপাতে সে কথা বলে, যেন হল্‌কায় হল্‌কায় আগুন বেরিয়ে আসে হিংসার বিদ্বেষের। সুরমা স্মিতমুখে মিষ্টি কথায় তাকে থামাতে গিয়ে তার গালের ঝাঁঝে একপা পিছিয়ে আসে। মনে হয় গিরির মা শেষ পর্যন্ত আঁচড়ে কামড়েই দিবে মুক্তাকে। মুক্তা দাঁড়িয়ে থাকে নিস্পন্দ হয়ে। এরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

মানুষ জমেছে কয়েকজন। একজন, কোমরে তার গামছা-পরা আর মাথায় কাপড়খানা পাগড়ীর মতো জড়ানো, হঠাৎ জোরে হেসে ওঠে। একজন বলে, 'বাঃ বাঃ বেশ।' একজন উরুতে থাপড় মেরে গেঁয়ো ভঙ্গিতে হাততালি দেয়।

একটু তফাতে নালা পেরোবার জন্য পাতা তাল গাছের কাণ্ডটায় এ মাথায় বসেছিল গদাধর, বহু দূরের মানুষকে হাঁক দেবার মতো জোর গলায় এমনি সময়ে সে ডাকে, 'গিরির মা। বলি ওগো গিরির মা!'

গিরির মা মুখ ফিরিয়ে তাকাতে সে আবার বলে তেমনি জোর গলায়, 'গিরি যে তোমায় ডাকছে গো গিরির মা কখন থেকে! শুনতে পাও না?'

গিরির মা থমকে যায়, দুঃস্বপ্ন-ভাঙা মানুষের মতো ক্ষণিক সম্বিৎ খোঁজে বিমূঢ়ের মতো, তারপর যেন চোখের পলকে এগিয়ে যায়।

'ডাকছে? অ্যাঁ, ডাকছে নাকি গিরি? যাইলো গিরি, যাই!'

এতগুলি মানুষ দেখে লজ্জায় সে জিভ কাটে। কোমরে এক-পাক জড়ানো ছেঁড়া কাঁথাখানা চট করে খুলে নিয়ে মাথায় ঘোমটার মতো চাপিয়ে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে।

ঘরের সামনে পুরোনো কাঁটাল গাছের ছায়ায় বসে রামপদ সবে হুঁকোয় টান দিয়েছিল। তামাক সেজেছে একটুখানি, ডুমুর ফলের মতো। তামাক পাওয়া বড় কষ্ট। মুক্তাকে সাথে নিয়ে ওদের আসতে দেখে সে হুকোটা গাছে ঠেস দিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়। এমনিই পুড়ে যেতে থাকে তার অত কষ্টে জোগাড় করা তামাক।

'আসেন।' রামপদ বলে ক্লিষ্ট স্বরে, দ্বিধা-সংশয়-পীড়িত ভীরু অসহায়ের মতো। তিন জন কাছে এগিয়ে এসেছে, ওদের দিকে না তাকিয়েই সে অনিশ্চিত অভ্যর্থনা জানায়, চোখ সে পেতে রাখে মুক্তার উপর। খানিক তফাতে থাকতেই মুক্তা থেমে গিয়ে হয়ে আছে কাঠের পুতুল।

'তোমার বৌকে দিয়ে গেলাম ভাই। যা বলার সব তোমায় বলেছি। ওর মন ঠিক আছে। যা হবার হয়ে গেছে, ভুলে গিয়ে আবার তোমরা ঘর-সংসার পাতো। আর একদিন এসে আমরা দেখে যাব।'

'দিয়ে তো গেলেন।' বলে উৎসাহহীন বিমর্ষ রামপদ। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে একবার সে ঢোক গেলে, চোখের পাতা পিট-পিট করে তার। শীর্ণ মুখ-

খানা বসন্তের দাগে ভরা, চুপসানো বাঁ গালটাতে লম্বা ক্ষতের দাগ। তবু এই মুখেও তার হৃদয়ের জোরালো আলোড়নের কিছু কিছু নির্দেশ ফুটেছে তার শিথিল নিস্তেজ সর্বাঙ্গজোড়া ঘোষণার সুস্পষ্ট মানে ভেদ করে।

'যাবে বলেছিলে, গেলে না কেন রামপদ?'

'তাই তো মুস্কিল হয়েছে দিদিমণি।'

সমাজ তাকে শাসিয়েছে, বৌকে ঘরে নেওয়া চলবে না। নিলে বিপদ আছে। সমাজ মানে ঘনশ্যাম দাস, কানাই বিশ্বাস, নিধু নন্দী, লোচন কুমার, বিধু ঘোষ, মধু নন্দী এরা ক'জন। ঘনশ্যাম এক রকম সমাজপতি এ অঞ্চলের চাষাভুষোদের, অর্থাৎ চাষী গয়লা কামার কুমোর তেলি ঘরামি জেলে প্রভৃতির। সে-ই ডেকে কাল ধমক দিয়ে বারন করে দিয়েছে রামপদকে। অন্য ক'জন উপস্থিত ছিল সেখানে। একটু ভয় হয়েছে তাই রামপদ'র। একটু ভাবনা হয়েছে।

একটু!

নৌকোতে পাতবার সতরঞ্চিটা কাঁটাল তলায় বিছিয়ে তিনজন বসে। রামপদকেও বসায়। মুক্তা এতক্ষণ পরে সরে এসে সুরমার পিছনে গা ঘেঁষে মাটিতেই বসে। ঘোমটা তার ছোট হয়ে গেছে। ছোট ঘোমটার মিথ্যে আড়াল থেকে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে রামপদ'র মুখের দিকে। বৌয়ের চোখে এমন চাউনি রামপদ কোনদিন দ্যাখেনি।

এ সমস্ত তুচ্ছ করার মতো নয়। একজন বড় মাতব্বর আর তার ধামাধরা ক'জন তুচ্ছ লোক রামপদ'র পারিবারিক ব্যাপারে নিয়ে কর্তালি না করতে এলে এ হাঙ্গামা ঘটত না। দু'চার জন হয়তো ঠাট্টা বিদ্রূপ করত কিছু দিন, দু'-চার জন হয়তো বর্জনও করত রামপদকে, কিন্তু সাধারণভাবে মানুষ মাথা ঘামাত না। চারিদিকে যা ঘটেছে আর ঘটছে তার কাছে এ আব এমন কি কাণ্ড? না খেয়ে রোগে ভুগে কত মানুষ মরে গেল, কত মানুষ কত পরিবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, কোন বাড়ির দশ জন কোথায় গিয়ে ফিরে এল মোটে দু'জন ধুঁকতে ধুঁকতে, কত মেয়ে-বৌ চালান হয়ে গেল কোথায়, এমনি সব কাণ্ডের মধ্যে কার বৌ কোথায় ক'মাস নষ্টামি করে ফিরে এসেছে, এ কি আবার একটা গণ্য করার মতো ঘটনা? এ যেন প্রলয়ের সময় কে কার ডোবার জল নোংরা করছে তাই নিয়ে ব্যস্ত হওয়া। কিন্তু ঘনশ্যামেরা ক'জন যখন গায়ে পড়ে উস্কে দিতে চাইছে সবাইকে, কি জানি কি ঘটবে।

সুরমা জিজ্ঞেস করে, 'যাই হোক, বৌয়ের জন্য ভাত তো রেখেছ রামপদ?'

'আজ্ঞে আপনারা?'

'আমাদের ব্যবস্থা আছে। বৌকে দু'টি খেতে দাও তো তুমি। চালাটা তোলনি কেন?'

'তুলব। তুলব।'

সুরমাই বলে কয়ে নিয়ে দু'টি খাওয়ার ছলে মুক্তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দেয় রামপদ'র সঙ্গে। বাইরে যা ঘটুক, ওদের মধ্যে আগে একটু কথা আর বোঝা-পড়া

হওয়া দরকার। গ্রামের একজন কর্মী শঙ্করের বাড়িতে তাদের এবেলা নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনেক আগেই তার এসে পড়া উচিত ছিল। গ্রামের অবস্থা সে ভালো জানে। তার সঙ্গে পরামর্শ করবারও দরকার হবে।

ঝাঁপটা উঁচু করে তুলে দিতে আরেকটু আলো হয় ঘরে।

'নাইবে?' রামপদ শুধোয়।

'মোর জন্যে রেঁধে রেখোছো!' বলে মুক্তা।

'শোলের ঝাল আর ভাত। আলুনি হৈছে কিন্তু?'

এগার মাস আর অঘটনের ব্যবধান আর কিছুতে নেই, শুধু যেন আছে অতি-বেশী রয়ে' রয়ে, অল্প দু'টি কথা বলায়, নিজের নিজের অনেক রকম ভাবনার গাদা নিয়ে নিজে নিজে ফাঁপরে পড়লে যেমন হয়। চুপ করে থাকার বড় যন্ত্রণা। ভাবনাগুলি নড়তে নড়তে মুক্তার মনে আসে ঃ ছেলেটা তার ছিল সাত মাসের রামপদ যখন বিদেশ যায়। এটা বলার কথা। মুক্তা বাঁচে।

'খোকন গেল কুপথ্যি খেয়ে। মাই-দুধ শুকিয়ে গেল, এক ফোঁটা নেই। চাল গুঁড়িয়ে বার্লি মতন করে দিলাম ক'দিন। চাল ফুরলে কি দিই। না খেয়ে শুকিয়ে মরবে এমনিতে, শাকপাতা যা সেদ্ধ খেতাম, তাই দিলাম, করি কি! তাতেই শেষ হল।'

না কেঁদে ধীর কথায় বিবরণটা দেবে ভেবেছিল মুক্তা, কিন্তু তা কি হয়। আগে পারত, না খেয়ে যখন ভোঁতা নির্জীব হয়ে গিয়েছিল অনুভূতি। আজ পুষ্ট শরীরে শুধু ক'মাসের অকথ্য অভিজ্ঞতা কেন বোধকে ঠেকাতে পারবে? গলা ধরে চোখে জল আসে মুক্তা'র।

'শেষ দু'টো দিন যা করলে গো পেটের যন্ত্রণায়, দুমড়ে মুচড়ে ধনুকের মতো বেঁকে—'

মুক্তা এবার কাঁদে।

'কেউ কিছু করলে না?'

'দাসমশায় দুধ দিতে চেইছিল, মোকেও দেবে খেতেপরতে। তখন কি জানি মোর অদেষ্টে এই আছে? জানলে পরে রাজী হতাম, বাচচাটা তো বাঁচতো। মরণ মোর হলই, সে-ও মরল।'

চোখ মুছে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে মুক্তা। এবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কেঁদে ককিয়ে দরদ সে চায় না, সুবিচার চায় না। সব জেনে যা ভালো বুঝবে করবে রামপদ, যেমন তার বিবেচনা হয়।

'খোকন মরল, তোমার কোন পাত্তা নেই। দাসমশায় রোজ পাঠাচ্ছে নেড়ীর মাকে। দিন গেলে একমুঠো খেতে পাই নে। এক রাতে দু'টো মন্দ এলে, কামড়ে দিয়ে বাদাড়ে পালিয়ে বাঁচলাম এতটুকুর জন্যে। দিশে মিশে ঠিক রইল না আর, গেলাম সদরে চলে।'

'দাসমশায় তো খুব করেছেন মোদের জন্যে!' রামপদ বলে চাপা ঝাঁঝালো সুরে।—'যা তুই, নেয়ে আয় গা।'

শোলের ঝাল দিয়ে মুক্তা বসেছে ভাত খেতে, বাইরে থেকে ঘনশ্যাম দাসের হাঁক আসেঃ রামপদ!

'তুই খা।'

বলে রামপদ বাইরে যায়। জন পাঁচেক সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে ঘনশ্যাম এসে দাঁড়িয়েছে সরকারী সমনজারীর পেয়াদার মতো গরম গাম্ভীর্য নিয়ে। শঙ্কর এসেছিল একটু আগে, ঘনশ্যামদের আবির্ভাবে সুরমাদের যাওয়া হয়নি।

'বৌ এসেছে রামপদ?'

'আজ্ঞে।'

'ঘরে নিয়েছিস্?'

'আজ্ঞে।'

'বার করে দে এই দণ্ডে। যারা এনেছে তাদের সঙ্গে ফিরে যাক।'

'ভাত খাচ্ছে।'

রামপদ'র ভাবসাব জবাব-ভঙ্গি কিছুই ভালো লাগে না ঘনশ্যামদের। টেকো নন্দী শুধোয়, 'তোর মতলব কী?'

রামপদ ঘাড় কাত করে।—'আজ্ঞে।'

'বৌকে রাখবি ঘরে?'

'বিয়ে করা ইস্তিরি আজ্ঞে। ফেলি কী করে?'

এই নিয়ে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয় মানসুকিয়ার চাষাভূষোর সমাজে। ঘনশ্যামরাই জোর করে জাগিয়ে রাখে আন্দোলনটাকে। নইলে হয়তো আপনা থেকেই ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে থেমে যেত মুক্তার ঘরে ফেরার চাঞ্চল্য। সামাজিক শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা ঘনশ্যামদের নেই, জমিদার দেশে থাকলেও হয়তো তাকে দিয়ে কিছু করানো যেত। তাবে সামাজিক শাস্তিই যথেষ্ট। সবাই যদি সব রকমের বর্জন করে রামপদকে, কথা পর্যন্ত বন্ধ করে, তাতেই পরম শিক্ষা হবে রামপদ'র। সমাজের নির্দেশ অমান্য করলে শুধু এক-ঘরে হয়েই যে সে রেহাই পাবে না তাও জানা কথা। টিটকারী, গঞ্জনা, মারধোর, ঘরে আগুন লাগা সব কিছুই ঘটবে তখন। সবাই এসব করে না, তার দরকারও হয় না। সবাই যাকে ত্যাগ করেছে, যার পক্ষে কেউ নেই, হয় বিপক্ষে নয় উদাসীন, যার উপর যা খুসী অত্যাচার করলেও কেউ ফিরে তাকাবে না, মিলেমিশে সেই পরিত্যক্ত অসহায় মানুষটাকে পীড়ন করতে বড় ভালোবাসে এমন যারা আছে ক'জন, তাদের দিয়েই কাজ হয়।

তবে সময়টা পড়েছে বড় খারাপ। প্রায় সকলেই আহত, উৎপীড়িত, সমাজ-পরিত্যক্ত অসহায়েরই মতো। মনগুলি ভাঙা, দেহগুলিও। আজ কী করে বাঁচা যায় আর কাল কী হবে এই চেষ্টা আর ভাবনা নিয়ে এমন ব্যস্ত আর বিব্রত সবাই যে জোট বেঁধে ঘোট পাকাবার অবসর আর তাগিদ যেন জীবন থেকে মুছে গেছে। সকলকে উত্তেজিত করতে গিয়ে এই সত্যটা বেরিয়ে আসে। রামপদ'র কাণ্ডের কথাটা হুঁ হাঁ দিয়ে সেরে দিয়ে সবাই আলোচনা করতে চায় ধান চাল নুন কাপড়ের কথা, যুদ্ধের কথা। পেতে চায় বিশেষ অনুগ্রহ, সামান্য সুবিধা ও সুব্যবস্থা। একটু

আশা-ভরসার ইঙ্গিত পেলে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, যার চিহ্নটুকু দেখা যায় না, রামপদ'র বিচার থেকে রোমাঞ্চ লাভের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায়।

কয়েকজন তো স্পষ্টই বলে বসল, 'ছেড়ে দ্যান্ না, যাক্ গে। অমন কত ঘটছে, ক'দিন সামলাবেন? যা দিনকাল পড়েছে।'

আপন জনকে যারা হারিয়েছে দুর্ভিক্ষে মহামারীতে বাঁচবার জন্য শহরে পালিয়ে, আপনজন যাদের হয়ে গেছে নিরুদ্দেশ, বিদেশ থেকে ফিরে যারা ঘর দেখেছে খালি, এ ব্যাপারে চুপ করে থাকার আর ব্যাপারটা চাপা দেবার ইচ্ছা তাদেরই বেশী জোরালো। এ রকম কিছুই ঘটেনি এমন পরিবারও ক'টাই বা আছে!

ঘনশ্যাম একটু দমে যায়। বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপায় গোকুল।

'বাড়াবাড়ি করলেন খানিক।'

'বটে?'

'সাধু হিদে নখাদের দিয়ে মেরে লাল করে দিতেন এক দিন, চুকে যেত, বিচার-সভা ডেকে বসলেন। দশ জনে যদি দশটা কথা কয়, যাবেন কোথা? দু'গ'গার কথা যদি তোলে কেউ?'

'তুই চুপ থাক হারামজাদা।' ঘনশ্যাম বলে ধমক দিয়ে, কিন্তু হাত তার উঠে গিয়ে ঘাঁটতে থাকে বুকের ঘন লোম। জ্বালাও করে মনটা রামপদ'র স্পর্ধায়। সে নাকি দাওয়ায় চালা তুলেছে, বেড়া দিয়েছে, গুছিয়ে নিচ্ছে সংসার। বলে নাকি বেড়াচ্ছে, গাঁয়ে না টিকতে দিলে বৌকে নিয়ে চলে যাবে অন্য কোথাও। আগের চেয়ে কত বেশী খাতির করছে ঘনশ্যামকে লোকে আজ, তুচ্ছ একটা রামপদ'র কাছে সে হার মানবে! মনটা জ্বালাও করে ঘনশ্যামের।

পরদিন বসবে বিচার-সভা। সদরে জরুরী কাজ সারতে বেরোবার সময় ঘনশ্যাম ঠিক করে যায় সকাল সকাল রওনা দিয়ে বিকাল বিকাল গাঁয়ে ফিরবে, গিরির কাছে আজ আর যাবে না। কাজ শেষ হয় বেলা দু'টোর মধ্যেই, কিন্তু মনের মত হয় না, যেমন সে ভেবেছিল সে-রকম। মনটা তার আরেকটু দমে যায়। সাধ হয় একটু বিলাতী খাবার! গিরির সাথে রাত কাটাবার। সময়ের হিসাবেও আটক পায় না। সভা হবে অপরাহ্নে, সকালে রওনা দিলেও গাঁয়ে সে পৌঁছবে ঠিক সময়ে!

গোকুলকে সবচেয়ে কমদামী বিলাতী বোতল কিনতে দিয়ে সে যায় গিরির ওখানে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ঘনশ্যামের চোখ উঠে যায় কপালে, হাত বুকে উঠে লোম খোঁজে জামার কাপড়ের নীচে। মাদুর পেতে ভদ্রঘরের চারটি মেয়ে গিরিকে ঘিরে বসেছে, দু'জন তার চেনা। মুক্তাকে নিয়ে যারা রামপদ'র কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

নিঃশব্দে সরে পড়বার চেষ্টা করারও সুযোগ মেলে না, 'এই! শোন, শোন।' বলে গিরি লাফিয়ে উঠে এসে চেপে ধরে গলাবন্ধ কোটের প্রান্ত।

'ভাগছো যে? দাঁড়াও, কথা আছে অনেক।'

'ওনারা কারা?'

'তা দিয়ে কাজ কি তোমার?' গিরি ফুঁসে ওঠে। জামা সে ছাড়ে না ঘনশ্যামের,

পিছন ছেড়ে সামনেটা ধরে রাখে। কটমটিয়ে তাকায় বিষণ্ণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে। ঢোক গিলে দাঁতে দাঁত ঘষে।

'মা না কি ভালো আছে, বেশ আছে, মোর মা?'

'আছে না?'

'আছে? মাথা বিগড়েছে কার তবে, মোর? ক্ষেপেছে কে, মুই! তা ক্ষেপিছি, মাথা মোর ঘুরতে নেগেছে। ওরে নক্ষীছাড়া, ঠক, মিথ্যুক—'

'ও গিরিবালা!' সুরমা ভিতর থেকে বলে মৃদু স্বরে।

গাল বন্ধ করে নিজেকে গিরি সামলায়, গলা নামিয়ে বলে, 'মোর বাপকে টাকা দিয়ে বিভুঁয়ে মরতে পেঠিয়েছিল কে?'

'ওনারা বলেছে বুঝি?'

'মিছে বলেছে?' গিরি ডুকরে কেঁদে ওঠে বাপের শোকে, 'ও বাবা! মোর নেগে তুমি খুন হলে গো বাবা। এ নচ্ছার মেয়ার ধরে প্রাণ কেন আছে গো বাবা।' ভেতর থেকে আবার সুরমা ডাকেঃ 'ও গিরিবালা! তোমার বাবা মরেছে কে বললে? খবর তো পাওয়া যায়নি কিছু! বেঁচেই হয়তো আছে, মরবে কেন?'

নিখোঁজ তো হয়েছে আজ দশ মাস।' গিরি বলে নিজেকে সামলে গলা নামিয়ে।

অন্য ঘরের মেয়েরা জানালা-দরজায় উঁকি দেয়, কেউ কাজের ছুতোয় ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক চলাচল করে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে। অঙ্গন ঝকঝকে পরিষ্কার, নালা ছিটাল থেকে উঠে আসছে অশ্লীল গন্ধ। এঁঠো বাসনগুলির অখাদ্যের গন্ধটাও কেমন বদ। সুরমারা চার জনে বেরিয়ে আসে। তাদের দিকে না তাকিয়েই সদর দরজার দিকে যেতে যেতে বলে যায়, 'সকালে আমরা আসব গিরিবালা, তৈরী থেকো।'

'সকালে আসবে কেন?'

'মোকে গাঁয়ে পোঁছে দিতে, মার কাছে। ঘরে এস, বসবে।'

গিরি তাকে টেনেই নিয়ে যায় ঘরে। ঘনশ্যামের দিশেহারা অবস্থা, শত উপায় শত মতলবের এলোমেলো টুকরো পাক খেতে থাকে তার মাথার মধ্যে, কি করা যায় কি করা যায় এই অন্ধ আতঙ্কের চাপে।

মাদুরে বসে বিড়ি ধরিয়ে কেসে বলে, 'গাঁয়ে গিয়ে কী করবি গিরি? আমি বরং—

'বরং টরং রাখ তোমার। মার চিকিচ্ছে করাব। সব খরচা দেবে তুমি, যত টাকা নাগে। নয়তো কি কেলেঙ্কারি করি দেখো।' ঘনশ্যামের পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে গিরি ফস করে একটা সিগারেট ধরায়। ধপাস করে বসে পা ছড়িয়ে পিছনে একটা হাত রেখে পিছু হেলে। কয়েক মাসেই মুখের স্নিগ্ধ লাবণ্য উবে গেছে অনেকখানি, মাজা রঙের সে আভাও নেই তেমন, কিন্তু গড়নশ্রী হয়েছে আরও অপরূপ, মারাত্মক। সাধে কি ওকে পাবার জন্য অত করেছে ঘনশ্যাম, ছেড়ে দেবে দেবে করেও ছাড়তে পারছে না। কায়স্থের মেয়ে না হলে ওকে সে বিয়েই করে ফেলত এখানে টেনে না এনে।

ছেড়ে দেবে ভাবছিল কিছু দিন থেকে, যদি ছেড়ে দিত! আজ তাহলে এ হাঙ্গামায় তাকে পড়তে হত না ভদ্রঘরের ও এই ধিঙ্গি মাগীগুলোর কল্যাণে।

'এত পয়সা করেছ, বিড়ি টানে।' গিরিবালা বলে, মুখ বাঁকিয়ে। বলে সোজা হয়ে বসে, রামপদ'র পেছনে নাকি নেগেছ তুমি? একঘরে করবে? সাধুপুরুষ আমার! মোর ঘরে ফেরবার পথে কাঁটা দেবার মতলব, না? ওর বৌকে ঘরে ফিরতে না দিলে, মোকে কে ঘরে ফিরতে দেবে শুনি? মোকে একঘরে করবে না সবাই?'

গোকুল মদের বোতল নিয়ে এলে গিরি একদৃষ্টে বোতলটার দিকে তাকিয়ে থাকে। জিভ দিয়ে ঘন ঘন ঠোঁট ভেজায়। মুখের ভাব পলকে পলকে বদলে গিয়ে ঘনিয়ে আসে রুগ্নের যাতনাভরা লোলুপতা নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি বিকারগ্রস্তের তীব্র কাতরতা।

'বিলাতী?'

গোকুল সায় দেয়।

গিরি যেন শিথিল হয়ে ঝিমিয়ে যায়। অতি কষ্টে বলে, 'যাক এনেছ যখন, খাও শেষ দিনটা। ভোর ভোর উঠে চলে যাবে কিন্তু।'

মদের গ্লাসে দু'চার বার চুমুক দিয়ে একটু স্থির হয়ে ঘনশ্যাম ভাবে, না, কোন উপায় নেই। ভয় দেখানো, জবরদস্তি, মিষ্টি কথা, লোভ দেখানো, বানানো কথায় ভোলানো কিছুই খাটবে না। সে গিরি আর নেই, সেই ভীরু লাজুক বোকা হাবা সরল গেঁয়ো মেয়ে। পেকে ঝানু হয়ে গেছে।

কিছু পেসাদ পেয়ে গোকুল বিদায় হয়। খুব ভোরে এসে সে ঘনশ্যামকে ডেকে তুলে নিয়ে যাবে।

রাত বাড়লে গিরি জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'কি করি বল? কাল একবার যেতে হবেই। মার জন্য আঁকুপাঁকু করছে মনটা। তা ভেবো না তুমি। মার একটা ব্যবস্থা করে ফিরে আসব ক'দিন পরে। মাঝে মাঝে গাঁয়ে যেতে দিও মোকে, এ্যাঁ? ভেবো না, ফিরে আসব।'

গেলাস থেকে উছলে পড়ে শাড়ী ভিজে যায় গিরির। খিল-খিল করে হাসতে হাসতে রাগের চোটে গিরি গেলাসটা ছুঁড়ে দেয় ঘরের কোণে।

বিচার-সভায় লোক খুব বেশী হল না, মানসুকিয়ার ঘেঁষাঘেঁসি পাঁচ-ছ'টা গাঁ ধরলে। লোক কমেই গেছে দেশে। রোগে শয্যাশায়ী হয়ে আছে বহু লোক। অনেকে আসতে পারেনি আসবে ঠিক করেও, কাঁপতে কাঁপতে জ্বরে পড়ায়। অনেকে ইচ্ছা করে আসেনি। সমাবেশটাও কেমন ঝিম-ধরা, নিরুত্তেজ, প্রাণহীন। ক্ষীণ শীর্ণ অবসন্ন সব দেহগুলি, চোখে উদ্দেশ্যহীন ফাঁকা চাউনি। সভার বাক্‌গুঞ্জনও স্তিমিত। কথা কইতে ভাল লাগার দিন যেন নেই। বছর দুই আড়াই আগে, ঘনশ্যামের এই সদর দাওয়া আর সামনের ফাঁকা জমিতে শেষ সামাজিক বিচার-সভা বসেছিল এই চাষাভূষা শ্রেণীর, পদ্মলোচনের বোনের ব্যাপার নিয়ে। কি চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা ছিল সে জমায়েতে, মানুষের কলরবে গম্‌গম্ করছিল। কি ঔৎসুক্য ফুটেছিল সকলের মুখে এক বিবাহিতা নারীর কলঙ্কের আলোচনা আরম্ভ হওয়ার প্রতীক্ষায়। তার তুলনায় এ যেন সরকারী জমায়েত ডাকা হয়েছে বর্তমান অবস্থায় গ্রামবাসীদের কি করা উচিত বুঝিয়ে দিতে।

দাওয়ায় বসেছে মাথারা, মাঝ-বয়সী আর বুড়ো মানুষ। ঘনশ্যাম বসেছে মাঝখানে, একেবারে চুপ হয়ে, অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে। তার ভাব দেখে মাথাদের অস্বস্তি জেগেছে—উপস্থিত মানুষগুলির ভাব দেখেও। দাওয়ার এক প্রান্তে মোড়ায় বসেছে শঙ্কর, সে এসেছে অযাচিত ভাবে। কেউ কেউ অনুমান করেছে তার উপস্থিতির কারণ, অনেকেই বুঝে উঠতে পারেনি। অঙ্গনের দক্ষিণ কোণে জন-সাতেকের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে রামপদ, এদের আগে থেকে তার ভাব ছিল, বিশেষ করে করালী ও বুনোর সঙ্গে। মেয়েদের মধ্যে বসেছে মুক্তা, গিরির গায়ে লেগে! সে অবশ্য গিরিকে খুঁজে তার গা ঘেঁষে বসেনি, গিরিই তাকে ডেকে বসিয়েছে। পুরুষের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা বড় কম হয়নি সভায়।

ঘনশ্যামের দৃষ্টি বার বার গিরির ওপরে গিয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ সরিয়ে নেয়।

বিচারের কাজে গোল বাধে গোড়া থেকেই। পূর্ব-পরামর্শ মতো বুড়ো টেকো নন্দী গৌরচন্দ্রিকা শুরু করলে জমায়েতের মাঝখান থেকে রুক্ষ চুলে, খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়িতে আর একটা হাতাছেঁড়া ময়লা খাকি সার্ট গায়ে পাগলাটে চেহারার বনমালী চেঁচিয়ে বলে, 'কিসের বিচার? কার বিচার? রামপদ'র বৌ কোন দোষ করেনি।'

সবাই জানে, বনমালীর বৌকে সদরের দত্ত-বাবু ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘর ছাড়িয়ে চালান দিয়েছে ব্যবসা করার জন্য। প্রথমে সদরে রেখেছিল বৌ-টাকে, বনমালী হন্যে হয়ে খুঁজে খুঁজে তাকে যখন আবিষ্কার করে ফেলেছিল তখন আবার তাড়াতাড়ি কোথায় চালান করে দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও বনমালী আর হদিস পায়নি। এখনো সে মাঝে মাঝে সদরে গিয়ে সন্ধান করে।

টেকো নন্দী বলে, 'আহা, দোষ করেছে কি করেনি তাই তো মোরা বিচার করব।'

বনমালী রুখে বলে, 'বটে? কোন দোষ করেনি, তবু বিচার হবে দোষ করেছে কি করেনি? এ তো খুড়ো ঠিক কথা নয়। গাঁয়ের কোন ছেলেমেয়ে গাঁ ছেড়ে ক'দিন বাইরে গেলে যদি তার বিচার লাগে, তবে তো বিপদ।'

করালী বসে থেকেই গলা চড়িয়ে বলে, 'ঠিক কথা, গাঁয়ে খেতে পায়নি, সোয়ামী কাছে নেই, তাই সদরে খেটে খেতে গেছে। ওর দোষটা কিসের?'

কে একজন মাথাটা নামিয়ে আড়াল করে বলে, 'সে-বেলা তো কেউ আসেনি, দুটি খেতে-পরতে দিতে?'

কানাই বিদেশে তিন ছেলে আর দুই মেয়ে হারিয়ে শুধু নিজের বৌ আর বড় ছেলের বৌকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরেছে। সে বলে, তাদের তিন জনের কইমাছের প্রাণ, সহজে যাবার নয়, যায়ওনি তাই। তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখা যায়, সে থর থর করে কাঁপছে, মুখে এক অদ্ভুত উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদনার ভাব। কথা তার এলোমেলো হয়ে যায়, 'প্রাণে বেঁচে ফিরেছে মেয়েটা, ভগবান ছিল না তো কি? ভগবান বাঁচত কি, মেয়েটা ফিরেছে তো মরে এসে। তা ভগবান আছেন।'

কেউ হাসে না। সভায় ভগবান এসে পড়ায় শঙ্করের মতো অযাচিত আবির্ভাবের কৌতূহলমূলক একটা অনুভূতি জাগে অনেকের মনে।

জমায়েত স্তব্ধ হয়ে থাকে খানিকক্ষণ। শুধু মেয়েদের মধ্যে গুজ-গাজ ফিস-ফাস চলতে থাকে অবিরাম। মুক্তার মতো মেয়েরা আবার গাঁয়ে ফিরুক এটা যারা ঠিক পছন্দ করে না তারাও চুপ করে থাকে।

শেষে দাওয়া থেকে ভুবন বলতে যায়, 'কথা হল কি, ও যদি সদরে সত্যি খেটে খেতে যেত, খেটেই খেত—'

গিরি তড়াক করে ঘাড় উঁচু করে গলা চিরে ফেলে, 'খেটে খায়নি তো কি? মোরা এক সাথে খেটে খেয়েছি। এ পাড়ায় দু'বাড়ি ঝি-গিরি করেছি, এক দোকানে মুড়ি ভেজেছি। কোন্ মুখপোড়া বলে খেটে খাইনি মোরা, শুনি তো একবার?'

প্রায় সকলেই জানে একথা সত্য নয় গিরির। কয়েকজন স্বচক্ষে মুক্তাকে দেখেছে সদরে। কিন্তু কেউ কথা বলে না। কিছুকাল আগে গাঁয়ে লজ্জাবতী লতার মতো কাঁচা মেয়ে গিরির পরিবর্তনটা সকলকে আশ্চর্য্য করে দেয়—খুব বেশী নয়। যে দিন কাল পড়েছে। দাওয়ার নাছোড়বান্দা মাথা টেকো নন্দীই শুধু বলে, 'কিন্তু বহু লোকে যে চোখে দেখেছে। ফণি বলছে সে নিজের চোখে—'

মাঝবয়সী বেঁটে ফণি চট করে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়, 'না না, আমি তা বলিনি। আমি কেন ও-কথা বলতে যাব?'

এতক্ষণ পরে ঘনশ্যাম মুখ খোলে। জমায়েতে টুঁ শব্দ নেই কারো মুখে মেয়েদের ফিসফিসানি ছাড়া, তবু নেতাদের সভার কলরব থামাবার ভঙ্গিতে দু'হাত খানিকক্ষণ তুলে রেখে সে বলে, 'যাক্, যাক্। ভাই সব, আজকালকার দিনে অত সব ধরলে মোদের চলে না। আমি বলি কি, কথাটা যখন উঠেছে, রামপদ'র ইস্তিরি নামমাত্র একটা প্রাচিত্তির করুক, চাপা পড়ে যাক ব্যাপারটা।'

বনমালী ফুঁসে ওঠে, 'কিসের প্রাচিত্তির? দোষ করেনি তো প্রাচিত্তির কিসের?'

গিরি গলা চেরে, 'মোকেও প্রাচিত্তির করতে হবে নাকি? তবে?'

তারপর বিশৃঙ্খলার মধ্যে জমায়েত শেষ হয়। বনমালীর বৌ চোখ-ভরা জল নিয়ে মুক্তার ঝাপসা মুখখানি দেখে তার চিবুক ধ'রে চুমো খেতে গিয়ে গালটা টিপে দেয়। কয়েকটি স্ত্রীলোক মুখ বাঁকিয়ে আড়-চোখে মুক্তার দিকে চাইতে চাইতে চলে যায়। শঙ্কর নিঃশব্দে মোড়া থেকে উঠে যেমন অযাচিত ভাবে এসেছিল তেমনি অযাচিত ভাবে বিদায় না নিয়ে বনমালীর সঙ্গ ধরে।

বলে, 'যদি খুঁজে পেতে এনে দিই, ফিরিয়ে নেবে ভাই?'

বনমালী আশ্চর্য হয়ে যায়।—'ফিরে নেবে না তো খুঁজে মরছি কেন?'

একটা কথা বলতে গিয়ে শঙ্কর থেমে যায়। ফিরিয়ে আনার মতো অবস্থা যে সকলের থাকে না, মন এমন বিগড়ে যায় যে ঘরসংসার আর যোগ্য থাকে না তার, সেও যোগ্য থাকে না ঘরসংসারের। কিন্তু কি হবে ও-কথা বলে বনমালীকে। মহামারীতে লক্ষ লক্ষ দৈহিক মৃত্যু ঘটানোর মতো লোকে যদি তার বৌয়ের নৈতিক মৃত্যু ঘটিয়েই থাকে, ওকে সে সম্ভাবনার কথা জানিয়ে লাভ নেই। বৌ হিসাবে ওর বৌয়ের মরণ হয়েছে, মনের

এমন রোগ হয়েছে যা চিকিৎসার বাইরে অথবা চিকিৎসা করে সুস্থ করে তাকে আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব মানুষের জগতে, সেটা আগে জানা দরকার।

'চেষ্টা করে দেখি কি হয়।' বলে সহানুভূতির আবেগে বনমালীর হাতটা শঙ্কর চেপে ধরে হাতের মধ্যে; কলেজের বন্ধুর হাত যেমন ভাবে চেপে ধরত।

সিকিখানা চাঁদের আলো ছাড়া মানসুকিয়া অন্ধকার সন্ধ্যা থেকে। বেলতলার ভূতের ভয়—বছরখানেক বছর-দুই আগেও খুব প্রবল ছিল। আজ-কাল বেলতলার ভূতের ভয়ের প্রসঙ্গই যেন লোপ পেতে বসেছে মানসুকিয়ায়। এই বেলতলায় দাঁড়িয়ে গিরি বলে ঘনশ্যামকে, 'তুমি যদি না বলতে ব্যাপারটা, চাপা দিতে—'

ঘনশ্যাম বলে, 'চোখ-কান নেই? দ্যাখোনি, আমি কি বলি না বলি তাতে কী আসতো যেত? আমি শুধু নিজের অবস্থাটা সামলে নিলাম লোকের মন বুঝে।'

গিরির বাড়ি বেলতলার কাছেই। বেলতলায় সে ভয় পায়নি, বাড়ি যেতে পথের পাশে নালার ওপর তালের পুলটার মাথায় একটা মানুষকে বসে থাকতে দেখে তার বুক কেঁপে যায়।

'কে গা?'

'আমি গা গিরি, আমি।'

'অঃ! এত রাতে এখানে বসে আছ?'

'এই দেখছিলাম, গাঁয়ে তো এলো, গাঁয়ে গিরির মন টিঁকবে কি টিঁকবে না।'

'কী দেখলে?'

'টিঁকবে না। গিরি, গাঁয়ে মন তোর টিঁকবে না। মোর সাথে যদি তোর বিয়েটা হয়ে যেত, মুক্তার মতো একটা ছেলেপিলে যদি হ'ত তোর, ক'বছর ঘর-সংসার যদি করতিস তবে হয় তো—না গিরি, গাঁয়ে মন তোর টিঁকবে না।'

কখন সে উঠে দাঁড়িয়েছে কথা বলতে বলতে, কখন সে তালের পুল ডিঙিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে কথা শেষ না করে আর গিরির দুটো ভারি কথা না শুনেই, ভাল-মতো টের পায় না গিরি। মুখ বাঁকিয়ে সিকি চাঁদের আলোর আবছাতে অজানাকে সে অবজ্ঞা জানায়। পরক্ষণে মনে হয় বুকের কাছে কিসে যেন টান পড়ে টন-টন করে উঠেছে বুকের শিরা-টিরা কিছু, তাই ব্যথায় গিরি আরেক বার মুখ বাঁকায়।

গিরির মা শুয়েছিল কাঁথা-মুড়ি দিয়ে।

গিরি ডাকে, 'মা? ওমা?'

গিরির মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। গিরির মুখের দিকে চেয়ে বিরক্তির সুরে বলে, 'কে গো বাছা তুমি? হঠাৎ ডেকে চমকে দিলে?'

দুঃশাসনীয়

আগে, কিছুকাল আগে, বেশীদিনের কথা নয়, গভীর রাতেও হাতিপুর গ্রামে এলে লোকালয়ের বাস্তব অনুভূতিতে স্বস্তি মিলত। মানুষের দেখা না মিলুক, মাঠ, ক্ষেত, ডোবাপুকুর, ঝোপঝাড়, জলা অপরিসীম রহস্যে ভরাট হয়ে থাক, হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠুক হঠাৎ, জঙ্গলের আড়ালে শুকনো পাতা মচমচিয়ে হাঁটুক রাত্রিচর পশু, বটপুকুরের পুবোত্তর কোণের তালবন থেকে খোনা কান্না ভেসে আসুক আবদেরে শকুন ছানার, দীপচিহ্নহীন ছায়ান্ধকারে নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে থাক সারাটি গ্রাম—এসবই যোগাত ভরসা, রাত দুপুরে ঘুমন্ত গ্রামের এই সঙ্গত লাগসই পরিবেশ ও পরিচয়। গ্রাম তো এই রকমই বাংলার, রাত্রে সব গ্রাম। গা ছম-ছম করত ভয়ের সংস্কারে, ভয় পাবার ভয়ে, সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে নয়।

আজ তারা হাতিপুরে এলে ভয় পাবে, সন্ধ্যার পর বাংলার গাঁগুলির স্বাভাবিক পরিবেশ আজ কি দাঁড়িয়েছে যারা জানে না। বাংলার গাঁয়ের কথা ভেবে বসে যেসব ভদ্রলোকের মাথা চিন্তায় ফেটে যাচ্ছে তাদের কথাই ধরা যাক। বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে যে অভূতপূর্ব ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চলছে সে বিষয়ে একান্ত অভিজ্ঞ এইরকম কোন ভদ্রলোক আজকাল একটু রাত করে হাতিপুরে এলে ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে মূর্চ্ছা যাবে। এরা বড়ই সংস্কার-বশ, মন প্রায় অবশ। অতএব, দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশের অপমৃত্যু—নিরুদ্ধার, এ জ্ঞান জন্মেই আছে। তারপর সেই গাঁয়ে চারিদিকে ছায়ামূর্তির সঞ্চরণ চোখে দেখে এবং মর্মে অনুভব করে তাদের কি সন্দেহ থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার হয়ে তারা ছায়ামূর্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে।

গাছপালার আড়ালে একটা ছনের বাড়ি। বাড়ির সামনে ভাঙা বেড়া কাত হয়েও দাঁড়িয়ে আছে। বেড়ার ওপাশ থেকে নিঃশব্দে ছায়া বেরিয়ে এসে হনহন করে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে জমকালো কতগুলো গাছের ছায়ার গাঢ় অন্ধকারে, নয়তো কাছাকাছি এসে পড়ে থমকে দাঁড়াবে, চোখের পলক একটা চাপা উলঙ্গিনী বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ফিরে যাবে বেড়ার ওপাশে। ডোবাপুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসী কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, দিদি, মাসী, খুড়ী বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে কাঁদবে অভিশাপ দেবে অদৃষ্টকে, আর কথা শেষ না করেই ফিরে এদিকে ওদিকে এ-কুঁড়ে ও-কুঁড়ের পানে চাইবে বিড়বিড় করে বকতে বকতে। বিদেশীর সামনে পড়ে গেলে চকিতে ঝোপের আড়ালে অন্তরাল খুঁজে নিয়ে ভীত করুণ প্রতিবাদের সুরে ছায়া বলবে, 'কে? কে গো ওখানে?'

কোন ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে একফালি ন্যাকড়া, কোন ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোন ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরু সভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।

সারাটা দিন, সূর্যের আলো যতক্ষণ উলঙ্গিনী করে রাখে, ছায়াগুলি বাড়ির ভিতরে বা ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কোন কোন ছায়া থাকে একেবারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে, বাপ ভাই স্বামী শ্বশুরের সামনে বার হতে পারে না—স্ত্রীলোক-সুলভ লজ্জায়। কোন বাড়িতে কয়েকটি ছায়া থাকে এক সঙ্গে, মা, মাসী, খুড়ী, পিসী, মেয়ে, বোন, শাশুড়ী, বৌ ইত্যাদি বিবিধ সম্পর্ক সে ছায়াগুলির মধ্যে—এক একজন তারা পালা করে বাইরে বেরোয় কারণ, বাইরে বেরোবার মতো আবরণ একখানিই তাদের আছে।

ভোলা নন্দী কোমরের ঘুন্সীর সঙ্গে দু' আঙুল চওড়া পট্টি এঁটে তার পাঁচহাতী ধুতিখানি বাড়ির মেয়েদের দান করেছে। কাপড়খানা যে কোন সাধারণ গতরের স্ত্রীলোকের কোমরে একপাক ঘুরে বুক ঢেকে কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে—কাঁধে সর্বক্ষণ অবশ্য ধরে রাখতে হয় হাত দিয়ে, নইলে বিপদ। ভোলার বৌ ঘাটে যায়। ঘাট থেকে ঘুরে এসে ভিজে কাপড়টি খুলে দেয়। ভোলার মেজ ছেলে পটলের বৌ পাঁচী বা ভোলার মেয়ে শিউলি কাপড়টি পরে ঘাটে যায়।

'কৎকাল এমনি কয়েদ হয়ে থাকবো মা?'

পাঁচী হু হু করে কেঁদে ওঠে।

'আর সয় না।'

বলে শাল কাঠের মোটা খুঁটিতে মাথাটা ঠকাস্ করে ঠুকে দেয়। 'আর সয় না, আর সয় না গো!' বলতে বলতে মাথা ঠুকতে থাকে খুঁটিতে খুঁটিতে, গড়াগড়ি দেয় আগের গোবর-লেপা গুঁড়ো গুঁড়ো মাটিতে, ধুলোয় ধূসর হয়ে যায় তার অপুষ্ট দেহ ও পরিপুষ্ট স্তন। হায়, ধুলো মাটি ছাই কাদা মেখেও যদি আড়াল করা যেত মেয়েমানুষের লজ্জাজনক পোড়া দেহের লজ্জা!

বৈকুণ্ঠ মালিক মাঠে মাঠে ভীষণ খাটে, নিজেকে আর বৌটাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে। সন্ন্যাসীবাবুর দালানের পর আমবাগান, তার এপাশে রাস্তা এবং ওপাশে ঘুপচিমারা পথের ইয়ার্কি, তার কাছে দুবিঘে বিচ্ছিন্ন ধান জমির লাগাও বৈকুণ্ঠের মোট আড়াইখানা কুঁড়ে নিয়ে তিন পুরুষের বসতবাটি। আড়াইখানা কুঁড়ের মধ্যে ঘর বলা যায় একটাকে, তার ঝাঁপের দরজা, বাঁশের দেয়াল, বাঁশের দুয়ার, বাঁশের খিল। ঝাঁপে থপ থপ থাপড় মেরে বৈকুণ্ঠ প্রায় পিত্তি-ফাটা তেতো গলায় বলে, 'বাড়াবাড়ি করছিস ছোট বৌ, বাড়াবাড়ি করছিস বড়। মোর কাছে তোর লজ্জাডা কি?'

তার বৌ মানদা ভেতর থেকে বলে, 'মুখপোড়া বজ্জাত! বোনকে কাপড় দিয়ে বোয়ের সাথে মস্‌করা? যমের অরুচি, লক্ষ্মীছাড়া।'

সুন্দর সকাল, সুন্দর সন্ধ্যা—কচুর পাতায় শিশির ফোঁটায় মুক্তা হীরা। সকাল

থেকে সন্ধ্যা তক্ ঝাঁপের দু'পাশে এমনি গালাগালি চলে দু'জনের মধ্যে। বাড়ির তিনদিকে মাঠ ভরে শন উঁচু হয়ে আছে আড়াই থেকে তিন হাত। ছুটে গিয়ে ডুব দিলে লজ্জাসরম সব ঢাকা পড়ে যায়—আকাশের দিকে চেয়ে প্রাণভরে কাঁদা যায় নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে। এই শনের বনের মাঝখানে পায়ে-হাঁটা পথ ধরে বেনারসী শাড়ী পরা গোকুলের বোন মালতী বিপিন সামন্তের পিছু পিছু ছ'কুনের ছাউনীর দিকে চলতে থাকে গর্বে ফাটতে ফাটতে, তাই তাকিয়ে দ্যাখে মানদা ঘরের বেড়ার ফোকর-জানালায় চোখ রেখে। দাসু কামারের মেয়েটা আজ ওদের সঙ্গে যাচ্ছে। ও-ও তো রাতের ছায়া ছিল কাল রাত্রি তক্, সারা দিন ঘরে লুকিয়ে থেকে চুপি চুপি ঘাটে আসত দুটোচারটে বাসন আর কলসী নিয়ে। ধোপদুরস্ত সাদা থান কাপড়টা কোথা পেল ও সধবা মাগী?

শনক্ষেতের রঙ্গমঞ্চে রঘু একটু মস্করা করে বেনারসী পরা মালতীর সঙ্গে, তা দেখে যেন যাত্রাদলের মেয়ে সাজা ছেলে সখীর মতো ভড়কে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় রাণুর হাপুসকাঁদা ষোল বছরের কাঁচা মেয়ে। এদিক ওদিক চায়। হঠাৎ পিছু ফিরে হাঁটতে থাকে হনহনিয়ে, ফাঁদ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে হরিণী যেন পালাচ্ছে যেদিকে পালান চলে। ইস্! কি সাদা ওর পরনের ধুতিটা।

'অ বিন্দু! দাঁড়া।' রঘু ডাকে।

বিন্দী দাঁড়ায়। ফাঁদছাড়া হরিণী তো নয় আসলে, মানুষের মেয়ে। দাঁড়িয়ে মুখ ফেরায়। বলে, 'কাল—কাল যাব সামন্ত মশায়। বড় ডর লাগছে আজ।'

বেনারসী পরা মালতী বলে, 'ইহিরে, খুকী মোর ডর লাগছে। দে তবে, দে কাপড় খুলে। খোল্ কাপড়। যাবি তো চ', নয় কাপড় খুলে ঘরে যা।'

বৈকুণ্ঠ বলে, 'ঝাঁপ ভাঙবো ছোট বৌ।'

মানদা বলে, 'ভাঙো—মাথা ভাঙব তোমার আমি।'

সন্ধ্যার পর মানদা ঝাঁপ খোলে। সন্ধ্যার পর সোয়ামীর কাছে মেয়েমানুষের লজ্জা কি?

ভূতির ছেলে কানুর বয়স বছর বারো। ভূতির স্বামী গদাধর কাজ আর কাপড়ের খোঁজে বেরিয়েছে আজ এগার দিন। খিদেয় কাতর হয়ে কানু ভূতির কয়েদখানার বাইরে থেকে কেঁদে বলে, 'মা, ওমা! খিদে পায় যে?'

ভূতি বলে ভেতর থেকে, শিকেয় হাঁড়িতে পান্তো আছে, 'খে-গে যা নিয়ে।'

'পাড়তে পারি না যে। তুই দে।'

ভূতি দিশেহারা হয়ে ভাবে, 'যাবো? ছেলে মাকে ন্যাংটো দেখলে কি আসে যায়? মা কালীও তো ন্যাংটো। ওমা কালী, তুই-ই বল মা, যাবো? বল্ মা, মোর হিদয়ে থেকে একটা কিছু বল!'

কিন্তু সেদিন হঠাৎ তাকে উলঙ্গ দেখে কানু যেমন হি হি করে হেসেছিল, আজও যদি তেমনি করে হাসে? চোখ ফেটে জল আসতে চায় ভূতির, জল পড়ে না। জল শুকিয়ে গেছে চোখের। চোখ শুকনো, জ্বালা করে আজকাল কাঁদতে চাইলে।

হঠাৎ ছেঁড়া মাদুরটা চোখে পড়ে।

'দাঁড়া একটু।'

মাদুরটা সে নিজের গায়ে জড়ায়। একহাতে শক্ত করে ধরে থাকে গায়ে জড়ানো মাদুরটা, আর এক হাতে দুয়ার খুলে রসুই ঘরে গিয়ে শিকে থেকে নামাতে যায় পান্তার হাঁড়িটা। পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে যায় হাঁড়িটা, পান্তা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। তখন মাদুরটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে ভূতি এঁটো ভাত আর ভাত ভেজানো এঁটো জলের মধ্যেই ধপ্ করে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে শুরু করে কান্না। আর এমনি আশ্চর্য কান্ড, এবার তার শুকনো চোখ থেকে জল বেরিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে ফোঁটা ফোঁটা মিশতে থাকে মেঝের ভাত ভেজানো জলে।

রাবেয়া বলে আনোয়ারকে, 'আজ শেষ। আজ যদি না কাপড় আনবে তো তোমায় আমায় খতম। পুকুরে ডুবব, খোদার কসম।'

রাবেয়া ক'দিন থেকেই এ ভয় দেখাচ্ছে, তবু তার বিবর্ণ মুখ, রুক্ষ চুল আর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে আনোয়ারের বুক কেঁপে যায়। চাষীর ঘরের বৌ দুর্ভিক্ষের দিনগুলি না খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে কাটিয়ে দিয়েছে, কথা বলেনি, শাক পাতা কুড়িয়ে এনে খুদ কুঁড়োর সাশ্রয় করে তাকে বাঁচিয়ে লড়াই করেছে নিজে বাঁচবার জন্য। আজ কাপড়ের জন্য সে কামনা করছে মরণ! খেতে দিতে না পারায় দোষ ও গ্রাহ্য করেনি, পরতে দিতে না পারার দোষ ও সইতে নারাজ, দিনভর ফুঁসে ফুঁসে গঞ্জনা দিচ্ছে। বিবিকে যে পরনের কাপড় দিতে পারে না সে কেমন মরদ, তার আবার সাদি করা কেন?

অনুনয় করে আনোয়ার বলে, 'আজিজ সাবু খপর আনতে গেছেন। হাতিপুরের কাপড়ের ভাগ মিলবে আজকালের মধ্যে। একটা দিন সবুর কর আর।'

'সবুর! আর কত সবুর করব? কবরে যেয়ে সবুর করব এবার।'

সেমিজ না পরলে দু'ফেরতা শাড়ী পরা রাবেয়ার অভ্যাস। এক-ফেরতা কাপড় জড়িয়ে মানুষের সামনে সে বার হয়নি কোন দিন। পায়খানার চটের পর্দাটা গায়ে জড়িয়ে নিজেকে তার বিবসনা মনে হচ্ছে। কাপড় যদি নেই, ঘোষ বাবুর বাড়ির মেয়েরা এবেলা ওবেলা রঙীন শাড়ি বদলে নিয়ে পরে কী করে, আজিজ সায়েবের বাড়ির মেয়েরা চুমকি বসানো হাল্‌কা শাড়ির তলার মোটা আবরণ পায় কোথায়? সবাই পায়, পায় না শুধু তার স্বামী! আল্লা, এ কোন্ মরদের হাতে সে পড়েছিল!

রাত্রের ছায়ামূর্তি হয়ে রাবেয়া গিয়ে দেখে আমিনা জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে, তার গায়ে দুটো বস্তা চাপানো, চুণের বস্তা! বস্তার নিচেই আমিনার গায়ের চামড়া জ্বরে যেন পুড়ে যাচ্ছে।

আমিনা বলে ফিসফিসিয়ে, 'গা জ্বলছে—পুড়ে যাচ্ছে! আজ ঠিক মর্‌ব। এ বস্তা মুড়ে কবর দেবে মোকে।'

আবদুল আজিজ আর সুরেন ঘোষ হাতিপুরের একুশ শ' চাষী ও কামার কুমার জেলে জোলা তাঁতি আর আড়াইশ' ভদ্র স্ত্রীপুরুষের কাপড় যোগাবার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। মাস দেড়েক আগে উলঙ্গ হাতিপুর সোজাসুজি সদরে গিয়ে মহাকুমা হাকিম গোবর্ধন চাকলাদারকে লজ্জিত করেছিল। এভাবে সিধে আক্রমণের উস্কানি

যুগিয়েছিল শরৎ হালদারের মেজ ছেলে বঙ্কু আর তার সতের জন সাঙ্গপাঙ্গ। সতের মাইল দূরে স্বদেশসেবক তপনবাবুর কাপড়ের কল কয়লার অভাবে অচল হয়েও সাড়ে তিনশ' তাঁত কী করে সচল আছে আর খালি গুদামে কেন অনেক শ' গাঁট ধুতি শাড়ি জমে আছে, এসব তথ্য আবিষ্কার করায় বঙ্কু আর তার সাতজন সাঙ্গপাঙ্গ মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার দায়ে হাজতে আছে সোয়ামাস। মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা তারা না করে থাকলে অবশ্য বিচারে খালাস পাবে, মিথ্যা হায়রানির জন্য ক্ষতিপূরণের পাল্টা নালিশও রুজু করতে পারবে আইন অনুসারে কিন্তু গুরুতর নালিশ যখন হয়েছে ওদের নামে, হাজতে ওদের থাকতে হবে। জামিন দেওয়ার অনেক বাধা। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে জামিনের কথা।

ঘোষ আর আজিজ সভা ডেকে ঘোষণা করেছে হাতিপুরের জন্য কাপড়ের 'কোটা' তারা যা আদায় করেছে, এবার কাপুড়ের ভাবনা কারো ভাবতে হবে না। মনোহর শা'র প্রস্তাবে নিজেদের তারা হাতিপুরের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে। বিশ্বাস না করেও হাতিপুরের লোক ভেবেছে, দেখা যাক। আশা ছেড়ে দিয়েও হাতিপুরের নরনারী ভেবেছে, উপায় কি!

দু'জনে আজ সদরে গিয়েছিল, কবে হাতিপুরে এসে পৌঁছবে হাতিপুরের জন্য নির্দিষ্ট-করা কাপড়ের ভাগ, তারই খবর জানতে! গাঁয়ের লোক উন্মুখ হয়ে পথ চেয়ে আছে তাদের। ছায়ারা ঘরে ঘরে লুকিয়ে আছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও আগ্রহ ও উত্তেজনার শেষ নেই।

বিকালে ছোটখাটো একটি জনতা জমে উঠল গ্রামের পূব প্রান্তে কাঁথি সড়কের বাস-থামা মোড়ে।

ঘোষকে একা বাস থেকে নামতে দেখে জনতা একটু ঝিমিয়ে গেল। ভিড় দেখে ঘোষও গেল একটু ভড়কে।

'কী হল ঘোষমশায়, কাপড়ের কী হ'ল?'

'গোলমাল হয়েছে একটু।'

'গোলমাল? কিসের গোলমাল?'

'কলকাতা থেকে মাল আসেনি। ভাই সব, আমরা জীবনপাত করে—'

বঙ্কু'র সাঙ্গপাঙ্গদের একজন, সরকারদের অবিনাশ, সে সময়টা কলেরায় মরমর হয়ে থাকায় মারপিটের নালিশে হাজতে যেতে পারেনি। সে বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'শনিবার ক্ষেত্র সামন্তের চালান এসেছে, সাত ওয়াগন। আমি দেখেছি, পুলিস দাঁড়িয়ে গাঁট নামিয়ে গুনে গুনে চালান দিল।'

'ও সদরের জন্যে। হাতিপুরের 'কোটা' আসেনি।'

কবে আসবে?

'আসবে। আসবে। ছুটোছুটি করে মরছি দেখতে পাচ্ছ তো ভাই তোমাদের জন্যে?'

হতাশ ম্রিয়মাণ জনতা গাঁয়ে ফিরে যাবার উপক্রম করছে, কাপড়ের গাঁট বোঝাই

প্রকাণ্ড এক লরি রাস্তা কাঁপিয়ে এসে থামবার উপক্রম করে তাদের সামনে রাস্তার সেই মোড়ে। ড্রাইভারের পাশে বসে আছে আজিজ, তার পাশে সুরেন ঘোষের ভাই নরেন ঘোষ। সুরেন ঘোষ মরিয়া হয়ে পাগলের মতো হাত নেড়ে ইসারা করে, আজিজ জনতার দিকে তাকিয়ে তার ইসারা দ্যাখে, ড্রাইভারকে কি যেন বলে, থামতে থামতে আবার গর্জন করে লরিটা জোরে এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অল্প দূরে পথের বাঁকের আড়ালে। লাল ধূলায় সৃষ্টি হয় মেঘারণ্য।

জনতা ঘুরে দাঁড়ায়, একপা দু'পা এগিয়ে এসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বাস তখনো ছাড়েনি। বাস থেকে নেমে এসেছে খাকি পোসাক-পরা সুদেব, কোমরে চামড়ার চওড়া বেল্টটা তার কী চকচকে! লালপাগড়ী আঁটা একজন চা আনতে যায় সুবলের দোকান থেকে--চা এবং একটা কিসের যেন চ্যাপ্টা শিশি আর সোডার বোতল। ঘোষের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে সুদেব ধরায়, টান মেরে ধোঁয়া ছাড়ে, যেন ভেতরে কাঁচা কয়লার আগুন ধরেছে মানুষের ভিড় দেখার উত্তেজিত রাগে।

'কিসের ভিড়?'

'কাপড় চায়।'

'হাঃ হাঃ। পরশু পচেটপুরে সার্চে গেছলাম নন্দ জানার বাড়ি। বাড়ির সামনে যেতেই হাত জোড় করে বলল, কী করে ভেতরে যাবেন হুজুর, মেয়েরা সব ন্যাংটো। ওরা রসুই ঘরে যাক, সারা বাড়ি তল্লাস করুন। আমায় যেন বোকা পেয়েছে! রসুই ঘরে ফেরারী ছোঁড়াটাকে সরিয়ে সারা বাড়ি সার্চ করাবে। আমি বললাম, বেশ। তারপর সোজা রসুই ঘরের দরজা ভেঙে একদম ভেতরে।/আরে বাপরে বাপ, সে যেন লাখ শালিকের কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেল মশায়। সব কটাই প্রায় বুড়ী, কিন্তু একটা যা ছিল মিঃ ঘোষ, কি বলব আপনাকে। পাতলা একটা উড়নি পরেছে, একদম জালের মতো, গায়ের রঙ দেখে তো আমি মিষ্টার--'

হাতিপুরের মানুষ হাতিপুরে ফিরে যায় ধীরে ধীরে। এদিকের আশা ফুরিয়ে যাওয়ায় হতাশার চেয়ে চিন্তা সকলের বেশী। এভাবে যখন হল না তখন এবার কী করা যায়। কেউ যদি উপায় বাৎলে দিত।

'জান্ নয় দিলাম রে আব্বাস,' আনোয়ার বলে ভুরু কুঁচকে, 'কী জন্যি জানটা দিব তা বল্?'

ভোলা বলে, 'লুঠ করে তো আনতে পারি দু'এক জোড়া, কিন্তু তারপর?'

তারপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আকাশে ছোট চাঁদটি উঠেই আছে, দিন দিন একটু একটু বড় হবে। ক'দিন পরে জ্যোৎস্নার তেজ বাড়লে বন্দিনী ছায়াগুলির কী উপায় হবে কে জানে। চাঁদ ডুবলে তবে যদি বাড়ির বাইরে যাওয়া চলে, রোজ পিছিয়ে যেতে থাকবে শেষরাত্রির দিকে চাঁদ ডুববার সময়। বিলের ধারের বাঁধানো সড়কে নানারঙা শাড়ি পরা মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাবুরা ক'জন হাওয়া খাচ্ছেন। কাপড় তৈরীর কলেই যে হাতিপুরের লোক কাজ করে ওই তার প্রমাণ। কিন্তু আরও কত লোকেও তো কাজ করে সতের মাইল দূরে কাপড় তৈরীর কলে, তবে কেন ও অবস্থা তাদের? সবাই ভাববার চেষ্টা করে।

হাতিপুরের ঘরে ঘরে খবর রটে যায়, কাপড় পাওয়া যাবে না।

'তবে যে ঢেঁড়রা দিয়ে গেল কাপড় পাওয়া যাবে?' সকলে প্রশ্ন করল সন্ত্রস্ত হয়ে।

রসুল মিয়ার দালানের সামনের রোয়াকে এক ঘণ্টা ধন্না দিয়ে পড়ে থেকে আনোয়ার বাড়ি গেল সন্ধ্যার পরে। শাড়ি না পাক, কথা সে আদায় করেছে। বাড়তি শাড়ি ঘরে ছিল কিন্তু রসুল মিয়াও একটু ভয় পেয়ে গেছেন। অবস্থাটা একটু ভাল করে বুঝতে চান আগে। কদিন পরে তিনি একখানা শাড়ি অন্ততঃ আনোয়ারকে দেবেন, আজ হবে না। অই হোক্, তাও মন্দের ভাল। রসুল মিয়ার কথার খেলাপ হবে না আশা করা যায়। রাবেয়াকে এই কথাটা অন্ততঃ বলা যাবে।

রাবেয়া খানিক পরে ঘাট থেকে ফিরে আসে। অদ্ভুত রকম শান্ত মনে হয় আজ তাকে। আনোয়ার গোড়ায় তাকে দুঃসংবাদটা দেয়।

রাবেয়া বলে, 'জানি।' তারপর আনোয়ার রসুল মিয়ার কাছে দু'চারদিনের মধ্যে শাড়ি পাবার ভরসার খবরটা জানায়।

এবারও রাবেয়া বলে, 'জানি।'

দাওয়ায় এসে রাবেয়া তার কাছেই বসে। তেল নেই, দীপহীন অন্ধকার বাড়ি। অন্ধকার বলেই বুঝি পায়খানার ছেঁড়া চটের পর্দা জড়িয়ে নিজের কাছে রাবেয়া লজ্জা কম পায়। তাই বোধ হয় সে শান্ত হয়ে বসে কথা বলে আনোয়ারের সঙ্গে, ফুঁসে না, শাসায় না, খোঁচায় না। মনে মনে গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আনোয়ার কয়েকদিন পরে সাহস করে হাত বাড়িয়ে রাবেয়ার হাত ধরে।

রাবেয়া বলে, 'খাবেনি? চল।'

'চল।'

দাওয়ার গাঢ় অন্ধকার থেকে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় উঠানের আবছা অন্ধকারে নেমে রাবেয়া একটু দাঁড়ায়। তারপর আনোয়ারকে অবাক করে গায়ে জড়ানো চটটা খুলে ছুঁড়ে দেয় উঠানের কোণে।

'ঘিন্না লাগে বড়। গা কুটকুট করছে।'

আনোয়ারের একটু ধাঁধা লাগে, একটু ভয় করে।

'ফের নেয়েনি।'

ঘর থেকে ভরা কলসী এনে রাবেয়া মাথায় উপুড় করে ঢেলে দেয়। গায়ের ছেঁড়া কুঠিটা খুলে চিপে নিয়ে চুল ঝেড়ে গা মোছে।

'পানি ঢেলে দিলি সব?'

'ফের আনব।'

আনোয়ারকে খাইয়ে নিজে খেয়ে সানকি আর কলসি নিয়ে রাবেয়া ঘাটে গেল, আর ফিরল না। কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতকগুলি ইট-পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁটে বেঁধে পুকুরের জলের নীচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।

নমুনা

কেবল কেশবের নয়, এরকম অবস্থা আরও অনেকের হয়েছে। অন্ন নেই কিন্তু অন্ন পাওয়ার একটা উপায় পাওয়া গিয়েছে মেয়ের বিনিময়ে। কয়েক বস্তা অন্ন, মেয়েটির দেহের ওজনের দু'তিন গুণ। সেই সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও, যা দিয়ে খানকয়েক বস্ত্র কেনা যেতে পারে।

বছরখানেক আগের কেশব ভাল ছেলে খুঁজেছে, নগদ গহনা জামা কাপড় আর তৈজসপত্র সমেত শৈলকে দান করার জন্য। মেয়েকে যথাশাস্ত্র, যথাধর্ম যথারীতি দান করতে সে সর্বস্বান্ত হতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার সর্বস্ব খুব বেশী না হওয়ায় যেমন তেমন চলনসই গ্রহীতাও জোটেনি। শৈলর রূপও আবার এদিকে চলনসই। অথচ বেশ সে বাড়ন্ত মেয়ে।

খুঁজতে খুঁজতে কখন নিজের, স্ত্রীর, অন্য কয়েকটি ছেলে-মেয়ের এবং ঐ শৈলর পেটের অন্ন—এক পেটা, আধ পেটা, সিকি পেটা অন্ন—যোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে, ভাল করে বুঝবার অবকাশও কেশব পায়নি। বড় ছেলেটার বিয়ে দিয়েছিল, ছেলেটা চাকরি করত স্কুলে তেতাল্লিশ টাকার মাস্টারি। ছেলেটা মরেছে এক বিশেষ ধরনের বিস্ময়কর ম্যালেরিয়ায়। ম্যালেরিয়া জ্বর যে একশো ছয় ডিগ্রিতে ওঠে আর ভরিখানেক সোনার দামে যতটুকু গা-ফোঁড়া ওষুধ মেলে তা যথেষ্ট না হওয়ায় পাঁচ দিনের মধ্যে যোয়ান একটা ছেলে মরে যায় এমন ম্যালেরিয়ার গুণটাই শুধু কেশবের শোনা ছিল।

আরেকটা মেয়েও কেশবের মরেছে, সাধারণ ম্যালেরিয়ায়। এ ম্যালেরিয়া কেশবের ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া শত্রু। এর অস্ত্র কুইনিনের সঙ্গেও তার পরিচয় অনেক দিনের। হরি হরি, মেয়েটার যখন এমনি কুইনিন গেলার ক্ষমতা ছিল না, জলে গুলে কুইনিন দিতে গিয়ে ময়দার আঠা তৈরী হয়ে গেল!

সদয় ডাক্তার বলল, 'পাগল, ও খুব ভাল কুইনিন। নতুন ধরনের কুইনিন—খুবই এফেক্টিভ। নইলে দাম বেশী নিই কখনো আপনার কাছে?'

মেয়েটা মরে যাওয়ার পর সদয় ডাক্তার রাগ করেছিল। হাকিমের রায় দেওয়ার মতো শাসনভরা নিন্দার সুরে বলেছিল, 'আপনারাই মারলেন ওকে। কুইনিন? শুধু কুইনিনে কখনো জ্বর সারে? পথ্য চাই না? পথ্য না দিয়ে মারলেন মেয়েটাকে, শুধু পথ্য না দিয়ে।'

শৈলের চেয়ে সে মেয়েটি ছোট ছিল মোটে বছর দেড়েকের। তার মুখখানাও ছিল শৈলের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। আজ তার বিনিময়ে অন্ন মিলতে পারত। কয়েক বস্তা অন্ন। নগদ টাকা ফাউ।

কিন্তু সে জন্য কেশবের মনে কোন আফশোষ নেই। সে বরং ভাবে সে মেয়েটা মরে বেঁচেছে।

শৈলকে কিনল কালাচাঁদ!

কালাচাঁদের মুখ বড় মিষ্টি। বড়ই মধুর ও পবিত্র তার কথা। মুখখানা তার ফরসা ও ফ্যাকাসে। ছোট ছোট চোখে স্তিমিত নিস্তেজ নিষ্কাম দৃষ্টি। রাবণের অধিকার বজায় থাকা পর্যন্ত ধার্মিক বিভীষণ বরাবর যে দৃষ্টিতে কৃশোদরী মন্দোদরীকে দেখত, কালাচাঁদ সেই দৃষ্টিতেই মেয়েদের দেখে থাকে। এটুকু ছাড়া অবশ্য বিভীষণের সঙ্গে কালাচাঁদের তুলনা চলে না। বছর পাঁচেক আগে কালাচাঁদের দাদা কি ভাবে যেন মারা যায়। দাদার দু'নম্বর বেওয়ারিশ পত্নীটিকে স্নেহ করা দূরে থাক, কালাচাঁদ তাকে জোর জবরদস্তি করে একটা বাড়ির বাড়িউলি করে দিয়েছিল। সেটি কালাচাঁদের পারিবারিক বাড়ি নয়। অনেক তফাতে ভিন্ন একটি ভাড়াটে বাড়ি। সে বাড়িতে তখন দশ বারটি মেয়ে বাস করত।

তার পাশের বাড়িটিও কালাচাঁদ কিছুদিন আগে ভাড়া নিয়েছে। দু'বাড়িতে এখন মেয়ের সংখ্যা সতের আঠার। কালাচাঁদের মন্দোদরী এখন দুটি বাড়ির কর্ত্রী। মহিলাটি কয়েক বছরের মধ্যেই আকারে একটু স্থূল হয়ে পড়েছেন। উদর রীতিমতো মোটা। ধপধপে আধাহাতা সেমিজের উপর ধপধপে থান পরলে তাকে সম্ভ্রান্তবংশীয়া দেবীর মতো দেখায়।

দুর্ভিক্ষে শহরে মেয়ের চাহিদা বাড়ায় এবং মফঃস্বলে মেয়ে সস্তা ও সুলভ হওয়ায় কালাচাঁদ এদিক ওদিক ঘুরেছে। দেশের গাঁয়ে এসে তার শৈলকে পছন্দ হয়ে গেল। শৈল অবশ্য তখন কঙ্কালসার, কিন্তু এ অবস্থায় এসে না পড়লে কি আর এসব ঘরের মেয়ে বাগানো যায়? তাছাড়া, উপোস দিয়ে কঙ্কাল হয়েছে, কিছুদিন ভাল খেতে দিলেই গায়ে মাংস উথলিয়ে উঠবে। শৈলকে সে আগেও দেখেছে। রূপ তার চলনসই হলেও কালাচাঁদের কিছু এসে যায় না। প্রতি সন্ধ্যায় রূপ সৃষ্টি করে দিলেই চলবে। প্রথম কিছুদিন অন্যে তৈরী করে দেবার পর শৈল নিজেই শিখে ফেলবে পথিকের চোখভুলানো রূপ সৃষ্টির স্থূল রঙীন ফুলেল কায়দা।

প্রায় কীর্ত্তনীয়ার মোহন করুণ সুরে আফশোষ করে কালাচাঁদ বলে, 'আহা চুক্ চুক্! আপনার অদেষ্টে এত কষ্ট ছিল চক্কোত্তি মশায়।'

কেশব স্তিমিত নিস্তেজ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দরদের স্পর্শে চোখে তার জল নেমে আসবে কালাচাঁদ তা আশা করে না, কিন্তু দুটি চোখ একটু ছল ছল পর্যন্ত করল না! দেখে সে একটু আশ্চর্য ও ক্ষুব্ধ হয়। অথচ এ অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়। কি যেন হয়েছে দেশ শুদ্ধ লোকের। সহানুভূতির বন্যা ক্ষীণ একটা সাড়াও জাগায় না। আগে হলে সমবেদনার ভূমিকা করা মাত্র এই কেশব চক্রবর্ত্তী ছেলেমেয়েদের শোকে কেঁদে ভাসিয়ে দিত, চোখ মুছতে মুছতে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ বর্ণনা দিত,

ব্যাকুল আগ্রহে চেষ্টা করত সমবেদনাকে জাগিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে। আজ ওসব যেন তার চুলোয় গিয়েছে।

শহরের আস্তানা হতে অনেক গাঁয়ে কালাচাঁদ আসাযাওয়া করেছে। অনেক উজাড় গাঁ দেখেছে। কিন্তু গাঁয়ে বসে দিনের পর দিন গাঁ উজাড় হতে দেখেনি, নিজে ঘা খায়নি। সে কেন কেশবের নির্বিকার ভাবের মানে বুঝতে পারবে!

কালাচাঁদ কিছু চাল ডাল মাছ তরকারী এনেছিল—একবেলার মতো। এরা অবশ্য দুবেলা তিন বেলা চালিয়ে দেবে। তা দিক। সে শুধু জিভে একটু স্বাদ দিয়ে পেট একটু শান্ত করে এদের লোভ বাড়িয়ে দিতে চায়, পাগল করে দিতে চায়। শৈলর জন্য সে একখানি শাড়িও এনেছে। কাপড়খানা পরে তার সামনে এসেছে শৈলর মা। শৈলর সেমিজটি প্রায় আস্ত আছে, ছেঁড়া কাপড় পরলেও তার লজ্জা ঢাকা থাকে।

কালাচাঁদ নানা কথা বলে। আসল কথাও পাড়ে একসময়।

শৈলিকে নিয়ে যাবে? চিকিচ্ছে করাবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বড় কষ্ট হয় মেয়েটার কষ্ট দেখে।'

কালাচাঁদের নারীমেধ আশ্রমিক ব্যবসা সম্পর্কে কাণাঘুষা কেশবের কাণেও এসেছিল। সে চাপা আর্ত কণ্ঠে বলে, 'তোমার বাড়িতে রাখবে? শৈলিকে বাড়িতে রাখবে তোমার?'

'বাড়িতে নয় তো কোথা রাখবো চক্কোত্তি মশায়?'

কেশব রাজী হয়ে বলে, 'একটু ভেবে দেখি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা, একটু ভেবে দেখি।' কালাচাঁদ খুসী হয়ে বলে, 'বুধবার আসব। একটু বেশী রাতেই আসব, গাড়িতে সব নিয়ে আসব। কার মনে কি আছে বলা তো যায় না চক্কোত্তি মশায়, আপনি বরং বলবেন যে, শৈল মামাবাড়ি গেছে।' কেশব চোখ বুজে বলে, 'কেউ জানতে চাইবে না বাবা। কারো অত জানবার গরজ আর নেই। যদি বা জানে শৈলি নেই, ধরে নেবে মরে গেছে।'

শৈলকে দেখা যাচ্ছিল। এত রোগা যে একটু কুঁজো হয়ে গিয়েছে। মনের গহন অন্ধকারে শৈশবের ভয় নড়াচড়া করে ওঠায় কালাচাঁদ একটু শিহরে ওঠে। সারা দেশটাতে বড় সস্তা আর সহজ হয়ে গিয়েছে মানুষের মরণ।

নিরুপায়, তবু ভাবতে হয়। ভাববার ক্ষমতা নেই তবু ভাবতে হয়। উদরের ভোঁতা বেদনা কুয়াশার মতো কুন্ডলী পাকিয়ে উঠে মাথার মধ্যে সব ঝাপসা করে রেখেছে, কী করা উচিত তার জবাব কোথায়, কে জানে! ভাবতে গেলে মাথার বদলে কেশবের শরীরটাই যেন ঝিমঝিম করে। এ গাঁয়ের রাখালের বোন আর দীনেশের মেয়ে এভাবে বিক্রী হয়েছিল। কালাচাঁদের কাছে নয়, অন্য দুজন ভিন্ন লোকের কাছে। তবু তো শেষ পর্যন্ত রাখাল বাঁচতে পারেনি। ঘরে মরে পচে সে চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। দীনেশও তার পরিবারের ঝড়তি পড়তি মানুষ কটাকে নিয়ে কোথায় যেন পাড়ি দিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

তাছাড়া ওরা কেউ বামুন নয়। ঠিক কেশবের মতো ভদ্রও নয়। শূদ্রজাতীয় সাধারণ গেরস্থ মানুষ। ওরা যা পেরেছে কেশবের কি তা পারা উচিত? বুকটা ধড়ফড় করে কেশবের। তার মৃতদেহের নাড়ী সচল হয়। তালাধরা কানে শঙ্খঘণ্টা সংস্কৃত শব্দের গুঞ্জন শোনে, চুলকানি ভরা ত্বকে স্নান ও তসরের স্পর্শ পায়, পচা মড়ার স্মৃতিভ্রষ্ট নাকে ফুল চন্দনের গন্ধ লাগে। বন্ধ করা চোখের সামনে এলোমেলো উল্টোপাল্টাভাবে ভেসে আসে ছাতনাতলা, যজ্ঞাগ্নি, দানসামগ্রী, চেলিপরা শৈল, সারি সারি মানুষের সামনে সারি সারি কলাপাতা। মনে যেন পড়তে থাকে সে শৈলের বাপ!

কচুশাক দিয়ে ফ্যানভাত দুটি খাওয়ার সময় সারি সারি লোকের সম্মুখে সারি সারি কলাপাতা দেওয়ার জন্য আলগা উনানে চাপানো বড় বড় হাঁড়ি ও কড়াইভরা অন্নব্যঞ্জনের গন্ধ ও সান্নিধ্য যেন কেশবের নিশ্বাসকে চিরকালের মতো টেনে নিয়ে দ্রুত উপে যায়। কে কার বাপ সেটা অগ্রাহ্য করার পক্ষে তাই আবার হয় যথেষ্ট।

শৈলর মা বিনায়, কাঁদে না। ঝিমায় আর গুণগুণানো গানের সুরে বিনায়। শুনলে মনে হয় ঘরে বুঝি ভ্রমর আসছে। শৈলর শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ম বলে সে মাঝে মাঝে কথাগুলি শুনতে পায়ঃ তোর মরণ হয় না! সবাই মরে তোর মরণ নেই! ভাইকে খেলি, বোনকে খেলি, নিজেকে খেতে পারলিনে পোড়ারমুখী! মর তুই মর! কলকাতায় যাবার আগে মর!

শৈলর রসকস শুকিয়ে গিয়েছে। মনে তার দুঃখবেদনা মান অভিমান কিছুই জাগে না। খিদের বালাইও যেন তার নেই! কালাচাঁদের সঙ্গে যেখানে হোক গিয়ে দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার কথা ভাবলে তার শুধু ঘন ঘন রোমাঞ্চ হয়। তার নারী-দেহের সহজ ধর্ম রক্তমাংসের আশ্রয় ছেড়ে শিরায় গিয়ে ঠেকেছে। প্যাঁচড়া চুলকিয়ে সুখ হয় না; রক্ত বার হলে ব্যাথা লাগে না। অথচ পেট মোটা ছোট ভাইটার কাঁচা পেয়ারা চিবানো পর্যন্ত তার কাছে রোমাঞ্চকর ঠেকে।

বুধবার সকালে পরিষ্কার রোদ উঠে দুপুরে মেঘলা করে, বিকালে আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। মধ্যাহ্নে সদয় ডাক্তারের নাতির মুখেভাতে কেশব চক্রবর্তীর বাড়িশুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। কুঞ্জ শানাইওলা তার সঙ্গী আর ছেলে নিয়ে আশেপাশের কয়েকটা গ্রামের বিয়ে পৈতে মুখেভাতে চিরকাল শানাই বাজিয়ে এসেছে। তার অবর্তমানে সদয়কে শানাইওলা আনতে হয়েছে সদর হতে। সপরিবারে নিমন্ত্রণ রেখে কোনমতে বাড়ি এসে কেশব সপরিবারে মাদুরের বিছানায় এলিয়ে পড়ল। পেট ভরে খেলে যে মানুষের এরকম দম আটকে মরণদশা হয় এটা তারা জীবনে আজ টের পেল প্রথম। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা এমনিভাবে অর্ধচেতন অবস্থায় পড়ে রইল, যেন জ্ঞানহারা মাতালেরা ঘুমাচ্ছে। পথে একবার এবং বাড়িতে কয়েকবার বমি করায় শৈলর ঘুমটাই কেবল হল অনেকটা স্বাভাবিক। কেশবের পেটে যন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ায় সে-ই কাছে বসে তার পেটে খালি হাত মালিশ করে দিতে লাগল। বাড়িতে তেল ছিল না।

পেটের ব্যথা কমতে রাত হয়ে গেল, কেশবের তখন মানসিক সংস্কারগুলি ব্যথায়

টনটন করছে। কালাচাঁদ এল অনেক পরে, রাত্রি তখন গভীর। পাড়ার খানিক তফাতে নির্জনে গাড়ি রেখে সে একজন লোক সঙ্গে করে এসেছে। শুধু এ পাড়া নয়, সমস্ত গ্রাম ঘুমে নিঝুম। কেবল কেশবের মনে হচ্ছিল অনেক দূরে সদয় ডাক্তারের বাড়িতে যেন তখনো অস্পষ্ট সুরে শানাই বাজছে।

কেশব কেঁদে বলল, 'ও বাবা কালাচাঁদ।'

'আজ্ঞে?'

'এমনিভাবে মেয়েকে আমার কেমন করে যেতে দেব, আমার বিয়ের যুগি: মেয়ে?'

'এই তো দোষ আপনাদের। আমাকে বিশ্বাস হয় না? বলুন তবে কী করব। মালপত্র গাড়িতে আছে। তিন বস্তা চাল—'

কেশব চুপ করে থাকে। টর্চের আলোয় কালাচাঁদ একবার তার মুখ দেখে নেয়। চোখ দেখে নেয়। চোখ ঝলসানো আলোয় বুনো পশুর চোখের মতো কেশবের জলভরা চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে, পলক পড়ে না।

খানিক অপেক্ষা করে কালাচাঁদ বলে, 'চটপট কবাই ভাল। এই কাপড় জামা এনেছি, শৈলকে পরে নিতে বলুন। মালপত্র আনতে পাঠাই চক্কোত্তি মশায়?'

কেশব অস্ফুটস্বরে সায় দেয় না বারন করে স্পষ্ট বুঝা যায় না। শৈলর মা আরেকটু স্পষ্টভাবে বিনায়।

কালাচাঁদ সঙ্গের লোকটিকে হুকুম দেয়, 'মালগুলো সব আনগে যা বদ্যি ওদের নিয়ে। ড্রাইভারকে বলিস যেন গাড়িতে বসে থাকে।'

মেঝে লক্ষ্য করে কালাচাঁদ টর্চটা জ্বেলে রাখে। অন্ধকারে তার গা ছমছম করছিল। বিচ্ছুরিত আলোয় ঘরে রঙ্গমঞ্চের নাটকীয় স্তব্ধতার থমথমে বিকার সৃষ্টি হয়। কেশব উবু হয়ে বসেছে, তার হাতে শৈলর আনা রঙীন শাড়ী, সায়া ও ব্লাউজ। ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে শৈল।

'একটা তবে অনুমতি কর বাবা।'

কেশবের গলা অনেকটা শান্ত মনে হয়।

'বলুন।'

'শৈলকে তুমি বিয়ে করে নিয়ে যাও।'

'বিয়ে? আপনি পাগল নাকি?'

শৈলর হাতে জামা কাপড় দিয়ে কেশব গিয়ে কালাচাঁদের হাত ধরে। মিনতি করে বলে যে এ বিয়ে সে বিয়ে নয়। দশজনের সামনে পুরুত যে বিয়ে দেয়, সাক্ষীসাবুদ থাকে, বরের দায়িত্ব আইনে সিদ্ধ হয়, সে বিয়ে নয়। এ কেবল কেশবের মনের শান্তির জন্য।

'আমি শুধু নারায়ণ সাক্ষী করে শৈলকে তোমার হাতে সঁপে দেব। তারপর ওকে নিয়ে তুমি যা খুসী কোরো, সে তোমার ধর্মো। আমার ধর্মো রাখো। এটুকু করতে দাও।'

দুজন জোয়ান লোকের মাথায় শৈলর মূল্য এসে পড়েছিল। গাঁ উজাড় হয়ে যাক্, তবু বেশী লোক সঙ্গে না করে মাঝ রাত্রে গাঁয়ের একটা মেয়েকে নিতে

আসবার মতো বোকা কালাচাঁদ নয়। একা পেয়ে তাকে কেটে পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ।

কেশবের ন্যাকামিতে বিরক্ত হয়ে সে বলল, 'যা করবার করুন চটপট্'

কালাচাঁদের কাছ হতেই দেশলাই চেয়ে নিয়ে কেশব ঘরের এক কোণে শিলারূপী নারায়ণের আসনের কাছে প্রদীপটি জ্বালল। ঘরের বাইরে জ্যোৎস্নায় গিয়ে শৈল নতুন ও রঙীন সায়া ব্লাউজ শাড়ী পরে এল। প্রদীপে সামান্য তেল ছিল। কেশবের নারায়ণ সাক্ষী করে কন্যাদানের প্রক্রিয়ার সমস্তক্ষণ শৈলর বারবার মনে হতে লাগল, প্রদীপের তেলটুকু মালিশ করলে বাপের পেট-ব্যথা হয়তো তাড়াতাড়ি কমে যেত, অতক্ষণ বাপ তার কষ্ট পেত না পেটের ব্যথায়।

নিবু নিবু প্রদীপের আলোয় কালাচাঁদ আর শৈলর হাত একত্র করে কেশব বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে। কালাচাঁদ দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে করতে তাগিদ দেয় 'শীগগির করুন।' ঘরে যে ঠাকুর আছেন সে জানত না। ঠাকুর দেবতার সঙ্গে এ সব ইয়ার্কি ফাজলামি তার ভাল লাগে না। একটু ভয় করে। মনটা অভিভূত হয়ে পড়তে চায়। গৃহস্তের শান্ত পবিত্র অন্তঃপুরে জলচৌকিতে শুকনো ফুলপাতায় অধিষ্ঠিত দেবতা, সদ্ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণ, নির্জন মাঠঘাট প্রান্তরের মফস্বলে পুঞ্জীভূত মধ্যরাত্রির নিজস্ব ভীতিকর রহস্য তাকে কাবু করে দিতে চায়। মনে মনে নিজেকে গাল দিতে দিতে সে ভাবে যে বুড়োর এ পাগলামিতে রাজী না হওয়াই তার উচিত ছিল।

প্রদীপটা নিবে যাওয়ামাত্র কালাচাঁদ হাত টেনে নিল। তার হাতে শৈলর হাত ঘামে ভিজে গিয়েছিল।

কালাচাঁদের গা-ও ঘেমে গিয়েছিল। রুমালে মুখ মুছে শক্ত করে শৈলর হাত ধরে টানতে টানতে সে বার হয়ে গেল। নিজেও বিদায় নিল না, শৈলকেও বিদায় নিতে দিল না। দোকানীর কাছে ক্রেতা বা পণ্য কোন পক্ষই বিদায় নেয় না বলে অবশ্য নয়; কালাচাঁদের ভাল লাগছিল না। শৈলও থ' বনে গিয়েছিল

শিউলি জবা গাছের মাঝ দিয়ে বাড়ির সামনে কাঁচা রাস্তায় পা দিতে দিতে এ-ভাবটা শৈলর কেটে গেল। সেইখানে প্রথম হাত টেনে প্রথমবার সে বলল, 'আমি যাব না।'

আরও কয়েকবার হাতটানা ও যাব না বলার পর জোরে কেঁদে উঠবার উপক্রম করায় তারই শাড়ির আঁচলটা তার মুখে গুঁজে দিয়ে কালাচাঁদ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য হাল্কা রোগী শরীরে জোর এল অদ্ভূত রকমের। পর পর কয়েকবার রোমাঞ্চ আসার সঙ্গে হাত পা ছুঁড়ে সে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যেতে লাগল! মুখে গোঁজা আঁচল খসে পড়লেও দাঁতে দাঁত চেপে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে লাগল। তারপর হঠাৎ শিথিল নিস্পন্দ হয়ে গেল।

সব শুনে কালাচাঁদের মন্দোদরী গোসা করে বলল, 'কী দরকার ছিল বাবা অত হাঙ্গামার? আর কি মেয়ে নেই পিথিমীতে?'

'কেমন একটা ঝোঁক চেপে গেল।'

ঝোঁক চেপে গেল। মাইরি? ওই একটা বোঁচানাকী কালো হাড়গিলেকে দেখে ঝোঁক চেপে গেল।'

'দুত্তোরি, সে ঝোঁক নাকি?'

কিন্তু মন্দোদরীর সন্দেহ গেল না। পুরুষের পছন্দকে সে অনেক কাল নমস্কার করেছে, আগামাথাহীন উদ্ভট সে জিনিস। শৈলর জন্য কালাচাঁদের মাথাব্যথা, আদর-যত্ন ও বিশেষ ব্যবস্থার বাড়াবাড়িতে সন্দেহটা দিন দিন ঘন হয়ে আসতে লাগল। সাদা থান ও সেমিজ পরা ভদ্রঘরের দেবীর মতো যে মন্দোদরী, তার চোখে দেখা দিল, কুটিল কালো চাউনি।

শৈলকে দেখতে ডাক্তার আসে। তার জন্য হাল্কা দামী ও পুষ্টিকর পথ্য আসে। অন্য মেয়েগুলিকে তার কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না! কালাচাঁদ তার সঙ্গে অনেক সময় কাটায়।

একদিন ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে গেল।

শৈলর চেহারাটা তখন অনেকটা ফিরেছে।

'ওকে বাড়ি নিয়ে যাব ভাবছিলাম।'

'কেন?'

'মনটা খুঁতখুঁত করছে। ধরতে গেলে ও আমার বিয়ে করা বৌ। ঠাকুরের সামনে ওর বাবা মন্ত্র পড়ে ওকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। আমি বলি কি, বাড়ী নিয়ে যাই, এক কোণে পড়ে থাকবে দাসী-চাকরাণীর মতো।'

দুজনে প্রচণ্ড কলহ হয়ে গেল! বাস্তব, অশ্লীল, কুৎসিত্ত কলহ। কালাচাঁদ রাগ করে একটা মদের বোতল হাতে করে শৈলর ঘরে গিয়ে ভিতর হতে খিল বন্ধ করে দিল!

পরদিন দুপুরে সে গেল বাড়ি। স্ত্রীর সঙ্গে বাকী দিনটা বোঝাপড়া করে সন্ধ্যার পর গাড়ি নিয়ে শৈলকে আনতে গেল।

বাড়িতে ঢুকতেই মন্দোদরী তাকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

'শৈলর ঘরে লোক আছে।'

কালাচাঁদের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। মনে হল, মন্দোদরীকে সে বুঝি খুন করে ফেলবে।

'লোক আছে! আমার বিয়ে করা স্ত্রীর ঘরে—'

মন্দোদরী নিঃশব্দে মোটা একতাড়া নোট বার করে কালাচাঁদের সামনে ধরল। একটু ইতস্তত করে নোটগুলি হাতে নিয়ে কালাচাঁদ সন্তর্পণে গুনতে আরম্ভ করল। গোনা শেষ হবার পর মনে হল সে যেন মন্ত্রবলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

'লোকটা কে?'

'সেই গজেন। চাল বেচে লাল হয়ে গেছে।'

নোটের মোটা তাড়াটা নাড়াচাড়ার সঙ্গে কালাচাঁদের চোখমুখের নিঃশব্দ বিস্ময় ও প্রশ্ন অনুমান করে সে আবার বলল, 'খেয়াল চেপেছে, ও আবার বেশী টাকা কি? গেঁয়ো কুমারী খুঁজছিল।'

গোপাল শাসমল

সাতপাকিয়ার গগন শাসমলের ছেলে গোপাল গিয়েছিল জেলে। একদিন ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরল। জেলে যাওয়ার সময় তার বাড়িতে ছিল মণ পাঁচশেক ধান, দুটো বলদ, একটা গরু, পুঁই-মাচা, লাউ-মাচা, আর তিনটে সজনে গাছ। বাড়ি ফিরে দেখল, ধান মোটেই নেই, একটা বলদ নেই, গরুটা নেই, পুঁই-মাচায় নেই পুঁই, আর লাউ-মাচায় নেই লাউ। সজনে গাছ তিনটে আছে। সজনে গাছ তিনটির বয়স প্রায় গোপালের সমান। গাছগুলির অনেক ডাঁটা আর আঠা গোপাল খেয়েছে। জেলে যাওয়ার সময় পর্যন্ত ডাঁটার চচ্চড়ি এবং ছেলেমানুষ থাকার বয়সটা পার হওয়া পর্যন্ত আঠা। আধপেটা ভাত খেয়ে এই ত্রিশ বছর সে জমাটবাঁধা সজনে আঠা সংগ্রহ করে করে চিউয়িং গাম-এর মতো চিবোতে চিবোতে অনেকক্ষণ ধরে কেবল এই কথাটাই ভাবল যে, জেল-ফেরত ছেলেকে আধপেটা ভাত দিতে মা উপোস দিয়েছে আর বোনকে না খাইয়ে রেখেছে, এতো ভাল কথা নয়। এর চেয়ে জেলে থাকাই যে ভাল ছিল।

তারপর গাঁ ঘুরে আসতে বেরিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তার সাধ হতে লাগল, পথের ধুলোয় কিম্বা কাঁটা বনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

গাঁ প্রায় উজাড় হয়ে গিয়েছে তার অনুপস্থিতির সময়টুকুর মধ্যে। বেঁচে যারা আছে তারাও জীবন্ত নয়। খুব বেশী জীবন্ত কোনদিনই ছিল না, কিন্তু যে-টুকু ছিল তাতেই দলাদলি ঝগড়াঝাঁটি পুজোপার্বণে, উৎসবে এমন কি সময় সময় মারামারি কাটাকাটিও করেছে গাঁয়ের লোক। আজ সকলে ধীর স্থির শান্ত সুবোধ মানুষ—চোখে হতাশার পর্দা, চলনে হতাশার ভঙ্গি, কথায় হতাশার লম্বা টান, প্রতিটি মানুষ যেন—আর কেন, কি আর হবে, সব মায়া, মরা ভাল ইত্যাদির ক্ষীণ প্রাণবন্ত প্রতীক। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া আর প্যাঁচড়া। এমন ব্যাপক না হলেও অন্য রোগেরও ছড়াছড়ি। এমন প্যাঁচড়া গোপাল জীবনে কখনো দ্যাখেনি। যাঁকে ভাল করে ধরেছে তার হাড়ে লাগানো মাংসটুকু পর্যন্ত যেন খসে খসে পড়ছে। গফুর আর বনমালীকে দেখে প্রথমে সে ভেবেছিল এ বুঝি কুষ্ঠ বা ওই ধরনের কোন ব্যারাম। ভূষণের কাছে সে রোগের নামটা শুনল। ভূষণের হাতে পায়ে প্যাঁচড়া হয়েছে।

ভূষণ গোপালের মামা। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে কিন্তু আরও বুড়ো দেখায়। একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে। সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখেছিল, জোতদার কানায়ের কাছে বিশ বাইশ বছর কাজ করার অবসরে সব আবার ভুলে গেছে।

'কাজ? না, কাজ নেই! অসুখে ভুগলাম দু'মাস, তারপর হাতে পায়ে হল এই প্যাঁচড়া। ভাগিয়ে দিয়েছে।'

আজ শুধু বুড়ো নয়, ভূষণকে কেমন অদ্ভুত দেখায়। মাটির দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে দু'হাতের থাবা উঁচু ক'রে তার বসার ভঙ্গিটা পাছা-পেতে-বসা বুড়ো ভালুকের মতো। থ্যাবড়া মুখটা এমন লম্বাটে হয়ে গেছে, দু'পাশ থেকে যেন পিষে দিয়েছে কোন জোরালো পেষণ যন্ত্র।

'নগা কিছু করছে না?'

'ঘানি টানছে। তুই যা অ্যাদ্দিন করে এলি। আমায় ছাড়িয়ে দেওয়ায় কানায়ের ওপর চটে ছিল। সীতু, রাখাল, বদ্যি আর কটা ছোঁড়াকে নিয়ে কেনালে কানায়ের চালের নৌকা ধরিয়ে দিতে গেছল বাহাদুরী করে। ফাটা মাথা নিয়ে ডাকাতির চার্জে জেলে গেছে। ব্যাটা কুপুত্র চণ্ডাল। দু'বেলা খেতে পাবার মতলব ছিল ব্যাটার।'

ভূষণের মেয়ে রতন এসেছিল একখানা তাঁতের কাপড় পরে।

'কি যা-তা বলছ বাবা। দাদা গেল তোমার জন্যে শোধ নিতে, তুমি বলছ তার মতলব ছিল। খেতে পাবার জন্যে কেউ জেলে যায়?'

বলে সে হাঁটু-বাঁকাবার যন্ত্রণায় মুখ বাঁকিয়ে গোপালের পায়ে ঢিপ করে প্রণাম করল।

গোপাল এসে মামাকে প্রণাম করেনি। যাবার সময় ভূষণের পায়ের পাতার আধ হাত তফাতে মাটি ছুঁয়ে সে প্রণাম সারল।

পথে নেমে জোতদার কানায়ের বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে গোপাল ভাবে, পৃথিবীতে যা সব ঘটছে তা তার বোধগম্য হবে না। বিশ বছরের বেশী যে কাজ করে এসেছে সে, দু'মাস অসুখে ভুগে অশক্ত হয়ে পড়ায় কানাই তাকে ভাগিয়ে দিল! কেবল তাও তো নয়। দু'এক যোজন দূরের হোক, কানায়ের সঙ্গে একটা সম্পর্কও যে আছে, তার ভূষণ মামার! যে সম্পর্কের জোরে তারও অধিকার আছে কানাইকে বড় মামা বলার।

জোতদার কানায়ের বাড়ির কাছে এসে কান্নার আওয়াজ শুনে গোপাল থমকে দাঁড়িয়ে গেল। গাঁয়ে পা দেবার পর এই কান্নার শব্দে যেন তার নিজস্ব একটা অদ্ভুত স্তব্ধতার আবেষ্টনী ভেঙে পড়ল এতক্ষণে, বেলা যখন খতম হয়ে এসেছে। এখন তার খেয়াল হল, গাঁয়ের এতগুলি নারীপুরুষের বুকভরা শোক কান্নায় রূপ পায়নি, কান্না সে শোনেনি গাঁয়ে এসে। মৃত্যুপুরীর নীরবতাকে এতক্ষণ সে অনুভব করেছে কিন্তু কতগুলি জীবন্ত কঙ্কাল চোখে পড়ায় সে অনুভূতিকে বুঝতে পারেনি। অথচ এ অনুভূতি তার কত চেনা! কতবার জনহীন শ্মশানে তার হৃদয় মন এ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

দাওয়ায় বসে কানাই আকাশ বাতাসকে শুনিয়ে অদৃষ্টকে শাপ দিচ্ছিল। গোপাল প্রণাম না করায় চটে গেলেও শ্রোতা পাওয়ায় সে খুসী হল; তার ছেলের আজ ফিট হয়েছে। দু'বছরে তেরো হাজার টাকা উপায় করেছে এমন সোনার চাঁদ ছেলে।

কোন বিশেষ অপদেবতা বা অপদেবী নজর দিয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু কেন এই নজর দেওয়া, এত ধর্মো কর্মো পূজো অর্চনা করার পর!

'দুবচ্ছর চব্বিশ ঘণ্টা ভয়ে ভাবনায় দিন কাটাবার জন্যে হবে বা? শশী একটু ভয়-কাতুরে বটে তো।'

'কিসের ভয় ভাবনা?' সবিস্ময়ে কানাই শুধোয়।

'এই ধরা পড়ে জেলে যাবার ভয়। চোরাই কারবারে ভয় তো আছে।'

'কচু আছে। হাজার হাজার লোক করেছে না ও কারবার? তুই বাঁদর, জেল খাটিস। ওর জেলের ভয়টা কিসের?' থেমে গিয়ে কানাই থুতনিটা ঘন ঘন এপাশ ওপাশ নাড়ে আর লোমবহুল বুকে বাঁ হাতের তালু ঘষে—অম্বলের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে বুকটা।

'সুধাময়ী এয়েছে আজ।'

'বটে নাকি? বেশ।'

'এয়েছে মানে আমি আনাইনি—এয়েছে। এনে ফেলে দিয়ে গেছে আমার বাড়ি। বেয়াই বেটা, জানিস গোপাল, বজ্জাতের ধাড়ী।'

গোপাল খবরটা শুনেছিল। কানাইয়ের মেয়ে সুধার বিয়ে হয়েছিল গত বছর আশ্বিন মাসে। এবছর কার্তিকের গোড়ায় সে প্রসব হতে এসেছে বাপের বাড়ি। জামাই এসে রেখে গেছে।

হুঁকো এসেছিল। কানাই হুঁকো টেনে টেনে কাসে আর বলে, 'পেটে তিনবার নাথি মেরেছে। নক্তে ভেসে যাচ্ছে পিথীমী। তাই ফেলে রেখে গেল হারামজাদার দল। এখন আমি ডাকব ডাকতার কবরেজ, টাকা খসাবো মুঠো মুঠো- -মরবে জানি, তবুও সব করা চাই। কেন বাবা? তিলে তিলে দগ্ধে মারা কেন বাপকে? মরণ সংবাদ দিলেই হত একবারে!'

'ডাক্তার এনেছেন কাকে!'

'মধুকে দিয়ে ঝাড়ফুঁক করিয়েছি। ওর গাছগাছড়া অব্যথা। ভীমের মাকেও আনেয়েছি। ও বড় ভাল দাই। একাজ করে করে চুল পেকে গেছে।'

গোপাল শোনে আর ভাবে, কানায়ের বাড়ি কেন এসেছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে হঠাৎ উঠে সে বিদায় নেয়।

কানায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে জীবনে প্রথম নিজের বিরুদ্ধে নালিশ ক'রে গোপাল নিজেকে ধিক্কার দেয়, ভূষণের বাড়ির কাছে পৌঁছন পর্যন্ত। সুধার রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। ভীমের সত্তর বছরের বুড়ী মা, যে কানে কম শোনে, চোখে কম দ্যাখে, সে সুধাময়ীকে মারছে। এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য মনে তার কেটে কেটে বসে গিয়েছে অথচ দুঃখ-বেদনার বদলে সে অনুভব করছে সন্তোষ! যা হওয়া উচিত এ যেন তাই হয়েছে! নিয়ম রক্ষা—নীতির সম্মান বজায় থেকেছে। কানাই কষ্ট পাক, তাতে পরম তৃপ্তি বোধ হোক, ততখানি হিংসুটে ছোটলোক হতে জেলখাটা গোপালের আপত্তি নেই। কিন্তু কানাইকে শাস্তি দেবার জন্য সুধাময়ীর রক্তে পৃথিবী ভাসিয়ে দেওয়ার মতো অমানুষ হওয়া কি তার উচিত?

গাঁয়ের অনেকের বাড়ি ঘুরেও, কার’ ক’জন আপনজন না খেয়ে মরেছে শুনেও, ভূষণমামার সঙ্গে আলাপ করে সুধাময়ীর জন্য ব্যথা বোধের অক্ষমতায় গোপাল কাবু হয়ে রইল। ভূষণের বাড়ির কাছে যখন সে পৌঁছল, সন্ধ্যা উৎরে গেছে। চাঁদ বুঝি উঠবে মাঝ রাতের কাছাকাছি, আকাশের কুয়াশায় তারাগুলি ম্লান, অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। ভূষণের মেয়ে রতন সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে এসে গোপালের হাত ধরল।

‘চাল এনেছো তো? আজ আগে চাল দেবে, তবে ছুঁতে দেব। মাইরি বলছি কানাইবাবু—’হুস করে একটা শ্বাস টানার শব্দ হল। ‘কে? কে তুমি?’ প্রশ্ন না করেই রতন তাকে ছেড়ে দিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

তখন আবার গোপাল টের পেল পথ নির্জন। সন্ধ্যার খানিক পরেই এত বড় গাঁয়ের মৃত জনহীনতায় একা সে জীবন্ত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে দায়িক হয়ে। সুধাময়ীর কথা সে ভুলে গেল। রতনকে সে বড় স্নেহ করত।

শত্রু মিত্র

আদালতের বাইরে আবার দেখা হয় দুজনের, পানবিড়ি চা মুড়ি মুড়কি আর উকিল মোক্তারের দোকানগুলির সামনে। দু'জনে তারা পরস্পরের দিকে তাকায়। তীব্র বিদ্বেষের আগুনে যেন পুড়ে যায় দু'জোড়া চোখ। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় রসুল একটা অকথ্য কুৎসিত কথা বলে। কথাটা দামোদরের কাণে যায় না, ভিতরের হিংসার ধাক্কাতেই সে হাত দুটো মুঠো করে রসুলের দিকে দু'পা এগিয়ে যায় নিজের অজান্তে, উচ্চারণ করে বিশ্রী একটা অভিশাপ, তারপর লাল কাঁকর-বিছানো পথ ছেড়ে ঘাসের উপর দিয়ে হন হন করে চলতে আরম্ভ করে কিছুদূরের বড় বটগাছটার দিকে।

বটের ছায়ায় অনেক লোক। কেউ বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে। গাছটার গোড়ার দিকে ঘেঁষে বসে চাঁপা আকাশ পাতাল ভাবছিল। তার মুখের ভাবটা ভ্রুকুটিগ্রস্ত। পাশে বসে বিড়ি টানছিল দেবর মহেশ্বর। মহেশ্বরের তৈলহীন রুক্ষ চুলে নিখুঁত ভাঁজের টেরি।

দুপুরের ঝাঁঝালো রোদে চারিদিক ঝলসে যাচ্ছে। বটের বিস্তীর্ণ গাঢ় ছায়া পর্যন্ত গরম। প্রতাপগড়ের বাস ছাড়বে সেই বিকেলে, আদালতের কাজ শেষ হওয়ার পর। এখানেই সময় কাটাতে হবে সে পর্যন্ত।

'ফের আসতে হবে তোমাকে?' চাঁপা শুধোয়।

এগার বছরের পুরনো উড়নী বাঁচিয়ে কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছে দামোদর বলে, 'হ্যাঁ, শালারা সময় নিল বেগতিক দেখে। সাতাশ তারিখ।'

একে দুয়ে দামোদরের অন্য সাক্ষীরা এসে সেখানে জোটে, মোট পাঁচজন। মাথার কাপড় চাঁপা আরেকটু টেনে দেয়। আগে অনেকবার ভেবেছে, এখন অনেকবার ভাবছে, তসরে তাকে কি ছাই মানিয়েছে কে জানে—আর কপালের প্রকাণ্ড চওড়া সিঁদুরের ফোঁটায়। এ বুদ্ধিটা বাতলিয়েছে বুদ্ধিমান কেদার উকিল। হাকিম নাকি পরম ধার্মিক। এসব দেখলে মন ভেজে। কিন্তু কই ভিজল বুড়োর মন, ওরা আব্দার করতেই তো মুলতুবী করে দিল। মরণও হয় না বুড়ো শকুনটার!

সাক্ষীরা তাদের গাঁয়েরই লোক। মামলা মুলতুবী হওয়ায় তারা খুসী না অখুসী হয়েছে ঠিক বোঝা যায় না। অহঙ্কারে শীর্ণ বুক ফোলাবার চেষ্টা করে সক্রোধে তারা ঘোষণা করে যে রসুল মিয়াকে আজ শেষ করে দিয়েছিল, বড় বাঁচা বেঁচে গেছে চালাকি করে। তারা যেন সত্যিই রাগ করেছে। অথচ সাক্ষী দিতে আসবার সুযোগ অনেকদিন বাড়ল বলে, আবার কিছু আদায় করা যাবে বলে, ভাবটাও ঠিক যেন তারা চাপতে পারছে না।

সাক্ষীদের মধ্যে গোঁসাই একেবারে চাক্ষুষ। গায়ের গলাবন্ধ ফতুয়াটার মতোই তার মুখ ময়লা, ঢিলে আর ছেঁড়া ছেঁড়া। সে উৎসাহে ফেলে ফেলে বলে, 'ভাবছ কেন ভায়া, তালিম দেয়া মিছে সাক্ষী তো নই যে জেরায় কুপোকাৎ হব। দিক না উকিল যাকে খুসী, করুক না জেরা যদ্দিন পারে। নিক না সময়।'

হলধর সহজ সরল বোকা চাষী।—'আটগন্ডা পয়সা বেশী দিতে হবে মোকে। নইলে এসবোনি কিন্তু বলে দিলাম, হাঁ।' ভুবন ঘোষ মাইনর স্কুলের মাঝামাঝি মাষ্টার। সে হঠাৎ খলখল করে হেসে বলে—'কান্ড বটে বাবা।' এত বেশী হেসে এরকম একটা সাধারণ মন্তব্য করায় মনে হয় সেই বুঝি ব্যাপারটার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছে মাথাওলা লোকের মতো। নইলে এমন ভীষণ কান্ডে তার কেন মজা লাগবে?

চাঁপার চোখে জল আসে! এরা কি নিষ্ঠুর!

হারাধন বাস্তব বুদ্ধির লোক। সে বলে, 'বলি দামোদর, বাস তো ছাড়বে ও বেলা। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে বাবা। খোরাকী বাবদ কি দেবে বলেছিলে, দাও দিকিনি, খেয়ে আসি।'

শুনে সকলের পেটেই খিদের জ্বালা চাড়া দিয়ে ওঠে, চাঁপার পর্যন্ত। সেই কোন সকালে গাঁ থেকে তারা খেয়ে বেরিয়েছে।

প্রতাপগড়ের একটিমাত্র বাস। প্রতাপগড়ের কাছাকাছি গিয়ে শা'পুরে সবাই নামবে। দামোদরেরা বাসে উঠবার খানিক পরেই সাঙ্গোপাঙ্গো সঙ্গে নিয়ে রসুলও উঠে জাকিয়ে বসে। আদালতে এ পক্ষের আকস্মিক অচিন্তিত চালবাজীতে রসুলের রক্তে আগুন ধরে গিয়েছিল, ওরা কায়দা করে দিন ফেলে চালবাজীটা ব্যর্থ করে দেওয়ায় ক্ষেপে গিয়েছিল দামোদর। খুনোখুনি হয়ে যাওয়া কিছুই আশ্চর্য ছিল না। এখন সে দিশেহারা উন্মত্ত আক্রোশ আর নেই, এসেছে গভীর হিংসা আর ঘৃণা। আমি মরি মরব ওকে তো মারব, এই বেপরোয়া ভাবের বদলে দুজনের মধ্যেই জেগেছে নিজের কোন ক্ষতি না করে অপরের সর্বনাশ করার কামনা—এমন কি পারলে অপরের সর্বনাশ থেকে নিজের কিছু লাভ করে নেবার সাধ! চাঁপা ঘোমটা টেনে ভালো করে ঢেকে ঢুকে বসে। বাসে তিনজন লালমুখো গোরা মদে চুর হয়ে বসেছিল আগে থেকে, মাঝে মাঝে আড় চোখে সে তাদের দিকে তাকায়। রসুলের দিকে চোখ ফেরাতে তার সাহস হয় না।

শহর থেকে বেরিয়ে রাস্তা সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। পিছনে আর সামনে থেকে ধুলো উড়িয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে লরি চলে যায়, শব্দ পেলেই বাস চালক কানাই গতি মন্থর করে যত পারে নর্দমার ধার ঘেঁষে সরে যায়, লরি পেরিয়ে গেলে গাল দিতে থাকে চাপা গলায়! চাঁপা বসেছে রাস্তার ভেতরে দিকের জানালায়—লরি কিছু দূরে থাকতেই সে নিশ্বাস বন্ধ করে চোখ বোজে।

চোখ বুজে থাকার সময়েই একবার প্রচন্ড আওয়াজের সঙ্গে সে ধাক্কা খেয়ে পাশের বুড়িকে নিয়ে নীচে পড়ে যায়। বাসটাও একটু কাত হয়ে থেমে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

একজন গোরা চাঁপাকে পাঁজা কোলা করে তুলবার চেষ্টা করতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। দরজা দিয়ে বেরোবার জন্য প্যাসেঞ্জারদের তখন ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। দু'তিনজন দরজা থেকে সোজা নালায় গিয়ে পড়ে। কানাই গালাগালি বন্ধ করে চেঁচায়, 'ভয় নেই, ঠিক আছে! ভয় নেই, ঠিক আছে!'

ঠিকই আছে কলটা। ডাইনের মাডগার্ডটা শুধু ভেঙেছে আর বডির খানিকটা তুবড়ে ভেতরের দিকে দেবে গেছে। আর চার ছ'ইঞ্চির জন্য বাসটা উল্টে নালায় পড়েনি।

নালায় যারা পড়েছিল নামতে গিয়ে তাদের একজন কে হাত মচকেছে, হয় তো ভেঙেছে। সঙ্গী জল কাদা সাফ করে দিলে বাসে উঠে সে কেবলি বলতে থাকে, 'নম্বর নিয়েছ কেউ? নম্বর?'

আরেকজন বলে, 'আরে মশায়, রাখুন। নম্বর! নম্বর নিয়ে হবে কি?'

গাড়ি ছাড়বার আগে কানাই বলে, 'শালারা! যতটুকু উচিত তার চেয়ে এক ইঞ্চি যদি সরি—'

'না না, গোঁয়ার্তুমি কোরো না হে।' মাঝবয়সী মোটাসোটা একজন প্যাসেঞ্জার বলে।

'কিসের গোঁয়ার্তুমি? ভয় পেলেই ও শালারা মজা পায়। আমি জানি।'

বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ক্ষেত মাঠ জলায় আর আকাশে চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে পড়ার ব্যথা ও দুর্ঘটনার আতঙ্ক চাঁপার মিলিয়ে আসে—নতুন আর একটা লরির আওয়াজ কানে আসার সময়টা ছাড়া। ধরে তুলবার ছলে মাতাল গোরাটার অভদ্র কুৎসিত স্পর্শটাই সর্বাঙ্গে ভয়ার্ত অস্বস্তিবোধের মতো রি রি করতে থাকে। একটা মুখ-ভাঙা বোতল থেকে ঢেলে ঢেলে ওরা আবার মদ খেতে শুরু করেছে। লরির ধাক্কা লাগার সময় বোতলের মুখটা বোধ হয় ভেঙে গিয়েছিলো।

পাকুনিয়ার মোড়ে বাস আসে। আরও দুজন গোরা উঠে আসে। দু'জন চাষাকে ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আগের তিনজনের পাশে বসে কিচির মিচির কথা শুরু করে দেয়—একজন হাতের বোতলটা দেখায় তিনজনকে। তিনজন ঘন ঘন তাকায় চাঁপার দিকে, নতুন দু'জন মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে চোখ ফেরানোর সময়টুকু ছাড়া চাঁপার গায়েই চোখ পেতে রাখে।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই একজন একতাড়া নোট বার করে চাঁপার দিকে বাড়িয়ে ধরে হাসে। দামোদর আর মহেশ্বর কটকটিয়ে তাকায়। রসুল ভ্রূকুটি করে নুরে হাত বুলোয়। চাঁপা তাড়াতাড়ি মুখ বার করে দেয় জানালা দিয়ে বাইরে। গাড়িশুদ্ধ লোক স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

রসুলের মুখের ভাবটা দেখবার এমন জোরালো ইচ্ছা দামোদরের জাগে! তার কেবলি মনে হয়, তার এই অপমানে রসুলের মুখে নিশ্চয় শয়তানী পরিতৃপ্তির হাসি ফুটেছে। তাকাবে না ভেবেও কখন যে সে তাকিয়ে বসে নিজেই টের পায় না। রসুলের মুখে হাসি নেই কিন্তু তার দিকেই সে তাকিয়ে আছে অনুকম্পা-মেশানো অবজ্ঞাভরা এমন এক মুখের ভাব নিয়ে যার অর্থ অতি সুস্পষ্ট। চুপচাপ অপমান

সহ্য করার জন্য রসুল তাকে মনে করছে অপদার্থ, অমরদ কেঁচো। কানের কাছে ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে দামোদরের। তাড়াতাড়ি সে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

মনে মনে বলে, 'রও। টের পাবে। তোমায় যদি না আমি—' কি করলে যে এ অপমানের প্রতিশোধ রসুল পাবে সে ভেবে পায় না।

চাঁপার দিকে গোরাটার নোটের তাড়া বাড়িয়ে ধরার সবটুকু দোষ গিয়ে পড়ে রসুলের ঘাড়ে।

রসুল ভাবে, গোরাটা যদি হাত দিত মাগীটার গায়ে! কি খুসিই সে হত। তাকে জব্দ করতে চালাকিবাজী খেলার মজাটা টের পেয়ে যেত ব্যাটারা। বলবে না ভেবেও আজিজের কানে কানে কখন যে সে কথাটা বলে ফেলে। আজিজ কনুই দিয়ে তার বুকে একটা খোঁচা মেরে হাসতে থাকে।

আধখানা চাঁদ আকাশে উঠেই ছিল। দিনের আলোটা ম্লান হতে হতে এক সময় আধো জ্যোৎস্না হয়ে যায়। শা'পুরের নির্জন রাস্তার মাথায় বাসটা থামলে রসুলেরাই আগে নেমে যায়।

চাঁপা নামবার সময় একজন গোরা তার আঁচলটা চেপে ধরে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে আঁচল ছাড়িয়ে চাঁপা হুড়মুড় করে বাস থেকে প্রায় নীচে গড়িয়ে পড়ে।

আরও একটু দাঁড়িয়ে বাস ছেড়ে দেয়। তখন সেই চলন্ত বাস থেকে টুপটাপ করে নেমে পড়ে পাঁচজন গোরা।

শা'পুরের রাস্তা ধরে রসুলেরা তখন খানিকটা এগিয়ে গেছে। বড় রাস্তা থেকে শা'পুর প্রায় আধ ক্রোশ তফাতে, আঁকা বাঁকা গাছপালা ঢাকা পথ। প্রথম বাঁকটা ঘুরবার সময় মুখ ফিরিয়ে রসুল দেখতে পায়, চাঁপারা জোরে জোরে পথ হাঁটতে শুরু করেছে, তাদের কয়েক হাত পিছনে আসছে গোরারা।

বাসের শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়। ক্ষেত মাঠ জলা জঙ্গলের মুখর স্তব্ধতা ঝম ঝম করে চারিদিকে। তারই মধ্যে চাঁপার আর্তনাদ শুনে রসুল ও তার সঙ্গীরা থমকে দাঁড়ায়।

কি হয়েছে তাদের বলে দিতে হয় না। ম্লান জ্যোৎস্নায় তারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। দুটি মূর্তি ছুটে এসে তাদের পাশ কাটিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে উধাও হয়ে যায় গ্রামের দিকে—গোঁসাই আর ভুবন ঘোষ।

হলধরও ছুটছিল, এদের দেখে সে দাঁড়ায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'ভাই সর্বনাশ ছুটে এসো।'

আজিজ বলে, 'যা যা আচ্ছা হয়েছে।'

তখন বোধ হয় সরল সহজ হলধরের খেয়াল হয়, ওরা কারা এবং এরা কারা। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখ হাঁ হয়ে যায়, চাঁপার আর্ত চিৎকার শোনা যায় বেশী দূরে নয়।

হাতের লাঠি শক্ত করে চেপে ধরে রসুল সঙ্গীদের বলে, 'চল যাই'।

আজিজ বলে, 'ওদের বন্দুক আছে।'

'লাঠির কাছে বন্দুক?' বলে রসুল ছুটতে আরম্ভ করে।

রাঘব মালাকর

[পুরাণে বলে একদা নর-রূপী ভগবান স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে তাদের অন্তর পরীক্ষা করেছিলেন—বহুকাল পরে আবার তিনি এবার অদৃশ্য থেকে তাঁর প্রতিনিধিদের দিয়ে, সমগ্র বাংলা দেশের নরনারীর বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে, কি পরীক্ষা করে দেখছেন, তা তিনিই জানেন...তবে দুঃশাসনকে জব্দ করে বস্ত্রহীনা হওয়ার নিদারুণ লজ্জা থেকে দ্রৌপদীকে তিনিই রক্ষা করেছিলেন, হে রাঘব মালাকর, জেলে বসে ফাটা কপালে মলম দিতে দিতে অন্তত সেই কথা স্মরণ করে মনকে সান্তনা দিও—আশা করি এই ছোট্ট কাহিনীটি পড়ার পর আপনিও ঠিক এই কথাই বলবেন...]

রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই। লাঠির ঘায়ে মাথাটা তার ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

ফুলবাড়ির চৌমাথা থেকে নামমাত্র পথটা মাঠ জলা বন-বাদাড়ের ভিতর দিয়ে দু'ক্রোশ তফাতে মালদিয়া গিয়েছে। এই দু'ক্রোশের মধ্যে গাঁ বলতে কিছু নেই, এখানে ওখানে কতগুলি কুঁড়ে জড়ো করা বসতি আছে মাত্র। হাটবারের দিন কিছু লোক চলাচল করে পথ দিয়ে, অন্যদিন সন্ধ্যায় পথটা থাকে প্রায় জনহীন।

নির্জন হোক, পথটা নিরাপদ। গত কয়েক বছরের মধ্যে এ পথে কোন পথিকের বিপদ ঘটেনি। বছর তিনেক আগে দিনদুপুরে একজনকে পাগলা শেয়ালে কামড়েছিল শোনা যায়। কেষ্টরামের পোড়া মাদুলী আর চুম্বকপাথরের চিকিৎসাতেও নাকি বাঁচেনি। সাপটাপ হয় তো কামড়েছে দু'একজনকে ইতোমধ্যে, কুকুর হয় তো তেড়ে গেছে ঘেউ ঘেউ করে, গরু শিঙ নেড়েছে। কিন্তু বিশেষ কিছু কারো হয়নি, কারণ হলে সেটা মানুষের মনে থাকত। রাহাজানির দু'একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়, কিন্তু কবে যে সে ঘটনাগুলি ঘটেছিল কেউ বলতে পারে না, একেবারে ঘটেছিল কিনা তারও কোন প্রমাণ নেই। এ পথের আশে-পাশের বস্তি-গাঁগুলিতে যাদের বাস, চুরি ডাকাতি তারা যদি করে, ধারে কাছে কখনো করে না। এ পথের একলা পথিকের গায়ে হাত দেয়া দূরে থাক, তাকে ভয় দেখাবার ভরসা পর্যন্ত ওদের নেই। ওরকম কিছু ঘটলে দায়ী হবে ওরাই। পুলিসও প্রমাণ খুঁজবে না, জমিদার কার্তিক চক্রবর্তীও নয়—দু'পক্ষের শাসনে থেঁতো হয়ে যাবে ওরা, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তাদের কুঁড়েগুলি, বাতিল হয়ে যাবে আশে-পাশে বাস করার অনুমতি।

একবার সদরে টাকা নিয়ে যাচ্ছিল গোমস্তা রাধাচরণ, সঙ্গে ছিল দু'জন পাইক। জন সাতেক লোক তাদের মারধোর করে টাকা কেড়ে নিয়ে যায়। পরে তারা ধরা পড়ে জেলে গিয়েছিল, ফুলবাড়ীর পাঁচজন আর মালদিয়ার দু'জন—পরে। দু'দিকের চাপে রাঘবের আর কাছাকাছি আরও তিনচারটে বস্তি গাঁয়ের মানুষেরা থেঁতো হয়ে যাবার পরে।

পথ থেকে হাঁক এলে এরা সাড়া দেয়। ভীরু লোক দাবি করলে সঙ্গে পৌঁছেও দিয়ে আসে এদিকে ফুলবাড়ি বা ওদিকে সড়কের মোড় পর্যন্ত। একলা ভীরু পথিকের ভালোমন্দের দায়িক ওরাই কিনা।

শেষ বেলায় ফুলবাড়ি—মালদিয়া নামমাত্র পথ ধরে বোঁচকা মাথায় দু'জন লোক চলেছে মালদিয়ার দিকে। বেশভূষা বোঁচকার আকার, বয়স, আর গায়ের রঙ ছাড়া দু'জনের মধ্যে পার্থক্য বেশী নেই— অর্থাৎ, লম্বায় চওড়ায় দু'জনেই প্রায় সমান হবে। গায়ের জোরে কিনা বলা অসম্ভব, জোরের পরীক্ষা কখনো হয়নি। রাঘব মালাকরের কোমরে একহাত একটি গামছা জড়ানো, জ্যালজেলে পুরনো গামছা। গৌতম দাসের পরনে প্রমাণসাইজ ঘরে-কাচা আধপুরনো মিলের ধুতি, গায়ে পুরনো ছিটের সার্ট, ঘাড়ের কাছে একটু ছিঁড়েছে। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। রাঘবের বোঁচকাটা বেশ বড়, গৌতমের বোঁচকা তার সিকির চেয়ে ছোট হবে। রাঘবের আছাঁটা চুলে পাক ধরেছে, গৌতমের ছাঁটা চুলেও তাই, তবে রাঘব পনের বিশ বছরের বড় হবে গৌতমের চেয়ে। রাঘব মিশকালো, গৌতম মেটে।

খান দশেক কুঁড়ের নামহীন গাঁয়ের কাছে এসে একটু হাঁপ ধরে রাঘবের। গতবারের চেয়ে এবারের বোঝাটা বেশী ভারি। দু'চার মিনিটের জন্য বোঝাটা একটু সে নামিয়ে রাখে।

গৌতম বলে, 'আবার নামালি? আজ তোর হয়েছে কি র্যা?'

'ডবল বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে বলছ?' আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম চেঁছে এনে ঝেড়ে ফেলে রাঘব বলে, 'বাপ্‌স! কাপড়ের এত ওজন হয় জানতাম না বাপু! এত কাপড় জন্মে দেখিনি দোকান ছাড়া।'

গৌতম চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে বলে, 'কাপড়? কাপড় কিরে ব্যাটা? বললাম না বস্তা নিয়ে যাচ্ছি? মথুর সা বস্তা চেয়েছে চাল চালানের জন্যে?'

'গতবার টের পেইছি বাবু, কাপড়।'

'হ্যাঁ, কাপড়! তোকে বলেছে। সদরে খাঁ খাঁ করছে লোকে কাপড়ের জন্যে, বিশ টাকা দিয়ে কাপড় পাচ্ছে না একখানা, আমি নিয়ে চলেছি! ব্যাটার বুদ্ধি কত।'

রাঘবের হাসিটা বড় খারাপ লাগে গৌতমের।

'সদরেই তো বেচছো বাবু। গুদোম করেছ মালদিয়ায়। এপথে মাল আনছ মাসে দু'বার চারবার, পাঁচগড়ের পথে রোজ এদিক ওদিক চালান দিচ্ছ খানিক খানিক। মোরা বলি যে ঠাকুরবাবু পাঁচগড়ের পথে বাসে চেপে মালদিয়া যায় না কেনে, ফুলবাড়ি নেমে মজুরি দিয়ে মাল নিয়ে দু'কোশ হাঁটে? পাঁচগড়ের পথে ছোকরা বাবুরা পাহারা দেয়, তাই তো বিপদ।'

'কে বলেছে তোকে? কার কাছে শুনলি?' সভয় গর্জনে গৌতম জিজ্ঞেস করে।

'কে বলবে বাবু? আন্দাজ করিছি। মুখ্যু বলে কি, কি এমন মুখ্যু মোরা?'

গৌতম চট করে একটা বিড়ি ধরায়। একটু ভাবে। রাঘব যে বলল, মোরা আন্দাজ করিছি, তার মানে কি এই যে জানাজানি হয়ে গেছে? মোরা কারা? রাঘব আর তার আত্মীয়বন্ধু কজন, না আরও অনেকে?

'তোকে চার টাকা মজুরি দি রঘু।'

'আজ্ঞে বাবু। তোমার দয়া।'

'তাই বুঝি বলে বেড়াচ্ছিস আমার কারবারের ব্যাপার দশজনকে? তোকে বিশ্বাস করলাম, তুই শেষে নেমকহারামি করলি রঘু?'

দশ কুঁড়ের গাঁ যেন জনহীন—কুকুর পর্যন্ত ডাকে না। পথের পাশে জলায় শালুক ফুটেছে অগুন্তি—দুমাস আগে পর্যন্ত এই শালুকের ফসল তুলে প্রাণ বাঁচিয়েছে এই বস্তি-গাঁগুলির স্ত্রীপুরুষ—অবশ্য সবাই নয়। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে প্রায় পিছনে হেলে যায় রাঘব, আবেগের ভারে ভারাক্রান্ত গলায় বলে, 'নেমকহারামি ঠাকুরবাবু? বল নেমকহারামি? হাটে সেদিন সভা করে স্বদেশীবাবুরা বললে, যে যা জানো থানায় বলবে। বলিছি থানায়? থানায় মোরা বলতে যাইনি ঠাকুরবাবু ভালোমন্দ। যা বলি তাতেই গুঁতো। বলাবলি করেছি নিজেদের মধ্যে। তোমার তাতে কি?'

'নে নে মোট তোল।' গৌতম বলে খুসী হয়ে, 'চটিস কেন? আট আনা বেশী পাবি আজ, যা।'

রাঘব নিঃশব্দে বোঁচকা মাথায় তুলে নেয় গৌতমের সাহায্যে। গৌতম তাকে ছেঁদো দর্শনের কথা শোনায়, যে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে মেরে রাখা হয়েছে কোটি রাঘবকে বহুকাল ধরেঃ কি ভাবে ভালো থেকে মরলে লাভ আর কি ভাবে খারাপ হয়ে বাঁচলে লোকসান। তেজী গলায় গৌতম কথা কয়। শুনে গলা বন্ধ হয়ে আসে রাঘবের। মন তার মাথা কুটে বলে, হায় কি করিছি, হায় কি করিছি!

পরের গাঁয়ে রাঘবের ঘর, ফুলবাড়ি আর মালদিয়ার প্রায় মাঝামাঝি। এটাকে মোটামুটি গাঁ বলা যায়। খান ত্রিশেক ঘর আছে, আসল পথের সমান চওড়া পথ আছে গাঁ পর্যন্ত সাত আট রশি, নামও আছে গাঁয়ের পতু। এইটুকু এসে রাঘব বোঁচকা নামিয়ে রাখে। আঙুল দিয়ে শুধু কপালের ঘাম ঝেড়ে ফেলে থ্যান্ত হয় না, বোঁচকার ওপর চেপে বসে বেশ আনন্দ অন্তরঙ্গতার সুরে বলে, 'একটা বিড়ি দেন গো ঠাকুরবাবু!'

সাত আট রশি দূরে খান ত্রিশেক ঘরের নামওয়ালা বস্তি-গাঁ, এটাও যেন খানিক আগের দশ-কুঁড়ে গাঁ-টার মতো নিঃশব্দ, জনহীন মৃত। উলঙ্গ ছেলেমেয়ে পর্যন্ত ছুটে আসে না পয়সা ভিক্ষা করতে, পথ দিয়ে পথিক কেউ যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, তাতে যেন কিছু এসে যায় না তাদের। পতু গাঁয়ের দক্ষিণে ঘন জঙ্গল, নীচু জমিতে বছরে ছ'মাস বর্ষার জল জমে থাকলে শোভাহীন বর্ণহীন বীভৎস জলজ জঙ্গল জন্মে। ঝিল্লীর ডাকে সন্ধ্যার স্তব্ধতা, অন্ধকার রাত্রির ইঙ্গিত, এখনো সন্ধ্যা নামেনি। বাইরে

সন্ধ্যা না নামলেও ঘরগুলির ভিতর যে গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়েছে, রাঘব তা জানে। গৌতমও জানে। এ অঞ্চলেরই মানুষ তো সে। রাঘবকে ধমক দিতে গিয়ে হঠাৎ শিশুর কান্না কানে আসায় গৌতম চমকে উঠে থেমে যায়। কে যেন চাপা দিয়েছে শিশুটির মুখে। গা ছম ছম করে গৌতমের। এই জলা-জঙ্গল, কুঁড়ে, পথ আর এই গামছা-পরা মানুষ এসব পুরনো সবকিছু যেন নতুন নতুন মনে হয়, গাঁয়ের শব্দহীন স্তব্ধতায়, মানুষের সদৃশ্যতায়, শিশুর কান্নার মুখ-চাপায়, বোঁচকায় বসবার ভঙ্গিতে।

রাঘবকে সে বিড়ি দেয়। নিজে বিড়ি ধরাবার আগেই রাঘবকে দেয়। বলে, 'টেনে নিয়ে চটপট চল বাবা, পা চালিয়ে বাকী পথটা।

মেরে দি। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ কচ্ছে, মাইরি বলছি তোকে রঘু, কালীর দিব্যি। চ' যাই চটপট। পৌঁছে দিলে তুইও খালাস। ওখানে খাবি তুই আজ। জানিস, আমার ওখানে খাবি। খেয়ে দেয়ে ফিরিস, নয় শুয়ে থাকবি।'

ঘাড় হেঁট করে রাঘব বসে থাকে বোঁচকায়, করুণ চোখের পলকে তাকিয়েই চোখ নামায়। ধরা গলায় বলে, 'বাবুঠাকুর, এ কাপড় মোদের চাই।'

'কাপড় চাই? আচ্ছা, আচ্ছা দেবখন তোকে একখানা—' গৌতম ঢোক গেলে, 'একজোড়া কাপড়। নে দিকি নি, চল দিকি নি এবার। ওঠ।'

রাঘব উঠে দাঁড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গৌতমের পায়ে, দু'হাতে দু'পা চেপে ধরে বলে, 'আজ চলাচলি নাই বাবুঠাকুর। কাপড়গুলো মোদের দিয়ে তুমি যাও গে। দানছত্তর করে যাও বাবুঠাকুর কাপড়গুলো। মোদের ঘরে মেয়ে-বৌ ন্যাংটো হয়ে আছে গো।'

গৌতমের ভয় করে। কিন্তু এদের সম্বন্ধে তার ভয় খুব অল্প, তাই মন তার ভয়ের সীমা পেরিয়ে যায়। ঝাঁকড়া চুল ধরে রাঘবকে টেনে তুলে গর্জন করে সে বলে, 'হারামজাদা! গাঁজাখোর! বজ্জাত! ওঠ বলছি! মোট তোল! নন্দবাবুকে বলে তোকে জেল খাটাব ছ'মাস। ভৈরববাবুকে বলে তোকে চালা কেটে তুলে দেব দেশ থেকে। মোট তোল, পা চালিয়ে চল।'

'মেয়েগুলো ন্যাংটো বাবুঠাকুর? মা-বুন ন্যাংটো, মেয়ে-বৌ ন্যাংটো—'

'ন্যাংটো তো ঘরে ঘরে...'

বলেই গৌতম অনুতাপ করে। এমন কুৎসিত কথা বলা উচিত হয়নি, রাঘবের মা-বোন মেয়ে-বৌকে এমন কদর্য গাল দেওয়া। দুটো মন-রাখা কি কি কথা বলে কাটিয়ে দেওয়া যায় এই ভীষণ কথাটা, গৌতম তাই মনে মনে স্থির করার চেষ্টা করে। বেশী নরম হলে ব্যাটা পেয়ে বসবে। বেশ লাগসই, যুতসই, ওজনসই কথা বলা চাই।

'কাপড় তবে রইলো বাবুঠাকুর।'

বলে রাঘব হাঁক দেয় গলা চড়িয়ে। মৃত পল্লী যেন জীবন্ত প্রাণ পেয়ে কলরব করে ওঠে, কিলবিল করে বেরিয়ে আসে উলঙ্গপ্রায় স্ত্রী-পুরুষ। পল্লীতে এত লোক থাকে না, অন্য সব বস্তি-গাঁয়ের লোকেরাও আজ ওখানে এসে জড়ো হয়েছিল।

গৌতম প্রথমে হতভম্ব হয়ে যায়, তারপর উঠে দাঁড়িয়েই ছুটে পালাবার উপক্রম করে। রাঘব লাফিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে।

'আর হয় না বাবুঠাকুর। বললাম দান করে দিয়ে যাও কাপড়গুনো, তা তো শুনলে না।'

'নে না কাপড়গুনো বাবা। সব কাপড় নে। আমায় ছেড়ে দে।'

'আর তা হয় না বাবুঠাকুর। দান দিয়ে যেতে সে ছিল ভিন্ন কথা: কাপড় লুট হল এখন, তোমায় ছেড়ে দিয়ে মরব মোরা?'

উত্তেজিত মানুষগুলিকে রাঘব সংযত রাখে। তার ধমকে অন্য সকলের চেঁচামেচি বন্ধ হয়, কিন্তু ভয়াতুর কয়েকজনের আর্ত ও তীব্র প্রতিবাদ সে থামাতে পারে না। বুড়ো নরহরি কপাল চাপড়ে চেঁচায়, 'মারবি তুই, সবাইকে মারবি তুই রাঘব! পুলিস আসবে সবাইকে বেঁধে মারবে, ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে। ওরে বাবা রে, সব্বোনাশ করলে রাঘব।'

দুটি স্ত্রীলোক চেঁচিয়ে কান্না ধরে।

তিনজন মাঝবয়সী লোক চোখ পাকিয়ে বলে, 'মোরা এর-মধ্যি নাই, রাঘব।'

রাঘব বলে, 'নাই তো দেঁড়িয়ে রইছ কেনে? কাপড়ের ভাগ নিও না, যাও গা।'

কাপড়ের বোঁচকা আর গৌতমকে গাঁয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। রাঘবের ঘরের দাওয়ায় বোঁচকা নামিয়ে বড়দের মজলিস বসে, এবার কি করা উচিত আলোচনার জন্য। কি করা হবে না হবে সব ঠিক হয়ে আছে কদিন থেকে, গৌতমকে পুঁতে ফেলার জন্য জঙ্গলে গভীর গর্তও কেটে রাখা হয়েছে একটা, তবু একটা আলোচনা না করে তারা পারে না! কাপড়গুলি তাড়াতাড়ি বিলি করে ফেলা দরকার, বাইরের যারা তার ফিরে যাবে যে যার গাঁয়ে, এখানকার যারা তারা যাবে যার যার ঘরে। এত লোক বেশীক্ষণ জমায়েত হয়ে থকা উচিত নয়, কে যাবে পথ দিয়ে। কার কি চোখে পড়বে কে বলতে পারে। রাঘব থেকে থেকে গর্জন করে ওঠে, ধারালো দা উঁচু করে একদম চুপ হয়ে যেতে বলে সবাইকে—গোলমাল শুনে কেউ যদি ব্যাপার দেখতে আসে পথ থেকে? তাকেও তো পুঁততে হবে বাবুঠাকুরের সঙ্গে। একটা লোক নিখোঁজ হওয়া এক কথা। বেশী লোক নিখোঁজ হলে হাঙ্গামা হবে না?

'কথা যে কইবে সে কাপড় পাবে না।'

রাঘবের গর্জনের চেয়ে বলরামের এই ঘোষণায় কাজ হয় বেশী। সবাই চুপ হয়ে যায় একেবারে, যারা প্রতিবাদী ছিল তারা পর্যন্ত। বুড়ী পচার মা শুধু বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকে।

গৌতমের কান্না, বিলাপ, অনুনয়-বিনয়ের অন্ত ছিল না, রাঘব একবার দা'টা উঁচিয়ে ধরার পর সেও থেমে গিয়েছিল। এবার সে বিনিয়ে বিনিয়ে বলে, 'আমায় ছেড়ে দে বাবা তোরা। আমায় মেরে কি হবে তোদের? কাপড় পেয়েছিস, বামুনের ছেলেকে মেরে কেন মহাপাপ করবি? ছেড়ে দে আমায়।'

বলরাম বলে, 'কি করে ছাড়ি? ছাড়া পেলে তুমি গিয়ে তো পুলিস আনবে বাবুঠাকুর।'

গৌতম পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে, বাপ-মার নামে আর দেব-দেবীর নামে দিব্যি গালে, পুলিসকে সে কিছু বলবে না।

'এ কথা কি মনে থাকবে বাবুঠাকুর?'

তখন হতাশ হয়ে প্রাণ বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করে গৌতম বলে, 'শোন বলি, পুলিসকে আমি বলতে পারি না। সাধ থাকলেও পারি না।'

'পার না?'

'না। বললে আমারি জেল হবে। এ কাপড় চোরা-বাজারের মাল, পুলিস যখন শুধোবে কাপড় পেলাম কোত্থেকে, কি জবাব দেব বল? সত্যি বললে যার কাছ থেকে এনেছি তাকে ধরবে, আমাকে ধরবে, কারবার তো ফাঁক হয়ে যাবেই, জেল হয়ে যাবে আমাদের। চোরা মাল না হলে কি এ পথে মাল নিয়ে আসি, তোরাই বুঝে দ্যাখ। পুলিস কেন, তোরা কাপড় লুটে নিয়েছিস, কারো কাছে বলবার উপায় নেই আমার।'

রাঘব বলে, 'তা বটে। এটা তো খেয়াল করিনি মোরা।' সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এতক্ষণে। বাবুঠাকুরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন না করে ফেলে তাদের উপায় ছিল না, কিন্তু জীবন্ত একটা মানুষকে এভাবে মারতে কি সায় দেয় মানুষের মন! বাবুঠাকুর নিজেই যখন চোর, তার চোরাই মাল কেড়ে নিলেও কি করতে পারবে বাবুঠাকুর? ওকে ছেড়ে দিলে তাদের কোন ভয় নেই।

রাঘব বলে, 'তবে তুমি যাও বাবুঠাকুর। অপরাধ নিও না।'

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে গৌতম পড়ে যায়। কথা বলতে গিয়ে গলার আওয়াজ বার হয় না। কাঠের মতো শুকনো গলায় ক'বার ঢোক গিলবার চেষ্টা করে সে কোনমতে বলে, 'জল। জল দে একটু।'

'মোদের ছোঁয়া জল যে বাবুঠাকুর।'

গৌতম মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে বলে, 'দে।'

জল খেয়েই সে পালায়।

পরদিন পুলিস আসে দল বেঁধে, বিকেলের দিকে। দলিলপত্র তৈরী করে আটঘাট বেঁধে, সব সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে এক বেলা সময় লাগে, নইলে সকালেই পুলিস আসত। নাথগঞ্জের গগন সা'র প্রকাশ্যে কাপড়ের দোকানও একটা আছে।

তিন দিন আগের তারিখে মালদিয়া গাঁয়ের জন্য কিছু কাপড় বরাদ্দ করিয়ে নিয়ে, গৌতম মুখোপাধ্যায়কে এজেন্ট নিযুক্ত করে, যথাশাস্ত্র খাতাপত্র রসিদ ইত্যাদি ঠিক করে ফেলায় পত্তুগাঁয়ে লুট-করা কাপড়গুলির চোরাই মালত্বের দোষ কেটে যায়।

পত্তুগাঁয়ে গিয়ে পুলিস দ্যাখে ধড়পাকড় ইত্যাদির চেয়েও ঢের বেশী গুরুতর ও সংগত অনেকটা কারণ উপস্থিত হয়েছে। লুট-করা কাপড়ের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে জোরালো একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে গত রাত্রে। খুন হয়েছে দু'জন আহত হয়েছে অনেক। রাঘবের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই।

যাকে ঘুস দিতে হয়

মোটর চলে, আস্তে: ড্রাইভার ঘনশ্যাম মনে মনে বিরক্ত হয়, স্পিড দেবার জন্য অভ্যাস নির্সপিস করে ওঠে প্রত্যঙ্গে, কিন্তু উপায় নেই। বাবুর আস্তে চালাবার হুকুম। কাজে যাবার সময় গাড়ি জোরে চললে তার কোন আপত্তি হয় না কিন্তু সস্ত্রীক হাওয়া খেতে বার হলে তারা দুজনেই কলকাতার পথে মোটর চড়ে-- নিজেদের দামী মোটর চড়ে-বেড়াবার অকথ্য আনন্দ রয়ে-সয়ে চেটেপুটে উপভোগ করতে ভালোবাসে।

এত বড়, এত দামী, এমন চকচকে মোটর গড়িয়ে চলেছে শহরের পিচ-ঢালা পথে, শুধু এই সত্যটাই যেন একটানা শিহরণ হয়ে থাকে সুশীলার। তারপর আছে পুরনো, সস্তা, বাজে মোটর গাড়ির চলা দেখে মুখ বাঁকানোর সুখ। আর আছে বোঝাই ট্রাম-বাসের দিকে তাকিয়ে তিন বছর আগেকার কল্পনাতীত স্বপ্নজগতে বাস্তব, প্রত্যক্ষ বিচরণের অনুভূতি। ট্রামের হাতল ধরে আর বাসের পিছনে মানুষকে ঝুলতে দেখে সুশীলার মায়া হয়, এক অদ্ভুত মায়া! যাতে গর্ব বেশী। তিন বছর আগে মাখনকেও তো এমনিভাবে ঝুলতে ঝুলতে কাজে যেতে হত। স্বামীর অতীত সাধারণত্বের দুর্দশা আজ বড় বেশী মনে হওয়ায় ট্রাম বাসের বাদুড়ঝোলা মানুষদের প্রতি উত্তপ্ত দরদ জাগে সুশীলার! মাখন সিগারেট ধরিয়ে এপাশে ধোঁয়া ছেড়ে ওপাশে সুশীলার দিকে আড়চোখে চেয়ে প্রায় সবিনয় নিবেদনের সুরে বলে, 'কে ভেবেছিল আমরা একদিন মোটর হাঁকাব?'

সুশীলা বিবেচনা করে জবাব দেয়। সে মধ্যবিত্ত ভালোঘরের মেয়ে, পরীক্ষায় ভালো পাশ-করা গরিবের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হল। ওমা, এত ভালো ছেলের চাকরী কিনা একশ' টাকার! কত অবজ্ঞা, অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা স্বামীকে দিয়েছে সুশীলার মনে পড়ে। চালাকও হয়েছে সে আজকাল একটু। ভেবে চিন্তে তাই সে বলে, 'আমি জানতাম।'

মাখনের মনে পড়ে সুশীলার আগের ব্যবহার। একটু খাপছাড়া সুরে সে জিজ্ঞাসা করে, 'জান্তে?'

'জানতাম বৈকি! বড় হবার, টাকা রোজগার করবার ক্ষমতা তোমার ছিল আমি জান্তাম। তাই না অত খোঁচাতাম তোমাকে! টের পেয়েছিলাম, নিজেকে তুমি জানো না। তাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমায় মরিয়া করে জিদ জাগালাম—'

'সত্যি! তোমার জন্যে ছাড়া এত টাকা—ড্রাইভার, আস্তে চালাও।'

সুশীলা তখন বলে, 'কিন্তু যাই বলো, দাস সাহেব না থাকলে তোমার কিছুই হত না।'

মাখন হাসে, বলে, 'তা ঠিক, কিন্তু আমি না থাকলেও আঁর দাস সাহেব ফাঁপতো না। কি ঘুষটাই দিয়েছি শালাকে!'

'কত কনট্রাক্ট দিয়েছে তোমাকে!'

'এমনি দিয়েছে? অত ঘুষ কে দিত?'

গাড়ি চলছে। আস্তে আস্তে গড়িয়ে চলছে। আরেকখানা গাড়ি, দামী কিন্তু পুরনো, পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে খানিক এগিয়ে স্পিড কমিয়ে প্রায় থেমে গেল। মাখনের গাড়ি কাছে গেলে পাশাপাশি চলতে লাগল দাস সাহেবের গাড়িটা।

'কোথায় চলেছেন?'

দাস সাহেবের দৃষ্টি তার মুখে বুকে কোমরে চলা-ফেরা করছে টের পায় সুশীলা। অন্দর থেকে উঁকি দিয়ে বৈঠকখানায় দাস সাহেবকে সে অনেকবার দেখেছে। লজ্জায় তার সর্বাঙ্গ কুঁচকে যায়। এই মহাপুরুষটি তার স্বামীকে ট্রামে ঝোলার অবস্থা থেকে এই দামী মোটরে চড়ার অবস্থায় এনেছেন। শ্বশুর ভাসুর ইত্যাদি গুরুজনের চেয়েও ইনি গুরুজন। ইনি দেবতার সামিল। 'আপনার স্ত্রী?'

'আজ্ঞে।'

দাস সাহেবের প্রশ্নের মানে মাখন বোঝে। তার মতো হঠাৎ লাখপতি কয়েকজনকে সে জানে, যারা মোটর হাঁকায় শুধু বাজারের স্ত্রীলোক নিয়ে—বাড়ির স্ত্রী বাড়িতেই থাকে।

সুশীলা ভাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি। যে-রকম উনি বুড়িয়ে গেছেন অল্পদিনে! ওঁর কাছে আমাকে নেহাৎ কচিই দেখায়। দুটি গাড়িই ততক্ষণে থেমেছে। পিছনে অন্য গাড়ির হর্ন শুরু করেছে অভদ্র আওয়াজ।

দাস সাহেব নেমে এ গাড়িতে এসে ওঠে। ড্রাইভারকে বলে দেওয়া হয় এ গাড়ির পিছনে আসতে। দাস সাহেব ভেতরে ঢোকা মাত্র মাখন আর সুশীলা টের পায় এই বিকেল বেলাই সে মদ খেয়েছে।

'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে তো পরিচয় করিয়ে দেননি?'

'এই যে দিচ্ছি। শুনছো, ইনি আমাদের মিঃ দাস।'

পরনের বেনারসীর রঙের মতো সুশীলা সলজ্জ ভঙ্গিতে একটু হাসে, নববধূর মতো! বৌয়ের মতোই যে তাকে দেখাচ্ছে সুশীলার তাতে সন্দেহ ছিল না। দাস সাহেব আলাপী লোক, অল্প সময়ে আলাপ জমিয়ে ফেলে। যে চাপা ক্ষোভ শুরু হয়েছিল মাখনের মনে অল্পে অল্পে তলে তলে তা বাড়তে থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে একজন যখন কোথাও যাচ্ছে, বিনা আহ্বানে কেউ এভাবে গাড়ি চড়াও হয়ে তাদের ঘাড়ে চাপে না—অন্তত যাদের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা বজায় রাখবার কিছুমাত্র প্রয়োজনও মানুষটা যদি বোধ করে। বার বার এই কথাটাই মাখনের মনে হতে থাকে যে, অন্য কেউ হলে তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করার কথা দাস ভাবতেও পারত না।

দাস বলে, 'চা খেয়েছেন?'

সুশীলা বলে, 'না।'

'আসুন না আমার ওখানে, চা'টা খাওয়া যাবে।'

মাখনের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাস যোগ দেয়, 'সেই কনট্রাক্টের কথাটাও আপনার সংগে আলোচনা করা যাবে। আপনাকে খুঁজছিলাম।'

মাখনের দু'চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে। সুশীলার নিঃশ্বাস আটকে যায়। আজ ক'দিন ধরে মাখন এই কনট্রাক্টটা বাগাবার চেষ্টা করছিল—প্রকাণ্ড কনট্রাক্ট, লাখ টাকার ওপর ঘরে আসবে! দাস যেন কেমন আমল দিচ্ছিল না তাকে, কথা তুললে এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিল। ঈশ্বরীপ্রসাদকে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতে দেখে আর তার সংগে দাসের দহরম মহরম দেখে ব্যাপারটা অনেকটা অনুমান করে নিয়ে আশা এক রকম মাখন ছেড়ে দিয়েছিল। দাস আজ ও-বিষয়েই তার সংগে কথা কইতে চায়! এই দরকারে তাকে খুঁজছিল!

সম্ভ্রান্ত শহরতলীতে দাসের মস্ত বাড়ি। সামনে সম্ভ্রান্ত বাগান। অনেকগুলি চাকর-খানসামা নিয়ে এত বড় বাড়িতে দাস একা থাকে। বিয়ে করেনি, বৌ নেই। আত্মীয়-স্বজনদের সে সাহায্য করে কিন্তু কাছে রাখে না। সখ হলে মাঝে মাঝে তাদের সংগ উপভোগ করে দু'চার দিনের জন্য, ছুটি ভোগ করার মতো।

যেই আসুক সাহেব বাড়ি নেই বলে দরজা থেকে বিদায় করে দেবার হুকুম জারি করে দাস তাঁদের ভেতরে নিয়ে বসায়। ঘরের সাজসজ্জা আর আসবাবপত্র তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখে সুশীলা, নিজেদের বাড়িতে এখানকার কোন বিশেষত্ব আমদানী করবে মনে মনে স্থির করে। তারপর আসে চা। একথা হতে হতে আসে কনট্রাক্টের কথা। সুশীলার সামনেই আলোচনা চলতে থাকে, গভীর আগ্রহের সংগে সে সব কথা শোনবার ও বোঝবার চেষ্টা করে, উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে। মাখনের সংগে আলোচনা আরম্ভ হবার পর সুশীলার দিকে দাসের বিশেষ মনোযোগ দেখা যায় না, কথাতেই তাকে মসগুল মনে হয়। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ঘরে আলো জ্বলে স্নিগ্ধ।

তরাপর দাস বলে, 'হাওয়ার্ডের সংগে কথা বলা দরকার। বসুন, ফোন করে আসছি।' ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে সুশীলার দিকে চেয়ে হেসে বলে, 'খালি কাজের কথা বলছি, রাগ করবেন না।'

সুশীলা তাড়াতাড়ি বলে, 'না, না।'

দাস চলে গেলে চাপা গলায় সুশীলা বলে, 'সোয়া লক্ষের মতো হবে!'

'বেশীও হতে পারে।'

'ফেরবার পথে কালীঘাটে পুজো দিয়ে বাড়ি যাব।' গলা বুজে আসে সুশীলার।

খানিক পরে ফিরে আসে দাস।

'মাখনবাবু?'

'আজ্ঞে?'

'হাওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বললাম। আপনাকে গিয়ে একবার কথা বলতে হবে। কাগজপত্রগুলি নিয়ে আপনি এখুনি চলে যান। দুটো সই করিয়ে নিয়ে আসবেন।'

দাস নিশ্চিন্ত ভাবে বসে।—'আমরা ততক্ষণে গল্প করি। আপনাদের না খাইয়ে ছাড়ছি না।' দাস একটা সিগারেট ধরায়! সুশীলাকে বলে, 'উনি ঘুরে আসুন, আমরা ততক্ষণ আলাপ জমাই। আরেক কাপ চা খাবেন?'

সুশীলা আর মাখন মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। পাখা ঘোরবার আওয়াজে ঘরের স্তব্ধতা গম্ গম্ করতে থাকে। মাখন আর সুশীলা দুজনেরি মনে হয় আওয়াজটা হচ্ছে তাদের মাথার মধ্যে—অকথ্য বিশৃঙ্খল উদ্ভট আওয়াজ!

তারপর মাখন বলে, 'তুমি চা'টা খাও, আমি চট করে ঘুরে আসছি।'

সুশীলা ঢোক গিলে বলে, 'দেরি কোরো না।'

'না, যাব আর আসব।'

গাড়ি রাস্তায় পড়তেই মাখন ড্রাইভারকে বলে, 'জোরসে চালাও! জোরসে!'

মাসী পিসী

শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাঁটা। জল নেমে গিয়ে কাদা আর ভাঙা ইঁটপাটকেল ও ওজনে ভারী আবর্জনা বেরিয়ে পড়েছে। কংক্রিটের পুলের কাছে খালের ধারে লাগানো সালতি থেকে খড় তোলা হচ্ছে পাড়ে। পাশাপাশি জোড়া লাগানো দুটো বড় সালতি বোঝাই আঁটি-বাঁধা খড় তিনজনের মাথায় চড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে ওপরের মস্ত গাদায়। ওঠানামার পথে ওরা খড় ফেলে নিয়েছে কাদায়। সালতি থেকে ওদের মাথায় খড় তুলে দিচ্ছে দুজন। একজনের বয়স হয়েছে, আধপাকা চুল, রোগা শরীর। অন্যজন মাঝবয়সী, বেঁটে, জোয়ান, মাথায় ঠাসা কদম-ছাঁটা রুক্ষ চুল।

পুলের তলা দিয়ে ভাঁটার টান ঠেলে এগিয়ে এল সরু লম্বা আরেকটা সালতি, দুহাত চওড়া হয় কি, না হয়। দুমাথায় দাঁড়িয়ে দুজন প্রৌঢ়া বিধবা লগি ঠেলছে, ময়লা মোটা থানের আঁচল দুজনেরি কোমরে বাঁধা। মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অল্পবয়সী একটি বৌ। গায়ে জামা আছে, নক্সা পাড়ের সস্তা সাদা শাড়ি। আঁটোসাটো থমথমে গড়ন, গোলগাল মুখ।

'মাসীপিসী ফিরছে কৈলেশ', বুড়ো লোকটি বলল।

কৈলাশ বাহকের মাথায় খড় চাপাতে ব্যস্ত ছিল। চটপট শেষ আঁটিটা চাপিয়ে দিয়ে সে যখন ফিরল, মাসীপিসীর সালতি ক'হাতের মধ্যে এসে গেছে।

'ও মাসী, ওগো পিসী, রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।'

সামনের দিকে লগি পুঁতে মাসীপিসী সালতির গতি ঠেকায়, আহ্লাদী সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটাটা টেনে দেয়। সামনে থেকে মাসী বলে বিরক্তির সঙ্গে, 'বেলা আর নেই কৈলেশ।' পিছনে থেকে পিসী বলে, 'অনেকটা পথ যেতে হবে কৈলেশ।'

মাসীপিসীর গলা ঝরঝরে, আওয়াজ একটু মোটা, একটু ঝংকার আছে। কৈলাশের খপরটা গোপন, দুজনে লম্বা লম্বা সালতির দুমাথায় থাকলে সম্ভব নয় চুপে চুপে। মাসী বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশটা চেপে ধরে থাকে, পিসী লগি হাতে নিয়েই পিছন থেকে এগিয়ে আসে সামনের দিকে। আহ্লাদী যেখানে ছিল সেখানে বসেই কান পেতে রাখে। কথাবার্তা সে সব শুনতে পায় সহজেই। কারণ, সে যাতে শুনতে পায় এমনি করেই বলে কৈলাশ।

'বলি মাসী, তোমাকেও বলি পিসী,' কৈলাশ শুরু করে, 'মেয়াকে একদম

শ্বশুরঘর পাঠাবে না মনে করেছ যদি, সে কেমন ধারা কথা হয়? এত বড় সোমত্ত মেয়া, তোমরা দুটি মেয়েলোক বাদে ঘরে একটা পুরুষ মানুষ নেই, বিপদ-আপদ ঘটে যদি তো—'

মাসী বলে, 'খুনসুটি রাখো দিকি কৈলেশ তোমার, মোদ্দা কথাটা কি তাই কও, বললে না যে খপর আছে কি?'

পিসী বলে, 'খপরটা কি তাই কও। বেলা বেশী নেই কৈলেশ।'

মাসীপিসীর সাথে পারা যাবে না জানে কৈলাশ। অগত্যা ফেনিয়ে রসিয়ে বলবার বদলে সে সোজা কথায় আসে, 'জগুর সাথে দেখা হল কাল। খড় তুলে দিতে সাঁঝ হয়ে গেল, তা দোকানে এট্টু মানে আর কি চা খেতে গেছি চায়ের দোকানে, জগুর সাথে দেখা।'

মাসী বলে, 'চায়ের দোকান না কিসের দোকান তা বুঝিছি কৈলেশ, তা কথাটা কি?'

পিসী বলে, 'শুঁড়িখানায় পড়ে থাকে, বারোমাস সেথা ছাড়া আর ওকে কোথা দেখবে! হাতে দুটো পয়সা এলে তোমারও স্বভাব বিগড়ে যায় কৈলেশ। তা, কি বললে জগু?'

কৈলাশ ফাঁপরে পড়ে আড় চোখে চায় আহ্লাদীর দিকে, হঠাৎ বেমক্কা জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে যে তা নয়, পুলের কাছেই চায়ের দোকান, মাসীপিসী গিয়ে জিজ্ঞাসা করুক না সেখানে। তারপরেই জোর হারিয়ে বলে, 'মাল খাওয়া একরকম ছেড়ে দিয়েছে জগু। লোকটা কেমন বদলে গেছে মাসী, সত্যি কথা পিসী, জগু আর সে জগু নেই। বৌকে নিতে চায় এখন। তোমরা নাকি পণ করেছ মেয়া পাঠাবে না, তাতেই চটে আছে। সম্মান তো আছে একটা মানুষের, কবার নিতে এলো তা মেয়া দিলে না, তাইতো নিতে আসে না আর। আমি বলি কি, নিজেরা যেচে এবার পাঠিয়ে দাও মেয়াকে।'

মাসী বলে, 'পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা খেতে? কলকেপোড়া ছ্যাঁকা খেতে? খুঁটির সাথে দড়ি বাঁধা হয়ে থাকতে দিন ভোর রাত ভোর?'

পিসী বলে, 'লাথির চোটে ফের গভ্‌ভোপাত হতে? না মরতে?'

'গভ্‌ভোপাত?' কৈলাশ বলে আশ্চর্য হয়ে, 'ফের গভ্‌ভোপাত? সত্যি নাকি মাসী? এ যে প্যাঁচালো ব্যাপার হল পিসী?'

মাসী বলে, 'কিসের প্যাঁচালো ব্যাপার কৈলেশ? মুয়ে নুড়ো জ্বালব তোমার ফের যদি বলবে তুমি বেয়াক্কেলে কথা। জগু আসেনি ঘন ঘন ওকে নিতে? থাকেনি দুদিন চারদিন করে?'

পিসী বলে, 'মেয়া না পাঠাই, জামাই এলে রাখিনি জামাই আদরে তাকে? ছাগলটা বেচে দিয়ে খাওয়াইনি ভালমন্দ দশটা জিনিস?'

মাসী বলে, 'ফের আসুক, আদরে রাখব যদ্দিন থাকে। বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো। ঘরে এলে খাতির না করব কেন? তবে মেয়া মোরা পাঠাব না।'

পিসী বলে, 'না কৈলেশ, মরতে মোরা মেয়াকে পাঠাব না।'

বুড়ো রহমান একা খড় চাপিয়ে যায় বাহকদের মাথায়, চুপচাপ শুনে যায় এদের

কথা। ছলছল চোখে একবার তাকায় আহ্লাদীর দিকে। তার মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মরেছে অল্পদিন আগে। কিছুতে যেতে চায়নি মেয়েটা, দাপাদাপি করে কেঁদেছে যাওয়া ঠেকাতে, ছোট অবুঝ মেয়ে। তার ভালর জন্যেই তাকে জোর জবরদস্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল রহমান। আহ্লাদীর সঙ্গে তার চেহারায় কোনো মিল নেই। বয়সে সে ছিল অনেক ছোট, চেহারা ছিল অনেক বেশী রোগা। তবু আহ্লাদীর ফ্যাকাসে মুখে তারই মুখের ছাপ রহমান দেখতে পায়, খড়ের আঁটি তুলে দেবার ফাঁকে ফাঁকে যখনি সে তাকায় আহ্লাদীর দিকে।

কৈলাশ বলে, 'তবে আসল কথাটা বলি। জগু মোকে বললে, এবার সে মামলা করবে বৌ নেবার জন্যে। তার বিয়ে করা বৌকে তোমরা আটকে রেখেছ বদ মতলবে, পয়সা কামাচ্ছ। মামলা করলে বিপদে পড়বে। সোয়ামী নিতে চাইলে বৌকে আটকে রাখার আইন নেই। জেল হয়ে যাবে তোমাদের। আর যেমন বুঝলাম, মামলা জগু করবেই আজকালের মধ্যে। মরবে তোমরা জানো মাসী, জানো পিসী, মারা পড়বে তোমরা একেবারে।'

আহ্লাদী একটা শব্দ করে, অস্ফুট আর্তনাদের মতো। মাসী ও পিসী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কয়েকবার! মনে হয়, মনে তাদের একই কথা উদয় হয়েছে, চোখে চোখে চেয়ে সেটা শুধু জানাজানি করে নিল তারা।

মাসী বলল, 'জেলে নয় গেলাম কৈলেশ, কিন্তু মেয়া যদি সোয়ামীর কাছে না যেতে চায় খুন হবার ভয়ে?'

বলে, মাসী বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশ ছেড়ে দিয়ে লগি গুঁজে দেয় কাদায়, পিসী তর তর করে পিছনে গিয়ে লগি কাদায় গুঁজে হেলে পড়ে, শরীরের ভারে সরু লম্বা সালতিটাকে এগিয়ে দেয় ভাঁটার টানের বিপক্ষে। বেলা একরকম নেই। ছায়া নামছে চারিদিকে।

শকুনেরা উড়ে এসে বসেছে পাতাশূন্য শুকনো গাছটায়। একটা শকুন উড়ে গেল এ আশ্রয় ছেড়ে অল্প দূরে আরেকটা গাছের দিকে, ডাল ছেড়ে উড়তে আর নতুন ডালে গিয়ে বসতে কি তার পাখা ঝাপটানি!

মায়ের বোন মাসী আর বাপের বোন পিসী ছাড়া বাপের ঘরের কেউ নেই আহ্লাদীর। দুর্ভিক্ষ কোনোমতে ঠেকিয়েছিল তার বাপ। মহামারীর একটা রোগে, কলেরায়, সে তার বৌ আর ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। মাসীপিসী তার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে আছে অনেকদিন, দূর ছাই সয়ে আর কুড়িয়ে পেতে খেয়ে নিরাশ্রয় বিধবারা যেমন থাকে। নিজেদের ভরণপোষণের কিছুটা তারা রোজগার করত—ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বেচে, হোগলা গেঁথে, শাকপাতা ফলমূল ডাঁটা কুড়িয়ে, এটা ওটা যোগাড় করে। শাকপাতা খুদকুঁড়ো ভোজন, বছরে দুজোড়া থান পরন—খরচ তো এই। বছরের পর বছর ধরে কিছু পুঁজি পর্যন্ত হয়েছিল দুজনের, রূপোর টাকা আধুলি সিকি। দুর্ভিক্ষের সময়টা বাঁচবার জন্য তাদের লড়তে হয়েছে সাংঘাতিকভাবে, আহ্লাদীর বাপ তাদের থাকাটা শুধু বরাদ্দ রেখে খাওয়া ছাঁটাই করে

দিয়েছিল্ একেবারে পুরোপুরি। তারও তখন বিষম অবস্থা। নিজেরা বাঁচে কি বাঁচে না, তার ওপর জগুর লাথির চোটে গর্ভপাতে মরমর মেয়ে এসে হাজির। সে কোনদিক সামলাবে? মাসীপিসীর সেবাযত্নেই আহ্লাদী অবশ্য সেবার বেঁচে গিয়েছিল, তার বাপমাও সেটা স্বীকার করেছে। কিন্তু কি করবে, গলা কেটে রক্ত দিয়ে সে ধার শোধ করা যদি বা সম্ভব অন্ন দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় পাবে। পাল্লা দিয়ে মাসীপিসী আহ্লাদীর জীবনের জন্যে লড়েছিল, পেল যদি তো খেয়ে, না পেল যদি তো না খেয়েই!

অবস্থা যখন তাদের অতি কাহিল, চারিদিকে না খেয়ে মরা শুরু করেছে মানুষ, মরণ ঠেকাতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনীশক্তি, একদিন মাসী বলে পিসীকে, 'একটা কাজ করবি বেয়াইন? তাতে তোরও দুটো পয়সা আসে, মোরও দুটো পয়সা আসে।'

শহরের বাজারে তরিতরকারী ফলমূলের দাম চড়া। গাঁ থেকে কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। একা মাসীর ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূর যেতে, যাওয়া আসাও একার দ্বারা হবে না তার। পিসী রাজী হয়েছিল। এতে কিছু হবে কি না হবে ভগবান জানে, কিন্তু যদি হয় তবে রোজগারের একটা নতুন উপায় মাসী পেয়ে যাবে আর সে পাবে না, তাকে না পেলে অন্য কারো সাথে হয়তো মাসী বন্দোবস্ত করবে, তা কি পারে পিসী ঘটতে দিতে।

সেই থেকে শুরু হয় গেরস্তের বাড়তি শাকসব্জী ফলমূল নিয়ে মাসীপিসীর সালতি বেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে বেচে আসা। গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারাও নগদ পয়সার জন্য বাগানের জিনিস বেচতে দেয়।

মাসীপিসীর ভাব ছিল আগেও। অবস্থা এক, বয়স সমান, একঘরে বাস, পরস্পরের কাছে ছাড়া সুখদুঃখের কথা তারা কাকেই বা বলবে কেই বা শুনবে। তবে হিংসা-দ্বেষ রেষারেষিও ছিল যথেষ্ট, কোন্দলও বেধে যেত কারণে অকারণে। পিসী এ বাড়ির মেয়ে, এ তার বাপের বাড়ি। মাসী উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে। তাই মাসীর ওপর পিসীর একটা অবজ্ঞা অবহেলার ভাব ছিল। এই নিয়ে পিসীর অহংকার আর খোঁচাই সবচেয়ে অসহ্য লাগত মাসীর। ধীর শান্ত দুঃখী মানুষ মনে হত এমনি তাদের, কিন্তু ঝগড়া বাধলে অবাক হয়ে যেতে হত তাদের দেখে। সে কি রাগ, সে কি তেজ, সে কি গোঁ! মনে হত এই বুঝি কামড়ে দেয় একে অপরকে, এই বুঝি কাটে বঁটি দিয়ে।

শাকসব্জী বেচে বাঁচবার চেষ্টায় একসঙ্গে কোমর বেঁধে নেমে পড়া মাত্র সব বিরোধ সব পার্থক্য উপে গিয়ে দুজনের হয়ে গেল একমন, একপ্রাণ। সে মিল জমজমাট হয়ে উঠল আহ্লাদীর ভার ঘাড়ে পড়ায়। নিজের নিজের পেটভরানো শুধু নয়, নিজেদের বেঁচে থাকা শুধু নয়, তাদের দুজনেরই এখন আহ্লাদী আছে। খাইয়ে পরিয়ে যত্নে রাখতে হবে তাকে, শ্বশুরঘরের কবল থেকে বাঁচাতে হবে তাকে, গাঁয়ের বজ্জাতদের নজর থেকে সামলে রাখতে হবে, কত দায়িত্ব তাদের, কত কাজ, কত ভাবনা।

বাপ মা বেঁচে থাকলে আহ্লাদীকে হয়তো শ্বশুরবাড়ি যেতে হত, মাসীপিসীও বিশেষ কিছু বলত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তারা তো নেই, এখন মাসীপিসীরই সব দায়িত্ব। বিনা পরামর্শে আপনা থেকেই তাদের ঠিক হয়ে ছিল, আহ্লাদীকে পাঠানো হবে না। আহ্লাদীকে কোথাও পাঠানোর কথা তারা ভাবতেও পারে না। বিশেষ করে ওই খুনেদের কাছে কখনো মেয়ে তারা পাঠাতে পারে, যাবার কথা ভাবলেই মেয়ে যখন আতঙ্কে পাঁশুটে মেরে যায়?

বাপের ঘরদুয়ার জমিজমাটুকু আহ্লাদীতে বর্তেছে, জগুর বউ নেবার আগ্রহও খুবই স্পষ্ট। সামান্যই ছিল তার বাপের, তারও সিকিমতো আছে মোটে, বাকি গেছে গোকুলের কবলে। তবু মুফতে যা পাওয়া যায় তাতেই জগুর প্রবল লোভ।

খালি ঘরে আহ্লাদীকে রেখে কোথাও যাবার সাহস তাদের হয় না। দুজনে মিলে যদি যেতে হয় কোথাও আহ্লাদীকে তারা সঙ্গে নিয়ে যায়।

মাসী বলে, 'ডরাস্‌নি আহ্লাদী। ভাঁওতা দিয়ে আমাদের দমাবার ফিকির সব। নয়তো কৈলেশকে দিয়ে ওসব কথা বলায় মোদের?'

পিসী বলে, 'দুদিন বাদে ফের আসবে দেখিস জামাই। তখন শুধোলে বলবে কই না, আমি তো ওসব কিছু বলিনি কৈলেশকে।'

মাসী বলে, 'চার মাসে পড়লি, আর কটা দিন বা! মা মাসীর কাছেই রইতে হয় এ-সময়টা জামাই এলে বুঝিয়ে বলব।'

পিসী বলে, 'ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়, জানিস আহ্লাদী। তোর পিসে ছিল জগুর মতো, মাল টানত আর মোকে মারত। খোকাটা কোলে আসতে কি হয়ে গেল সেই মানুষ। চুপি চুপি এনে এটা ওটা খাওয়ায়, উঠতে বলি তো ওঠে, বসতে বলি তো বসে, রাত দুপুরে চুর হয়ে এসে হাতে পায়ে ধরে বলে, একবারটি খোকাকে কোলে দে পদী—খোকা যেতে পাগলের মতো দিবারাত্তির মাল খেয়ে খেয়ে নিজেও গেলো।'

মাসী বলে, 'তোর মেসো ঠিক ছিল, শাউড়ি ননদ ছিল বাঘ। উঠতে বসতে কি ছ্যাঁচা খেয়েছি ভাবলে বুক কাঁপে। কিন্তু জানিস আহ্লাদী, মেয়েটা যেই কোলে এল শাউড়ী ননদ যেন মোকে মাথায় করে রাখলে বাঁচে।'

পিসী বলে, 'তুইও যাবি, সোয়ামীর ঘর করবি। ডরাস্‌নি, ডর কিসের?'

বাড়ি ফিরে দীপ জেলে মাসীপিসী রান্নাবান্না সারতে লেগে যায়। বাইরে দিন কাটলেও আহ্লাদীর পরিশ্রম কিছু হয়নি, শুয়ে বসেই দিন কেটেছে। তবু মাসীপিসীর কথায় সে একটু শোয়। শরীর নয়, মনটা তার কেমন করছে। নিজেকে তার ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে। মাসীপিসীর আড়ালে থেকেও সে টের পায় কি ভাবে মানুষের পর মানুষ তাকাচ্ছে তার দিকে, কতজন কতভাবে মাসীপিসীর সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছে তরিতরকারির মতো তাকেও কেনা যায় কিনা যাচাই করবার জন্য। গাঁয়েরও কতজন তার কতরকমের দর দিয়েছে মাসীপিসীর কাছে। মাসী-পিসীকে চিনে তারা অনেকটা চুপচাপ হয়ে গেছে আজকাল, কিন্তু গোকুল হাল

ছাড়েনি। মাসীপিসীকে পাগল করে তুলেছে গোকুল। মায়ের বাড়া তার এই মাসীপিসী, কি দুর্ভোগ তাদের তার জন্য। মাসীপিসীকে এত যন্ত্রণা দেওয়ার চেয়ে সে নয় শ্বশুরঘরের লাঞ্ছনা সইত, জগুর লাথি খেত। ঈষৎ তন্দ্রার ঘোরে শিউরে ওঠে আহ্লাদী। একপাশে মাসী আর একপাশে পিসীকে না নিয়ে শুলে কি চলবে তার কোনদিন?

রান্না সেরে খাওয়ার আয়োজন করছে মাসীপিসী, একেবারে ভাতটাত বেড়ে আহ্লাদীকে ডাকবে। ভাগাভাগি কাজ তাদের এমন সড়গড় হয়ে গেছে যে বলাবলির দরকার তাদের হয় না, দুজনে মিলে কাজ করে যেন একজনে করছে। এবার ব্যঞ্জনে নুন দেবে একথা বলতে হয় না পিসীকে, ঠিক সময়ে নুনের পাত্র সে এগিয়ে দেয় মাসীর কাছে। বলাবলি করছে তারা আহ্লাদীর কথা, আহ্লাদীর সুখদুঃখ, আহ্লাদীর সমস্যা, আহ্লাদীর ভবিষ্যৎ। জামাই যদি আসে, একটি কড়া কথা তাকে বলা হবে না, এতটুকু খোঁচা দেওয়া হবে না। উপদেশ দিতে গেলে চটবে জামাই, পুরুষ মানুষ তো যতই হোক, এটা করা তার উচিত নয়, এসব কিছু বলা হবে না তাকে। জামাই এসেছে তাই আনন্দ রাখবার যেন ঠাঁই নেই এইভাব দেখাবে মাসীপিসী—আহ্লাদীকে শিখিয়ে দিতে হবে সোয়ামী এসেছে বলে যেন আহ্লাদে গদগদ হবার ভাব দেখায়। যে কদিন থাকে জামাই, সে যেন অনুভব করে, সেই এখানকার কর্তা, সেই সর্বেসর্বা।

বাইরে থেকে হাঁক আসে কানাই চৌকিদারের। মাসীপিসী পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, জোরে নিশ্বাস পড়ে দুজনের। সারাটা দিন গেছে লড়ে আর লড়ে। সরকারবাবুর সঙ্গে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করতে অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে দুজনের। এখন এল চৌকিদার কানাই! হাঙ্গামা না করতে ও আসে না রাত্রে, গাঁয়ে লোক যখন ঘুমোচ্ছে।

রসুই-চালায় ঝাঁপ এঁটে মাসীপিসী বাইরে যায়। শুক্লপক্ষের একাদশীর উপোস করেছে তারা দুজনে গতকাল। আজ দ্বাদশী, জোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। কানাই-এর সাথে গকুলের যে তিনজন পেয়াদা এসেছে তাদের মাসীপিসী চিনতে পারে, মাথায় লাল পাগড়ি আঁটা লোকটা তাদের অচেনা।

কানাই বলে, 'কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার।'

মাসী বলে, 'এত রাতে?'

পিসী বলে, 'মরণ নেই?'

কানাই বলে, 'দারোগাবাবু এসে বসে আছেন বাবুর সাথে। যেতে একবার হবে গো দিদিঠাকরুনরা! বেঁধে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।'

মাসীপিসী মুখে মুখে তাকায়। পথের পাশে ডোবার ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় তিন-চারজন ঘুপটি মেরে আছে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে মাসীপিসী। ওরা যে গাঁয়ের গুন্ডা সাধু বৈদ্য ওসমানেরা তাতে সন্দেহ নেই, বৈদ্যের ফেটিবাঁধা বাবরি চুলওয়ালা মাথাটায় পাতার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে। তারা যাবে কাছারিতে কানাই আর পেয়াদা কনেস্টবলের সঙ্গে। ওরা এসে আহ্লাদীকে নিয়ে যাবে।

মাসী বলে, 'মোদের একজন গেলে হবে না কানাই?'

পিসী বলে, 'আমি যাই চল?'

কর্তা ডেকেছেন দুজনকে।

মাসীপিসী দুজনেই আবার তাকায় মুখে মুখে।

মাসী বলে, 'কাপড়টা ছেড়ে আসি কানাই।'

পিসী বলে, 'সকড়ি হাত ধুয়ে আসি, এক দন্ড লাগবে না।'

তাড়াতাড়িই ফিরে আসে তারা। মাসী নিয়ে আসে বঁটিটা হাতে করে, পিসীর হাতে দেখা যায় রামদার মতো মস্ত একটা কাটারি।

মাসী বলে, 'কানাই, কত্তাকে বোলো, মেয়েনোকের এত রাতে কাছারিবাড়ি যেতে নজ্জা করে। কাল সকালে যাবো।'

পিসী বলে, 'এত রাতে মেয়েনোককে কাছারিবাড়ি ডাকতে কত্তার নজ্জা করে না কানাই?'

কানাই ফুঁসে ওঠে, 'না যদি যাও ঠাকরুনরা ভালয় ভালয়, ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে কিন্তু বলে রাখলাম।'

মাসী বঁটিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে, 'বটে? ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে? এসো। কে এগিয়ে আসবে এসো। বঁটির এক কোপে গলা ফাঁক করে দেব।'

পিসী বলে, 'আয় না বজ্জাত হারামজাদারা, এগিয়ে আয় না? কাটারির কোপে গলা কাটি দু-একটার।'

দুপা এগোয় তারা দ্বিধাভরে। মাসীপিসীর মধ্যে ভয়ের লেশটুকু না দেখে সত্যই তারা খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছে। মারাত্মক ভঙ্গিতে বঁটি আর দা উঁচু হয় মাসীপিসীর।

মাসী বলে, 'শোন কানাই, এ কিন্তু এর্কি নয় মোটে। তোমাদের সাথে মোরা মেয়েলোক পারব না জানি কিন্তু দুটো একটাকে মারব জখম করব ঠিক।'

পিসী বলে, 'মোরা নয় মরব।'

তারপর বিনা পরামর্শেই মাসীপিসী হঠাৎ গলা ছেড়ে দেয়। প্রথমে শুরু করে মাসী, তারপর যোগ দেয় পিসী। আশেপাশে যত বাসিন্দা আছে সকলের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে তারা হাঁক দেয়, 'ও বাবাঠাকুর! ও ঘোষ মশায়! ও জনার্দন! ওগো কানুর মা, বিপিন, বংশী...'

কানাই অদৃশ্য হয়ে যায় দলবল নিয়ে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় পাড়ায়, অনেকে ছুটে আসে, কেউ কেউ ব্যাপার অনুমান করে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দেয় বাইরে না বেরিয়ে।

এই হট্টগোলের পর আরও নিঝুম আরও থমথমে মনে হয় রাত্রিটা। আহ্লাদীকে মাঝখানে নিয়ে শুয়ে ঘুম আসে না মাসীপিসীর চোখে। বিপদে পড়ে হাঁক দিলে পাড়ার এত লোক ছুটে আসে, এমনভাবে প্রাণ খুলে এতখানি জ্বালার সঙ্গে নিজেদের

মধ্যে খোলাখুলিভাবে গোকুল আর দারোগা ব্যাটার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে সাহস পায়, জানা ছিল না মাসীপিসীর। তারা হাঁকডাক শুরু করেছিল খানিকটা কানাইদের ভড়কে দেবার জন্যে, এত লোক এসে পড়বে আশা করেনি। তাদের জন্য যতটা নয়, গোকুল আর দারোগার ওপর রাগের জ্বালাই যেন ওদের ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছে মনে হল সকলের কথাবার্তা শুনে। কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে মাসীপিসী। বুকে নতুন জোর পায়।

মাসী বলে, 'জানো বেয়ান, ওরা ফের ঘুরে আসবে মন বলছে। এত সহজে ছাড়বে কি।'

পিসী বলে, 'তাই ভাবছিলাম। মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে দেওয়ায় সোনাদের ঘরে মাঝরাতে আগুন ধরিয়েছিল সেবার।'

খানিক চুপচাপ ভাবে দুজন।

মাসী বলে, 'সজাগ রইতে হবে রাতটা।'

পিসী বলে, 'তাই ভাল। কাঁথা কম্বলটা চুবিয়ে রাখি জলে, কি জানি কি হয়।'

আস্তে চুপি চুপি তারা কথা কয়, আহ্লাদীর ঘুম না ভাঙে। অতি সন্তর্পণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে। আহ্লাদীর বাপের আমলের গরুটা নেই, মাটির গামলাটা আছে। ঘড়া থেকে জল ঢেলে মোটা কাঁথা আর পুরানো ছেঁড়া একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে, চালায় আগুন ধরে উঠতে উঠতে গোড়ায় চাপা দিয়ে নেভানো সহজ হয়। ঘড়ায় আর হাঁড়ি কলসীতে আরও জল এনে রাখে তারা ডোবা থেকে। বঁটি আর দা রাখে হাতের কাছেই। যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসীপিসী।

পেট ব্যথা

কথা মতো মানোর মা শেষ রাত্রে ভৈরবকে তুলে দিতে গিয়ে টের পায় সে জেগেই আছে। মুখে আগে ডেকে আর দেখবে কি, একেবারে ঠেলা দিয়ে মানোর মা বলেছে, 'ওগো ওগো। শুনছো? ওঠো গো।'

তাতে গোসা হয়েছে জাগন্ত ভৈরবের।

'এত তাড়া কিসের, আঁ, কিসের তাড়া এত? ঘুমোসনি রাতে বুঝি কতখনে কালীকে তাড়িয়ে হাড় জুড়োবি ভেবে?'

এ পর্যন্ত বললে কোনো কথা ছিল না, মানোর মা গায়ে মাখত না কথা। পুরুষ মানুষ অমন বলেই থাকে। কিন্তু উঠে এসে হাই-টাই তোলার পর জানলার চাঁদের আলোয় নেংটি ছেড়ে ছেঁড়া মোটা হেঁটো ধুতিটি পরবার সময়তক জের চলে ভৈরবের গোসার।

'হাঃ', সে বলে মাঝখানে যত ঘরোয়া কথা হয়েছে তা ডিঙিয়ে তার প্রথম রাগের কথাটাই একটানা বলে যাওয়ার মতো, মেয়েলোক নইলে বলে কাকে। পেলে টেলে মেয়ে বেচে দেয় পেটের লেগে। মেয়ের মতো পেলে একটা ছাগল বেচতে চেয়ে পাগল হবে সে তো ডাল-ভাত। এতে অগত্যা গোসা করতে হয় মানোর মাকে।

'ছাগল লোকে বেচে না পোড়ারমুখো, অভাবে নয়তো স্বভাবে?' মানোর মা বলে কলহের গরম অবস্থায় গাল দেবার সুরে, 'মেয়ের কথা বলো না যদি সরম থাকে একরতি। না খেয়ে মরেছে মেয়েটা, হায় গো! ছাগলটা বেচলে তখন বাঁচতো মেয়েটা। ছাগলের মায়ায় নিজের মেয়েকে না দিয়ে মারতে পারে কেউ পুরুষলোক ছাড়া!' হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে মানোর মা কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে।

'ছাগল বেচলে বাঁচতো?' মানোর মার ধাঁধায় কাবু হয়ে পড়ে ভৈরব, 'ছাগল কোথা ছিল তখন? কালী তো জন্মালে দুচার দিন আগে, মানো যাওয়ার দুচার দিন আগে ওই গোয়াল-ঘরটায়।'

'ওর মা-টাকে বেচা যেত না? বাচ্চা কটাকে?'

'কার ছাগল কি বিত্তান্ত কিছু জানি না, বেচে দেব? আর সবে বিইয়েছে দুটো তিনটে দিন আগে?'

'রওনা দেও না? এসো না গিয়ে ভালয় ভালয়?' মানোর মা বলে লড়ায়ে জেতা রানীর মতো, 'বেলা যে দুকুর হয়ে যাবে সদরে পোঁছতে ছাগল খেদিয়ে নিয়ে?'

গলায় কাপড়ের পাড় বেঁধে কালীকে টানতে টানতে ভৈরব রওনা দেয় সদরের উদ্দেশে শেষ রাত্রির অস্তগামী চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্নায়। দুপা গিয়েছে কি না গিয়েছে মানোর মা ছুটে এসে বাঁশের কঞ্চিটা হাতে তুলে দেয়। উপদেশ দেয় যে টানতে টানতে ছাগল নিয়ে যাওয়া চলে তিন কোশ পথ? কালীকে সামনে দিয়ে পেছন থেকে কঞ্চির বাড়ি মেরে মেরে নিয়ে গেলে যদি ভরসা থাকে আজ সদরে পৌঁছবার।

উপদেশটা কাজে লাগে ভৈরবের, বৌয়ের উপদেশ। সে যেন জানে না ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে যাবার কায়দা, জন্ম-ভোর ক্ষেত চষে আর গরু-ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে চুলে তার পাক ধরেছে। তবে কি না কালীকে বারবার কঞ্চির বাড়ি মারতে হয় এই যা দুঃখ। পাড়ের দড়ি বেশ লম্বা ও শক্ত। বাঁধন খুলে পালাবার চেষ্টা করে কালী শেষে হার মানে। যুদ্ধের আগের সস্তা শাড়ির পাড়, চওড়া যেমন শক্ত তেমন। ঘরে কাপড় নেই ভৈরবের। এই কটা পাড় আজও টিকে আছে, গরু-বাঁধা দড়ির কাজ পর্যন্ত বুঝি ভাল চলত আজকালকার দড়ির চেয়ে এই পাড় দিয়ে, যদি গরুটা তার থাকত।

কোথা থেকে কার একটা ছাগল এসে তার ভাঙা গোয়ালের ফাঁকা চালাটার নীচে পাঁচটা বিইয়েছিল। মানোর শোকে কাতর, না খেয়ে আধমরা মানোর মা শুকনো পাতা জেবলে মাঘের বাঘ-মারা শীত থেকে বাঁচিয়েছিল ছাগল আর তার বাচ্চা কটাকে, নয়তো ছাগলটা বাঁচলেও কটা বাচ্চা টিকত কে জানে! কয়েক দিন পরে জাফর এসেছিল তার ছাগল আর বাচ্চা নিয়ে যেতে। একটা বাচ্চা পুরস্কার দিয়ে গিয়েছিল।

'দুধ না খেয়ে বাঁচবে তো?' জাফর শুধিয়েছিল। 'বাঁচাবো।' বলেছিল ভৈরব উদাসীন ভাবে। মনে মনে সে ভাবছিল, বাঁচে তো বাঁচবে, না বাঁচে তো কচি ছাগলের মাংস এক দিন মন্দ লাগবে না খুদের সঙ্গে দুটো পেঁয়াজ যদি কোনো মতে তুলে আনা যায় কাল্লুর ক্ষেত থেকে।

তার মেয়ে মানো কিন্তু সত্যিই না খেয়ে মরেনি। চলতে চলতে এলোমেলো ভাবনার মধ্যে খাপছাড়া ভাবে ভৈরব অন্তত দশবার মনের মধ্যে জোর গলায় বলে যে মানো না খেয়ে মরেনি। মানোর মা ও-কথা বলে গায়ের জ্বালায়। নয়তো পেটের জ্বালায়। মানো মরেছে রোগ হয়ে, ব্যারামে। না খেয়ে না খেয়ে গায়ে শক্তি না থাকায় হয়তো সে মরেছে রোগে, তেমন পথ্য পেলে হয়তো মরত না, তবু না খেয়ে না খেয়ে যে মরেছে এ-কথা কোনো মতে মানবে না ভৈরব তার বাপ হয়ে। মানোর মা মরত না তাহলে? জোয়ান মর্দ মেয়েটা খেতে না পেয়ে মরল আর তার মা বেঁচে রইল, এ কখনো হয় না! সেও তো মরেনি, তার আর দুটো ছেলেমেয়ে। দুর্ভিক্ষটা কোনো মতে সামলেছে ভৈরব। এক বেলা আধ বেলা শাক-পাতা খুদ-কুঁড়ো কোনো মতে জুটিয়ে হাড় চামড়া টিকিয়ে রেখে কোনো মতে বেঁচে থেকেছে সবাই মিলে,— মানো ছাড়া। মানোর অসুখ হল। ওই অবস্থায় পোয়াতি মেয়ে বাঁচে কখনো অসুখ হলে! অসুখটা যদি না হত, না খেয়ে মানো মরত না, শাক-পাতা খুদ-কুঁড়ো

তারও জুটত, মানোও বেঁচে থেকে দেখত ক্ষেতে ক্ষেতে ভরপুর অজস্র ফসল, অনেক কাল যেমন ফসল কারো মাটিতে ফলেনি।

আর কটাদিন পরে মাঠের ফসল তার ঘরে উঠবে—জমিদার অবশ্য যদি কেড়ে না নেয় বাকি খাজনার দায়ে। তা, করালীবাবু কি এমন রাক্ষস হবে যে একটা বছর তাকে সময় দেবে না সামলাবার জন্য, এত বোকা কি হবে করালীবাবু যে সে বুঝতে পারবে না একটা বছর তাকে সময় না দিলে সে উৎখাত হয়ে যাবে, বছর বছর খাজনা দেবার কেউ আর থাকবে না তখন।

আনমনা ভৈরবের সামনে দাঁড়িয়ে কৈলাস বলে, 'বলি, চলেছ কোথা ছাগল নিয়ে শুঁড়ির পো?'

গায়ে যেন হাজার বিছে লাগে ভৈরবের। সা বটে তার উপাধি, কিন্তু পাঁচ-পুরুষে শুঁড়ির কর্ম তো কেউ করেনি তার বংশে, পাঁচ-পুরুষে তারা চাষী। তার এক দূর-সম্পর্কের কুটুম সদরে মদ বেচে টাকা করে। এজন্য তাকে শুঁড়ি বলা আর বাপ মা বৌ মেয়ে তুলে গাল দেওয়া সমান কথা।

'এই যাচ্ছি হেথা হোথা।'

কৈলাস ব্যাপার বুঝে মুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয়। সুর বদলে বলে, 'রাগ ক'রো না। ওটা নিছক তামাসা। তামাসা বোঝ না, কেমন চাষী তুমি? যাই হোক, যত হোক, তুমি লোক ভাল, তা কি জানি না আমি? তবে কথা কি জানো, ছাগল নিয়ে যাচ্ছো কোথায়?'

'সদরে বেচে দেব ছাগলটা। ফসল তোলা-তক্ কটাদিন আর চলে না কোনো মতে।'

'সদরে গিয়ে ছাগল বেচবে?' কৈলাস বলে আশ্চর্য হয়ে, 'তোমার তো আস্পর্দা কম নয় ভৈরব! গাঁয়ের গরু-ছাগল সব কিনে নিচ্ছি আমি, যে যা বেচতে চায়, আমার লোক চাদ্দিকে রয়েছে, বেচতে যাতে কারো অসুবিধা না হয়, তুমি সদরে চলেছ একটা ছাগল বেচতে? আমাকে ছাড়িয়ে উঠতে চাও দেখছি তুমি!'

পুবের আকাশে সূর্য তখন কয়েক হাত উঠেছে। কালাপুর ছাড়বার পথ এটা, একটু আগেই পুল। খালের চেয়েও মরা-মজা ছোট-খাটো নদীটা লোকে অনায়াসে হেঁটেই পার হয়ে যেত, পুল তৈরি করে দেবার কনট্রাক্ট নিয়ে কৈলাস গুছিয়ে নিয়েছিল। ভোরের রোদে ঝলমলে বাঁকাটে পুলটার দিকে চেয়ে ভৈরব ভয়ডর ভুলে যায়।

'আপনাকে গরু-ছাগল দেওয়া মানে তো খয়রাত করা।'

'বটে না কি? সবাই তাই আমাকে গছিয়ে দিতে পাগল!' নাক ঝেড়ে কৈলাস বলে, 'শোন বলি তোকে, ছ টাকা সবাই পায়, তোকে আট দিচ্ছি, আর কাউকে বলিস না। এমনি ছাগলের জন্য আট টাকা করে দিতে হলে ব্যবসা গুটোতে হবে। গাঁয়ে গিয়ে লতিফকে এ চিঠিটা দিবি যা—পেন্সিলে লিখে দিলাম তো কি হয়েছে, ওতেই হবে। ছাগলটা জমা দিলে লতিফ তোকে আটটা টাকা দেবে।'

'রও, রও।' ভৈরব সাতঙ্কে বলে, 'আট টাকা কিসের? সদরে এ ছাগল আঠারো টাকায় বেচবো।'

কৈলাসের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়!—'বাড়াবাড়ি করিস নে ভৈরব। ছাগল নিয়ে সদরে যাবার তোর রাইট নেই। তা জানিস ব্যাটা?'

'কি জন্যে? আমার ছাগল আমি যেথা খুশি নিয়ে যাব।'

'মাইরি?' কৈলাস খেঁকিয়ে ওঠে বাঘা কুকুরের মতো, আমি দশ-বিশ হাজার ঢেলে লাইসেন্স নেবো সরকারের কাছ থেকে, আর তোমরা যার যেথা খুশি নিয়ে গরু-ছাগল বেচবে? সরকার আইন করে দিয়েছে, চাল-কাপড়, কেরোসিনের মতো গরু-ছাগল কেউ গাঁয়ের বাইরে নিতে পারবে না। আরে বোকা, আইন যদি না থাকবে তো অত টাকা ঢেলে কে নেবে লাইসেন্স?'

ভৈরবকে ভড়কে যেতে না দেখে কৈলাস আশ্চর্য হয়ে যায়। ভৈরব নিশ্চিন্তভাবে বলে, 'বোকা পেলে না কি কৈলাসবাবু? আইন শুধিয়েছি? চালানী কারবারে নামি যদি তো আইন দেখিয়ো তখন।'

ভৈরব বলতে শুরু করলে কৈলাস ভুরু কুঁচকে তার দিকে চেয়ে ভাবে। একটা ছাগল কিছুই নয়, কিন্তু লক্ষণটা মন্দ। দশজনে জেনে বুঝে সাহস পেয়ে এ রকম শুরু করলেই তো সে গেছে। এ বিদ্রোহ দমন করা দরকার।

শহরে ঢুকতে না ঢুকতে সহজেই কালী বিক্রয় হয়ে যায় একুশ টাকায়। ভৈরব খুশী হয়। শুধু ভাল দাম পেয়েছে বলেই নয়, গেরস্ত ঘরে কালীকে বেচতে পেরেছে বলে। পোষা ছাগল বেচতে হওয়ার খেদটা তার দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল এই ভাবনায় যে কার কাছে কালীকে বেচবে, কেটে-কুটে গর্ভিনী কালীকে হয়তো খেয়ে ফেলবে, নয় মাংস বেচে দেবে। যে দিনকাল পড়েছে। কৈলাসের কাছে তো গরু মহিষ পাঁঠা খাসী ছাগলের কোনো তফাত নেই, মাংস হলেই হল। কুকুর-বেড়ালও নাকি সে মেশাল দেয়, সে যে মাংস দৈনিক যোগান দেয় তাতে। কালী ভাল ঘরে পড়েছে, ফল ফুল আনাজের মস্ত বাগানের মাঝখানে পুরানো একতলা বাড়ি, ছেলে-পুলে নিয়ে সংসারী ভদ্র গৃহস্থ, কালী বিয়োলে তার দুধটা খাবে, কালীকে নয়! বাড়ির লাগাও মাঠ-জঙ্গল আছে, কালী চরে বেড়াতেও পারবে।

কিছু সওদা করতে বাজারে যায় ভৈরব। একখানি গামছা কেনে, শাড়ির বদলে এতেই মানোর মার এক রকম চলে যাবে। আধ সের আলু এক সের ডাল মোট সাড়ে ছ আনার হলুদ লঙ্কা ধনে আর জিরে, চার পয়সার সোডা আর দুআনার একটি কাপড় কাচা সাবান কিনে গামছায় বাঁধে। শেষে ভেবেচিন্তে দু আনার তামাক-পাতাও কিনে ফেলে মানোর মার জন্য।

তারপর পথের ধারে তেলেভাজার দোকানে গিয়ে বসে গাঁয়ের দিকে চলতে শুরু করার আগে একটু বিশ্রাম করতে ও কিছু তেলেভাজা খেয়ে নিতে। তেলেভাজা বড়ই পছন্দ করে।

বাদাম তেলের চেনা গন্ধে পুরনো দিনের খিদে যেন পাক দিয়ে চেগে ওঠে ভৈরবের মন ও পেটের মধ্যে। বসে বসে অনেকগুলি তেলেভাজা সে খেয়ে ফেলে,

জল ও তেলেভাজায় পেট ভরে যাওয়া পর্যন্ত। পেটভরার আরামে অলস অবশ হয়ে আসে সর্বাঙ্গ, মাথা ঝিমিয়ে আসে মধুর শান্তিতে। শুধু তার জীবনটা নয়, জগৎটাও জুড়িয়ে গেছে ভৈরবের। সামনে নোংরা রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে যে মিলিটারি লরিগুলো চলছে, দিক কাঁপিয়ে সেগুলি চলতে শুরু করার পর দেখতে দেখতে দুর্দশা তার চরমে এসে ঠেকেছে, সেগুলিও এখন আর বুকের মধ্যে অভিশাপের দপদপানি জাগায় না। রাগ দুঃখ আপসোস দুর্ভাবনা সব তলিয়ে গেছে ভরা-পেটের তেলেভাজার তলে!

ঘুম আসা চোখে ভৈরব বাইরে বেলার দিকে তাকায়। গাঁয়ে যখন ফিরতে হবে, রওনা দেওয়াই ভাল। তেমন নাছোড়বান্দা হয়ে যদি চেপেই ধরে ঘুম, পথের ধারে কোনো গাছতলায় ঘুমিয়ে নিলেই হবে খানিক। গামছায় বাঁধা জিনিস কাঁধে তুলে আস্তে আস্তে সে হাঁটতে শুরু করে। আসবার সময় চোখে লাগানো ছিল নানা ভাবনার ঠুলি, দেখতে পায়নি, এবার শহর ছাড়িয়েই দুদিকে ছড়ানো পরের ক্ষেতের ফসল দেখে চোখ তার জুড়িয়ে যায়, মন ভরে যায় ওই সবুজের মতোই তাজা খুশিতে। তার নিজের ক্ষেতটুকু যেন লুকিয়ে আছে যে দিকে তাকায় সেইখানে।

ডাক দিয়ে তাকে দাঁড় না করিয়ে এবার কৈলাস সামনে থেকেই তার পথ আটকায়। তার সঙ্গে এবার দুজন ষণ্ডা-গুণ্ডা চেহারার মানুষ।

'ছাগল বেচলি ভৈরব?'

ভৈরব উৎসাহের সঙ্গে বলে, 'বেচেছি গো কৈলাসবাবু, তোমার আশীর্বাদে। দর পেয়েছি এক কুড়ি এক টাকা।'

'তাই না কি! তা বেশ করেছিস, আমার বেচা-কেনার ঝক্কিটা তুই নিজেই পুইয়েছিস। আট গণ্ডা কমিশন দেব তোকে। বার কর দিকি টাকাটা।'

কৈলাস তাকে ছোঁয় না, সঙ্গের লোক দুজন ভৈরবকে ধরে কোমরে বাঁধা টাকা বার করে তার হাতে দেয়। টাকা পয়সা গুনে হিসাব করতে করতে কৈলাস বলে, 'হুঁ, খরচা করা হয়েছে এর মধ্যে। দাঁড়া হিসেব করে তোর পাওনা বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোর ছাগলের দাম বাবদ আট টাকা আর আট আনা মেহনত—সাড়ে আট টাকা। একুশ থেকে সাড়ে আট গেলে থাকে সাড়ে বারো, এই আমি নিলাম সাড়ে বারো, বাকিটা তোর।'

'এ কেমন ধারা তামাসা কৈলাসবাবু? ছাড়ো আমায়, ছেড়ে দাও।'

'তামাসা? ব্যাটা, তুই আমার তামাসার পাত্র?' দাঁতে দাঁত ঘষে কৈলাস গালে এক চড় বসিয়ে দেয় ভৈরবের, 'বলিনি তোকে, আমি ছাড়া এ এলাকায় গরু-ছাগল কেনা-বেচার লাইসেন্স কারো নেই, ছাগল বেচতে হলে আমাকে বেচতে হবে? ঘাড়ে তোর কটা মাথা রে হারামজাদা, গট-গট করে সদরে চলে গেলি ছাগল বেচতে বারণ না মেনে?'

ভৈরব ক্রুদ্ধ অসহায় আর্তনাদের সুরে বলে, 'ডাকাতি করে গরিবের পয়সা কেড়ে নেবে? নাও—আমি থানায় যাবো, নালিশ করবো'।

'থানায় যাবি? নালিশ করবি?' কৈলাসের মুখে হাসির ব্যঙ্গ দেখা দেয়,

'যা ব্যাটা থানায়, নালিশ কর গা।' বলে তাকে থানার দিকে এগিয়ে দেবার জন্যই যেন পা তুলে জোরে এক লাথি কষিয়ে দেয় তার বাঁ কোমর লক্ষ্য করে। লাথিটা লাগে ভৈরবের পেটে।

পথ-চলতি রাম শ্যাম যদু মধুরা ভৈরবকে জমিদার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওদের মধ্যে দুজন কাছাকাছি এসে পড়েছিল ঘটনাটা ঘটবার সময়। লাথি মারাটা তারা দেখেছে,--কৈলাসকেও কে না চেনে এ অঞ্চলে! তারা কাছে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে কৈলাসেরা অবশ্য চলতে শুরু করে দিয়েছিল ভৈরবকে রাস্তায় ফেলে রেখে,--দৌড়ে পালায়নি, কৈলাস আগে আগে হাঁটছিল হেলে-দুলে, পিছনে চলছিল সংগী দুজন, কিছুই যেন ঘটেনি এমনিভাবে। পথে পড়ে মানুষটাকে দুমড়ে মুচড়ে কাতরাতে দেখে, বমির সংগে রক্ত তুলতে দেখে, রাম শ্যাম গোড়াতে ভড়কেই গিয়েছিল খানিকটা। কিন্তু যদু মধুরা এসে পড়বার আগেই কাছাকাছি খানা থেকে আঁচলা ভরে জল এনে ভৈরবের মুখে-চোখে ছিটিয়ে দিতেও আরম্ভ করেছিল।

দুহাতে পেট চেপে ভৈরবের বেঁকে তুবড়ে যাওয়া কিছুতে কমছে না দেখে সবাই পরামর্শ করে চলতি এক গরুর গাড়িতে চাপিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

আর ভৈরবের এমনি সৌভাগ্য যে, এই অসময়ে বাড়িতে দিবানিদ্রা দেওয়ার বদলে স্বয়ং কুঞ্জ ডাক্তার হাসপাতালে হাজির ছিল। কৈলাসের প্রতিনিধি বলাই-এর সংগে কুঞ্জ ডাক্তারের কুইনিন সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল একটা।

হাসপাতালে পৌঁছেই আরেকবার বমি করে ভৈরব। একগাদা তেলে-ভাজার সংগে উঠে আসে এক গাদা রক্ত। কুঞ্জ ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করতে করতে শুধোয়, 'কি হয়েছে?'

মধু বলে, 'রাস্তায় পড়ে ছটফট করছিল আর রক্ত-বমি করছিল ডাক্তারবাবু। আমরা তুলে এনেছি।'

যদু বলে, 'কারা না কি মার-ধোর করেছে।'

শ্যাম বলে, 'পেটে লাথি মেরেছে এক জন।'

রাম বলে, 'ছি, ছি, পেটে এমন লাথি মানুষ মারে মানুষকে! মরে যদি যায়!'

কুঞ্জ ডাক্তার বলে, 'লাথি মেরেছে? কে লাথি মেরেছে? ধরতে পারলে না তোমরা তাকে?'

রাম বলে, 'আজ্ঞে, লাথিটা মারলেন কৈলাসবাবু।'

শুনে বলাই বলে, 'হুম্।'

শ্যাম বলে, 'মোরা দুজন আসতেছিলাম, কাছে যেতে যেতে লাথি মেরে কৈলাসবাবু চলে গেলেন সাথের লোক নিয়ে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। থামো বাবু তোমরা একটু লোকটাকে দেখতে দাও!' বলে কুঞ্জ ডাক্তার গম্ভীর মুখে গভীর মনোযোগের সংগে ভৈরবকে পরীক্ষা করে,

লোক-দেখানো অনাবশ্যক পরীক্ষাও করে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি দিয়ে। বমিটা ভাল করে দেখে। তার পর সে রায় দেয়, কলিক। কলিক হয়েছে।

বলাই বলে, 'আঃ! তাই বটে। পেট চেপে ধরে মোচড় খাচ্ছে দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছিল।'

রাম শ্যাম যদু মধুদের শুনিয়ে কুঞ্জ ডাক্তার বলে, 'কলিকের ব্যথা উঠেছে। কলিকের ব্যথা হল, যাকে তোমরা শূল বেদনা বলো। ঠেসে তেলেভাজা খেয়েছে, দেখছ না বমি তেলেভাজায় ভর্তি?'

যদু বলে, 'কিন্তু ডাক্তারবাবু—ও রক্তটা?'

'কলিকে রক্ত ওঠে।'

যদু বলে, 'পরশু মোকে শূল বেদনায় ধরেছিল ডাক্তারবাবু। রক্ত তো ওঠেনি? বমি হতে পেট ব্যথাটা নরম পড়ল।'

'রোগের লক্ষণ সবার বেলা এক রকম হয় নাকি?'

শ্যাম বলে, 'আমরা যে দেখলাম ডাক্তারবাবু লাথি মারতে।'

'দেখেছো তো বেশ করেছো। ডাক্তারের চেয়ে বেশি জানো তুমি? লাথি কে মেরেছে কে মারেনি জানি না বাপু, তেলেভাজা খেয়ে ওর কলিকের ব্যথা উঠেছে।'

রাম বলে, 'কৈলেসবাবু লাথি মারতেই পড়ে গেল, রক্ত-বমি করতে লাগল—'

'যাও দিকি তোমরা, যাও। যাও যাও, বাইরে যাও, ভিড় ক'রো না। ওষুধ-পত্তর দিতে দাও মানুষটাকে, চিকিৎসা করতে দাও। বেরোও সব এখান থেকে।'

রাম শ্যাম যদু মধুরা হাসপাতালের প্রাঙ্গণে নেমে যায়। ভৈরব দুমড়াতে মোচড়াতে থাকে হাসপাতালের দুটি লোহার খাটের একটিতে। আরেক বার সে বমি করে। এবার তেলেভাজা ওঠে কম, রক্ত ওঠে বেশি। মনে হয়, রক্ত-বমি করে তার পেটব্যথা বুঝি একটু নরম হয়েছে, তার ছটফটানি অনেকটা কমে আসছে।

বাইরে থেকে গুঞ্জন কানে আসে কুঞ্জ ডাক্তারের, বাড়ি যাবার জন্য হাসপাতাল থেকে বেরোতেই ক্রুদ্ধ ঝাপ্টার মতো এসে লাগে গুঞ্জনধ্বনিটা। ইতিমধ্যে রাম, শ্যাম, যদু মধুদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তেঁতুলগাছটার তলায় জোট বেঁধে তাদের উত্তেজিত আলোচনা চলছে। একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতেই তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে পাশ কাটিয়ে খানিক তফাত দিয়ে কুঞ্জ ডাক্তার এগিয়ে যায়।

বাড়ি গিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমের আয়োজন করছে কুঞ্জ ডাক্তার, সেই উদ্ধত ক্রুদ্ধ গুঞ্জনধ্বনি দূর থেকে এগিয়ে এসে থেমে দাঁড়ায় তার বাড়ির দরজার সামনে।

বাইরে থেকে হাঁক আসেঃ 'ডাক্তারবাবু! ও ডাক্তারবাবু! শূলবেদনার রুগী এসেছে আর একজন—কলিকের রুগী।'

ভয়ে বিবর্ণ কুঞ্জ প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বাইরে গিয়ে দেখতে পায়, তারই সদরের চৌকাটে মুখ থুবড়ে পড়ে দুমড়ে মুচড়ে গোঙাচ্ছে কৈলাস। মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

রাম শ্যাম যদু মধুরা বলে, 'পোলাও মাংস খেয়ে শূলবেদনা ধরেছে ডাক্তারবাবু, কলিক হয়েছে।'

শিল্পী

সকালে দাওয়ায় বসে মদন সারা গায়ে শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ে খিঁচ ধরল ভীষণভাবে।

একেবারে সাত সাতটা দিন তাঁত না চালিয়ে হাতে-পায়ে কোমরে পিঠে কেমন আড়ষ্ট মতো বেতো ব্যথা ধরেছিল, তাতে আবার গাঁটে গাঁটে ঝিলিকমারা কামড়ানি। সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, বিনা রোগে ব্যারাম ধরার মতো হুদ্দ করে ফেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা ধরাবাঁধা নড়নচড়ন তাঁত চালানোর কাজে, তার অভাবে শরীরটা মিইয়ে ঝিমিয়ে ব্যথিয়ে ওঠে, দুদিনে রাতে ঘুম আসে না, মনটা কেমন টনটন করে এক ধরনের উদাসকরা কষ্টে, সব যেন ফুরিয়ে গেছে! যাত্রা শুনতে গিয়ে নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার সময় যেমন লাগে তেমনি ধারা কষ্ট, তবে ঢের বেশি জোরালো আর অফুরন্ত। শরীর মনের ওসব উদ্বেগ সয়ে চুপচাপ থাকে মদন। যা সয় তা সইবে না কেন।

সকালে উঠেই মা গেছে বৌকে সাথে নিয়ে বাবুদের বাড়ি। বাড়ির মেয়েদের ধরবে, বাবুর ছোট মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে দু-একখানা ভাল, মদন তাঁতির নাম করা বিশেষ রকম ভাল, কাপড় বুনে দেবার ফরমাস যদি আদায় করতে পারে। বাবুর বাড়ির বায়না পেলে সুতো অনায়াসে যোগাড় হয়ে যাবে বাবুদেরই কল্যাণে। বাড়িতে ছিল শুধু মদনের মাসী। তার আবার একটা হাত নুলো, শরীরটি প্যাকাটির মতো রোগা। মদনের হাউমাউ চিৎকার শুনে সে ছুটে আসে মদনের দুবছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে, সাথে আসে মাসীর চার বছরের মেয়ে। মাসীর কি ক্ষমতা আছে এক হাতে টেনে খিঁচধরা পা ঠিক করে দেয় মদনের। মাসীও চেঁচায়। মদনের চিৎকারে ভয় পেয়ে ছেলে মেয়ে দুটো আগেই গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়েছিল।

তখন রাস্তা থেকে ভুবন ঘোষাল এসে ব্যাপারটা বুঝেই গোড়ালির কাছে মদনের পা ধরে কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দেয় আর উরুতে জোরে জোরে থাপড় মারে। যন্ত্রণাটা সামালের মধ্যে আসে মদনের, মুচড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ার বদলে বশে আসে পাটা।

'বাঁচালেন মোকে।'

মুখে শুষতে শুষতে মদন পায়ে হাত ঘসে। খড়িওঠা ফাটা পায়ে হাতের কড়া তালুর ঘষার শব্দ হয় শোষের মতো।

ভুবন পরামর্শ দেয়: 'উঠে হাঁটো দুপা। সেরে যাবে।'

মদন কথা কয় না। এতক্ষণে আশেপাশের বাড়ির কয়েকজন মেয়ে পুরুষ ছুটে এসে হাজির হয়েছে হুল্লোর শুনে। শুধু উদি আসেনি প্রায় লাগাও কুঁড়ে থেকে, কয়েকটা কলাগাছের মোটে ফারাক মদন আর উদির কুঁড়ের মধ্যে। ঘর থেকেই সে তাঁতিপাড়ার মেয়ে পুরুষের পিত্তি জ্বালানো মিষ্টি গলায় চেঁচাচ্ছে: 'কি হল গো? বলি হল কি?'

ভুবন রাস্তা থেকে উঠে এলেও এটা জানা কথাই যে উদির কুঁড়ে থেকেই সে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে এসেছে। উদিই হয়তো তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে। সাতদিন তাঁত বন্ধ মদনের, বৌটা তার নমাস পোয়াতি, না খেয়ে তার ঘরে পাছে কেউ মরে যায় উদির এই ভাবনা হয়েছে, জানা গেছে কাল। কিছু চাল আর ডাল সে চুপি চুপি দিয়েছে কাল মদনের বৌকে, চুপি চুপি শুধিয়েছে মদনের মতিগতির কথা, সবার মতো মজুরি নিয়ে সাধারণ কাপুড় বুনতে মন হয়েছে কিনা মদনের। কেঁদে উদিকে বলেছে মদনের বৌ যে, না, একগুয়েমী তার কাটেনি।

পাড়ার যারা ছুটে এসেছিল, ভুবনকে এখানে দেখে মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই বদলে যায়। ইতিমধ্যে পিসী পিঁড়ি এনে বসতে দিয়েছিল ভুবনকে। বারবার সবাই তাকায় মদন আর ভুবনের দিকে দুচোখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা নিয়ে। সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল, রাজী হল প্রায় বেগার খাটা মজুরি নিয়ে সস্তা ধুতিশাড়ি গামছা বুনে দিতে? মদন অস্বস্তি বোধ করে। মুখের খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি মুছে ফেলে হাতের চেটোতে।

সবার নিঃশব্দ জিজ্ঞাসার জবাবেই যেন বুড়ো ভোলাকে শুনিয়ে সে বলে, 'পায়ে খিঁচ ধরল হঠাৎ। সে কি যন্তনা, বাপ, একদম যেন মিত্যু যন্তনা' মরি আর কি। উনি ছুটে এসে টেনেটুনে ঠিক করে দিলেন পাটা, বাঁচালেন মোকে।'

গগন তাঁতির বেঁটে মোটা বৌ অদ্ভুত আওয়াজ করে বলে, 'অ! কাছেই ছিলেন তা এলেন ভাল তাইতো বলি মোরা।'

'তাঁত না চালিয়ে গাটা ঠিক নেই', তাড়াতাড়ি বলে মদন। গগন তাঁতির বৌয়ের মুখকে তার বড় ভয়।

বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে অপরাধীর মতো। তার কুঁড়েও মদনের ঘরের প্রায় লাগাও—উত্তরে একটা আম গাছের ওপাশে, যার দুপাশের ডালপালা দুজনেব চালকে প্রায় ছোঁয় ছোঁয়।

বুড়ো ভোলার চেয়ে বৃন্দাবনের বয়স অনেক কম কিন্তু শরীর তার অনেক বেশী জরাজীর্ণ। একটি তার পুরানো জীর্ণ তাঁত, গামছা আর আটহাতি কাপড় শুধু বোনা যায়। তাঁতে সে আর বসে না, ক্ষমতা নেই। তার বড় ছেলে রসিক তাঁত চালায়। সুতোর অভাবে তাঁতি পাড়ায় সমস্ত তাঁত বন্ধ, অভাবে ও আতঙ্কে সমস্ত তাঁতি পাড়া থমথম করছে। শুধু তাঁত চলছে কেশবের আর বৃন্দাবনের।

ভুবন অমায়িক ভাবে বৃন্দাবনকে জিজ্ঞাসা করে, 'কখানা গামছা হয়েছে বৃন্দাবন?'

বৃন্দাবন যেন চমকে ওঠে। এক পা পিছিয়ে যায়।

'জানি না বাবু, মোর ছেলা বলতে পারে।'

কেশবকে বোলো বোনা হলে যেন পয়সা নিয়ে যায়।

বাঁকা মেরুদণ্ডটা একবার সোজা করবার চেষ্টা করে বৃন্দাবন অসহায় করুণ দৃষ্টিতে সবার দিকে একবার তাকায়।

'ছেলেকে শুধোবেন বাবু। ওসব জানি না কিছু আমি।'

পিছু ফিরে ধীরে ধীরে চলে যায় বৃন্দাবন।

গগনের বৌ বলে মুখ বাঁকিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে, 'আমি কিছু জানি না গো, মোর ছেলা জানে! কত ঢং জানে বুড়ো।'

বুড়ো ভোলা বলে, 'আহা থাম না বুনোর মা? অত কথায় কাজ কি। যন্তনা গেছে না মদন? মোরা তবে যাই।'

কেশব গেলেই পয়সা পাবে, গামছা কাপড় বুনে দিলেই পয়সা মেলে, এসব কথা— এসব ইঙ্গিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে তারা ভয় পায়। সব ঘরে রোজগার বন্ধ, উপোস।

ভুবন বলে, 'তোমার গাঁয়ের তাঁতিরা, জানো মদন, বড় বোকা।'

মদন নিজেও সাতপুরুষে তাঁতি। রাগের মাথায় সে ব্যঙ্গই করে বসে, 'সে কথা বলতে। তাঁতি জাতটাই বোকা।'

ভুবন নিজের কথা বলে যায়, 'সুতো কিনতে পাচ্ছিস না, পাবিও না কিছুকাল। তাঁত বসিয়ে রেখে নিজে বসে থেকে লাভ কি? মিহিরবাবু সুতো দিচ্ছেন, বুনে দে, যা পাস তাই লাভ। তা নয় সুতো না কিনতে দিলে কাপড়ই বুনবে না, একি কথা? তোমার কথা নয় বুঝতে পারি, সস্তা কাপড় বুনবেই না তুমি, কিন্তু ওরা—'

'পোষায় না ওদের। সুতো কি সবাই কেনে, না কিনতে পারে? আপনি তো জানেন, বেশির ভাগ দাদন কর্জে তাঁত চালায়। পড়তা রাখে দিবারাত্তির তাঁত চালিয়ে, মুখে রক্ত তুলে। আপনি তাও আদ্দেক করতে চান, পারব কেন মোরা?'

'নইলে ইদিকে যে পড়তা থাকে না বাপু। কি দরে সুতো কেনা জানো?' ভুবন আপসোসের শ্বাস ফেলে। 'যাক, সে কি করা যাবে। কত্তাকে কত বলে তোমাদের জন্য সুতো বরাদ্দ করিয়েছিলাম, তোমরা না মানলে উপায় কি। বুঝি তো সব কিন্তু দিনকাল পড়েছে খারাপ, তাঁত রেখে কোনোমতে টিকে থাকা। নয়তো দুদিন বাদে তাঁত বেচতে হবে তোমাদের। ভাল সময় যখন আসবে, সুতো মিলবে আবার, তখন মনে পড়বে এই ভুবন ঘোষালের কথা বলে রাখছি, দেখো মিলিয়ে। তখন আপসোস করবে আমার কথা শুনলে তাঁতও বজায় থাকত, নিজেরাও টিকতে।'

তাঁত বাঁধা দিতে বেচতে হলে মিহিরবাবুর হয়ে ভুবনই কিনবে। সেই ভরসাতেই হয়তো গাঁট হয়ে বসে আছে লোকটা। কিন্তু সে পর্যন্ত কি গড়াবে? তার আগে হয়তো ভুবনের কাছে সুতো নিয়ে বুনতে শুরু করবে তাঁতিরা।

মাসী এসে ঘুরঘুর করে আশেপাশে। বামুনের ছেলে পায়ে হাত দিয়েছে মদনের, গড় হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ভুবনকে যতক্ষণ সে প্রণাম না করছে মাসীর মনে স্বস্তি নেই। মদনের বুঝি খেয়াল হয়নি, ভুলে গেছে। মদনের পা দুটো টান হয়ে ভুবনের

পিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলে মাসীর আর ধৈর্য থাকে না। মদনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রণামের কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

মদন একেবারে খিঁচড়ে ওঠে, 'মেয়েটাকে নে না কোলে, কেঁদে মরছে? মরগে মা হেথা থেকে যেথা মরবি?'

ছেলে মেয়ে দুটোকে নিয়ে মাসী পালায়। মদনের এ মেজাজ চেনে মাসী। মেয়ে কাঁদছে বলে বকুনি মিছে, ওটা ছুতো। ছেলে পিলে কানের কাছে চেঁচালে মানুষের অশান্তি কেন হবে মাসীও জানে না মদনও বোঝে না। ছেলে মেয়ের কান্না মদনের কানে লাগে না। তাঁতের ঠকঠক ,মেয়েদের বকাবকি, ঝিঁঝির ডাকের মতো। মেজাজটাই বিগড়েছে মদনের। না করুক প্রণাম সে বামুনের ছেলেকে। মদনের ওপর মাসীর বিশ্বাস খাঁটি। রামায়ণ সে পড়তে পারে সুর করে, তাঁতের কাজে বাপের নাম সে বজায় রেখেছে, সেরা জিনিস্ তৈরির বায়না পায় মদন তাঁতি। মদনের মার সাথে কচি বয়সে এ বাড়িতে এসে মাসী শুনেছিল, বাবুদের বাপের আমলে বেনারসী খুনে দেবার বায়না পেয়েছিল মদনের বাপ। বিয়ের সময় জালের মতো ছিণ্টিছাড়া শাড়ি বুনে পড়তে দিয়ে তাব সঙ্গে যে মস্করা করেছিল মদনের বাপ সে কথা কোনোদিন ভুলবে না মাসী। আজ আকাল, বায়না আসে না, সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, তবু মদন ওঁচা কাপড় বোনে না। ওর জন্য কষ্ট হয় মাসীব, ওর বাপের কথা ভেবে। মা বৌ যেন কেমন ব্যাভার করে ওর সঙ্গে।

মদনের বাপ যদি আজ বেঁচে থাকত, মাসী ভাবে। বেঁচে থাকলে সাড়ে চার কুড়ির বেশি বয়স হত তার। মাসী তা ভাল বোঝে না। শুধু শ্রীধরের চেয়ে সে বেশি বুড়ো হয়ে পড়ত ভাবতে মনটা তার মুষড়ে যায়। শ্রীধর তাঁতির বেঁচে থাকার দুর্ভাগ্য দেখে সে নিজেই যে কামনা করে, এবার বুড়োর যাওয়াই ভালো।

না থাক মদনের বাপ। মদন তো আছে!

মদনের মা বৌ ফিরে আসে গুটিগুটি, পেটের ভারে মদনের বৌ থপথপ পা ফেলে হাঁটে, হাত পা তার ফুলছে কদিন থেকে। পরনের জীর্ণ পুরানো শাড়িখানা মদন নিজে বুনে দিয়েছিল তাকে বিয়ের সময়। এখনো পাড়ের বৈচিত্র্য, মিহি বুনমের কোমল খাপি উজ্জ্বলতা সব মিলে এমন সুন্দর আছে কাপড়খানা যে অতি বিশ্রীভাবে পরলেও রুক্ষ্ম জট বাঁধা চুল চোক্‌লা ওঠা ফাটা চামড়া এসব চিহ্ন না থাকলে বাবুদের বাড়ির মেয়ে মনে করা যেত তাকে।

মদনের মা বিড়বিড় করে বকতে বকতে আসছিল লাঠি ধরে কুঁজো হয়ে, ভুবনের সামনে সে কিছু না বললেই মদন খুশি হত। কিন্তু বুড়ীর কি সে কাণ্ডজ্ঞান আছে। সামনে এসেই সে শুরু করে দেয় মদন তাঁতির এয়োতি বশীকরণ বসন্ত শাড়ির বায়নার কথা শুনেই বাবুর বাড়ির মেয়েদের হাসি টিটকারি দিয়ে তাদের বিদেয় করার কাহিনী। ওসব কাপড়ের চল আছে নাকি আর, ঠাকুমা দিদিমারা ঝিরা আর চাষার ঘরের মেয়েরা পরে ওসব শাড়ি।

মদন তাঁতি! মদন তাঁতির কাপড়! বনগাঁয় শ্যাল রাজা মদন তাঁতি।

'বলল? বলল ওসব কথা?' পা গ্রুটিয়ে সিধে হয়ে বলে মদন, 'বেড়েছে—বড় বেড়েছে বাব্রা। অতি বাড় হয়েছে বাব্দের, মরবে এবার।'

দাওয়ায় উঠতে টলে পড়বার উপক্রম করে মদনের বৌ। খ্রুটি ধরে সামলে নিয়ে ভেতরে চলে যায়, ভেতর থেকে তার উগ্র মন্তব্য আসে : 'এক পয়সার ম্রোদ নেই, গর্বো কত!'

ভুবন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'মেয়েরা অমন বলে মদন, ওসব কথায় কান দিতে নেই।'

তা বলে, বাব্দের বাড়ির মেয়েরাও বলে, তার মা বৌও বলে, উঁদিও বলে। কিন্তু সব মেয়েরা বলে না। এই তাঁতিপাড়ার অনেক মেয়েই বলে না। মদন তাঁতিকে সামনে খাড়া করিয়ে তারা বরং ঝগড়া করে ঘরের প্রুষদের সংগে। মদনও তাঁত বোনে তারাও তাঁত বোনে, পায়ের ধ্লোর য্গ্যি নয় তারা মদনের। এক আঙ্ল গোঁপ-দাড়ির মধ্যে ভাঙা দাঁতের হাসি জাগিয়ে মদন শোনায় ভুবনকে। একটা এড়ে তাঁতির তেজ আর নিষ্ঠায় একট্ খটকাই যেন লাগে ভুবনের। একট্ রাগ একট্ হিংসার জ্বালাও যেন হয়। সম্প্রতি মিহিরবাব্ তাঁতের কারবারে জড়িয়ে পড়ার পর সে শ্নেছিল এ অঞ্চলের তাঁতি মহলে একটা কথা চলিত আছে: মদন যখন গামছা ব্নবে। গোড়ায় কথাটার মানে ভাল বোঝেনি, পরে টের পেয়েছিল, স্র্য যখন পশ্চিমে উঠবে—এর বদলে ওই কথাটা এদিকের তাঁতিরা ব্যবহার করে। সে জানে মদন যদি তার কাছ থেকে স্তো নিয়ে কাপড় ব্নে দিতে রাজী হয় আজ, কাল তাঁতিপাড়ার বেশির ভাগ লোক ছ্টে আসবে তার কাছে স্তোর জন্য। বড় খামখেয়ালী একগ্রুয়ে লোকটা, এই রাগে, এই হাসে হাহ্তাশ করে, এই লম্বাচওড়া কথা কয় যেন রাজামহারাজা!

উঠবার সময় ভুবনের মনে হয় ঘর থেকে যেন একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এল।

তার পরেই মাসীর গলাঃ 'ও মদন, দ্যাখসে বৌ কেমন করছে।'

ভুবন গিয়ে উঁদিকে পাঠিয়ে দেয় খবর নিতে। বেলা হয়েছে তার বেরিয়ে পড়া দরকার, কাজ অনেক। কিন্তু মদনের ঘরের খবরটা না জেনে যেতে পারে না। তেমন একটা বিপদ ঘাড়ে চাপলে মদন হয়তো ভাঙতে পারে। উঁদির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ও ছ্রুড়ির বড় বাড়াবাড়ি আছে সব বিষয়ে, খবর আনতে গিয়ে হয়তো সেবা করতেই লেগে গেছে মদনের বৌয়ের। কি হয়েছে মদনের বৌয়ের? কি হতে পারে? গ্রুতর কিছ্ যদি হয় . . .

উঁদি ফেরে অনেকক্ষণের পরে। অনেকটা পথ হেঁটে মদনের বৌয়ের শরীরটা কেমন করছিল, একবার ম্র্ছা গেছে। মনে হয়েছিল ব্ঝি ওই পর্যন্তই থাকবে, কিন্তু পরে মনে হচ্ছে প্রসব ব্যাথাটাও উঠবে।

'পেসব হতে গেলে মরবে মাগী এবার। একবেলা একম্ঠো ভাত পায় তো তিন বেলা উপোস। এমনি চলছে দ্মাস। গাল দিয়ে এলাম তাঁতিকে, মরণ হয় না?'

আখায় কাঠ গ্রুজে নামানো হাঁড়িটা চাপিয়ে দেয়। বেঁটে আঁটো দেহটা পর্যন্ত

তার পরিচয় দেয় দুর্জয় রাগের। বসাতে গিয়ে মাটির হাঁড়িটা যে ভাঙে না তাই আশ্চর্য।

'এখনো গেলে না যে?'

'যাবো। আলিস্যি লাগছে।'

'ভাত খাবে, মোর রাঁধা ভাত?' উঁদি আব্দার জানায়।

ভুবন রেগে বলে, 'তোর কথা বড় বিচ্ছিরি।'

মদন দাওয়ায় এসে বসেছে উঁকি মেরে দেখে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে ভুবন আবার যায়। সকালের পিড়িটা সেইখানে পড়েছিল, তাতে জাঁকিয়ে বসে।

'কেমন আছে বৌ?'

ব্যাথা উঠেছে কম কম। রক্ত ভাঙছে বেশি, ব্যাথা তেমন নয়। দুগ্‌গা বুড়ীকে আনতে গেছে।

মদনের শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব দেখে ভুবন রীতিমত ভড়কে যায়। একটা বিড়ি ধরিয়ে ভাবে, ভেবে মদনকেও একটা বিড়ি দেয়।

মদন বলে হঠাৎঃ 'ভাল কিছু বোনান না, একটু দামী কিছু? সুতো নেই বুঝি?'

মনটা খুশি হয়ে ওঠে ভুবনের।

'সামান্য আছে। কিন্তু বেনারসী ছাড়া তুমি কি কিছু বুনবে?'

'বেনারসী?' বেনারসী না বোনা যেন তারই অপরাধ, তারই অধঃপতন এমনি আপসোসের সঙ্গে বলে মদন, 'বেনারসী জীবনে বুনিনি।'

একঘণ্টার মধ্যে সুতো এসে পড়ে। ভুবন লোক দিয়ে সুতো পোঁছে দেয় মদনের ঘরে। সুতো দেখে কান্না আসে মদনের। এই সুতো দিয়ে তাকে ভাল কাপড়, দামী কাপড় বুনে দিতে হবে! এর চেয়ে কেশবের মতো গামছাই নয় সে বুনত, লোকে বলত মদন তাঁতি গামছা বুনেছে দায়ে পড়ে কিন্তু যা-তা ওঁচা কাপড় বোনেনি। সকালে পায়ে যেমন খিঁচ ধরেছিল তেমনি ভাবে কি যেন টেনে ধরে তার বুকের মধ্যে। ট্যাঁকে গোঁজা দাদনের টাকা দুটো যেন ছ্যাঁকা দিতে থাকে চামড়ায়। কিন্তু এদিকে তাঁত না চালিয়ে চালিয়ে সর্বাঙ্গে আড়ষ্টমতো ব্যাথা, পেটে খিদেটা মরে জাগছে বারবার, বৌটা গোঙাচ্ছে একটানা।

কি করবে মদন তাঁতি?

সেদিন রাত্রি যখন গভীর হয়ে এসেছে, শীতের চাঁদের ম্লান আলোয় গাঁ ঘুমিয়ে পড়েছে, চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে মাঝে মাঝে ও দূরে কুকুর-শিয়ালের ডাক ছাড়া, মদন তাঁতির তাঁত ঘরে শব্দ শুরু হল ঠকাঠক্ ঠকাঠক্। খুব জোরে তাঁত চালিয়েছে মদন, শব্দ উঠেছে জোরে। উঁদির ঘরে তো বটেই, বৃন্দাবনের ঘরে পর্যন্ত শব্দ পোঁছতে থাকে তার তাঁত চালানোর।

ভুবন বলে আশ্চর্য হয়ে, 'এর মধ্যে তাঁত চাপাল? একা মানুষ কখন ঠিক করল সব?'

উঁদিও অবাক হয়ে গিয়েছিল—'ও খাঁটি গুণী লোক, ও সব পারে—' সে বলে ভয়ে ও বিস্ময়ে কান পেতে থেকে।

বুড়ো বৃন্দাবন ছেলেকে ডেকে বলে, 'মদন তাঁত চালায় নাকি রে?'

'তা ছাড়া কি আর?' কেশব জবাব দেয় ঝাঁজের সঙ্গে, 'রাতদুপুরে চুপে চুপে তাঁত চালাচ্ছেন, ঘাট শুধু মোদের বেলা।'

'ভুবনের সুতো না হতে পারে।'

'কার সুতো তবে? কার আছে সুতো ভুবন ছাড়া শুনি?'

মদনের তাঁত কখন থেমেছিল উঁদি জানে না। ভোরে ঘুম ভেঙেই সে ছুটে যায় মদনের কাছে। মদনকে ডেকে তুলে সাগ্রহে বলে, 'কতটা বুনলে তাঁতি?'

'আয় দেখবি।'

মদন তাকে নিয়ে যায় তাঁত ঘরে। ফাঁকা শূন্য তাঁত দেখে থ বনে থাকে উঁদি। সুতোর বাণ্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

সুতো মদন উঁদির হাতে তুলে দেয়, টাকা দুটোও দেয়। বলে, 'নিয়ে যা ফিরে দে গা ভুবনবাবুকে। বলিস, মদন তাঁতি যেদিন গামছা বুনবে—'

একটু বেলা হতে তাঁতি পাড়ায় অর্ধেক মেয়ে পুরুষ দল বেঁধে মদনের ঘরের দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখ দেখলেই বোঝা যায় তাদের মনের অবস্থা। রোষে ক্ষোভে কারো চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম করেছে। গগন তাঁতির বৌটা পর্যন্ত নির্বাক হয়ে গেছে।

বুড়ো ভোলা শুধোয়ঃ 'ভুবনের ঠেঁয়ে নাকি সুতো নিয়েছ মদন? তাঁত চালিয়েছ দুকুর রাতে চুপি চুপি।?'

'দেখে এসো তাঁত।'

'তাঁত চালাওনি রাতে?'

'চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে, রাতে তাই খালি তাঁত চালালাম এটটু। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে? মদন তাঁতি যেদিন কথার খেলাপ করবে—'

মদন হঠাৎ থেমে যায়।

কংক্রীট

সিমেণ্ট ঘাঁটতে এমন ভাল লাগে রঘুর। দশটা আঙুল সে ঢুকিয়ে দেয় সিমেণ্টের স্তূপে, দু হাত ভর্তি করে তোলে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝুরঝুর করে ঝরে যায়। হাত দিয়ে সে থাপড়ায় সিমেণ্ট নয়, শুধু এলোমেলোভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করে। যোয়ান বয়সে ছেলেবেলার ধুলোখেলার সুখ। কখনো থাবলা দিয়ে মুঠো করে ধরে, যতটা ধরতে চায় পারে না, অল্পই থাকে মুঠোর মধ্যে। হাসি ফোটে রঘুর ঠোঁটে। এখনো গংগামাটির ভাগটা মেশাল পড়েনি—ও চোরামিটা কোম্পানি একটু গোপনে করে। কি চিকন মোলায়েম জিনিসটা, কেমন মিঠে মেঘলা বরণ। মুক্তার বুক দু'টির মতো। বলতে হবে মুক্তাকে তামাসা করে, আবার যখন দেখা হবে।

'এই শালা খচ্চর।'

গিরীনের গাল, ছিদামের নয়। ছিদাম বিড়ি টানছে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, ব্যাটার তিনটে আব বসানো কিম্ভূত মুখ দেখলে গা জ্বলে যায় রঘুর, গাল শুনলে আরো বেশি। রুমাল-পোঁছা আসছে বুঝি তার চাকে পাক দিতে, ব্যাটা হুলো বোলতা, গিরীন তাই সামলে দিয়েছে তাকে। চট্ করে কাজে মন লাগায় রঘু। গিরীনকে ভালো লাগে রঘুর, লোকটা হুলো বেড়ালের মতো রগ-চটা আর বেঁটে-খাটো ষাঁড়ের মতো একগুঁয়ে হলেও। যত বদ মেজাজী হোক, যে কোনো হাসির কথায় হ্যা হ্যা করে হাসে যেন শেয়াল ডাকছে ফুর্তির চোটে। আবার কারো দুঃখদুর্দশার কথা শুনলে বাঘের মতো গুম হয়ে যায়, মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দেয় যেন রোলার মেসিনে পাথর গুঁড়োচ্ছে মড়মড়িয়ে।

'রুমাল-পোঁছা এলো না দিকি?'

'না।'

'এলো না এলো, তোর কিরে বাপোত্?' ছিদাম বলে দাঁত খিঁচিয়ে, 'ওনার আর কাজ নেই, তোর কাজ দেখতে আসবেন? আমি আছি কি কর্তে?'

কথা না কয়ে খেটে যায় রঘু। পোঁছাবাবু আসে এদিক-ওদিক তেরচা চোখে চাইতে চাইতে, দুবার রুমাল দিয়ে মুখ পুঁছে ফেলে দশ পা আসতে আসতেই। তার গালভরা নাম বিরামনারায়ণ—এই মুদ্রাদোষে চিরতরে তলিয়ে গিয়ে হয়েছে রুমাল-পোঁছা, সংক্ষেপে পোঁছাবাবু। গিরীন, গফু, ভগলু, নিতাই, শিউলালেরা একটু শক্ত বনে গিয়েই কাজ করে যায়, ছিদাম যেন খানিকটা নেতিয়ে বেঁকিয়ে যায় পোষা কুকুরের ঢঙে, উৎসুখ চোখে তাকায় বারবার মুখ তুলে, লেজ থাকলে বুঝি নেড়ে দিত।

'তোর ওটা এখন হবে না গিরীন, সাফ কথা। হাঙ্গামা মিটলে দেখা যাবে।'

'দুমাস হয়ে গেল বাবু। হাঙ্গামার সাথে মোর ওটার—'

'বাস, বাস। এখন হবে না। সাফ কথা।'

রুমালে মুখ পুঁছে এগিয়ে যায় পোঁছাবাবু। রগ-চটা গিরীন রাগের চোটে বিড়বিড় করে বুঝি গাল দিতে থাকে। ছিদাম একটু অবাক হয়ে ভাবে যে দুপুরের ভোঁ পড়ার মোটে দেরি নেই, টহল দিতে বার হল কেন পোঁছাবাবু অসময়ে। ভোঁ-এর টাইম হয়ে এলে কাজে ঢিল পড়ে কেমন, ফাঁকি চলে কি রকম দেখতে? দেখবে কচু, পোঁছাবাবু টহলে বেরোলে টের পায় সবাই। এর বদলে তাকে ডেকে শুধোলেই সে বলে দিতে পারত সব!

খিদেয় ভেতরটা চোঁ চোঁ করছে রঘুর, তেষ্টায় কিনা তাও যেন ঠিক আন্দাজ করা যায় না, ঘেমে ঘেমে দেহটা লাগছে যেন কলে মাড়া আখের ছিবড়ে। ভোঁ-র জন্য সে কান পেতে থাকে। আগে মুখ হাত ধোবে না সোজা গেটে চলে যাবে, বন্ধ গেটের শিকের ফাঁক দিয়ে চানা কিনবে না মুড়ি কিনবে, আগে পেট পুরে জল খাবে না দুমুঠো খেয়ে নেবে আগে, এই সব ভাবে রঘু। মুক্তাকে এনে রাখতে পারলে হত দেশ থেকে, রোজ পুঁটলি করে খাবার সাথে দিত বেন্দার বৌটার মতো। বৌ একটা বটে বেন্দার! রঙে ঢঙে ছেনালিতে গনগনে কি বাস্ রে মাগীটা, মুক্তার মতো কচি মিষ্টি নয় যদিও মোটে। তবে পুঁটলি করে বেন্দাকে খাবার দেয় সাথে রোজ, রুটি চচ্চড়ি ভাজা, নয়তো ঝাল ঝাল শুখা ডাল, নয়তো চিচিঙার পেঁয়াজ ছেঁচকি।

হঠাৎ বড় শ্রান্ত, অবসন্ন লাগে নিজেকে রঘুর। সে জানে এ রকম লাগলে কি ঘটবে এখুনি। কাশি আসছে। আঁতকানির মতো একটা টান লাগে ভেতরে, তারপর শুরু হয় কাশি; কাশতে কাশতে বেদম হয়ে পড়ে রঘু। হাঁটু গেড়ে সে বসে পড়ে, দুহাতে শক্ত করে নিজের হাঁটু জড়িয়ে হাঁটুতেই মুখ গুঁজে দেয়। এমনি করে আস্তে আস্তে শ্বাস টানবার চেষ্টা করলে কাশিটা নরম পড়ে, এক দলা সিমেণ্ট-রঙা কফ উঠে আসবার পর কাশিটা থামে।

গিরীন গুম হয়ে তাকিয়ে থাকে, বাঘের মতো, গলায় দুবার খাঁকারি দেয় আড়ালের রোলার মেশিনটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

আমি সাতবচ্ছর খাটছি, তুই শালা দুচার বছরে খতম হয়ে যাবি।

ট্যাঁক ফ্যা ফ্যা করছে রঘুর, পয়সা নেইকো। বেন্দার ট্যাঁকে দু-এক টাকা আছেই সব সময়, মাল টেনে এত পয়সা ওড়ায়, তবু। রঘু তাই দু-এক আনা ধার করতে যায় বেন্দার কাছে আর তাই সে দেখতে পায় রোলার মেসিনে কেষ্ট বাতাপির পিষে থেঁতলে যাবার রকমটা।

মাটিতে শিকড়-আঁটা গুমোটের গাছের মতো রঘু নড়ে চড়ে না, মুখ হাঁ হয়ে যায়, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। সরে পড়তে গিয়ে তাকে দ্যাখে বেন্দা, দাঁতে দাঁত ঠেকে গিয়ে খিঁচে উঠে ছিরকুটে যায় বেন্দার মুখ। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে সাপের হিস্‌হিসানির আওয়াজে সে বলে, 'যা যা ভাগ। পালা শীগগির।'

দিশেহারা রঘু পালাতে গেলে কিন্তু ফের তাকে ডেকে বেন্দা বলে, 'শোন্। এখানে এইছিলে খপর্দার বলিসনি কাউকে, মারা পড়বি—খপর্দার।'

পাতা হয়ে ঝড়ে উড়ে যেন রঘু ফিরে আসে নিজের জায়গায়, রঘুর প্রাণটা আর কি, নয়তো ফেরে সে পায়ে পায়ে হেঁটেই। মেঘলা গুমোটের কালঘাম ছুটেছে, সেটা দেখা যায়। ভাবসাব দেখে মনে হয়, কাশির ধমকটা ঝাঁকি দিয়ে গেছে তাকে, কাবু করে দিয়েছে। কিন্তু রঘু ভাবে তার ভেতরের উল্টেপাল্টে পাক খাওয়াটা বুঝি চোখে পড়েছে সকলের, এই বুঝি কে শুধিয়ে বসে, ব্যাপারখানা কি রে!

'জল খেলি?' গিরীন শুধোয় বাপের মতো সুরে।

'হাঁ খেলাম।'

প্রথম ভোঁ বাজে দুপুরের। হাঁপ ফেলবার, ঢিল দেবার, জল চানা খাবার এতটুকু অবকাশ। দমে আর হাত পায়ে একটু ঢিল পড়ে, মনটা শিথিল হবার সুযোগ পায় না কারো। হবু ধর্মঘট নিয়ে ব্যগ্র উত্তেজিত হয়ে আছে মজুরেরা, ও ছাড়া চিন্তা নেই, আলোচনা নেই। তার মধ্যে খবর ছড়ায় দুর্ঘটনার, কি তাড়াতাড়ি যে ছড়ায়। কেষ্ট ব্যাতাপি রোলার মেসিনে পিষে থেতলে মারা গেছে খানিক আগে—এ খবর যে শোনে সে গুম হয়ে যায় খানিকক্ষণের জন্য, তারপর অকথ্য বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে, এটা কি রকম হল? হু হু করে উত্তেজনা বেড়ে যায়, ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাতে থাকে উত্তেজনার, সবার কথার মোট আওয়াজটা নতুন রকমের ধ্বনি হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে খবর পেয়ে কয়েকজন যারা ছুটে গিয়েছিল দেখতে, তারাই শুধু দেখতে পেয়েছে কেষ্ট বাতাপির ছেঁচা দেহটা, জিজ্ঞেস করে ভাসাভাসা শুনতে পেয়েছে কিসে কি ঘটল। তারপর খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে সকলকে, ওখানে গণ্ডগোল করা বারণ হয়ে গেছে।

ছিদাম বলে, 'আহা রে! বিষ্যুৎবারের বারবেলায় পেরাণটা গেল কপাল দোষে।'

রগচটা গিরীন যেন চটেই ছিল আগে থেকে, শুনেই গর্জে ওঠে, 'বারবেলার কপাল দোষ! পোঁছা বুঝি বলেছে তোকে বলে বেড়াতে? পোঁছার পা-চাটা শালা ঘাগী বুড়ো! পোঁছা খুন করিয়েছে কেষ্টকে, জানিস্? বজ্জাত শকুন তুই, চুপ করে থাক।'

ছিদাম সরে পড়ে, চমক লেগে, চমৎকৃত হয়ে। কৌতূহলে ফেটে পড়ে তার মনটা। এদিক-ওদিক ঘোরে সে. ছাড়া ছাড়া কথা শুনতে ছোট ছোট দলের উত্তেজিত আলোচনার। কাছে যেতে তার ভরসা হয় না। সবাই হয় তো চুপ হয়ে যাবে, কেউ তাকাবে আড়চোখে, কেউ কটমটিয়ে। যেটুকু সে শোনে তাতেই টের পায়, শুধু গিরীন নয়, অনেকেই বলাবলি করছে ষড়যন্ত্র—গোপন কারসাজির কথা।

আরেকবার ভোঁ বাজে। যে যার কাজে যায়। যন্ত্রের একটানা গম্ভীর গর্জনে চাপা পড়ে যায় বটে কথার গুঞ্জন কিন্তু খাটুনেদের কানাঘুষা চলতে থাকে কাজের মধ্যেই।

ছিদাম আমতা আমতা করে বলে, 'একটা কথার হদিস পাচ্ছি না, তোকে শুধাই গিরীন। কেষ্ট ভিন্ন ডিপার্টে, রোলার মেসিনে ও গেছল কেন?'

'বদলি করল না ওকে ক'রোজ আগে? এই মতলব পোঁছা শালার, খুনে ব্যাটা।'

'হাঁ—? বটে—?'

'কি তবে?' গিরীন ফের চটে যায়, রগচটা গিরীন, 'কি বলতে চাস তুই? একরোজ যে কাজ করেনি সে কাজ বদলি করবার মানেটা কি?'

রঘু শোনে। তার খাপছাড়া ভয়ংকর অভিজ্ঞতা মানে পেয়ে পেয়ে বীভৎসতর হয়ে উঠেছিল আগে থেকেই, গিরীনের কথায় মানে আরও পরিষ্কার হয়ে যায়।

ছিদামও তাই ভাবছিল।

ম্যানেজারের ডান হাত পোঁছাবাবু। কিছুদিন আগেও বড় খুশি ছিল পোঁছাবাবু তার ওপর। কত গোপন কথা পোঁছা জেনে নিত তার কাছে, ওপরের কত গোপন ব্যাপারের হদিস তাকে দিত, সেই সংগে খোলা হাতে বোতল বোতল মদের দাম বখশিস্। সে রকম অনুগ্রহ পোঁছাবাবু আর তাকে করে না আজকাল, যদিও ছোটখাট দয়া আজও তার জোটে, ছোটখাট কাজে সে লাগে। দোষ তার নিজের। সবাই জেনে গেল তার ব্যাপার আর সাপের মতো বিছার মতো তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল, ফলে আজ তার এই অবস্থা। তার নিজের গোখুরি ছাড়া আন্দাজ কি করতে পারত কেউ। আপসোসে বুকটা বিছার বিষে জ্বলে যায় ছিদামের। নিজের ঘরে সিঁদ দেওয়ার মতো কি বোকামিটাই সে করেছে। ম্যানেজার পর্যন্ত তাকে খাতির করে জানিয়ে জানিয়ে খাতিরের সাঙ্গাতদের কাছে নিজের মান বাড়াবার কি ভূতটাই চেপেছিল তার ঘাড়ে। তা না হলে কি জানাজানি হয় আর এমনভাবে তার খাতির কমে যায় পোঁছাবাবুর কাছে। বড় বেশি মাল খাচ্ছিল সে কাঁচা টাকা পেয়ে পেয়ে, মাথার তার ঠিক ঠিকানা ছিল না কিছু, বিগড়ে গিয়েছিল একদম। একটু যদি সে সামলে চলত, কর্তারা তাকে খাতির করে এটা চেপে গিয়ে যদি বলে বেড়াত ওপর থেকে তাকে পিষে মারছে, আজ কি তাহলে তার অগোচরে কেষ্ট বাতাপিকে রোলার মেসিনে পিষে মারবার ব্যবস্থা করতে পারত পোঁছাবাবু, কয়েকটা নোট তার পকেটে আসত না!

জ্বালা যেন সয় না ছিদামের। এত পাকা বুদ্ধি নিয়ে বোকামি করে সব হারাল, এখন যে একটা চাল চালবার বুদ্ধি গজাচ্ছে মাথায় সেটাকে দাবিয়ে রেখে ফের কি একটা সুযোগ হারাবে বোকার মতো। উসখুস করতে করতে এক সময় মরিয়া হয়ে সে বেন্দার কাছে যায়। ভয়ে এদিকে বুকটা কাঁপেও।

'কি যে বোকার মতো কাজ করিস বেন্দা।' চুপি চুপি বলে সে বেন্দাকে।

সরু সরু লাল শিরায় আচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে বেন্দা বলে, 'কি বলছ? বোকার মতো কি কাজ?'

'সবাই কি বলাবলি করছে জানিস?'

'কি বলাবলি করছে?' চমকে আঁতকে ওঠে বেন্দা।

'হুঁ, হুঁ', ছিদাম মুচকে হাসে প্রাণপণ চেষ্টায়, 'আরে বাবা, আমার কাছে চাল মারিস কেন? পোঁছাবাবু আমাকে জানে, আমি পোঁছাবাবুকে জানি। সবাই কি বলাবলি করছে জানা দরকার পোঁছাবাবুর।'

বেন্দা ঢোঁক গিলে গিলে ভাবে। তারপর বলে, 'চলো বলবে চলো পোঁছাবাবুকে।'

পোঁছাবাবু বলে, 'কিরে ছিদাম, খবর আছে?'

'আজ্ঞে।'

পোঁছাবাবু তাকে বসতে বলে চেয়ারে! প্রায় রোমাঞ্চ হয় ছিদামের বুড়ো শরীরে। চাল খেটেছে তার। কাজে আর সে লাগে না, দরকার তার ফুরিয়ে গেছে, তবু এ ব্যাপারের কিছু সে টের পেয়েছে ধরে নিয়ে একটু কি খাতির তাকে করবেন না পোঁছাবাবু—ভেবেছিল সে। ঠিকই ভেবেছিল। নিজের পাকা বুদ্ধির তারিফ করে ছিদাম মনে মনে।

যেন আলাপ করছে এমনিভাবে পোঁছাবাবু তাকে জেরা করে। সে টেরও পায় না পোঁছাবাবু কি করে জেনে নিচ্ছে যে সবাই খোলাখুলিভাবে যা বলাবলি করছে তাও সে ভালরকম জানে না, পোঁছাবাবু তার চেয়ে অনেক বেশি জেনে এর মধ্যেই ব্যবস্থা আরম্ভ করেছে প্রতিবিধানের।

গালে প্রচণ্ড একটা চড় খেয়ে সে বুঝতে পারে চালাকি তার খাটেনি, আরেকটা সে বোকামি করে ফেলেছে।

তবে সে আপনার লোক, যতই বোকা হোক। দুটো টাকা হাতে দিয়ে পোঁছা বলে, 'কাজ করবি যা। বজ্জাতি করিস না, কংক্রীটের গাঁথনি উঠছে, ওর মধ্যে পুঁতে ফেলব তোকে।'

কাজে যখন ফিরে যায় ছিদাম, মাথাটা ভোঁতা হয়ে গেছে। মাথায় শুধু আছে যে আজ আস্ত একটা বোতল কিনে খাবে, দুটো টাকা তো দিয়েছে পোঁছাবাবু। কিন্তু প্রতিশোধ নেবে। এবার থেকে সে ওদের দলে।

--'শোন বলি গিরীন। কেষ্টকে ওরা মেরেছে টের পেয়েছি। আমি সাক্ষী দেব তোদের হয়ে।'

'তোর সাক্ষী চাই না।'

অতি রহস্যময় দুর্ঘটনা, অতি সন্দেহজনক যোগাযোগ। মুখে মুখে আরও তথ্য ছড়িয়ে যায়, রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে আছে। গোবর্ধন নাকি সময়মতো এসেও কার্ড পায়নি ভেতরে ঢুকবার, সে তাহলে উপস্থিত থাকত দুর্ঘটনার সময়, যদি না কোনো ছুতায় সরিয়ে দেওয়া হত তাকে—নাসিরকে যেমন ঠিক ওই সময় পোঁছা ডেকে পাঠিয়েছিল সামান্য বিষয় নিয়ে বকাবকি করার জন্য। হানিফ ছুটির জন্য ঝুলোঝুলি করছিল আট দশ দিন থেকে, হঠাৎ কালকে তার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। পিষে থেঁতলে মরল কেষ্ট বাতাপি কিন্তু একজনও তার মরণ-চিৎকার শোনেনি, মেসিনের আওয়াজ নাকি চাপা দিতে পারে মরবার আগে মানুষের শেষ আর্তনাদকে! সোজাসুজি প্রমাণ কিছু নেই, কিন্তু সবাই জানে মনে মনে কেষ্ট দুর্ঘটনায় মরেনি, তাকে হত্যা করা হয়েছে। ম্যানেজারের, রুমাল-পোঁছার বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধে ছিল কেষ্ট, বুঝতে কি বাকি থাকে কারো কেন তাকে মরতে হল, কি করে সে মরল।

রঘু টের পায়, ক্ষোভে আপসোসে অনেকে ফুঁসছে মনে মনে গিরীনের মতো যে,

এমন একটা কিছু পাওয়া যাচ্ছে না যার জোরে পোঁছার টুঁটি টিপে ম্যানেজারকে চেপে ধরে বাধ্য করা যায় পুরো নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি মানতে।

সে পারে। একমাত্র সেই-শুধু পারে ওই অস্ত্রটি ওদের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু বড় যে এক খটকা রঘুর মনে। কারসাজি কি ফাঁস হবে ওপরওলাদের? আটঘাট বেঁধে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা কি করে রাখেনি ওরা ধরি মাছ না ছুঁই পানির কায়দায়? কোনো যোগসাজস কি প্রমাণ করতে পারবে কেউ? অস্ত্রটা শুধু পড়বে গিয়ে বেন্দার গর্দানে। আর কেউ যদি হত বেন্দা ছাড়া—

গাঁয়ের মানুষ, বন্ধু মানুষ। পয়সা ধার চাইলে কখনো না বলে না, ঘরে বোতল খুললে তাকে ডেকে দুপাত্র খাওয়ায়। রানী খুশী হয় তাকে দেখলে, এসো বোসো বলে ডেকে বসায় আদর করে, ঘরে রাঁধা এটা ওটা খাওয়ায়, হাসি তামাসা রঙ্গরসে মসগুল করে রাখে। মুক্তার জন্য বুকটা যে খাঁ খাঁ করে তার, তাও যেন ভুলিয়ে দেয় রানী। ওর চলনফিরন নড়নচড়ন দেখে রক্ত-তাজা হয়ে ওঠে তার, বুকের মধ্যে কেমন করে। আর কি বুঝদার মেয়েটা, কত আপন ভাবে তাকে। কদিন আগে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সে যে বলা নেই কওয়া নেই জড়িয়ে ধরেছিল তাকে, সে রাগ করেনি, শুধু একটা ধমক দিয়েছিল। বেন্দাকে কিছু বলেনি, নিজে তফাত হয়ে থাকেনি, আগেরই মতো হাসিখুশি আপন ভাব বজায় রেখেছে।

কিন্তু বেন্দা শুধু খুন করেনি কেষ্ট বাতাপিকে পোঁছার টাকা খেয়ে, সে দালাল এই ছিদামের মতো। ট্যাঁক তার ফাঁকা থাকে না কখনো, ঘরে বাইরে সে বোতল বোতল মাল টানে, মিহি শাড়ি কিনে দেয় রানীকে, সব পাপের যা সেরা পাপ তারই টাকাতে। রঘুর মাথার মধ্যে বিছার হুলের মতো বিঁধে থাকে এই চিন্তা।

ছুটির পর ক্রুদ্ধ উত্তেজিত মানুষগুলি কেষ্ট বাতাপির দেহটা দাবি করে। ওকে যারা মেরেছে আজ তাদের মারা না যাক, শোভাযাত্রা করে কেষ্টকে তারা শ্মশানে নিয়ে যাবে। এদের মধ্যে নিজেকে কেমন একা আর অসহায় মনে হয় রঘুর। দুর্বল অবসন্ন লাগে শরীরটা, মুখটা এমন শুকনো যে ঢোক গেলা যায় না। মাথার মধ্যে রোলার মেসিনে ঘর্ঘর আওয়াজ চলে, জ্যান্ত একটা মানুষের খুলি চুরমার হয়ে যায় প্রচণ্ড শব্দে, তারপর সব যেন স্তব্ধ হয়ে যায় মানুষের নরম মাংস ছেঁচে যাবার রক্তাক্ত শব্দহীনতায়।

বস্তিতে নিজের ঘরটিতে সে একা। অন্য ঘরের বাসিন্দারের হৈ চৈ বেড়েছে সন্ধ্যার সময়, রোজ যেমন বাড়ে। গলির ওপারে দুটো বাড়ির পরের বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে ছিদামের গলা-ফাটানো বেসুরো গান, এর মধ্যে বুড়ো নেশা জমিয়েছে। একটানা কোঁদল চলছে সামনের বাড়ির তিন-চারটি স্ত্রীলোকের, ওদের মধ্যে কুব্জার বয়স গড়ন মুক্তার মতো, গলাটা কিন্তু ফাটা বাঁশির মতো ভাঙা। সন্ধ্যার সময় বাড়ি যেতে বলে বেন্দা কি দরকারে কোথায় গেছে। যাবে জেনেও রঘু মনে মনে নাড়াচাড়া করে, না গেলে কেমন হয়। রানী তাকে টানছে, এখন থেকেই টানছে জোরালে টানে। এই যে তার একা একা মন খারাপ করে থাকা, রানী যেন ম্যাজিকে সব উড়িয়ে দেবে। তবু সে ভাবছে, না গেলে কেমন হয়। মনটা তার বিগড়ে গেছে

বেন্দার ওপর, বিতৃষ্ণায় বিষিয়ে উঠছে। সোজা সহজ একটা কথা বারবার মনে পড়ছে যে এ সব লোকের সাথে দহরম-মহরম রাখতে নেই, হোক গাঁয়ের মানুষ, হোক বন্ধু মানুষ, চোর ডাকাত খুনের চেয়ে এরা বদ, এদের সাথে থাকলেই বিপদ। রানী যদি বেন্দার বউ না হত—

মালতীর ন বছরের মেয়ে পুষ্প এসে দুয়ারে দাঁড়িয়ে বুড়ীর মতো বলে, 'কিগো, আজ রাঁধবে না?'

বলে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকে জবাবের। অসুখবিসুখ যদি হয়ে থাকে, যদি আলসেমি ধরে থাকে না রাঁধবার, যদি বলে, দুটি রেঁধে দিবি পুষ্প, সে ছুটে গিয়ে মাকে ডেকে আনবে। পুষ্পর আজ পেটটা ভাল করে ভরবে। উঠোনে পা ঝুলিয়ে ভিজে দাওয়ায় বসে বাতাসের সঙ্গে বকাবকি করছে পুষ্পর মা মালতী। থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে, ঠ্যাং ছিঁড়ো না, ঠ্যাং ছিঁড়ো না বলছি! ও বছর পুষ্পর বাপ লক্ষ্মণের পা আটকে গিয়েছিল কলে, পাটা কেটে ফেলতে হয়েছিল পাছার নীচে থেকে, শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি।

'আলসেমি লাগছে পুষ্প।'

'মাকে ডাকি?' বলেই পুষ্প ছুট দেয় রঘুর সায় শুনবার আগেই।

রানী আসে রঘুকে ডাকতে।

'যাওয়ার যে চাড় দেখি না, হাপিত্যেশ বসে আছে লোকটা ঢেলে চুলে?'

'চলো যাই।'

গলিতে নেমে ছিদামের গান আরও স্পষ্ট শোনা যায়, কথাগুলি জড়ানো। নেশা আরও চড়িয়ে চলেছে ছিদাম। নয় তো মিনিট কয়েক চেঁচানোর পর সে ঝিমিয়ে যায়, আশেপাশের লোক স্বস্তি পেয়ে বলে, যাক্, শ্যাল শকুনের কোঁদল থামল।

গলি থেকে আরও সরু গলি, তার মধ্যে ঘর বেন্দার, কাছেই। লণ্ঠনের আলোয় ফুর্তির সরঞ্জাম সাজিয়ে বসে আছে বেন্দা। ভাঁড়ের বদলে আজ কাঁচের গেলাস, কিনেই এনেছে বুঝি। খুরিতে ঝাল মাংস, কাগজে ডাল বাদাম। জলের বদলে চারটে সোডা।

'হুঁ হুঁ বাবা, আজ খাঁটি বিলিতি, দামী চিজ্।'

কফে গলাটা ধরা ছিল বেন্দার, রঘু ঘড়ঘড় আওয়াজ পায়। একদিনে যেন বেন্দার মুখটা আরও ছুঁচলো হয়ে চামড়া আরও বেশী কুঁচকিয়ে গেছে। মিহি শাড়িটা পরেছে রানী, তলায় বুঝি সালুর সেমিজ, রঙ বেরোচ্ছে। দানা দানা মিহি বুদবুদ উঠছে ভর্তি গেলাসের টলটলে রঙীন পানীয় থেকে।

'ঢেলে বসে আছি তোর জন্যে। মাইরি ঠেকাইনি ঠোঁটে।'

আজ তার বিশেষ খাতির। হবে না কেন, হওয়াই উচিত। গেলাস তুলে একচুমুকে শেষ করে ফেলে রঘু হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে ওঠে, হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সেদিন যেমন সাপটে ধরেছিল রানীকে।

'আরে আরে, রয়ে সয়ে খাও'। রানী বলে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে তার কাণ্ড দেখে।

বেন্দা বোতল থেকে তার গেলাসে মদ ঢেলে দেয়, খানিকটা সোডা দিয়ে খানিকটা জল মেশায়, সোডায় কুলোবে না।

নিজের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে, 'বাপ্‌সে! ভাগ্যে এলি, এলি তুই এলি আচমকা, অন্য কেউ নয়! প্রাণটা লাফিয়ে উঠেছিল কণ্ঠাতে, মানুষ দেখে, তারপর দেখি তুই! ধড়ে প্রাণ এল। আরও দুবার চুমুক দেয়, খানিকটা বেপরোয়াভাবে বলে, 'তবে, কি আর হত! একটু হাঙ্গামা, বাস। পোঁছাবাবু ঝানু লোক, ঠিক করে নিত সব।'

আরেক গেলাস ঢেলেছে সবে বেন্দা নিজের জন্য, লোক আসে পোঁছাবাবুর কাছ থেকে।

পোঁছাবাবু একবার ডেকেছে বেন্দাকে, এখুনি যেতে হবে, জরুরী দরকার। পোঁছাবাবু আছে ম্যানেজার সাহেবের কাছে, সেখানে যেতে হবে। ম্যানেজার সায়েব নিজের গাড়ি পাঠিয়েছে, বড় রাস্তার মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি।

'দুত্তোরি শালার নিকুচি করেছে।' বেন্দা বলে বেজার হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, 'তুই বোস রঘু, খা। চটপট আসছি কাজটা সেরে। গাড়ি করে যদি না দিয়ে যায় তো—'

বেন্দা বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে রানী। টুক করে এসে উবু হয়ে বসেই বেন্দার খালি গেলাসে বোতল থেকে মদ ঢেলে এক চুমুকে গিলে ফেলে জল বা সোডা না দিয়ে, ঝাঁঝে মুখ বাঁকিয়ে থাকে কতক্ষণ।

রঘুর চাউনি দেখে বলে, 'কি হল খাও?' হাত বাড়িয়ে গালটা সে টিপে দেয় রঘুর।

ভাল করে বসে আরেকটু ঢালে, এবার সোডা মিশিয়ে রসিয়ে রসিয়ে খায় একটু একটু করে। রঘুর গেলাস তুলে ধরে তার মুখে।

কাছে ঘেঁষে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'ওকে বোলো না খেয়েছি। ফিরে এসে নেশা চড়লে নিজেই ডাকবে, তখন একটুখানি খাব'খন দেখিয়ে। ফিরতে দেরি আছে একঘণ্টা তো কম করে।'

গায়ে লেগে কানে কথা কয় রানী, তার মদ পেঁয়াজের গন্ধ ভরা নিঃশ্বাসে ঝড় ওঠে রঘুর মাথার রঙীন ধোঁয়ায়। গেলাস রেখে সে ধরে রানীকে।

রানী বলে, 'বাসরে, ধৈর্য নেই একটুকু? গেলাসটা শেষ কর?'

খালি গেলাস মদ সোডার বোতল নিজেই তফাতে সরিয়ে জায়গা করে মুচকে হেসে নিজে থেকেই সে নেতিয়ে পড়ে রঘুর বুকে।

আরেকটু মদ ঢেলে খায়, রঘুকে দেয়। বলে, 'আর তোমার ভাবনাটা কি? কত বিলিতি খাবে তুমি এবার নিজের রোজগারে। তুমি চালাক চতুর আছ ওর চেয়ে, ও তো একটা গোঁয়ার। এবার কত কাজে লাগাবে তোমায় পোঁছাবাবু, কত টাকা কামাবে তুমি।'

মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে রঘুর এতক্ষণ পরে।

'যাই বাবা ওঘরে, কখন এসে পড়বে।' যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে রানী আবার বলে, 'একটা কথা বলি শোন। তোমার জন্যেও পোঁছাবাবু টাকা দিয়েছে ওকে, চেয়ে

নিও। ভাগ ছাড়বে কেন নিজের? এমনি হয়তো চেপে যাবে, কথায় কথায় বোলো, মোকে কিছু দিলে না পোঁছাবাবু? তাহলে দেবে।' চোখ ঠেরে রানী হাসে, 'বাতলে দিলাম, ভাগ দিতে হবে কিন্তু মোকে।'

কানে তালা লেগে গেছে রঘুর, সেটা যেন মানুষের নরম মাংস পিষে থেঁতলে যাবার যে শব্দ সেই—তার মতো। এই কাজ করতে হবে তাকে এবার, বেন্দা যা করে, ছিদাম যা করে। চুপ করে থাকলে তার চলবে না, পোঁছাবাবু তাকে কাছে টেনে কাজে লাগাবে বেন্দার মতো, ছিদামের মতো। এই তার পথ! আর একমুহূর্ত এখানে থাকলে তার যেন প্রাণটা যাবে এমনি ভাবে চট করে খিল খুলে রঘু পথে নেমে যায়। হনহন করে এগিয়ে যায় অন্ধকার গলি ধরে। নেশা তার কেটে গেছে। মদের নেশার চেয়ে অন্য নেশাই তার হয়েছিল জোরালো। ছিদামের ঘরের কাছাকাছি সে হোঁচট খায় একটা মানুষের দেহে। নেশার ঝোঁকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিদাম রাস্তায় পড়ে আছে, কেউ তাকে তোলেনি। হোঁচট খাওয়ার রাগে একটা লাথি তুলে পা নামিয়ে নেয় রঘু। জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করে। তার ধৈর্য ধরছিল না কতক্ষণে গিরীনের কাছে গিয়ে বলবে নিজের চোখে যা কিছু দেখেছে—রোলার মেসিনের ঘটনা। সবাই যে অস্ত্রটি খুঁজছে, নিজের কাছে অকারণে এক মুহূর্ত বেশী সেটি লুকিয়ে রাখবার কথা সে ভাবতেও পারছিল না।

প্রাণের গুদাম

গুদামটা আগে ছিল পুরানো একটা শেড, তাড়াতাড়ি টিন দিয়ে চারিদিক ঘিরে ফেলে গুদামে পরিণত করা হয়েছে। টিন দিয়ে ঘিরে দিয়েছে কণ্ট্রাক্টর, মেঝেটা পাকা করে দেবার দায়িত্বও ছিল কণ্টাক্টরের। কথা ছিল নতুন টিন দেবার, কিছু কিছু যে দেওয়া হয়েছে নতুন টিন তাতে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। মেঝেটা উঁচুও করা হয়েছে চারিদিকের জমি থেকে হাতখানেক, গুদামের বাইরের ভিটেটুকুতে সিমেণ্ট ঝক-ঝক করে। ভেতরে ইঁট পড়েছে কি রকম, সিমেণ্ট খরচ হয়েছে কত, লোক খেটেছে কতজন সে সব জানবার প্রয়োজন কারো হয়নি। জেনে লাভও নেই।

মাল বোঝাই হবার আগে গুদামের ভেতরটা ছিল আবছা অন্ধকার। মাল বোঝাই হবার পর তো মেঝে একেবারে আড়াল হয়ে গেছে। তাছাড়া, গুদাম একরকম একটা হলেই হল—মানুষ সহজে কোনো খাদ্য চুরি করে নিতে না পারে এইটুকু ব্যবস্থা থাকলেই যথেষ্ট। তাই বোধ হয় ফাঁকায় খাদ্যের বস্তাগুলি গাদা করে না রেখে শেডের নিচে ঘেরা জায়গায় ঢুকিয়ে সশস্ত্র প্রহরী দিয়ে রাখা হয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষের হাত থেকে খাদ্য বাঁচল, সেই সঙ্গে বর্ষা বাদলেও খুব বেশী ক্ষতি করতে পারবে না। আর কি চাই?

শিবরামের হাত থেকে কন্ট্রাক্টটা ফস্‌কে চলে গিয়েছিল মিঃ রায়ের হাতে, আত্মীয়তামূলক যোগাযোগের বাড়তি টানে, ঘুষে মিঃ রায় শিবরামকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি একথা নিশ্চয়। শিবরাম ধীরে ধীরে টের পাচ্ছিল, শুধু টাকার ঘুষের আর সেরকম দাম যেন নেই অনুগ্রহকারীদের কাছে, দেবতার কাছে নিছক চাল-কলার নৈবিদ্যের মতো, সেই সঙ্গে ফুল চন্দন ধূপ-ধুনা প্রভৃতিরও দরকার হয়েছে আজকাল। আত্মীয়তা কুটুম্বিতা থাকে তো ভালই, নয়তো আনাগোনা, টুকিটাকি উপহার, মিঠে কথা মোসাহেবী এসব উপচারে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেও বজায় রেখে চলতে হয়। মানুষের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ যে তাহার ভুল হয়নি পরে শিবরাম তার প্রমাণ পেয়েছে। মিঃ রায়ের হাত থেকে কন্ট্রাক্ট খসে চলে এসেছে তার কাছে। ঘুষ দিয়ে পেরে উঠবে কেন মিঃ রায় তার সঙ্গে, সেই সঙ্গে সে যদি মানুষকে বশ করতেও আরম্ভ করে অন্যভাবে তবে আর কথা কি?

শিবরাম বলেছিল, এমন ফাঁকি আমরাও দিতে শিখিনি, আমাদেরও বিবেক আছে। তিনভাগ টিন মর্চেধরা, ফেলে দিতে হত। ভেতরে, একটু সিমেন্টগোলা জল ছিটিয়ে

দিয়েছে। ইট তো দেয়নি. ভিটেতে—জঞ্জাল আর আবর্জনায় ফাঁপা করে রেখেছে। এমনিতেই লাখখানেক ইঁদুর বাস করত, এখন শেয়াল গর্ত খুঁড়ে বাচ্চা মানুষ করবে!

শশাঙ্ক বলে, উপায় কি, এক জায়গায় তো জমা করে রাখতে হবে; বাজারে ছাড়লেই তো পড়বে গিয়ে আপনাদের এজেন্টদের হাতে। এমনি তবু গরিবদের পাবার ভরসা আছে দু'দশ ছটাক, তখন আর চোখেও দেখতে পাবে না।

ওসব আটা ময়দা চাল আমরা খাই না মশায়।

আপনারা ভাল জিনিস খান, কিন্তু বেচেন তো এসব। খাবার জন্যে না কিনুন, চালান দেবেন, নয় চালানী দামে আশেপাশে বেচবেন।

এমনিভাবে কথা বলে শশাঙ্ক, জীর্ণ শীর্ণ আধবুড়ো এক কেরাণী। এই দুর্ভিক্ষের দিনে তেত্রিশ-হাজার মন খাদ্য দেখাশোনা করার দায়িত্ব পেয়ে বুকটা যেন তার ফেঁপে উঠেছে। দায়িত্ব তো ভারি, শুধু দেখা যে বড় বড় তালাগুলি ঠিকমত লাগানো আছে আর দারোয়ান ও পাহারাওয়ালা ক'জন ঠিকমত কাজ করছে। একটা তালা খুলবার ক্ষমতাও তার নেই। তবু তার কথা শুনে মনে হয়, চারিদিকের ওত-পাতা মুনাফাখোরদের কবল থেকে সেই বুঝি এই খাদ্যগুলি প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁচিয়ে সাধারণ দুঃখী লোকের জন্য জমিয়ে রেখেছে। তবে, শশাঙ্ক কখনো শত্রুতা করে না। হাতের তালুতে ভাঁজ করা কিছু নিয়ে ওর হাতে হাত মেলালে খালি হাত ফিরে আসে, খাতির, বাতিল করার বাহাদুরী ওর নেই। তার সরবরাহ আট হাজার মন আটা দেখে সেও মুখ বাঁকিয়ে ছিল, কিন্তু সময়মত জায়গামত ঠিক কথাটি বলতে কসুর করেনি,—আটা মোটা হলে একটু ভোঁতা গন্ধ ছাড়ে হুজুর, নতুন আটাতেও। লোকে এ আটা পেলে লুফে নেবে!

না বললেও অবশ্য ক্ষতি ছিল না কিছু। কেনা মাল যেমন হোক গুদামে তোলাই তখন কাজ। পরের কথা পরে।

শশাঙ্ক নিজেও জানে না বিশেষ দরকার. না থাকলেও নিবারণ বা মিঃ রায়ের পক্ষ টেনে সময়মতো ওসব সমর্থনের কথা কেন সে বলতে যায়। কতটুকুই বা ক্ষমতা তার উপকার করা বা ক্ষতি করার। সব কিছু ঘটে এক রকম তার নাগালের বাইরে, দু'চারটে নোট তার হাতে গুঁজে দেওয়া হয় সে যাতে কোন গোলমাল না করে, চুপ করে থাকে। মুখটা বন্ধ করে রাখার পুরস্কার ওটা। কেন তবে সে বাহাদুরী করতে যায়? টাকার কৃতজ্ঞতায়? অথবা ওপরওয়ালাকে জানিয়ে দিতে, আমিও আছি এর মধ্যে, কিন্তু ভয় পাবেন না, আমি আপনার অনুগত, আপনারই পক্ষে।

হয়তো ভালই হয়েছে ফলটা। তাকে যে বিশ্বাস করে ওপর থেকে, তার তো প্রমাণই পাওয়া গেল. কিন্তু উপার্জনটা বড় কমে গেছে এই বিশ্বাসের বোঝায়। এই কাজে এসে উপরি তেমন জুটছে না। আগেকার বাটোয়ারার জের টেনে কিম্বা নায়েবের সঙ্গে এখনো তার খাতির আছে এই জন্য ভিক্ষার মতো কিছু যদি কেউ দেয়।

বিশেষ কিন্তু আপশোষ হয়নি শশাঙ্কের। মনটা তার চিরদিনই একটু স্পর্শপ্রবণ ছিল, চারিদিকের আকাশছোঁয়া লোভ ও স্বার্থপরতার চাপে কঠিন হয়ে গেলেও এখনো দুঃখের ছোঁয়া লেগে তাকে একটু উন্মনা করে দেয়। অন্তরের এই বিলাসিতাটুকু সযত্নে বাঁচিয়ে সে পুষে রেখেছে, সময় ও সুযোগ মতো উপভোগ করে। চারিদিকে অনাহারে মৃত্যুর তান্ডবলীলা চোখে দেখে ও বর্ণনা শুনে ও পড়ে সে দুঃখিত হতে সাহস পায়নি, নিজেকে উদাসীন করে রেখে দিয়েছে। আনমনা হয়ে মানুষ পুত্রশোক ভুলে যেতে পারে, এতো পরের, গরিব দুখীর, না খেয়ে মরার জন্য সমবেদনা বোধ করা।

এখন আর অতটা মনকে বাঁচিয়ে চলবার দরকার হয় না শশাঙ্কের, খেতে না পেলে ক্রমে ক্রমে নানা বয়সের মানুষের কি অবস্থা হয়, কি অবস্থায় তারা মরে পড়ে থাকে পথের ধারে, এসব এখন সে চোখ মেলে চেয়ে দেখতে পারে, দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলতে পারে। তেত্রিশ হাজার মন খাদ্য তার মনে এই জোরের সঞ্চার করছে। এই বিরাট খাদ্য ভান্ডারের সংস্পর্শে থেকে সে অনুভব করে, আর ভাবনা নেই, না খেয়ে এবার আর কেউ মরবে না এ শহরে বা আশেপাশের গ্রামে। কে পেট ভরে খেল কার আধ-পেটা জুটল সে হিসাব চুলোয় যাক, না খেয়ে কেউ আর মরবে না এত খাদ্য থাকতে!

টিনের ফুটো আর ফাঁক দিয়ে খাদ্যের গন্ধ প্রতিদিন নাকে এসে লাগে শশাঙ্কের, খাদ্য বস্তুর এই অবিস্মরণীয় ঘনিষ্ঠতায় তার হৃদয় স্বস্তিতে ভরে যায়; হাজার হাজার মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবে এই খাদ্য, দুর্দিন পার করে দেবে।

স্টেশনে নেমে লাইন ধরে হেঁটে লেভেল-ক্রসিং-এর রাস্তা দিয়ে শহরে যাবার সময় 'গুদামটা ডাইনে পড়ে। এ রাস্তায় লোক চলাচল কম, গাড়ি ঘোড়াই চলে বেশী। দুপুর বেলা হঠাৎ জামাই সত্য এসে প্রণাম করায় শশাঙ্ক টের পায়, একটার গাড়ি থেকে নেমে সত্য বাড়িতে যায়নি, লেভেল-ক্রসিং হয়ে সোজা এখানে এসেছে। কারণটা শশাঙ্ক বুঝে উঠতে পারে না। এইখানে যে তার অফিস হয়েছে আজকাল তাও বা জামাই কি করে জানল সে ভেবে পায় না।

বাড়িতে যাওনি?

আজ্ঞে না। ভাবলাম যাবার পথে আপনাকে প্রণাম করে যাই। এই নাকি ফুড স্টোরেজ?

এসে দাঁড়িয়েই মুখ বাঁকিয়েছিল সত্য, মুখের ভঙ্গীটা তার আরও গভীর ভাবোদ্যোতক হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক নিজে থেকে কৈফিয়ত দিয়ে বলে, আটা ময়দা থাকলে ওরকম গন্ধ একটু হয়। চলো তোমাকে নিয়ে বাড়ি যাই।

আপিস?

আপিস আর কি, বসে থাকা। একদিন একটু তাড়াতাড়ি গেলে কিছু হবে না। ন'মাসে ছ'মাসেও এখানে কেউ খোঁজ নিতে আসে না।

একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে কুলির মাথা থেকে সত্যের মালপত্র গাড়িতে তোলা

হয়। প্রথম মেয়ের প্রথম জামাই, বিয়েও হয়েছে মাত্র বছর দুই, তাকে এভাবে নিজে হাজির থেকে আদর অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ পেয়ে শশাঙ্ক খুব খুশি হয়। আগের কাজে থাকলে এভাবে হঠাৎ যখন খুশি জামাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যাওয়া সম্ভব হত না। তবে, আগের কাজে থাকলে জামাই বাড়ি যাবার পথে তাকে প্রণাম করার জন্য অতটা ঘুরে যেত কিনা সেটা ভাববার কথা বটে।

আপনার ও আটা ময়দা কিন্তু খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

গরিব দুঃখী খেতে পায় না, তাদের আবার ভাল আর খারাপ।

দু'একমাস পরে আর মানুষের গ্রহণযোগ্য থাকবে না। ভেতরে গিয়ে কেউ কখনো দ্যাখে না?

কই, না? দরকার লাগলে বার করা হবে, কে আবার দেখতে যায় গেট খুলে ভেতরে গিয়ে? তুমি তো ভাবিয়ে দিলে আমায়।

ভাবনা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখবার কায়দা আয়ত্ত করতে হয়েছে শশাঙ্ককে অনেক দিনের চেষ্টায়, নতুন জামাইকে সঙ্গে রেখে অত ভাবনা ভাবলে চলবে কেন। কিন্তু রাস্তার দু'পাশের শত শত চিহ্ন যেন ষড়যন্ত্র করেছে, কথাটা তাকে ভুলতে দেবে না। গাছের ছায়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে গাঁ থেকে পলাতক কঙ্কালগুলি, সূর্যাস্তের সঙ্গে ওদের কতগুলির জীবন অস্ত যাবে কে জানে। ছায়া না খুঁজে দুপুরের এই খর-রোদে হেঁটেও বেড়াচ্ছে অনেক কঙ্কাল ধুলায় ধুসর হয়ে, উৎসুক ভয়ার্ত চোখে ঘোড়ার গাড়ির দিকে চেয়ে ওরা কি কামনা করছে শশাঙ্ক জানে। জামায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বার বার সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তার ভীরু করুণ উদাস চাউনি দেখে সত্য অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

বাড়ি পৌঁছেই শশাঙ্কের ছুটি, জামাইকে লুপে নেয় মেয়েরা। নিচে পিছন দিকের ছোট ঘরখানায় বসে শশাঙ্ক আকাশ পাতাল ভাবে। গন্ধ? গুদামের ভেতর থেকে গন্ধ কিছু বেরোচ্ছে বৈকি, সে তো রোজই টের পাওয়া যায়। সে কি ভিতরের সমস্ত খাদ্য পচবার গন্ধ? অথবা অত খাদ্য একসঙ্গে জমা করা থাকলে এখানে ওখানে একটু আধটু পচন ধরে ওরকম গন্ধ ছাড়ে, যার কোন প্রতিকার নেই। মানুষের খাদ্য নিয়ে যত সাজানো গুছানো কায়দা করা মিথ্যা কথা শশাঙ্ক শুনেছে আর নিজেও বলেছে। আজ সেই কথাগুলিই তার মনের মধ্যে ভাঁজ খুলে খুলে নতুন যুক্তি আর সত্যের রূপ নিয়ে তাকে নিশ্চিন্ত করতে চায়। মেঝেতে যে যে বস্তা লেগে থাকে ড্যাম্প লেগে সে বস্তাগুলি খারাপ হয়ে গন্ধ বেরোয়—কিন্তু উপরের বস্তাগুলির কিছুই হয় না। একটা বস্তা কোনো কারণে আগে থেকেই খারাপ হয়ে থাকলে সেটা ক্রমে ক্রমে চারপাশের অন্য বস্তাগুলি নষ্ট করতে থাকে, তাতেও পচা গন্ধ বার হয়, কিন্তু তাই বলে একটু তফাতের বস্তা কেন নষ্ট হবে। সত্য এসব বিষয়ে কি জানে যে বাইরে থেকে শুধু গন্ধ শুঁকেই সে বলে দিতে পারবে ভেতরের সব জিনিস খারাপ হয়ে যাচ্ছে! ভাঁড়ার ঘরে একটা ইঁদুর পচলেও তো মনে হয় সমস্ত জিনিস বুঝি পচে গলে ভাপ্‌সে উঠেছে। সেই ভুলই হয়তো করেছে সত্য?

মন শান্ত হয় না। তেত্রিশ হাজার মন খাদ্য যদি সত্য সত্যই নষ্ট হতে বসে থাকে, প্রায় অযোগ্য হয়ে গিয়ে থাকে মানুষের খাবার? তার নিজের কোন ক্ষতি নেই, শশাঙ্ক জানে। গুদামের জিনিস কি অবস্থায় আছে দেখবার দায়িত্ব তার নয়। সে শুধু দেখবে তালা ঠিকমত লাগানো আছে কি না, পারাহা ঠিকমত চলছে কি না আর লিখিত হুকুম এলে ঠিক সেই পরিমাণ জিনিস ডেলিভারি হল কি না। তার বেশী আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা তার নয়। দোষ তাকে কেউ দিতে পারবে না। তবু এই দুর্দিনে তেত্রিশ হাজার মন খাদ্য নষ্ট হওয়ার কথা ভাবলেও নিজেকে কেমন তার দুর্বল মনে হয়। পুণ্যের বোঝা ফাঁকা দেখলে পাপীর যেমন হয়, তেমনি যেন অসহায় ঠেকে তার নিজেকে।

দুটি ভিক্ষে দাও গো মা!

খিড়কির এই দরজাতে ভিখারিণী এসে জুটেছে, জঙ্গল বাঁশ ঝাড়ের বাধা না মেনে। এঁটো-কাটা ফেলবার আস্তাকুড় বাড়ির পিছনে থাকে বলে বোধ হয় জঞ্জালও ঘাঁটা চলে, ভিক্ষাও চাওয়া চলে। বাড়ির পিছনে ছিটাল দিয়ে ভিখারীও চলাফেরা করে কম। জানালা দিয়ে শশাঙ্ক চেয়ে থাকে ভিখারিণীর দিকে। জট-বাঁধা রুক্ষ চুলের নীচে শেওলা ধরা মেঝের মতো সেঁত সেঁতে মুখ, কোলে একটি শিশু। বাচ্চাটিকে দেখে কেমন যেন একটা ক্লেদাক্ত ভয়ের স্পর্শে সর্বাঙ্গে তার শিহরণ বয়ে যায়, গা ছম ছম করতে থাকে। এতটুকু মানুষের বাচ্চা মাথা উঁচু করে অস্ফুট আওয়াজে কাঁদছে? একটু অপুষ্ট ভ্রূণ যেন অভিনয় করছে জীবন্ত শিশুর। দড়ির মতো পাকানো রুগ্ন শিশু দেখেছে শশাঙ্ক, কি করে বেঁচে আছে ভেবে দেহ শির শির করে উঠেছে, কিন্তু এ বাচ্চাটার দিকে তাকালে যেন ধাঁধা লেগে যায় চোখে।

ভিখারিণী ক্ষীণ স্বরে ডেকে চলে, দুটি চাল কেউ দিয়ে যায় না। জামাইকে নিয়ে বাড়ির সকলে ব্যতিব্যস্ত।

এই শোন্। এদিকে আয়।

ভিখারিণী উবু হয়ে বসেছিল, জানালায় একটু তাকিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট পিষে ফেলে মুখের একটা ভঙ্গি করে। ভেতরটা রি রি করে ওঠে শশাঙ্কের। নির্জন দুপুরে আধবুড়ো ভদ্রলোকও জানালা দিয়ে হাতছানি দিয়ে কেন ডাকে এত বেশী করে ভিখারিণী তা জেনে গেছে, লোল চামড়া বুড়ীর চেয়েও ভাঙা শিথিল ও রোগজীর্ণ ওই বয়সকালের দেহটি নিয়ে!

কচুগাছ সরিয়ে ভিখারিণী জানালার সামনে আসে।

ক'মাসের ছেলে?

বছর পুরবে বাবু।

বছর পুরবে! খানিকক্ষণ শশাঙ্ক কথা কইতে পারে না। কাছে থেকে বাচ্চাটাকে দেখে ভেতরটা তার পাক দিয়ে উঠতে থাকে।

এসব বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে ভিখারিণীর পরিচয় আছে, সে বলতে থাকে,

হওয়ার পর বাপ মোলো। আমি না খেতে পেলে দুধ পাবে কোথা? খেতে না পেয়ে ওমনি হয়ে গেছে।

না খেয়ে হয়েছে? না, ভিক্ষে বেশি পাবি বলে নিজে করেছিস?

কার জন্যে ভিক্ষে করা বাবু? ওরি জন্যে তো। নইলে—ভিখারিণী নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকায়, মরলে বাঁচি, তা মরবে না। আমার পোড়া কপাল তাই বেঁচে রয়েছে, মেরে ফেলতে পারি না তাই!

এক বছর আগেও সে গেরস্ত ঘরের বউ ছিল, স্বামী নিয়ে ঘর করত। আজ তার মুখে হৃদয়ের ছায়াপাত হয় না, শুধু জ্বালার প্রতিচ্ছবি ছাড়া। শশাঙ্ক নিজে উঠে গিয়ে কিছু চাল আর বাটিতে দুধ নিয়ে আসে। দুধের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করতে হয়।

জামায়ের এদিকে দুধ কুলোবে না, এক বাটি দুধ তুমি দাতব্য করছ!

ওবেলা এক সের দুধ বেশি এনে দেব।

খিড়কির দরজা খুলে দুধের বাটি নামিয়ে রেখে শশাঙ্ক ভিখারিণীকে বলে, আমার সামনে বসে খাওয়া ছেলেকে পেট ভরে।

আমি খেয়ে ফেলব ভাবছ বাবু? গাছের পাতা ছিঁড়ে চট করে একটা চামচ বানিয়ে সে বাচ্চাটিকে দুধ খাওয়াতে শুরু করে, এই জন্য বেঁচে আছে বাবু, তোমাদের দয়ায়। কেন দয়া কর বাবু, কেন দয়া কর? মরলে যে আমি রেহাই পাই।

গুদামের পচা খাদ্যের গন্ধ নাকে লাগায় শশাঙ্ক আশ্চর্য হয়ে এদিক ওদিক তাকায়। এখানেও গন্ধ আসছে কোথা থেকে? ভিখারিণী উঠে দাড়াতে গন্ধটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পচা মানুষের গন্ধও কি পচা খাদ্যের মতো? আশ্চর্য কি, খাদ্যই তো প্রাণ মানুষের, খাদ্য থেকেই তো দেহ! ভিখারিণী চলে যাবার পর তেত্রিশ হাজার মন খাদ্যের রক্ষক বলে নিজের মধ্যে যে অর্থহীন স্বস্তিটা সে গড়ে তুলেছিল তার অস্তিত্বটুকুও যেন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় তারই বোকামিতে তারই একটু অবহেলায়, ওই খাদ্যে যত লোকের জীবন রক্ষা হতে পারত ততগুলি লোক মরে পচে উঠতে আরম্ভ করেছে, দায়িত্ব তার। পচা গন্ধে মস্‌গুল হয়ে উঠেছে চারিদিক, সে কি বলে চুপ চাপ বসে রয়েছে শুধু গুদাম পাহারা দিয়ে?

শশাঙ্ককে জামাকাপড় পরতে দেখে তার স্ত্রী বলে, আবার বেরুচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ, সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করব।

জামাই বলছিল তোমার সঙ্গে কি দরকারী কথা আছে।

ডাকবো নাকি, না আমিই যাবো? শশাঙ্ক ভাবে, জামাইরা সত্যি লাট সাহেব!

তুমিই যাও না, জিজ্ঞেস করো কি বলবে।

খেয়ে উঠে ওপরের ঘরে পান চিবুতে চিবুতে সত্য সিগারেট টানছিল, শশাঙ্ককে দেখে সিগারেটটা একটু আড়াল করে অনেক ভূমিকা ও ভনিতার পর সে তার দরকারী কথায় আসে।

জানেন তো চাকরী করি না, আমি এখন সুখনলালের এজেন্ট। ব্যবসাই করছি

বলা চলে একরকম। কমিশন যা পাই কোনো কালে ব্যবসা করে অত পার্সেণ্ট লাভ কেউ করেনি। এখন কথা হল কি, আপনার গুদামের আটা ময়দা তো পচে যাচ্ছে।

কথায় যোগাযোগটা বুঝে উঠতে পারে না কিন্তু বুকটা শশাঙ্কের ধড়াস্ করে ওঠে।

গুদামটা আমার নয় বাবা। সে বলে কোনমতে।

সত্য হাসে, ও একই কথা। সে যাই হোক, এখনো গুদামের মাল বাজারে বেচা-কেনা চলবে। আমার হাতে কিছু রদ্দি মাল আছে, সেটা বদলে দিতে হবে আপনাকে। তেল যা লাগে খরচ করব, তাতে আটকাবে না। আপনারও কোন ভয় নেই, চ্যালেঞ্জ করলে বলবেন গুণে দ্যাখো মেপে দ্যাখো। যে পরিমাণ নেব ঠিক সেই পরিমাণ রিপ্লেস করব।

পাংশু বিবর্ণ মুখে ঢোঁক গিলে শশাঙ্ক বলে, কিন্তু আমার কাছে তো চাবি নেই।

নিরুপায় হয়ে মিথ্যা কথাই বলে শশাঙ্ক। গুদামের আপিসে সত্যের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণটা এতক্ষণে তার কাছে পরিস্কার হয়।

সত্য আশ্চর্য হয়ে বলে, গুদামের চাবি আপনার কাছে নেই? দরকার হলে গুদাম খোলে কে?

আমিই খুলি, সাহেব তখন আমাকে চাবি দেয়। অন্য সময় নিজের কাছেই রাখে।

তাইতো! সত্য বলে চিন্তিত হয়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে, মিঃ নন্দীর কাছে হেঁটে যাওয়ার ধৈর্য শশাঙ্কের থাকে না, সে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বসে। তার চিরকুট পেয়ে খাস কামরায় উঠে গিয়ে সেখানে মিঃ নন্দী তাকে ডেকে পাঠায়।

আটা ময়দা পচে যাচ্ছে? এই জন্য আপনি এমন ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন?

অতগুলি ফুড হুজুর। কত লোক খেয়ে বাঁচত।

ঢেঁড়া দিয়ে বিতরণ করতে চান না কি?

আজ্ঞে না।

তবে? মিঃ নন্দীর মুখে হাসি ফোটে, আপনি তো বড় নার্ভাস লোক মশায়। নষ্ট হয়তো হবে, আমাদের কি করার আছে! স্টোর করার কথা, আমরা স্টোর করেছি। তার বেশি কিছু করার ক্ষমতাই বা কই আমাদের? ইনস্ট্রাকসন না পেলে কিছুই করা চলে না। তা ছাড়া—মিঃ নন্দীর হাসিটা এবার করুণাদ্যোতক মনে হয়, নানা কোয়ালিটির জিনিস পোরা হয়েছে, সব মাল খারাপ হয়ে দাঁড়ালে ধরা যাবে না। ভাববেন না, সব ঠিক আছে।

বাড়ি ফিরে শশাঙ্ক শোনে, জামাই নাকি সে বেরিয়ে যাবার আধঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে গেছে, এখনো ফেরেনি। সন্ধ্যার সময় মিঃ নন্দীর বাংলোতে শশাঙ্কের ডাক আসে। সেখানে সে দেখতে পায় সত্যকে।

মিঃ নন্দী বলে, আপনার কথাটা ভাবছিলাম শশাঙ্কবাবু। আটা ময়দা নষ্টই

যখন হয়ে যাচ্ছে, কিছন্ বাজারে গেলেও লোকে খেতে পাবে। ইনি দন্'হাজার বস্তা খারাপ মাল বদলে নিতে চান। স্টোর থেকে ওঁকে পছন্দসই দন্'হাজার বস্তা দিয়ে. ওঁর বস্তা সেখানে রেখে দেবেন।

কেউ জিগ্যেস করলে—

জিগ্যেস করলে বলবেন, কিছন্ নতুন মাল এল, কিছন্ পন্রানো মাল চালান গেল। রিপোর্ট ঠিক করে নেব'খন।

শালাশালীরা বলামাত্র জামাই বাড়িতে সে রাত্রে মস্ত ভোজ দেয়, হৈ চৈ চলে অনেক রাত পর্যন্ত। শরীর খারাপের অজন্হাতে শশাঙ্ক সকাল সকাল শন্য়ে পড়ে। ঘন্ম কিন্তু তার আসে না সহজে, বিছানায় শন্য়ে শন্য়ে ছটফট করে।

সকালে সত্য সত্যই শরীরটা খারাপ লাগে। খেয়ে-দেয়ে আপিসে বেরোবে, সদরের সামনে দেখা হয় গতকালের সেই ভিখারিণীর সঙ্গে।

এগিয়ে এসে নিস্পন্দ বাচ্চাটিকে সে শশাঙ্কের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখে।

তোমার দন্ধ খেয়ে মরেছে বাবন্।

ছোঁড়া

সেকেলে বুড়ো ছেঁড়া মাদুরে বসে ঝিমোয়। একেলে বুড়ো তার সামনে একগাদা বই খাতা নিয়ে বসে থাকে গোমড়া মুখে। ছেঁড়া প্যাকিং কাগজের মলাট দেওয়া ইংরেজী বাংলা অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল।

ইংরেজী পড়বি না ইংরেজী? ভাল করে ইংরেজী পড়। বেশী করে পড়। ইংরেজী ভাল জানলে বাস্।

ছেঁড়া ছেঁড়া ঝিমানো কথা, তবু প্রত্যাশা ও উৎসাহ বেশ আছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে পড়ন্ত রোদ কালচে খড়ের জীর্ণ চালায় রংটুকু হারিয়ে সিক্ততায় চিকচিকিয়ে কাঁদছে। পচার চোখ চকচক করে উঠেছিল ভেজা গাছপালার দিকে চেয়ে, ওই আড়ালের ওপারে খেলার মাঠের কাদা, নদীর ধারের পিছল তীর। শ্রান্তিতে মিইয়ে যায়, মুখের ভাব, বসার ভঙ্গি। সারাদিন স্কুল করে এসে আবার পড়া তৈরী করা, দিনের আলোয় যতক্ষণ পড়া যায়। ভাঙা লণ্ঠন জ্বলবে না সন্ধ্যার পর। কেরোসিন নেই। কিন্তু খেলাধুলাও যে চলবে না সন্ধ্যার পর, তা কি ভাবে দাদু, মামীমা জানে।

ইংরেজী পড়, ইংরেজী শেখ। ইংরেজী একটু জানলে, বাস, আর ভাবনা নেই। রাখাল দুটো ইংরেজী কথা কইতে শিখেছিল ফাস্টোবুক পড়ে, কলকাতায় দালান রেখে গেছে। বোকাসোকা ছিল, তবু। ভাঙা ভাঙা ঝিমানো কথা, তবু প্রত্যাশা ও ঈর্ষার সুর মেলে। বাঁধা বলদটা হাড় পাঁজরায় ধুকছে উঠোনের কোণে কাদা গোবরে দাঁড়িয়ে, নিজেকে গুতুচ্ছে থেকে থেকে পোকা মাছির জ্বালায়। আগামী চাষের আয়োজনে লাঙল টানার জন্য ওকে পুষতে হবে দিন মাস ধরে, এবারের কাজ ওর সারা। ও বছরের কুমড়ো মাচাটি ফাঁকা, লিকলিকে লাউ চারাটি সবে উঠছে মাচাতে। অনেক কুমড়ো দিয়ে গেছে গাছটা। ফুল আর ডগাও খাইয়েছে অনেক। কোথায় যে গেল তার চিহ্ন!

পড়তে বলছি না? চুপচাপ বসে রয়েছিস?

হাতড়ে কঞ্চিটা খুঁজে নিয়ে সেকেলে বুড়ো সপাৎ করে বসিয়ে দেয় পচার পিঠে. মুখবিহীন গোল যে ফোড়াটা বড় হয়ে উঠছে সেটাকে প্রায় ছুঁয়ে।

ফুলু সুখী হয় তার চিৎকার শুনে। বুড়োটা মেরেছে পচাকে, বুড়ো চটেছে পচার ওপর। এই তার অস্থায়ী একটু অবসর ছোঁড়াটাকে দুটো গালমন্দ শাপমন্যি দেবার। বুড়ো চটেছে, কিছু বলবে না। নাতিকে গাল দিতে শুনেও।

চেঁচাল কেনে ষাড়ের মতো? মরণ হয় না! ঘরের পক্ষি তাড়াবে চেঁচিয়ে। মরণ নেই! টেনে নিতে পারে না বাপে মায়ে যেথা গেছে?

ননদ পো উড়ে এসে জুড়ে বসেছে সংসারে বাপ মাকে খেয়ে। খাওয়া পড়া দিয়ে রেহাই নেই, ইস্কুলে পড়ছেন। বই খাতা কাগজ পেন্সিল, মাস গেলে মাইনে, কত কি। বুড়ো দেয় বটে খরচা, কিন্তু কেন পয়সা ঢালবে বুড়ো ওর পিছনে? ওকে দিতে না হলে তো সংসারে দিত।

দিত কি? গায়ের জোরেই মনকে বলাতে হয়, দিত, দিত, নিশ্চয় দিত। মনকে একথা না বললে জোর থাকে না জ্বালার আশা থাকে না মরণ কামনা ফলবে।

মা, ওমা মা! খিদে পায় যে, ওমা, মাগো? . .

নাকি সুরে কেঁদেই চলেছে শুনু পিছন থেকে ছেঁড়া পচা কাপড় চেপে ধরে। ওকেও মরতে বলার ঝোঁকে দমক মেরে ঘুরতে যেতেই পাছার কাছে ফেঁসে গেল জ্যালজেলে কাপড়।

খা! খা! খা! মোকে খা! পাঁজর-ভাঙা মরণ কান্না ঠেলে ওঠে বুকের মধ্যে। বুড়ো বেঁচে থাক, পচা সুখে থাক, তার কেন মরণ হয় না ভগবান। দিনে রাতে সাপের ছোবল আর সয় না।

হেথায় কেন গোল কর শুনুর মা। পচা পড়ছে। ইংরেজী পড় পচা। চেঁচিয়ে পড়।

উচু বাঁধের উপর দিয়ে ট্রেন চলে যায় ঝমঝমিয়ে। গলগল করে উগলানো ধোঁয়া পিছনে পড়ে থাকছে গুমোটে মড়ার মতো এলিয়ে। দখিণ কোণে দূরের ওই লোহার চোংগা থেকে ধোঁয়া সোজা উপরে উঠছে আকাশের নাগাল পেতে। ওর কাছে স্টেশানটাতে থেমে এসে বেরিয়ে গেল ট্রেনটা।

কোঠা বাড়ির মনাবাবুর বৌটা কলেরায় মারা গেছে পরশু, ট্রেনে কি মনাবাবু আজ এলো? এতদিন আসেনি, বৌ মরেছে খবর শুনে আসবে নিশ্চয়। ছেলেটা হল দেড় বছরের, গা ভরা ঘায়ে কি কষ্ট ওইটুকু কচি ছেলের।

শুনুর বাপও যদি আসে এই গাড়িতে! বৌটা তার মরেনি, জলজ্যান্ত বেঁচে আছে মরে যাওয়া উচিৎ হলেও, তবু যদি এখনি আসে, হঠাৎ কোন মনের খেয়ালে আসে চার ছ'মাস আসেনি বলে। যদি নিয়ে আসে রেশনের একজোড়া নতুন শাড়ি, রঙীন একটি সায়া, টুকটুকে লাল কি বেগুনি রঙের। আর সস্তা সাদা গোছের ঘি, পাঁপর, চানাচুর লেবেঞ্চুস—

ট্রাক চলে গেল মাটি কাঁপিয়ে। একটা, দুটো তিনটে। ছিঁড়ে দিয়ে গেল সব স্বপ্ন, মাড়িয়ে দিয়ে গেল সাধ। বুক দুরু দুরু করে ফুলুর। এখানে উনুনের সামনে বসে সে দেখতে পায় বড় প্রকাণ্ড জোড়া চাকা রাস্তায় খাদগুলির জল কাদা ছিটিয়ে দিচ্ছে। কানাই আর নিধুর দুটো ঘর ডিঙিয়ে জল কাদা যেন ছিটকে এসে তার গায়ে লাগবে এখানে।

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে পচা বুড়োকে শুনিয়ে। একটা পাখি শিস দিল এই ঘর ছোঁয়া আমগাছটার ডালে। আমের সোয়াদ এবারও জিভে লাগল না, এবারও

তিনটে গাছই বুড়ো জমা দিয়েছিল রামশরনকে। একটা গাছ রাখ নিজেদের জন্যে, ওই বর্ণচোরার গাছটা, সবুজ-কালো আমগুলিতে যেন মধু পোরা, কি রঙ আর কি মিষ্টি গন্ধ। তা নয়, সবগুলি গাছ বুড়ো জমা দিয়েছিল। নাতিকে পড়াবে, ইস্কুলে পড়াবে। মরণ হয় না।

কাঠ কুড়িয়ে ফিরল বুঝি পিসি, ভিজে কাঠ পাতা আজ আর জ্বলছে না। এখনো বেলা আছে, আর খানিকক্ষণ খুঁজে-পেতে আর কটা বেশি শুকনো ডাল, ঝোপটোপ আনা পোষাল না পিসির, দুবেলা খাবার মুখটা আছে।

পদী আবার চেঁচাচ্ছে। অবেলায় কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে জ্বরটা বাড়ছে আবার। আর কাঁথা নেই চাপা দেবার। যেমন বুদ্ধি বুড়োর, এত বড় মেয়েকে পার না করে ঘরে রেখে পুষছে। শুনুর বাপেরও যেন কোনো চাড় নেই বোনটাকে পার করবার। পই পই করে সে বলেছে শুনুর বাপকে, ফের এ বর্ষায় জ্বরে পড়লে যা ছিরি হবে মেয়ের, পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে কেউ আর ছোঁবে না তখন। সেরে উঠে ফের একটু মানুষের মতো দেখাতে আরও ছ'মাস এক বছর। তা কে শোনে কার কথা! মরে যদি যায় তো অবিশ্যি আর—সেই আশায় আছে নাকি বুড়ো আর শুনুর বাপ? যাকগে বাবা থাক্, তার অত ভাবনায় দরকার কি। নিজের জ্বালাই বলে তার সয় না। দিন রাত শত বিছায় কামড়ায় আর ছোবল দেয় সাপে।

মা, ওমা, মা, খিদে পায় যে, মা, ওমা, মাগো!. . . .

ওকে ভোলানো গেল না এক কোয়া কাঁঠাল দিয়ে দু'দণ্ডের বেশি। ভুতুরি তোলা আছে সকালে সিদ্ধ করা হবে বলে, তাই হাতড়ে কোয়াটা মিলেছিল। আর নেই, আর একটি কোয়াও নেই।

এই যে ভাত নামবে যাদু, খাবে। একটু সবুর, সোনা আমার। হল বলে, এই হল বলে।

শুনু কেঁদে চলে। কথায় কি খিদে ভোলে কেউ।

আমায় খাবি? মান খাবি? খা।

কোলে নিয়ে শুকনো মাই গুঁজে দিতে যায় শুনুর মুখে, সে দাঁতে দাঁত কামড়ে থাকে। তিন বছর মাই ছেড়েছে দুধ না পেয়ে চার বছরের মানুষ, সে কি আর এ ফাঁকিতে ভোলে।

তখন উনানে চাঁপানো হাঁড়ি থেকে এক হাতা আধসিদ্ধ জাউ আর পাথরের বাটি থেকে একটু কচু শাক তাকে দেয় ফুলু। ঠাণ্ডা শাকটুকু সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলে শুনু। খাওয়ার মতো জুড়োলেই খায় জাউটা। তারপর আরও চেয়ে কাঁদে, ঢিমে সুরে নেতিয়ে পড়ে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে সেইখানে।

সময় কি পার হয়ে গেছে, শুনুর বাপের আসবার, এসেই যদি থাকে ওই গাড়িতে? এমনি যদি এসে থাকে, মিছিমিছি? এক কোশ পথ, জলে কাদায় চলার মতো নেই। হেঁটে আসতে সময় লাগবে বৈকি।

আসে যদি তো তাকে খাওয়াবে কি? পরশু বাড়ন্ত হবে চাল, কিনে না আনলে।

এতগুলি মুখ তো বাড়িতে। বিকালে জাউ বরাদ্দ, নয় তো পচাটে গন্ধের নষ্ট যে চাল বুড়ো সরকারী দোকান থেকে এনেছে সস্তা দরে, ওই চালের ভাত। ভাগ্যে শুনুর বাপের মনি অর্ডার এসে গিয়েছে ডাকঘর বন্ধ হবার আগে, চাল কেনা যাবে। কটা আর টাকা, কতটুকুই বা চাল কেনা যাবে, যা দর বেড়েছে চালের। চাল বাড়ন্ত হবেই এ মাসে, ও আর ঠেকানো যাবে না, পরশুই হবে না চাল বাড়ন্ত এইটুকু শুধু ভরসা টাকাটা এসে পড়ায়। বুড়ো এগারো টাকা পেন্সন পেয়েছে, আগের জমানো দু'দশ টাকা আছেও নিশ্চয় হাতে, কিন্তু বুড়োর ভরসা করা বৃথা, ও নিজে খাবে, নাতিকে খাওয়াবে, নাতিকে ইংরেজী পড়াবে ইস্কুলে।

শীতকালের জমাট নারকেল তেলের মতো সাদা ঘি আনবে, পাঁপর আনবে লেবেঞ্চুস আনবে শুনুর বাপ, শাড়ি আনবে, সায়া আনবে তার জন্য, এই জাউ আর কচু শাক সে খাওয়াবে নাকি তাকে? কুলোবে না—এতে তাদেরি আধপেটা হবে না পদীকে বাদ দিয়েও, ফুলুর বাপ এলে এতে কুলোবে না। চাট্টি চাল নিয়ে সে আবার ভাত রাঁধবে। দুটি যে ডাল আছে তোলা, তাও দিয়ে দেবে হাঁড়িতে। খিচুড়ি হবে না, ডালে চালে সেদ্ধ একটা জিনিস হবে যা হোক কিছু। ভিন্ন করে ডাল রাঁধতে হলে—

নিবু নিবু উনুনটার দিকে চেয়ে থাকে ফুলু। কাঠির মতো সরু কটা শুকনো ডাল আর বাকী আছে, পিসি যা কুড়িয়ে এনেছে সব ভিজে চুপসে, কালও জ্বলবে না। ডাল ভাতে একটা চড়াও সে রাঁধবে তবে কি দিয়ে শুনুর বাপ যদি এসেই পড়ে এখন?

আসবেনা এখন আসতেই পারে না। ডাক ধর্মঘট শুরু হয়েছে, এখন কি আর সে ছুটি পাবে একটা দিনের, এমনি অবস্থায় দু'মাসের মধ্যে পেল না? ধর্মঘট শুরু না হলে বরং কথা ছিল। এখন কাজ না করলে তো তাড়িয়েই দেবে একেবারে। বুড়ো তাই বলছিল।

কিন্তু যদি ধর্মঘট করে থাকে ফুলুর বাপ?

নিশুতি রাতের ভিজে অন্ধকারকে ছিঁড়ে দেয় বিদ্বেষী কুকুরগুলির ভীরু আর্তনাদ। শেয়ালের পালা ডাকের জবাব নয় এটা, শেয়াল ডাকেনি কিছুক্ষণের মধ্যে। কি হল, কে এল পাড়ায়, কে জানে। ফুলুর চোখে ঘুম নেই। মাঝরাত্রি পর্যন্ত পেট ভরে অনেক কিছু খাওয়ার কল্পনার অলীক কষ্ট আর উত্তেজনা তাকে জাগিয়ে রাখে, চোখ বুজে আর চোখ মেলে সে দেখবার চেষ্টা করে ঘরেব আঁধার বেশি কম হল কি না। তাতেও আনমনা হতে পারে না।

মনাবাবু আসেনি বিকালের গাড়িতে। কানাই ছাড়া কেউ আসেনি। কানাই যে এসেছে তাও ফুলু টের পেয়েছে মাত্র খানিক আগে পাশের বাড়ি থেকে হঠাৎ কানাই-এর রামপ্রসাদী গান শুনে। এমন সুন্দর গাইতে পারে কানাই রামপ্রসাদী গান, মদ খেয়ে অনেক রাতে সে গান ধরলে এমন আকুল হয়ে ওঠে ফুলুর প্রাণটা। মন তুমি কৃষি কাজ জান না গানটা গাইতে গাইতে হঠাৎ কেন যে থেমে গেল কানাই।

কার সাথে যেন কথা বলছে। শুনুর বাপের গলা!

বাবা শুনছেন? ওঠেন। ছেলে এয়েছে আপনার। দোর খুলে দাও?

খুলি।

আঁধার রাতে একা দোর খুলে দিতে ভয় করে শুনুর বাপকেও। সত্যি যদি না হয়, এমন যদি হয় যে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে, ঘুমের মধ্যে উঠে গিয়ে দরজা খুলবে অজানার ডাকে, কোথায় চলে যাবে বাইরের রহস্যময় রাত্রির জগতে। পিসিকে ঠেলে তুলে দেয়। শুনুকে কাঁদায়। পচাকে ডাকে জোর গলায়। ঘুমের মোহকে করে নেয় বাস্তব। হুড়কো খোলার আগে শুধোয়, কে গা?

আমি গো আমি। বীরেন।

বাইরে মেঘ ঢাকা চাঁদের আলোয় রাত্রির রং ফিকে, ঘরে গলা শুনে মানুষ চিনতে হয়। ফুলু হাত ধরে বীরেনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে তক্তপোসে বসায়। মুখ না দেখে, মানুষ না দেখে, কুশল জানাজানি, কথা বলাবলি কেমন অর্থহীন শোনায়, ব্যাঙের মতো মনে হয়।

হঠাৎ যে এলি বীরু? বুড়ো বলে কাঁপা গলায়।

স্ট্রাইক হল যে? শোন নি?

সব্বোনাশ! বুড়োর গলায় কাঁপুনি নেই, আওয়াজটা দাপড়ানির, তুই করেছিস কি? অন্য সময় যেমন তেমন, এখন কামাই করলে তাড়িয়ে দেবে যে চাকরী থেকে!

সবাইকে তাড়াবে?

সবাইকে? সবাই কখনো ধম্মোঘট করে? তোর মতো হাবা গোবা দু'চার জন গরম গরম কথা শুনে—

ঠিক আছে, ঠিক আছে। সব ডাকঘরে কুলুপ আঁটা। কাজ করব কোথা যে কামাই হবে? বীরেনের কাছে দেশলাই চেয়ে নিয়ে সন্ধ্যা দেখাবার রেড়ির তেলের দীপটা জ্বালে ফুলু। তেলটুকু ফুরিয়ে যাবে, কাল মুস্কিল হবে সাঁঝকে বরণ করা। তা হোক প্রদীপের আলোয় হাঁড়িকুড়ি কাঁথাখানি আম কাঠের সিন্দুক টিনের তোরঙ্গের ঘর সংসার আর মানুষগুলি রূপ নেয় সব জুড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া ভাঙা চোরা জীর্ণ পুরানো দারিদ্র্যের রূপ।

বেড়ার ওপাশে পদী কাতরায়, দাদাগো, জ্বরে মরলাম গো। একবারটি এলে না দাদা, দেখলে না মোকে?

খুব জ্বর ম্যালেরি ধরেছে। বলেছিলাম না তোমায়? ফুলু বলে বীরেনকে।

অ্যাঁ? ও হ্যাঁ। বীরেন বলে আনমনে। শ্রান্ত ক্লান্ত নয়, তাকে চিন্তিত দেখায়, গম্ভীর।

পিসি বলে অনুযোগ দিয়ে, গেরন গেল, গঙ্গায় ডুব দেওয়ালী না বাবা আমাকে?

পচা বলে, সবাই স্ট্রাইক করেছে মামা? বাঃ কি মজা! আমাদেরো স্কুলে কাল থেকে স্ট্রাইক।

কিসের স্ট্রাইক? বীরেন জিজ্ঞেস করে। বুড়ো উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

মাইনে বাড়িয়েছে না, সেজন্য। আর দু'একজনকে তাড়িয়েছে বলে। শিবুদাকে চেনো তুমি, আরেকজনকে চেনো না, তার নাম সতীশ, সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে। মাইনে

বাড়াবার জন্য মিটিং করেছিল ছেলেদের নিয়ে, সেক্রেটারীর নিন্দে করেছিল, তাই তাড়িয়েছে। ওদের না নিলে, মাইনে না কমালে আমরা আর যাচ্ছিনে স্কুলে।

ইস্কুলে যাবি না? টান হয়ে যায় বুড়ো, রাগে থর থর করে কাঁপে। তোর ঘাড় যাবে ইস্কুল। আমি তোকে কাল ইস্কুল নিয়ে যাব। আট গণ্ডা মাইনে বেড়েছে তা তোর বাপের কি? তুই গুনিস মাইনের টাকা?

মুখ চোরা ভীরু ছেলেটাকে সোৎসাহে মামার সঙ্গে এ কথা বলতে দেখে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

পদী উঠে আসে গায়ে কাঁথা জড়িয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বেড়ার ওপাশ থেকে। বীরেনের বিয়ের সময় ঘরের মাঝামাঝি মানুষের চেয়ে হাত খানেক উঁচু এই বেড়া উঠেছিল ছেলে বৌকে শুতে দেবার জন্য, এপাশের সব কথা ওপাশে শোনা যায়। শুধু কথা শুনে চলছিল না পদীর।

তিন্যটুকু খেতে দেয়নি দাদা। 'কাঁদ কাঁদ' সুরে পদী নালিশ জানায়।

জ্বরের মধ্যে কি খাবি? উঠে এলি কেন আবার? যা, শুয়ে থাকবি যা।

সবাই ভড়কে যায় তার ধমকে। জ্বর গায়ে বোনটা উঠে এসেছে একটু আদরের জন্য তাকে এমন করে ধমকানো! ওর ন্যাকামিতে ফুলুরও গা জ্বলছিল, কিন্তু এভাবে ধমকে উঠাতে তারও মন সায় দেয় না। আনমনা গম্ভীর শুধু নয়, শুনুর বাপ যেন কেমন শক্ত আর নিষ্ঠুর হয়ে গেছে।

খারাপ লাগে সকলের, কিন্তু এমন আশ্চর্য ব্যাপার ধমক যে খায় সে খানিক হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থেকে কথা কয় স্বাভাবিক ভাবে. অভিমানের লেশটুকুর হদিস মেলে না।

একটু উঠলে কি হয় শুয়েই তো আছি। হ্যাঁ দাদা, গুলি টুলি চলছে নাকি?

এখনো চলেনি।

কিছু খাবে নাকি তুমি? ফুলু জিগগেস করে ভয়ে ভয়ে। কিছুই নেই খেতে দেবার। শুনুর বাপ সত্যই বাড়ি এসেছে এ আনন্দে এতক্ষণ বার বার ঝাপটা এসে লাগছিল এই লজ্জা ও দুঃখের যে, বাড়ির মানুষটা বাড়ি ফিরেছে এতকাল পরে তাকে খেতে দেবার কিছুই নেই গেরস্ত বাড়িতে।

বীরেন বলে সে এত রাতে কিছু খাবে না, গাড়িতে খেয়েছে। মনে শান্তি আসে না ফুলুর। সামনে যদি ধরে দিতে পারত কিছু, তারপর শুনুর বাপ বলত খাবে না, তা হলে ছিল ভিন্ন কথা।

স্থান অদল বদল করে শোয়ার ব্যবস্থা হয়। বেড়ার একপাশে যায় সকলে, অন্য পাশে ফুলু, বীরেন আর শুনু। গাদাগাদি করে শুতে হয় সকলকে, কিন্তু উপায় কি, এতকাল পরে ছেলে বাড়ি এসেছে, ছেলে বৌতে নিরিবিলি শুতে না দিলে চলবে কেন। নিবু নিবু দীপটা ফুলু হাতের বাতাসে নিবিয়ে দেয়। এবার কথা বলতে হবে চুপি চুপি, প্রায় কানে কানে, নয় তো ও পাশে শুনতে পাবে ওরা।

বুক কাঁপছে শুনে থেকে। কেন করতে গেলে ধম্মোঘট?

হুঁ।

এখনো আনমনা অনিচ্ছুক মানুষটা, মোটে চাড় নেই, সাড়া নেই। এমন তো করে না কোনো বার বাড়ি এসে। আহত অভিমানে নিজেও চুপ করে থাকবে কিনা মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে ভাবে ফুলু। কিন্তু তা কি পারা যায়। টিপি টিপি শুরু হয়ে জোরে বৃষ্টি নেমে ঝমাঝম আওয়াজ তোলে টিনের চালে। এমনি বৃষ্টি খানিকক্ষণ চললেই শোয়ার দফা শেষ। ভাঙা চালার তিন জায়গা থেকে জল পড়বে ঘরের মধ্যে, উঠে সামলাতে হবে। তবে বৃষ্টির শব্দ ওঠায় একটু জোরেই এখন কথা বলা চলবে, শোনা যাবে না।

কি হয়েছে তোমার?

কি হয়েছে? হয়নি কিছু। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় চলে এলাম, ভাল লাগছে না এখন।

কাজ থাকবে না? তাড়িয়ে দেবে? উৎকণ্ঠায় ফুলু ব্যাকুল, তবে যে বললে তালা বন্ধ ডাকঘরে কিছু হবে না কাজে না গেলে?

সে কথা নয়। ভাবছি কি, চলে এলাম, কি হচ্ছে না হচ্ছে জানতে পাব না। বীরেনের কথা উৎকণ্ঠায় ভরা, তা ছাড়া, চলে এলাম, পিকেটিং-এর লোক যদি কম পড়ে? যদি হেরে যাই আমরা?

বললে না হাজার হাজার লোক ধম্মোঘট করেছে? ওরা তো আছে।

তা আছে। কিন্তু—

কি বলবে ঠিক করতে পারছে না শুনুর বাপ। মনের ভাবটা বুঝিয়ে বলতে পারছে না তাকে, এটা সে বুঝেছে যে হঠাৎ বাড়ি চলে এসে এখন ভারি উতলা হয়ে পড়েছে তার মন। এত বড় একটা কান্ড করে এসেছে, চাকরির ব্যাপার, এ বাঁচন মরণের কথা। সেখানে কি হচ্ছে জানতে পাবে না ভেবে আকুল তো হবেই মনটা। কিন্তু ও নেই বলে কিছু হবে না, ধম্মোঘট ভেস্তে যাবে, এ কোন দেশী কথা! এ দুশ্চিন্তার মাথা-মুণ্ডু মাথায় ঢোকে না ফুলুর। ওই কি কম্মকত্তা ছিল, ধম্মোঘট চালাচ্ছিল? বীরেনের বুকে মাথা রেখে সে তার আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করে। বোঝাবার চেষ্টায় বীরেন বলে, কি জান, লড়াই চলছে তো একটা, একজন কম হলে জোর তো একটু কমল? তা ছাড়া, আমি চলে এলাম, আর দশজন আমার মতো ভাবল, একা একজন চলে গেলে কি হয়, সবাই তো আছে। বুঝলে না? ভাল লাগছে না আমার।

ভেবে আর কি করবে?

না আমার বিশ্রী লাগছে। মিটিং হবে আমি নেই, পিকেটিং হবে আমি নেই,—

অবিরল জল ঝড়ে টিনের চালে, বিরাট জনতার গর্জনের মতো আওয়াজ চলে অবিরাম। কারো চোখে ঘুম নেই। বীরেন ছট্‌ফট করে জ্বরের রোগীর মতো। ফুলুকে উঠে প্রদীপটা আবার জ্বালতে হয়, ঘরে জল পড়ছে। মেঝে ভেসে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে, মেঝেতে আর শোয়া চলবে না, আর কিছু রাখাও চলবে না। সেকেলে পুরনো তক্তপোষটি আর ও বছরের বানানো বাঁশের ছোট নিচু মাচাটিই এখন সম্বল

সকলের। পদীকে মাচাটিতে শুতে দেওয়া হয়। কাঁথা কানি জিনিসপত্র নিয়ে অন্য সকলে ঘেঁষাঘেঁষি করে আশ্রয় নেয় তক্তপোষে।

ফুলু বসে মেঝেতে একটা পিঁড়ি পেতে। প্রদীপ নিভে গেছে তেল ফুরিয়ে।

ভোরের আগে বীরেন বলে, আমি রওনা দি। ভোরের ট্রেনটা ধরতে হবে।

বিষ্টি পড়ছে যে?

পড়ুক বিষ্টি। ভিজে ভিজেই যাব।

কাগজ মোড়া শুকনো জামা কাপড়ের পুঁটুলিটা বগল-দাবা করে ভিজতে ভিজতে বীরেন স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেছে অর্ধেক পথ, পিছন থেকে ডাক আসে, মামা!

বীরেন দাঁড়ায় পচা এসে তার নাগাল্ ধরে। কেঁদে বলে, আমি কাল ইস্কুল যাব না মামা।

এই কথা বলতে এলি ভিজে ভিজে অ্যান্দুর?

দাদু জোর করে নিয়ে যাবে ইস্কুলে। এখানে থাকব না আমি। তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে চলো।

বীরেন হাঁটতে শুরু করে বলে, হাঁট তবে, জোরসে হাঁট। গাড়ি ফেল করলে চড় খাবি।

ওপরে বৃষ্টিপাত, নিচে খাল খন্দ কাদা ভরা পিছল পথ। দুজনে এগিয়ে চলে পাশাপাশি। বীরেন হাত ধরে পচার।

খতিয়ান

সে আটকে গেল এ এলাকার বস্তিতে তার বন্ধুর ঘরে। কার কাছে হদিস পেয়ে বিশ পঁচিশ জনের একটা দল হৈ হৈ করে ছুটে আসছিল তার রক্তের খোঁজে। টের পেয়ে বন্ধু তাকে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলল ঘরের মধ্যে ভাঙা তক্তাপোষটার নিচে।

ভেগেছে। আগেই ভেগেছে।

ভেগেছে? খুনের নেশায় মাতাল মানুষগুলি ক্ষুণ্ন হল, ক্ষুব্ধ হল, ভাগতে দিলি কেন? তোকেই মারা উচিত এক ঘা।

এত নিচু তক্তাপোষের নিচে শুয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই, বন্ধু ছেঁড়া মাদুর আর চট বিছিয়ে দেয়, একটা তেলচিটে ওয়াড়হীন বালিশও দেয়, বালিশটা পাথরের মতো শক্ত কিন্তু আস্ত। অন্য একটা তালি মারা খানিকটা নরম বালিশ আছে, কিন্তু তুলো বেরোয় একটু নাড়া চাড়া করলেই। সেইখানে বন্ধুর ঘরের নিচু তক্তাপোষের নিচে বেশীর ভাগ সময় গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থেকে তার কাটে পরদিন রাত্রে বস্তিতে আগুন লাগা পর্যন্ত

সে থাকে বড় রাস্তার পুব এলাকার বস্তিতে। দুটি বস্তিই অবশ্য বড় রাস্তার খানিকটা তফাতে, দুপাশেই ইঁটের বাড়ীর এলাকা ভেদ করা পথ অতি নোংরা অতি সংকীর্ণ হয়ে বস্তিতে পোঁচেছে। বস্তি দুটিকে যোগ দিয়ে লাইন টানলে বড় রাস্তার সংগে খানিক তেরচা হবে। বড় রাস্তার বড় মোড়টার পর থেকে দক্ষিণের বাঁক পর্যন্ত সায়েব পল্লী। রাস্তার দুদিকের এলাকার এই বস্তিগুলি তুলে দিয়ে আধুনিক ধাঁচের ইঁট কংক্রীটের বাড়ি তুলবার পরিকল্পনা ও আয়োজন চলছে কিছুদিন ধরে।

বিশেষ দরকার থাকলেও আজ এদিকে আসা বোকামি হয়ে গিয়েছিল তার।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি অবস্থা এমন খারাপ হয়ে দাঁড়াবে, এমন লহমায় লহমায় ভীষণ থেকে ভীষণতর হতে থাকবে চারিদিকে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, সে তা ভাবতেও পারেনি।

তুই শালা একটা আস্ত উল্লু! তাকে গুম করে ফেলবার আয়োজন করতে করতে বন্ধু বলেছে রাগ করে গাল দিয়ে।

তুই শালা ভাল্লু! সে অবশ্য জবাব দিয়েছে সমানে, কিন্তু কেউ তারা সুখ পায়নি এই দোস্তির আলাপে। আতঙ্কে খিঁচ ধ'রে গেছে তখন দুজনেরি বুকে।

এক কারখানায় খাটবার দোস্তিতে, এই সেদিন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ধর্মঘটে জয়ী হবার দোস্তিতে হঠাৎ কেমন যেন চিড় খেয়ে গেছে। দু'জনেই তারা কেমন একটা দিশেহারা অসহায় ভাবের সঙ্গে অনুভব করে যে তাদের মিল আছে, তারা বন্ধু বটে, কিন্তু আর যেন এক নয়,—দু'জনে তারা দু'দলের হয়ে গেছে, দারুণ আক্রোশে হন্যে হয়ে যে-দু'টি দল চালিয়েছে হানাহানি খুনোখুনি লুটতরাজ আগুন দেওয়া। হৈ চৈ হল্লার আওয়াজ এসে অবিরাম ভয়চকিত মনে হানা দিয়ে সচেতন করে রাখছে, যে দু'দলে ভাগ হয়ে থেকেও এতদিন তারা অনায়াসে এক সঙ্গে সভা-শোভাযাত্রা ধর্মঘট পিকেটিং পুলিসের সাথে লড়াই সব কিছু করে এসেছে, আজ পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরেছে সেই দল দু'টি।

দু'জনেরি খারাপ লাগে।

লে বিড়ি লে। চটপট ফুঁকে লে বিড়ি।

বন্ধু আধপোড়া বিড়িটা চালান করে দেয় চৌকির নিচে।

কোলের ছেলেটাকে মাটিতে আছড়ে বসিয়ে কাঁদায় বন্ধুর বৌ, কান্নায় কান না দিয়ে চাপা গলাতে বলে, যত আপদ জোটে বাবা। কি হবে এখন!

জোরে রাগ প্রকাশ করার উপায় নেই। নিচু গলায় যতটা পারে ঝাঁঝ ঢেলে বন্ধুর বৌ একটানা প্রতিবাদ জানিয়ে চলে তার ঘরে এভাবে মানুষটার চড়াও হওয়ার বজ্জাতির। রেশন যা আছে ঘরে টেনেটুনে দুটো দিন নিজেদের মুখে দু'মুঠো গোঁজা চলত তাদের, যোয়ান মদ্দ মুখ একটা বাড়ল। তাছাড়া, মানুষ সব ক্ষেপে গেছে। দয়া-মায়া বিচার-বিবেচনা নেই কারো। জানাজানি হয়ে গেলে না জানি কি-দশা হবে তাদের। গজর গজর করতে করতে বন্ধুর বৌ ভাত রাঁধে, বন্ধুকে বাইরে দাওয়ায় পাহারা রেখে ভেতর থেকে দরজার হুড়কো দিয়ে তাকে চটপট খাওয়ার তাগিদের চোটে গিলিয়ে দেওয়ার মতো, তারপর আবার তাকে চৌকির নিচে পাঠিয়ে এঁটো বাসন তুলে দরজা খুলে আগে উঁকি মেরে এদিক ওদিক ভাল করে দেখে নিয়ে বাইরে আসে। তাকে লুকিয়ে রেখে পাড়ার প্রতিহিংসায় উন্মাদ মানুষগুলির কাছে অপরাধ করার অনুভূতি আর ধরা পড়লে শাস্তির ভয়টা স্বামীর চেয়ে তার অনেক বেশী তীব্র। আপদ বিদায় করে স্বস্তি পাবার সহজ উপায়টার কথা তবু কিন্তু একবারও তার মুখে শোনা যায় না।

দিনদুপুরেও চৌকির নিচে পাঁশুটে আঁধার। এসব ঘরের আঁশটে সোঁদা গন্ধ তার অভ্যস্ত, তবে এখানে গন্ধটা বড় উগ্র। তার গা বেয়ে আরশোলা চলাফেরা করে, হরদম মশা কামড়ায়, মাঝে মাঝে পোকা, বাইরে যে কাণ্ড হচ্ছে তার বাড়ানো-ফাঁপানো বীভৎস বিবরণ আর বীভৎসতর গুজবের কথা শুনতে শুনতে নিজেকে তার কখনো মনে হয় মরা মানুষ। কখনো জ্বরো রোগী। কখনো বারুদ-ঠাসা বোমা। বুড়ি মা আর বৌ-ছেলেমেয়ের ভাবনা গোড়ার দিকে বরফের ছুরির মতো কুরিয়ে কুরিয়ে কাটছিল তার বুকের ভেতরটা—ধীরে ধীরে তার মধ্যেই ফেঁপে গেঁজে উঠে দুর্ভাবনাটা শতগুণ জোরালো এমন একটা যন্ত্রণায় পরিণত হয়ে থমথম করছে যে সে যেন ধরতে

বুঝতে পারছে না কার জন্য বা কিসের জন্য এই বিষম কষ্ট। আনমনে হঠাৎ গায়ে ঝাঁকি দিয়ে উঠতে গিয়ে নাকটা তার ছে'চে যায় চৌকির কাঠে, চোখ ফেটে জল আসে সেই চিকন ধারালো ব্যথায়। এভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখার লজ্জা দুঃখ অপমানে আরেকবার ফুঁসে উঠে তার মন। বাইরে থেকে সে যেন শুনতে পায় যে কোন পথে যখন খুশি যেদিকে খুশি তার চলাফেরা করার অধিকারের ডাক, অনুভব করে ভেতরের জোরালো তাগিদ গটগট করে বাইরে বেরিয়ে যাবার, যা হবার তা হবে। গা থেকে কয়েকটা আরশোলা ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে প্রথমে সে টের পায় ঘামে চপচপ করছে তার শরীরটা, তারপর খেয়াল করে গুমোটের গরমে দম তার প্রায় আটকে আসছে। অন্ধ আক্রোশে, অসহ্য বিদ্বেষে দাঁতে দাঁত লেগে যায় তার। দুনিয়া নিপাত যাক, খতম হোক মানুষের চিহ্ন। উঠে গিয়ে এই ঘরে প্রথমে আগুন দিয়ে বঁটি লাঠি চ্যালাকাঠ যে কোন হাতিয়ার নিয়ে সে বাইরে বেরোবে। যাকে সামনে পাবে তাকেই খুন করতে করতে মরবে নিজে। ওঃ, এত সে গরিব—

গরিব? আবার খেয়াল হয় তার যে সে গরিব। আরেকবার আশ্চর্য হয়ে সে ভাবে যে এ কথাটা ভুলে গিয়ে এতক্ষণ আবোলতাবোল কী সব ভাবছিল। গরিব ছাড়া আর কি। সে গরিব, এ বস্তির সবাই গরিব।

পরদিন বস্তিতে আগুন লাগার হট্টগোলের মধ্যে সে মরিয়া হয়ে রওনা হল তার নিজের বস্তির দিকে। বন্ধুর কাছেই শোনা গেল, সে বস্তিতেও নাকি আগুন লেগেছে।

কি করবি এবার? এ যে মুস্কিল হল! বন্ধু বলে আপসোসের সঙ্গে।

ঠিক আছে।

সোজা পথে যাওয়া যাবে না। চেহারা পোশাক দু-ই তার ছাপমারা! এদিকে দিয়ে ঘুরে সায়েবপাড়া হয়তো সে পৌঁছতেও পারে কোনরকমে প্রাণটি নিয়ে। না যদি পৌঁছতে পারে, প্রাণটা যদি যায়, যাবে। সে কাউকে মারেনি, কাউকে মারতেও চায় না, তবু যদি তাকে মরতে হয় যতক্ষণ পারে লড়াই করে মরবে, আর সে গ্রাহ্য করে না মরণকে। সায়েবপাড়া থেকে দুটো ঘোরা পথ আছে তার বস্তিতে যাবার, বড় রাস্তায় হয়তো এখন সামনাসামনি লড়াই চলছে দু'টো বস্তিতে আগুন লাগার জের হিসাবে। সায়েবপাড়া পৌঁছে ঠিক করা যাবে কোন পথে যাওয়া নিরাপদ।

প্রায় আনমনে চলতে থাকে সে। মিছামিছি যারা বোকার মতো নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরে তাদের সম্বন্ধে একটা গভীর অবজ্ঞার ভাব জেগেছে তার মধ্যে। ওরা তুচ্ছ, ওরা বাজে, বয়স্ক মানুষ নয়, হিংসুটে বজ্জাত বাচ্চা মাত্র। হাজার দশ হাজার মিলে একসাথে যদি তেড়ে আসে ওরা, সে দুটো ধমক দিলে আর দু'চারটে চড়চাপড় কষিয়ে দিলে সব কটা কেঁদে ফেলবে, পালিয়ে যাবে। বস্তির আগুনে লাল হয়ে গেছে আকাশ, নীল তারা ঝকমক করছে। বস্তি এলাকার পর ইঁটের বাড়ির এলাকায় জনশূন্য স্তব্ধ পথ। ইঁটপাটকেল ভাঙা বোতল ছড়ানো, আর কতকগুলি মানুষের দেহ; পচা গন্ধের তীব্রতায় মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে, মনে হয়

বন্ধুর বস্তির ঘরে যেন ফুলের সুবাসে ভরপুর ছিল চৌকির তলাটা, সেখান থেকে যেন সে পচা গ্যাসের কারখানায় নেমে এসেছে। বস্তির আগুন থেকে ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে মিশে মানুষের মাংসপোড়া গন্ধ আকাশে উঠছে।

সে দাঁড়ায়, দুটি শবের পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে পাশ কাটিয়ে যেতে না পেরে। পরস্পরকে তারা হয়তো মারেনি। কাউকে তারা একেবারে মারতে চেয়েও ছিল কিনা তাও জানবার উপায় নেই, শুধু পোশাকের তফাতের জন্যই হয় তো শত্রু হিসাবে তাদের মরতে হয়েছে, কিন্তু মরার পর রাস্তায় পড়ে আছে ঠিক বন্ধুর মতো ঘনিষ্ঠভাবে। মাথা এত কাছাকাছি যে মনে হয় যেন ঠেকে আছে, রাস্তার ধুলোয় এলানো একজনের হাতের ওপর আরেকজনের হাত।

ধীরে ধীরে সে মুখ তুলে তাকায় আকাশের দিকে। তার ঠোঁট নড়তে থাকে, গ্রহ-তারার অনন্ত রহস্যের আড়ালে যিনি গা-ঢাকা দিয়ে আছেন তাকে শুনিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, মড়াপচা গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারছ কোনটা হিন্দুর, কোনটা মুসলমানের? মাংস পোড়া গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারছ কোনটা হিন্দুর, কোনটা মুসলমানের?

কে যায়?

আমি।

কোথায় যাবে?

হাসপাতাল।

সায়েবপাড়ার বড় রাস্তা পর্যন্ত পথটুকু যেতে বারচারেক প্রাণের আশা ছেড়ে দিতে হয় তাকে। সে একা বলে, এই ভীষণ অবস্থায় এই বিপজ্জনক পথে সে একেবারে একা চলছে বলে, বোধ হয় ভীত-ত্রস্ত উত্তেজিত মানুষগুলি তাকে মারেও না, ধরেও নিয়ে যায় না। তাকে অনেক উপদেশ আর আদেশও শুনতে হয় ফিরে যাবার, বোকামি না করবার। এ মন্তব্যও সে শোনে কয়েকবার, লোকটা পাগল নাকি!

সায়েবপাড়ার বড় রাস্তায় পা দিতেই নতুন এক জগতে পৌঁছায় সে। জ্যোৎস্নার মতো মিঠে গ্যাস ও বিদ্যুতের আলোয় পরিচ্ছন্ন চওড়া অ্যাসফল্টের পথটিতে যেন রাশি রাশি শান্তি ও শুচিতা ছড়ানো। দুদিকে বাগান ও লনওয়ালা ছবির মতো বড় বড় বাড়ি, আলোয় ঝলমল করছে। উচ্ছৃঙ্খল হাসি ও গানবাজনা ফুলবাগিচা ডিঙিয়ে মৃদু ব্যঙ্গ হয়ে ভেসে আসে তার কানে। এগিয়ে যায় পায়ে পায়ে। রাস্তা-ঘেঁষা একটি বাড়ি থেকে পিয়ানোর অতি মিষ্টি টুংটাং আওয়াজ শুনে ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্তের মতো সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কোন হ্যায়? ক্যা মাংতা?

গেটের কাছ থেকে খাকি পোশাক পরা অস্ত্রধারী একজনের হাঁক আসে।

জবাব না দিয়ে সে হাঁটতে আরম্ভ করে। ঘুরপথের কথা ভুলে গিয়ে বড় রাস্তা ধরেই সে এগিয়ে চলে—কিছুদূর থেকে এই রাস্তার উপরেই সংঘর্ষের কোলাহল ভেসে আসছে শুনতে পেয়েও। তার কানে তখনো পিয়ানোর মিষ্টি টুংটুং শব্দ দমকলের ঢং ঢং আওয়াজ হয়ে বাজছে। কানে তার তালা লেগে গিয়েছে।

বাঁক ঘুরে সে দেখতে পায় এলোমেলো আবোলতাবোল হানাহানির দৃশ্য। লালের

আভাস লাগছিল দেখে। ধীরে ধীরে সে চোখ তোলে। তার বাড়িটা পুড়ছে এদিকে! তার বুড়ি মা আর বৌ ছেলেমেয়েরাও পুড়ছে কি না কে জানে।

কয়েকদিন পরে বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা হয় কারখানার গেটের সামনে। গেট তখনো খোলেনি, যদিও অনেকক্ষণ সময় হয়ে গেছে খোলার।

বিড়ি দে। খপর বল।

খানিক তফাতে মোড়ের বটগাছটার নিচে বেঞ্চে তক্তাপোষে শোয়া-বসা সৈন্য আর এলোমেলোভাবে জমা করা রাইফেলগুলির দিকে চোখ রেখে দুজনে তারা খবর বলাবলি করে।

দেখলি তো? আমরা শালা গরিবরাই মরলাম।

না তো কি? কে মরবে তবে?

ওনারা সব ঠিক আছেন বহাল তবিয়তে।

তা রইবেন না? বহাল তবিয়তে রইবার জন্যে তো এত কান্ড। বৌটা পুড়ে মরেনি। পাত্তা পাইনি কিনা আগুন লাগার দিন থেকে, তাই ভাবছিলাম পুড়েই মরেছে বুঝি। খোঁজ পেলাম কাল।

সচ্?

হাসপাতালে আছে। বাঁচবে বুঝি।

মা'টা মরেছে পুড়ে।

হাঃ?

আর সবকটা ঠিক আছে। ভুখে মরছে বটে তা সামলে যাবে মালুম হয়, আজ রেশন মিলবে জরুর। মিলবে না?

গেট খোলা হয়, ঠিক আধহাত। লোহার চেনে ঢিল দিয়ে একেবারে একটা মানুষ ঢুকবার মতো ফাঁক রেখে আবার চেনে তালা আঁটা হয়।

শ'তিনেক লোক তখন জমা হয়ে গেছে গেটের সামনে। নাম ডেকে ডেকে একজন একজন করে ঢোকান হয় ভেতরে। বাদ পড়ে জন চল্লিশেকের নাম। সে আর তার বন্ধুর নামও। গেটের ফাঁকটুকু তারপর বন্ধ হয়ে যায়।

তাদের কাজ নেই। ভেতরে যাবার অধিকার বা প্রয়োজনও তাদের নেই। হল্লা না করে সরে পড়ুক তারা, হটে যাক। একদিনে এমন বেপরোয়াভাবে প্রায় চল্লিশ জনকে ছেঁটে ফেলা! একমাস আগে তিন জনকে ছাঁটাই করার বাহাদুরি যারা হজম করতে পারেনি, বাধ্য হয়েছিল আবার সে তিনজনকে কাজে ফিরিয়ে নিতে, তাদের এত সাহস! মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সকলে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সে আর তার বন্ধু

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বন্দুকধারী পুলিস আসে, ১৪৪ ধারা অমান্যের অপরাধে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় পুলিসের লরিতে।

লরি চলতে আরম্ভ করলে হাত বাড়িয়ে সে বন্ধুর ছেঁড়া শার্টের কলার চেপে ধরে থু-থু করে রাস্তায় ফেলে দেয় মুখের বিড়িটা।

—আজ শালা তোকে খ্নন করব। বন্ধ্ন মাথা নেড়ে সায় দেয়।—কর।

—বল শালা তোর কোন জাত নেই, আমার কোন জাত নেই। তুই গরিব, আমি গরিব। আমরা গরিবের জাত।

বন্ধ্ন মাথা নেড়ে সায় দেয়।—ঠিক।

ছাঁটাই রহস্য

গিধর অ্যান্ড বাঙনা কোম্পানীর এই আপিসটা, রণধীর যেখানে ক'বছর কাজ করছে প'চাত্তরে ঢুকে আশীতে উন্নত হয়ে, সেটার বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পঞ্চাশ ষাটজনের আপিসটাতে লড়ায়ের সময় একশো'র ওপর নতুন কর্মচারী নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের একজনের চাকরিও অস্থায়ী নয়, সবাই এখানে পারমানেণ্ট। সকলের নিয়োগ পত্রে স্পষ্ট লেখা আছে যে নিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ যথেষ্ট বিবেচনা না করলে ম্যানেজার তাকে বরখাস্ত করতে পারবে না। বরখাস্ত করলে এক মাসের নোটিশ অথবা বেতন দেওয়া হবে। ম্যানেজারের সিদ্ধান্ত অন্যায় মনে করলে বরখাস্ত কর্মচারী স্বয়ং ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাছে লিখিত দরখাস্ত পাঠাতে পারবে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্বয়ং বিচার ও বিবেচনা করে রায় দেবে।

রণধীর কাজ করছে চার বছরের বেশী। এই সময়ের মধ্যে ম্যানেজার টি, এল, বাঙনা আসল বাঙনার সে ভাইপো, বরখাস্ত করেছিল মোট ন'জনকে। প্রথম দু'জনের দরখাস্ত হয়েছিল নিষ্ফল, তৃতীয় জন দরখাস্ত করেনি। চতুর্থ জন দরখাস্ত করায় সত্যিই তার চাকরী টি'কে গিয়েছিল ম্যানেজারের হুকুম নাকচ হয়ে। তাই পরে বরখাস্ত অন্য সকলেই দরখাস্ত করেছিল, ফলও পেয়েছিল আরেক জন। সে অষ্টম জন।

দু'জনের বেলা হুকুম নাকচ করে দিয়েও কিন্তু ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জি, জি, গিধর ম্যানেজার সায়েবের প্রেস্টিজের ক্ষতি করেনি এতটুকু। কোন লিখিত বা মৌখিক আদেশ আসেনি তার কাছ থেকে ম্যানেজারের হুকুমের বিরুদ্ধে, বাঙনার মারফতেই সব করা হয়েছে। বাঙনা দু'জনকে ডেকে পাঠিয়ে জানিয়েছে যে তাদের দরখাস্ত পড়ে দয়া হয়েছে গিধরের, গিধর তাকে অনুরোধ জানিয়েছে তাদের আরেকটা চান্স দেওয়া যেতে পারে কি না বিবেচনা করতে। সে তাদের তিন মাস টাইম দিচ্ছে। তিন মাস ঠিকমতো কাজ করলে, আর কোন দোষ না করলে, সে বিবেচনা করবে তাদের রাখা চলবে কি চলবে না। কয়েকজন রিজাইন দিয়ে চলে গেছে,—কেউ স্থায়ী চাকরিতে কেউ অস্থায়ী চাকরিতেও। মাইনে বড় কম এখানে। মাগগী ভাতাও কম। এ বিষয়ে কোম্পানী দৃঢ় ও স্পষ্টভাষীঃ কাল লড়াই থেমে গেলেও কোম্পানী যখন একজনকেও লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবার ইচ্ছা রাখে না, কোম্পানী যখন দিচ্ছে চিরদিনের নিরাপত্তা, নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের গ্যারাণ্টি, প্রায় সরকারী চাকরীর (স্থায়ী) মতই যখন নির্ভরযোগ্য

মনে.. করা যেতে পারে কোম্পানীর চাকরী, ঠিক যুদ্ধের সময়টুকুর জন্য যখন লোক নিচ্ছে না কোম্পানী, মাইনে মাগগীভাতা গ্রেড প্রভৃতি ঠিক করা সম্পর্কে পৃথিবীতে লড়াই চলছে কি চলছে না সে প্রশ্ন বাদ দেবার অধিকার নিশ্চয় কোম্পানীর আছে। কোম্পানীর এই পলিসি অবশ্য সরকারী ভাবে কোম্পানী ঘোষণা করেনি।

কয়েক জন চাকুরে গল্পগুজব-আলোচনা বিবেচনা-বিচার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কর্মচারী মহলে মাইনে পত্র কম পেয়েও এখানে চাকরি করার পরম সুবিধা ও চরম সৌভাগ্যের কথা প্রচার করেছে—এতটুকু রিস্ক নেই ফ্যাসাদে পড়বার, যাই ঘটুক পৃথিবীতে। তালা-আঁটা সিন্দুকের নিশ্চিন্ত নির্ভরশীলতা এখানে।

আত্মীয় স্বজনের যুক্তি পরামর্শ উপদেশের প্রতিধ্বনি যেন এসব কথা, তাদের কামনার পরিতৃপ্তি যেন কোম্পানীর এই ভরসা দান—বেকার তুমি কখনো হবে না তোমার নিজের দোষ—গুরুতর, অমার্জনীয় দোষ ছাড়া। তবু চারিদিকে সকলের মধ্যে অসন্তোষ, গুমরানো গুমরানো অসন্তোষ, জ্বালা। রণধীর এটা প্রতিদিন টের পেয়ে আসছে চাকরীর প্রথম দিন থেকে, অনুভব করছে। তার নিজের অসন্তোষ এবং জ্বালাও কম নয়। কিন্তু সে ধীর শান্ত ধৈর্যশীল, বাপের মতই বিবেচক বলে সংসারে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তার প্রশংসা। সে ভাবে যে কেরানীর জীবনে, চাকুরের জীবনে, দাসের জীবনে, এটাই স্বাভাবিক। শুধু এ আপিসে নয়, সব আপিসেই এটা অনিবার্য। বুদ্ধি দিয়ে হিসাব করে, হতাশা দিয়ে মেনে নিয়ে সে ভাবে যে উপায় কি।

এখানে চাকরী নেবার সময় একটা কঠিন সমস্যায় পড়তে হয়েছিল তাকে। একশোটাকার আধা-সরকারী অস্থায়ী লড়ায়ের চাকরিটা নেবে, না পঁচাত্তর টাকার এই চাকরীটা নেবে। আত্মীয় স্বজন সবাই ছিল স্থায়ী চাকরীর পক্ষে, বৌ পর্যন্ত—একটি তার মেয়ে জন্মেছে তখন, আরেকটি ছেলে অথবা মেয়ে কয়েকমাসের মধ্যে জন্মাবে। কিন্তু এ চাকরী যে স্থায়ী হবে তার স্থিরতা কি, এই নিয়ে খটকা বেধেছিল সকলের মনে।

রণধীরের নিজের মনেও।

দোটানায় পড়ে একটা কিছু ঠিক করে ফেলতেই হবে এ অবস্থা হওয়া যেন চড়া জ্বর হওয়ার মতো, ছটফট করতে করতে মরিয়া হয়ে জীবন সরকারকেই সে জিজ্ঞেস করে বসেছিল, একটা কথা বলব স্যার আপনাকে। ওয়ার টাইম বলে বাড়তি লোক নিচ্ছেন অনেক, লড়াই থেমে গেলে কাজ না থাকলে এত লোককে রাখা চলবে কি করে?

জীবন সরকার বরাভয় দেওয়া হাসির সঙ্গে বলেছিল, থাকবে না কে বললে তোমায়? লড়াই শেষ হলে ব্যবসা বাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে যাবে নাকি? ওয়ার টাইম বলেই আমরা বরং কোণঠাসা হয়ে আছি, বাড়তে পারছি না। লড়াই থামলে কোম্পানী আরও বাড়বে, অরও নতুন লোক নিতে হবে তখন, আমাদের প্ল্যান আছে।

আমরা! আমাদের! আড়াইশো টাকা মাইনে দেয় কোম্পানি মাসে মাসে জীবনবাবুকে, তাতেই কোম্পানী নিজস্ব হয়ে গেছে জীবনবাবুর। থ্যাবড়া মোটা

নাকের ওপর ঢালু কপালে চন্দনের ফোঁটার দিকে চেয়ে হঠাৎ হাসি পেয়েছিল রণধীরের, হাতটা নিসপিস করে উঠেছিল তাড়াতাড়ি পেন্সিল দিয়ে কাগজের ওপর নিশ্চিন্ত অমায়িক গোলগাল ভোঁতা মুখখানার স্কেচ করে নিয়ে তলায় লিখতেঃ চালকুমড়োয় কাকের কীর্তি।

শ্বেত চন্দনের ফোঁটা কাটা এই অমায়িক মুখখানাই খেঁকিয়ে ওঠা পাগলা কুকুরের মুখের মতো কি বীভৎস রকম ক্রূর দেখাতে পারে, তার পরিচয় রণধীর পেয়েছিল পরে। অনেক বার।

বেতন কম খাটুনি বেশী, ব্যবহার হরেদরে অন্য আপিসের মতই। জিনিসপত্রের দামে আগুন লাগায় সব আপিসেই কিছু কিছু মাগগী ভাতা দেবার রীতি চালু হয়েছে, এখানেও বরাদ্দ হয়েছে যৎসামান্য। আর সেই জন্যই বোধহয় গ্রেড জিনিসটার হয়েছে পক্ষাঘাত, মাইনে আর বাড়ে না কারো, বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। বছরে পাঁচ টাকা বাড়ার কথা রণধীরের, তিন বছর লেগেছে একটা পাঁচ টাকা বাড়তে—তাও জীবনবাবুর বিশেষ দয়ায়। পাড়ায় থাকে, চেনা শোনা আছে আগে থেকে, রণধীরকে একটু স্নেহ তার করা উচিত, এইজন্য।

মুস্কিল কি জানো? গ্রেড তো অটোমেটিক নয়, ওই যে ক্লজটা আছে কাজের মেরিট সম্বন্ধে, ওটাই আসল। রাখাল আর ভুবন দুটো ইনক্রিমেণ্ট পেয়ে গেল এরি মধ্যে দশ টাকা আর পঁচিশ টাকার—ওদের কাছে কোম্পানী উপকার পেয়েছে বলেই তো।

মুখ গম্ভীর করে জীবন একটু চিন্তা করেছিল।

আচ্ছা তোমার একটা করে দিচ্ছি। মন দিয়ে কাজ করো, কোম্পানীর ইনটারেষ্ট নিজের ইনটারেষ্ট ভাবতে শেখো, গ্রেড নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। কোম্পানী নিজে থেকে যেচে গ্রেডের দশগুণ ইনক্রিমেণ্ট দেবে।

বাদামী দেয়াল চোখে কর্কশ লাগে। ছোট একটি সংসার আর এই আপিসের সংক্ষিপ্ত জগৎটুকুতে জীবনের রীতিনীতির মধ্যে সামান্য সামঞ্জস্য খুঁজে বার করবার চেষ্টায় এই বয়সেই একেবারে শেষ বারের মতো হার মানতে সাধ যায় রণধীরের, নিস্পৃহ বৈরাগ্যে সব একাকার হয়ে চুলোয় যাক। জীবনটা নিংড়ে দিচ্ছে সংসারকে, সংসার তবু খুসী নয়। খেটে রক্ত জল করছে, আপিস তবু খুশী নয়। হঠাৎ দুশো টাকার একটা চাকরী নিয়ে ভাইটা কোথায় চলে গিয়েছিল, দু'বছরে সে সংসারে সাহায্য পাঠিয়েছে তিন কিস্তিতে দেড়শো টাকা আর লিখেছে লম্বা লম্বা কথা ভরা চিঠি। কারো পরামর্শ জিজ্ঞেস না করে চাকরি নিয়ে উধাও হওয়ার জন্য তার ওপরে চটে আছে সকলেই, কিন্তু সেই যেন গর্ব আর গৌরব সংসারের—ও কিছু করবে জীবনে। রাখাল ও ভুবনের ফাঁকির সাগরে কাজের ডিঙি ভাসে না; ম্যানেজারের পা চেটে, জীবনের খোসামোদ করে আর কোম্পানীর গুণ কীর্তন করেই সময় কাটে, কোম্পানী বড় খুশী ওদের ওপর, ওরা কাজের লোক।

কলমের আঁচড়ে আঁচড়ে দরকারী ফাইলের মলাটে বাঁদর গড়ে ওঠে একটা, ভেংচি

দিয়ে হাসছে। খানিক চেয়ে আরও কয়েকটা আঁচড়ে হাসিটা কান্নায় পরিণত করে রণধীর, একটু কালী লেপে দেয় বাঁদরটার ওপর।

ফাঁদে পড়ার মনোভাব প্রায় সকলেরই—আশঙ্কা, আপসোস, নিরুপায় হতাশা। গোড়ার দিকে এই ছিল সব, তারপর কিভাবে যেন ধীরে ধীরে জেগেছে ঘৃণাবোধ, উগ্র তীব্র ঘৃণাবোধ, আর—রণধীর ঠিক জানে না—বিদ্বেষের জ্বালা অথবা রাগ। তার নিজের মধ্যেও জেগেছে। ভালরকম সে বোঝে না হৃদয় মনে এই ঘৃণা ও জ্বালা অথবা রাগের সৃষ্টি কাহিনী, একটু শুধু অনুমান করে যে চারিদিকে লড়ায়ের বিপর্যয় যে ধাক্কা মেরে চলেছে ক্রমাগত, ওটা তারই প্রতিক্রিয়া। সংকীর্ণ জীবনের সীমাবদ্ধ শান্ত ম্রিয়মাণ জগৎটুকুতে এসে পড়েছে উদ্দাম তান্ডব, জগতের যা কিছুর সঙ্গে হৃদয়মনের সংযোগ তাতেই ঘটছে নিয়মাতীত বে-হিসাবী অবিশ্বাস্য ওলোট পালোট, ধারণা বিশ্বাস সংস্কারের তো কথাই নেই, স্বপ্ন পর্যন্ত রেহাই পায়নি। অলস কল্পনা আজও আকাশে ফুলের চাষ করছে; রঙীন আকাশ কিন্তু হয়ে গেছে কালো, ফুলগুলি তাতে ঝিলিক মারছে তারার মতো, আগুনের ফুলকির মতো।

কি যে এক অস্থিরতা এসেছে ভেতরে আগেকাব কোন ব্যাকুলতার সঙ্গে তার মিল নেই। অন্যের মধ্যেও এই অস্থিরতার অস্তিত্ব এত সহজে সে টের পায়। তারই মতো সকলে যেন একটা খাপছাড়া কাজ করতে চায়, হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ভেঙে চুরমার করে ফেলতে চায় যা কিছু আছে চারিদিকে, প্রিয় বা অপ্রিয়। জীবনের সঙ্গে জড়ানো সব কিছুর প্রতি যে অদম্য মমতা, এই আপিসেব তালাচাবি আঁটা সিন্দুকের নিরাপত্তার অন্ধ বিশ্বাস রেখে নিশ্চিন্ত হবাব কামনা থেকে বাঙনা-জীবনদের কাছে মাথা নিচু করে সবরকমে আত্মসমর্পণ করার তৃপ্তিকর বাসনাব প্রতি পর্যন্ত, সেই মমতাকে পায়ের নিচে ফেলে থেঁতলে থেঁতলে আথালি পাথালি নাচতে চায়। আগে প্রাণ ব্যাকুল হলে রণধীরের মুড়ানো বঞ্চিত ব্যর্থ জীবনের ব্যথা বেদনা দুঃখ লজ্জা পরাজয় অপমান পিছনে ফেলে পালিয়ে যেতে আছাড়িপিছাড়ি করত প্রাণটা, কাঁটার ব্যথায় দিশেহারা গরু ছাগলের মতো, আজ বাঘের মতো হুমড়ি দিয়ে পড়ে নখে দাঁতে কাঁটা গাছটাকে ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য ছটফটানি।

রোগা দুর্বল নিরীহ নকুল পর্যন্ত বলে, দুত্তোরি আব ভাল লাগে না। ঘরে একটা আর এই আপিসে একটা বোমা পড়ত, বাস চুকে যেত সব। তা শালার জাপানী ব্যাটারা এগোতেই পারল না।

গোকুল ফিরে আসে দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে। মিনিট খানেক চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ তাকে ডেকে বলে, শোন্। এই গালটা বাঙনার।

আঙুল দিয়ে নিজের ডান গালটার দেখিয়ে জোরে ঠাস করে এক চড় মারে গালে।

এই গালটা জীবন-শালার।

বাঁ গালে চড়টা মাবে আরও জোরে।

গোকুলকে বাঙনা বরখাস্ত করেছে। গিধরের কাছে দরখাস্ত দিতে বারণ করেছে জীবন। গোকুল তবু চাপাচাপি করাতে তার হাত থেকে দরখাস্তটি নিয়ে কুচিকুচি

করে ছিঁড়ে ফেলেছে জীবন, চোখ লাল করে বলেছে, গোলমাল করলে এক মাসের মাইনে পর্যন্ত পাবে না, এই দণ্ডে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবো।

বিড় বিড় করে বকে যায় গোকুল। নিজের মারা চড়ে দুটি গাল তার লাল হয়ে উঠেছে।

গিধর বাঞ্চোতের গালে তো চড় মারা হল না? ব্যাটা বেঁচে গেল। গোকুলের হাতের এক চড় খেলে নির্ঘাৎ—বহুত আচ্ছা, লাথি মারব ব্যাটাকে।

উঠে দাঁড়িয়ে মেঝেতে সে প্রাণপণে লাথি মারে।

গোকুলের পর রঞ্জিত। তাকেও জীবন বারণ করেছিল গিধরের কাছে দরখাস্ত দিতে, তবে জোর জবরদস্তি করেনি। রঞ্জিত বারণ না মানায় দরখাস্ত নিয়ে জীবন বলেছিল, বেশ পাঠিয়ে দেব।

তারপর তিলকের পালা। তার দরখাস্তও নেওয়া হল। একদিন দুদিন পরে পরেই বরখাস্তের নোটিশ পড়তে লাগল এক একজনের ওপর আকাশের বজ্র পড়ার মতো, রাস্তায় মিলিটারী লরী ঘাড়ে পড়ার মতো। এক মাসে সতরজন বরখাস্তের হুকুম পেল। প্রত্যেকে তারা অকর্মণ্য, তাছাড়া নানা দোষে দোষী।

তারক বড় বেশী কামাই করে।

তারক তো অবাক। গিয়ে প্রতিবাদ জানাল। খাতা খুলে দেখানো হল, গত চারমাস ধরে প্রতিমাসে তার পাঁচ ছ'দিন করে কামাই।

তারক বলল, স্যর, ঠিক টাইমে এসেও খাতা পাইনি সই করতে। আপনি বললেন কোথায় যেন আছে খাতাটা, আপনি মার্ক করে নেবেন আমি প্রেজেণ্ট। ক্রশ মার্কের বদলে দুটো লাইন টেনে মার্ক দিয়েছেন আমি প্রেজেণ্ট বলে—

জীবন বলল গর্জে, দুলাইন মার্ক কামাই-এর মার্ক, যারা কামাই করে খবর পাঠায় তাদের মার্ক ক্রশ, যারা কামাই করে খবর দেয় না তাদের মার্ক দুটো লাইন। তুমি আমায় শেখাবে?

অবনী লেট করে।

অবনী তো অবাক। গিয়ে প্রতিবাদ জানাল। খাতা খুলে দেখানো হল বছর খানেক ধরে প্রতিমাসে সে গড় পড়তা দশ বার দিন লেট!

অবনী বলল স্যর, আপনি তো বলেছিলেন সই করতে হবে না, ঠিক টাইমের বিশ মিনিট আগে যারা আসে—তাদের ভি মার্ক দিয়ে রাখেন ভেরি গুড বলে, তাদের একটা প্রাইজ দেওয়া হবে।

জীবন গর্জে বলল, যারা এক ঘণ্টার বেশী লেট করে এল-এর বদলে তাদের ভি মার্ক—ভেরি লেট। শেখাতে এসেছো?

অনিল আপিসে রাজনৈতিক প্রচার কার্য চালিয়ে আপিসের কাজে ব্যাঘাত জন্মায়।

অনিল তো অবাক। গিয়ে প্রতিবাদ জানাল। তিনখানা অভিযোগ পত্র তার সামনে ফেলে দেওয়া হল। রাখাল, ভুবন, আর শৈলেন নালিশ জানিয়েছে যে অনিল তাদের কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বার হবার জন্য সর্বক্ষণ জ্বালাতন করে, কাজ কর্ম করতে দেয় না।

অনিল বলল, আমি তো পলিটিক্স্ করি না, কোন দলে নেই।

জীবন গর্জে বলল, 'ওসব ন্যাকামি জানি আমি। এমনি সাধু সেজে ন্যাকামি করে তোমরা কাজ চালাও। আমায় শেখাতে এসেছো?'

নারায়ণ পেন্সিল নিব আলপিন প্যাড চুরি করে।

নারায়ণ তো অবাক! গিয়ে প্রতিবাদ জানাল। খাতা খুলে দেখানো হল গত মাসে সে সাতটা পেন্সিল দশ ডজন আল্পিন চারটে প্যাড নিয়েছে। একজন কেরানীর কখনো এত পেন্সিল, নিব আর প্যাড লাগতে পারে একমাসে?

নারায়ণ বলল, আপনি তো বললেন আমার সেকশনে পেন্সিল টেন্সিল নিব্ এসব আমি বিলি করব। আমি নিজের নামে নিয়ে গিয়ে যার যেমন দরকার দিয়েছি। মুখে মুখে হিসেব দিচ্ছি শুনুন। রাখালবাবু দুটো পেন্সিল তিন ডজন আলপিন নিয়েছে, ভুবনবাবু দুটো পেন্সিল দু'ডজন আলপিন দুটো প্যাড্—

জীবন গর্জে বলল, রসিদ দাও।

রসিদ? খিল খিল করে হেসে উঠেছিল নারায়ণ, তার অল্প বয়সে সামনের একটা দাঁত পড়ে যাওয়ার ফাঁকে হুইসেলের শব্দ তুলে, রসিদ কি বলছেন স্যর? কে একটা আলপিন চায়, নিব চায় আপিসের কাজে সেজন্য রসিদ নিয়ে দিতে হবে? আগে জানলে আমি তো ভার নিতাম না আমার সেকশনে এসব বিলি করার।

জীবন গর্জে বলল, চোরেরা এরকম কৈফিয়ত দেয়। আমায় শেখাতে এসেছো?

নারায়ণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, বেঁটে রোগা হাসি খুসী রহস্য প্রবণ নারায়ণ। অন্যেরা চলে যেত, সে দাঁড়িয়ে রইল। অন্যেরা অনেক কথা বলত, রাগত, কাঁদত, নারায়ণ এক পলকে বিদ্যুদ্গর্ভ ধাতুর মতো কঠিন হয়ে গেল।

আমি চোর?

তা ঠিক বলিনি, তবে কথাটা কি জানো নারায়ণ—

নারায়ণের চড়ে গাল ফাটল না বটে জীবনের, কিন্তু বাঁধানো দাঁতে গাল কেটে গিয়ে রক্ত বেরোল মুখ দিয়ে থুতু আর শ্লেষ্মার সঙ্গে। বাঁ হাতে মুঠো করে তখনো নারায়ণ ধরে আছে জীবনের মাথার চুলগুলি। চুল তার কম, তবে বড় বড়। টাক ঢাকতে জীবন বড় চুল রাখে এবং উল্টো করে আঁচড়ায়।

আমি চোর? বলে গর্জন করে নারায়ণ চড় মারা হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করে ঘুষি মারতে যাচ্ছে, রাখাল, ভুবন, শৈলেন এবং আরও কয়েকজন তার হাত এবং তাকে ধরে ফেলল। আধ ঘণ্টার মধ্যে পুলিস এসে নারায়ণকে নিয়ে গেল হাজতে।

পরদিন থেকে বরখাস্তদের সামনাসামনি প্রতিবাদ জানানো বারণ হয়ে গেল। যা কিছু বলার আছে তা তারা লিখে জানাবে। মানুষিক দুর্বলতার দরুন এমন একটা অঘটন ঘটে যাওয়ায় কর্তারা বোধ হয় অনুতপ্ত হয়েই অমানুষিক সরলতার সঙ্গে হুকুম জারি করল যে ম্যানেজারের বরখাস্তের বিরুদ্ধে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাছে বিচার প্রার্থনার দরখাস্ত পাঠাবার প্রয়োজন নেই, কারণ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিশেষভাবেই সচেতন যে, এই দুঃসময়ে একজনের চাকরী যাওয়াটাই কি শোচনীয় ব্যাপার। অতএব তিনি স্থির করেছেন যে বরখাস্তের নোটিশ জারি হবার আগেই

তিনি প্রত্যেকটি নোটিশে নিজে স্বাক্ষর করবেন—বরখাস্ত না করে চলে কিনা, আরেকটা চান্স দেওয়া যায় কিনা, ম্যানেজারের অন্যায় হয়েছে কিনা, গভীর সহানুভূতির সঙ্গে এসব বিবেচনা করার পর।

বাড়ি গিয়ে চা পর্যন্ত না খেয়ে মাদুরে চিৎ হয়ে, রণধীর বলল তার স্ত্রীকে, তার মানে গিধরের সই করা বরখাস্ত নোটিশের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা চলবে না।

ওগো, তুমি বরখাস্ত হয়েছ নাকি? বলে কেঁদে উঠল সরলা। মেয়েটা আগে থেকে কাঁদছিল, এক বছরের মেয়ে আর তার মায়ের কান্না একই সুরে বাজতে লাগল রণধীরের কানে। রণধীরের হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল, আনন্দে সর্ব শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠল। আজকে সকালেই বাজারে যাওয়ার সময় হঠাৎ দেখা হওয়ায় ডাঁটা, ঝিঙা, চিচিঙা, বেগুন কেনার ফাঁকে ফাঁকে ললিত তাকে শোনাচ্ছিল—বেদের ওংকার কি ভাবে এ যুগে কারখানায় ভোঁ-কার হয়ে গেছে। মেয়ের খিদের কান্না আর তার মায়ের ভয়ের কান্না একাকার হয়ে সেই কথাটাই যেন প্রমাণ করে দিল রণধীরের কাছে।

যুদ্ধ শেষ হবার পর মাস দুই কাটতে একমাসে সতেরজন বরখাস্ত! শঙ্কার কালো ছায়া নেমে আসে সকলের মুখে। বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকায়, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে। আপিস বসবার আগে, টিফিনের সময় ও ছুটির পর পাঁচসাতজনে একত্র হয়ে ছোট ছোট ভাগে আলোচনা চালায়, চাপা গুঞ্জনে আপিসটা যেন গমগম করে। সর্বদা হাসি গল্পে মসগুল ফুর্তিবান রাখাল ও ভুবন কেমন যেন দমে গেছে, সেই নির্ভয় নিশ্চিন্ত বেপরোয়া ভাব আর নেই। কয়েকজন মিলে যেখানে কথা বলছে তার ধারে কাছে তাদের কেউ একজন এলেই সবাই এমন ভাবে চুপ হয়ে যায় যে তাকে দুবার ঢোক গিলতে হয়, তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট বার করে ঢং করে বলতে হয়, দেশলাইটা কেউ ছাড়ুন না স্যর! এইভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে সিগারেটটা ধরিয়েই সরে পড়তে হয়, আগে হলে সবাইকে সিগারেট দিত, এখন ভরসা পায় না।

রবিবার সকালে রণধীর যায় জীবনের বাড়ি। সবিনয়ে প্রশ্ন করে ছাঁটাই শুরু হল নাকি স্যর?

তুমি বড় বেয়াদব রণধীর গভীর আপসোসের সঙ্গে জীবন বলে, বড় বোকা তুমি। তোমাকে চাকরী দেওয়াটাই ভুল হয়েছিল আমার। ছাঁটাই কিসের? কয়েকটা অকেজো ফাঁকিবাজ বাজে লোককে বিদায় করা হচ্ছে। নতুন লোক নেওয়া হবে ওদের জায়গায়। তাছাড়া—ভ্রূকুটিতে কুটিল রেখায় ছেয়ে যায় জীবনের গোলগাল মুখ,—সব বিষয় তোমার মাথা ঘামাবার দরকারটা কি? কাজ করছ, কাজ করে যাও। আমি তো আছি। কাকে রাখি, কাকে তাড়াই, কাকে আনি, তোমার তাতে কি এলো গেলো? তোমার চাকরী থাকলেই তো হ'ল?

জীবনের মুখের মেঘ অদৃশ্য হয়ে যায় হঠাৎ।—বোসো। ওরে, কে আছিস, এক কাপ চা দিয়ে যা বাইরে।

চা খেয়ে এসেছিলাম, স্যর।

বার্ণিশ করা চকচকে চেয়ারে বসে রণধীর বলে। জীবন সে কথার জবাব দেয় না,

যেন শুনতেই পায়নি। আপন খেয়ালে দার্শনিকের মতো কতগুলি মূল্যবান কথা শুনিয়ে যায় রণধীরকে,—সংসারটা, কি জানো রণধীর, বড় কঠিন ঠাঁই। অনেক বিবেচনা করে, অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষকে টিকে থাকতে হয় সংসারে। আত্মরক্ষাই ধর্ম্মো মানুষের—শুধু মানুষ কেন, সব জীবেরই ধর্ম্মো। যে নিজেকে বাঁচাতে পারে সেই বাঁচে, অন্যরা ধ্বংস হয়ে যায়। এ ছাড়া আর পথ নেই, উপায় নেই। এই দুর্ভিক্ষটা গেল, লাখ লাখ লোক মরল, তুমি আমি বাঁচলাম কি করে? আমরা যে ভাবে হোক খাদ্য যোগাতে পেরেছি, বেঁচেছি। ওরা পারেনি, মরেছে। চাকর চা এনে দিলে বলে, খাও। আপিসে নাকি গণ্ডগোল পাকাচ্ছে? কি বলেছে সবাই বলতো শুনি?

সবাই ভয় পেয়ে গেছে।

ক'জন নাকি দল বাঁধবার চেষ্টা করছে হাঙ্গামা করার জন্য? সতীশ আর নিবারণ সবাইকে উস্কাচ্ছে, না?

গরম চা-এ বিষম লাগে রণধীরের। কাপ থেকে চা উছলে পড়ে তার জামা কাপড়ে। কাপ রেখে নিজেকে রুমাল দিয়ে ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ে সে আশ্চর্য রকম শান্ত কণ্ঠে বলে আমি তো জানি না।

জান না? ও!

পরদিন সোমবার। একটু সকাল সকাল আপিসে যায় রণধীর। অন্যায় বরখাস্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করবার একটা চেষ্টা চলছে আপিসে সে জানে। কিন্তু বিশেষ তার শ্রদ্ধা ছিল না এ প্রচেষ্টায়। কেরানী জীবদের সে চেনে। আগে থেকেই আঁট ঘাট বেধেই কর্তারা উচ্ছেদ সুরু করেছে। সতর জন শুধু ওয়ার টাইমে নেওয়া নতুন লোক নয়, ওদের মধ্যে তিনজন আছে পুরানো, একজন কাজ করছে তের বছরেব ওপর। বেছে বেছে অকেজো অপদার্থ কয়েকজনকে তাড়িয়ে বাকী সকলকে রাখা হবে—আপিস তো থাকবে, লোক তো লাগবে আপিস থাকলেঃ এই রকম একটা জোরালো প্রচারও চলছে তলে তলে। অনেকে নিশ্চয় ভাবছে, অন্যের বেলা যাই হোক আমি হয়তো টিকে যাব। প্রতিবাদের একটু আগুন জ্বালাতে পারলেও তা মিন মিন করে জ্বলছে সমর্থনের অভাবে, গিধর, বাঙনা, জীবনেরা অনায়াসে ফুঁ দিয়ে তা নিভিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু কাল জীবনের সঙ্গে কথা বলে একটু খটকা লেগেছে তার মনে। এত আঁটঘাট বেঁধে ছাঁটাই সুরু করেও তো তেমন নিশ্চিন্ত নয় জীবন, কেরানীদের গোলমাল বাধাবার চেষ্টাকে মোটেই সে তুচ্ছ করে দিতে পারছে না। জীবন কেরানীদের কথা এত জানে, অথচ সে নিজে কেরানী হয়ে জানে না অবস্থা ঠিক কি দাঁড়িয়েছে। কিছু হবে না ভেবেই উদাসীন থেকেছে, এড়িয়ে চলেছে সকলের সঙ্গ। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি রণধীরের। আগ্রহ উত্তেজনা কৌতূহলের চাপে ছটফট করেছে।

অবিনাশ ছাড়া কেউ তখন আপিসে আসেনি। অবিনাশ তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে না। তার মস্তিষ্ক একটু শ্লথ। ঘণ্টাখানেক আগে না এলে কাজ সেরে,

আপিস থেকে বেরোতে সন্ধ্যা উৎরে যায়। ভাল করে কাজ না করার সাহসও তার নেই।

অবিনাশ বলে ধীরে ধীরে, তাই ভাবছি দাদা। হ্যাঁ, প্রোটেষ্ট একটা করা উচিত। ওদের রাখা হোক সবাই মিলে এ অনুরোধটা জানানো চলে। কিন্তু ওদের রাখতেই হবে, ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে, নইলে সবাই স্ট্রাইক করব, এটা উচিত মনে হয় না। ছাঁটাই তো চলছে না স্পষ্টই বলেছে সেকথা। অনেক লোক নিয়েছে, বাজে লোক ঢুকেছে কয়েকটা তার মধ্যে, তাদের যদি রিপ্লেস করতে চায়—

একটু দমে যায় রণধীর। তবে অবিনাশ লোকটাই আধ মরার মতো শ্লথ, নির্জীব। সকলে ওর মতো নয়।

একে দুয়ে অন্যেরা আসতে থাকে। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা কয় রণধীর। অবিনাশের মতো কথা কয় দু'একজন, কিন্তু সকলে অতটা নরম নয়। নিশ্চয় জোরালো প্রতিবাদ করতে হবে। যাদের বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের কেস আবার বিবেচনা করা হোক, যাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে তাদের বহাল রাখা হোক, এ দাবীও জানাতে হবে। তবে দাবী না মানলে তারা স্ট্রাইক করবে, এ ভয় দেখানো সঙ্গত হবে না। সে রকম অবস্থা দাঁড়ায়নি। কয়েকজনকে বরখাস্ত করা হয়েছে, বড় জোর আর দু'চারজনকে করবে—তাও করবে কিনা ঠিক নেই। কর্তৃপক্ষ তো স্পষ্টই জানিয়েছে যে এ আপিসে ছাঁটাই চালাবার প্রশ্নই ওঠে না। আবার খুব গরম হয়েও আছে কয়েকজন। তাদের কথা স্পষ্ট—শুধু প্রতিবাদ আর দাবী জানিয়ে হবে কচু।

আপিসের কাজ আরম্ভ হবার পরেও রণধীর বার বার এর টেবিল ওর টেবিলে হাতের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে আসে। এই সতেরটা বরখাস্তের মানে যে অনেকে ধরতে পারেনি একথা ভেবে তার অদ্ভুত এক বিস্ময় জাগে, লজ্জায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গুম খেয়ে খানিকক্ষণ নিজের জায়গায় বসে থাকার পর ধীরে ধীরে লজ্জা ও আপসোস কেটে গিয়ে বিস্ময় বোধটাই বড় হয়ে ওঠে তার মধ্যে। আর কারো সঙ্গে কথা বলার দরকার আছে বলে তার মনে হয় না! সকলের মন যেন স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে। ক্রোধ, ঘৃণা, অবিশ্বাস ধোঁয়াচ্ছে সবার মনে, কিন্তু এখনো ওরা বিশ্বাস আঁকড়ে আছে মানুষের ওপর, মানুষের কথায়—গিধর, বাঙনা, জীবনকে ঘৃণা করেও পুরোপুরি প্রত্যয় জন্মাতে পারছে না, ওরা একেবারেই অমানুষ, এতটুকু দাম নেই ওদের কথার, ওরা রক্তচোষা রাক্ষস।

সাড়ে এগারটার সময় পিয়ন এসে রণধীরকে দিয়ে যায় তার বরখাস্তের নোটিশ। রণধীর আশ্চর্য হয় না। নোটিশের আপিসী ভাষার মধ্যে সে জীবনের ঘরোয়া ভাষার ডাক শুনতে পায়। আমার কাছে এসে, ক্ষমা চাও, অনুগত হও, আমি থাকতে তোমার ভাবনা কি, নোটিশ আমি বাতিল করিয়ে দেব। আরেকটা কথা স্পষ্ট হয় রণধীরের কাছে এই নোটিশ পেয়ে। যারা তেজী গোঁয়ার মানুষ, হঠাৎ বরখাস্ত করলে যারা চুপচাপ তা মেনে না নিয়ে হৈ চৈ হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে পারে মরিয়া হয়ে, তাদের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ হঠাৎ কিছু করতে সাহস পায় না। সতের জন নিরীহ

মানুষকে ছাঁটাই-এর কবলে ফেলা হয়েছে অনায়াসে, তাকেও নির্ভয়ে নোটিশ দিয়েছে, কিন্তু সতীশ আর নিবারণকে অবিলম্বে দূর করা জরুরী হয়ে পড়লেও হঠাৎ ওদের নোটিশ দিতে ভরসা পাচ্ছে না কর্তারা, ওদের তাড়াতে হলে বিশেষ বিবেচনা, বিশেষ আয়োজন দরকার।

মনের মধ্যে পুড়তে থাকে। তাকে তবে এমন ভীরু কাপুরুষ, গোবেচারা মনে করে জীবন—জীবনের চোখে মানুষ হিসাবে তার মূল্য এই! কাকের কীর্তি আঁকা একটা চাল কুমড়ো—

একটা সিগারেট ধরিয়ে রণধীর স্থির দৃষ্টিতে সোজা তাকিয়ে থাকে পার্টিশনের কাঠটার দিকে। দু'চোখ তার জ্বল জ্বল করে। পার্টিশন থেকে তার চোখ উঠে যায় ওপাশের দেয়ালে। মনের মধ্যে একে একে চলে যেতে থাকে আপিসের ভিন্ন ভিন্ন দেয়ালগুলি।

তারপর সে রঙের টিন আর তুলি হাতে নিয়ে গিয়ে ঢোকে আপিসের একপ্রান্তে কর্মচারীদেরই স্বকীয় পায়খানাদি ও জলের কলের ঘরটিতে। দরজার পর সরু প্যাসেজের ডাইনে তিনটি খোপ, প্যাসেজের শেষে ট্যাপ, বাঁয়ে শুধু চুনকাম করা সাদা দেয়াল। বিবর্ণ হয়ে গেছে দেয়ালটা, তবু তাই ভালো। নোংরা দুর্গন্ধ এখানটা—কিন্তু এখানে কেউ তার কাজ ঠেকাতে পারবে না, দরজাটা বন্ধ করে দিলে নির্জনে নিশ্চিন্ত মনে কাজ করা যেতে পারবে।

বাধা কিন্তু পড়ে রণধীরের কাজে। কিছুক্ষণ পরে পরেই দরজায় ধাক্কা পড়ে, ডাক আসেঃ দরজা কে বন্ধ করেছে? দরজা খুলুন! রণধীর সাড়া দেয় না, তাড়াতাড়ি দেয়ালে তুলি চালিয়ে যায়।

টিফিনের ঘণ্টা কাবার হতে মিনিট পনের বাকী আছে, দরজা খুলে সে বেরিয়ে আসে। বাইরে থেকে জোরে জোরে ধাক্কা পড়েছিল দরজায়। বেরিয়ে এসে সে দেখতে পায় জন পাঁচেক সহকর্মী ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে অবিনাশও আছে।

এ দরজাটা বন্ধ করার মানে?

ভেতরে গিয়ে দেখুন।

তাড়াতাড়ি সে সরে যায়। আপিস থেকে বেরিয়ে ধীরে সুস্থে চা খেয়ে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে খানিক মানুষ ও গাড়ীঘোড়ার চলাচল দেখে টিফিনের ঘণ্টার পর প্রায় আধ ঘণ্টা দেরী করে ফিরে আসে। মনটা তার অপূর্ব পরিতৃপ্তিতে ভরে গেছে। আপিসে তার ঢুকতেই ইচ্ছা হচ্ছিল না।

নতুন একটা উত্তেজনা ও সাড়া যে পড়ে গেছে চারিদিকে, আপিসে পা দিয়েই সে তা টের পায়। একজন উত্তেজিত ভাবে কি বলছে আরেক জনকে, যে শুনেছে তার মুখে ফুটেছে বিস্ময়, তারপর সে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে কর্মচারীদের স্বকীয় পায়খানাদির ঘরের দিকে।

নিজের জায়গায় চুপ করে বসে থাকে রণধীর। অবিনাশ ধীরে ধীরে এসে কাছে দাঁড়ায়। শ্লথ নির্জীব মানুষ বেশ খানিকটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

—যা এঁকেছো তা কি সত্যি ভাই? ঠিক জানো তুমি?

জানি বৈকি।

অবিনাশের পর আরও অনেকে আসে। কেউ হেসে তার পিঠ চাপড়ে দেয়, কেউ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলে, চমৎকার এঁকেছো, কেউ বলে বেশ করেছো ভাই। অনেকেই তাকে প্রশ্ন করে। সে প্রশ্ন প্রায় অবিনাশের জিজ্ঞাসার মতোই।

ছুটির পর দু'চারজন ছাড়া কেউ বেরিয়ে যায় না। প্রথমে একত্র হয় আটদশ জন, তারপর কেউ না ডাকলে সেই ছোট দলটির চারিপাশে সকলে এসে জমা হয় কয়েক মিনিটের মধ্যে।

অবিলম্বে বরখাস্তের নামে ছাঁটাই বন্ধ করার ও যারা ছাঁটাই হয়েছে তাদের বরখাস্তের নোটিশ প্রত্যাহার করার দাবী এবং এই দাবী না মানা পর্যন্ত কোন কর্মচারী কাজ করবে না এই ঘোষণার নীচে প্রায় সকলেই স্বাক্ষর করে বাড়ী যাবার আগে।

ভুবন আসল খবর জানায় জীবনকে। জীবন ছুটে যায় ঘটনাস্থলে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে দেয়ালের পাশাপাশি দু'টি মস্ত ছবি ও লেখাগুলির দিকে। বাঁয়ের ছবির উপরে বড় বড় হরপে লেখা "১৯৪০ সাল—পরামর্শ!" ছবিতে ভুঁড়ির মতো গিধর ও বাঙনা এবং কাকের কীর্তির ছাপ মারা চাল-কুমড়োর মতো জীবনকে স্পষ্ট চেনা যায়। তাদের পিছনে বোর্ডে লেখাঃ "পারমানেণ্ট চাকরী—চলা আও!"

ছোট হরফে নীচে লেখাঃ গিধর বলছে—পারমানেণ্ট বলে লোক নিলে কত সুবিধা। গড়পড়তা বিশ রুপেয়া কম দিতে হলে লোক পিছু বছরে দুশো চল্লিশ রুপেয়া মুনাফা।

বাঙনা বলছে—তারপর বরখাস্ত করলেই হল।

জীবন বলছে—ঠিক কথা হুজুর!

পাশের ছবির উপরে লেখা "১৯৪৫—শেষ ভাগ।" ছবিতে একই তিনজন—মুখের বীভৎস হাসি শুধু বীভৎসতর হয়েছে। দেহের তুলনায় হাতগুলি প্রকাণ্ড—সেই হাতে সাপটে তুলে ছোট ছোট অনেকগুলি মানুষকে তারা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে ডাষ্টবিনে। কয়েকটা মানুষ পড়েছে ডাষ্টবিনে, হাতের মুঠোয় কয়েকজন লড়বড় করে ঝুলছে—লেখা আছেঃ পারমানেণ্ট কর্মচারী।

আর ডাষ্টবিনের গায়ে লেখাঃ বরখাস্ত।

জীবনের চোখ কপালে উঠে যায়। তখন তার চোখে পড়ে যে সব কিছুর ওপরে আরেকটা লেখা আছে মোটা হরফেঃ ছাঁটাই রহস্য।

চক্রান্ত

একমাস আগে পরে দুজনে চাকরি পেয়েছিল। প্রতিমা পেয়েছিল আগে দেড়শো টাকার। মহেশ মাসখানেক পরে শুরু করেছিল একশ টাকায়। তারপর অবশ্য মহেশ তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে গিয়েছিল প্রতিমাকে। যুদ্ধের অস্থায়ী চাকরি বলেই বোধ হয়। প্রতিমার চাকরিটা স্থায়ী হওয়ায় সে দেড়শো টাকাতেই ঠেকে গিয়েছিল কয়েক বছরের জন্য। চাকরি করে একদিন বাড়ির সকলকে মোটর চাপিয়ে হাওয়া খাওয়াবে বলেই মহেশকে পরীক্ষাগুলি পাশ করানো হয়েছিল। প্রতিমার কাছে অবশ্য ওরকম প্রত্যাশা কেউ করেনি। তাকে পরীক্ষা পাশের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কম খরচে ভাল জামাই জোটাবার ভরসায়। পড়াবার ঋণ যে এদিক দিয়ে এভাবে শোধ করবে সে বাড়ির কেউ ভাবতেও পারেনি।

মা বলেছিলেন মাথা চাপড়ে, চাকরি করবে? খেঁদি চাকরি করবে? ও মধুসূদন! ওগো মাগো! হায় গো ভগবান!

বাপ বলেছিলেন ধমক দিয়ে, চুপ কর তুমি। দেড়শো টাকা মাইনে—করবে না চাকরি? কত মেয়ে আজকাল চাকরি করছে, ওতে দোষ নেই।

তারপর বলেছিলেন ঝাঁঝের সঙ্গে, ছেলে! ছেলে তো রাজা করল তোমায়, বুড়ো বাপের পয়সায় সিগারেট টানছে, লজ্জা নেই! অমন ছেলের চেয়ে মেয়ে ভালো। ভগবান যদি রাখুকে নিয়ে খেঁদির মতো আরেকটা মেয়ে দ্যান—

এভাবে কথাটা বলা অন্যায় হয়েছিল দীনেশের, ছেলের মৃত্যু কামনা করার মতোই শুনিয়েছিল কথাটা। রাখালকে টেনে নিয়ে তার বদলে ভগবান প্রতিমার মতো আরেকটা দেড়শো টাকার চাকুরে মেয়েকে ধপ করে আকাশ থেকে ফেলে দেবেন, প্রার্থনাটা এতখানি খাপছাড়া হওয়া সত্ত্বেও।

প্রতিমাও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল, এটা তোমার অন্যায় বাবা। দাদা চাকরি করবে না বলেই তো, নইলে একশো দেড়শোর চাকরি দাদা খুশী হলেই নিতে পারে। আমি যদি মিস্টার ঘোষকে বলি, শ'খানেক টাকার পোস্ট একটা নিশ্চয় দাদা পেয়ে যাবে।

রাখাল ঘরের ভিতর ছিল না। বাড়ির কয়েকজনের যেখানে একসঙ্গে বসে কথাবার্তা চলে, রাখাল সেখানে কখনো থাকে না। সে তো জানে কি আলোচনা সবাই করে থাকে। পৃথিবী জুড়ে এমন একটা হানাহানি চলছে ভয়াবহ, এলোমেলো

উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে সকলের জীবন, কিন্তু এত বড় জোয়ান মদ্দ সে, রোজগার করছে না—এ ছাড়া কওয়া বলার কথা কারো কিছু নেই। লুঙ্গি পরে খালি গায়ে ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টানছিল, সিগারেটটা সত্যিই বাপের পয়সায় কেনা। গলির ওপাশে কলতলার ধারে বস্তির মেয়েদের জল নিয়ে মারামারি করা দেখতে দেখতে সে ঘরের ভেতরের আলোচনা শুনছিল। প্রতিমা তখনো আশ্বাস দিয়ে চলেছে বাপ-মাকে যে দাদাকে সে চাকরি পাইয়ে দেবে, বলে কয়ে রাজী করাবে চাকরি করতে। রাখাল তখন হঠাৎ ঘরে ঢুকে বয়স্থা চাকুরে বোনের গালে ঠাস করে বসিয়ে দিয়েছিল একটা চড়।

নিজে একেবারে চাকরিতে বাহাল হয়ে না এসে প্রতিমা এসব কথা বললে হয়তো মেজাজটা তার এতখানি খিঁচড়ে যেত না।

দীনেশ প্রায় মারতে উঠেছিল ছেলেকে, হুঙ্কার ছেড়ে বলেছিল, এই দণ্ডে বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। দূর হয়ে যা—বজ্জাত পাষণ্ড গুণ্ডা—এখখুনি বেরো।

বাড়িটা দীনেশের নয়, ভাড়াটে বাড়ি। আস্ত বাড়িটারও সে ভাড়াটে নয়, মাত্র দোতালাটুকু। রাখাল সেই দণ্ডে এক কাপড়ে দীনেশের দোতালা ছেড়ে চলে গিয়েছিল একতলায়। একতলার ভাড়াটে ফণি চক্রবর্তীর অল্পবয়সী বোকা বৌ মাধুরীর কাছ থেকে দশটা টাকা চেয়ে রাস্তায় নেমে গিয়েছিল। টাকাটা অবশ্য ফণি চক্রবর্তী পরে আদায় করে নিয়েছিল দীনেশের কাছ থেকে। কিন্তু চাওয়া মাত্র রাখালকে টাকা দেবার ব্যাপারটাকে সে যে কতকাল মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে মাধুরীকে ঠেঙাবার ছুতো হিসাবে কাজে লাগিয়েছে তার হিসাব হয় না।

উপর থেকে মাঝে মাঝে প্রতিমাদের কানে এসেছে ফণির বজ্রগর্জনঃ গেলেই হত রাখাল চাঁদের সঙ্গে? গেলি না কেন?

তারপর রাখালের আর কোন খবর মেলেনি। বৈশাখের মুহুর্মুহু বাজ ফেলা ঘন কালো আকস্মিক মেঘের মতো যে জ্বালাভরা নিরুপায় হতাশার বিষাদ মহা-সমারোহে ঘনিয়ে এসেছিল সেদিন এ বাড়িতে, বাড়ির দুটি তলাতেই, আজও তা একেবারে মিলিয়ে যায়নি, কয়েকটা বর্ষা শীত বসন্ত যদিও ঘুরে গেছে ইতিমধ্যে।

অন্য সকলের বিষাদ কমে এল ক্রমে ক্রমে, প্রতিমার দুঃখ বেদনা গাঢ় ও গভীর হতে লাগল দিনে দিনে। দুরন্ত মর্মজ্বালার বৈশাখী ঝড়ো মেঘ উড়ে মিলিয়ে না গিয়ে পরিণত হয় জীবনের আকাশ-ঢাকা স্থায়ী শান্ত আষাঢ়ের বিষণ্ণ ভিজে মেঘে। রাখাল নিরুদ্দেশ হয়েছিল শুধু এজন্য নয়। মহেশও চলে গিয়েছিল, এজন্যও খানিকটা। দুজনে তারা ভাল চাকরি বাকরি পাওয়ায় তাদের মিলনের বাতিল-যোগ্য বাধাগুলি তুচ্ছ ও অকারণ হয়ে গিয়েছিল; তবু তো মিলন তাদের হল না, মহেশ চাকরি করতে চলে গেল জব্বলপুর।

হাজার বার মনে মনে নাড়াচাড়া করেও প্রতিমা মহেশের যুক্তিটা বুঝতে পারেনি। অস্থায়ী চাকরি—তাতে কি এসে যায়? যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন তো চাকরি থাকবে। কবে যুদ্ধের শেষ কেউ কল্পনা করতেও পারছে না আজ। তাছাড়া, যুদ্ধের

সঙ্গে অস্থায়ী চাকরিটা শেষ হলেও অন্য কোন চাকরি জুটিয়ে নিতে পারবে, এটুকু আত্মবিশ্বাস কি নেই মহেশের?

অথবা, সে বেশী মাইনের স্থায়ী চাকরি পেয়েছে বলে পুরুষের অভিমানে ঘা লেগেছে মহেশের, এটাই আসল কথা? প্রতিমা বিশ্বাস করতে চায় না, কথাটা কিন্তু কামড়ে থাকে মনের মধ্যে, তাকে ভাবতে হয়। জ্বালাভরা উদ্বেগের মতো চিন্তাটা তাকে পীড়ন করে। মহেশের একটা ছেলেমানুষী অভিমান তাকে বাতিল করে দিয়েছে এটা সে বিশ্বাস করতে চায় না, তবু সময় সময় এমন তুচ্ছ মনে হয় নিজেকে, এমন আঘাত লাগে তার নিজের অভিমানে!

তারপর মাইনের হিসাবে মহেশ তাকে ছাড়িয়ে গেল। তখন এদিকে জ্বালাটা কমলো প্রতিমার। কিন্তু চাকরিতে এত উন্নতি করেও মহেশ কেন ইতস্ততঃ করছে, অনেক দূরের ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ভয়কে আঁকড়ে রয়েছে ভেবে, আসল জ্বালাটা তার বেড়েই গেল।

তাদের দু'জনকে দূরে সরিয়ে দিলেও দু'জনের চাকরি যে দুটি সংসারকে চালু রেখেছে তাতে সন্দেহ নেই। চলতে চলতে লড়াই তখন প্রচণ্ড জোরে চলা আরম্ভ করেছে। জিনিসপত্রের দাম চড়তে আরম্ভ করেছে হু হু করে, বাজার পরিণত হয়েছে চোরা বাজারে। লক্ষ লক্ষ সংসার হয়ে এসেছে অচল, টলমল। লক্ষ লক্ষ মানুষের না খেয়ে মরবার সম্ভাবনা বাস্তব সত্যে পরিণত হতে আরম্ভ করেছে পথে ঘাটে গাঁয়ে গঞ্জে শহরে। মহেশের বাবার পেনসনের টাকায় তাঁর অতবড় সংসার তখন কোন মতেই চলত না। পেনসন এক পয়সা না বাড়লেও সংসার চালানোর উপকরণের দাম বেড়েছে বহুগুণ, একটা টাকা যেন হয়ে গেছে দু'আনির সামিল। দীনেশের সংসারও অচল হত। তার সদাগরী আপিসের চাকরির মাইনে বাড়ল না এক পয়সা, আপিসটার আয় প্রায় আড়াইশ গুণ বেড়ে যাওয়ায় কর্তারা তাকে মাগ্‌গী ভাতা দিতে আরম্ভ করল সাড়ে তের টাকা।

দু'জনে তারা মেনে নেয়, মেনে নিয়ে সান্ত্বনা পায় যে এদিক দিয়ে চাকরি করা তাদের সার্থক হয়েছে। কিন্তু নিজেরা সুখী ও সার্থক হয়েও তো অনায়াসে তারা চাকরি করে চালু রাখতে পারত সংসার দুটিকে। চাকরি পাওয়াতেই যখন বাধা সব বাতিল হয়ে গেল, মহেশ একা না পেয়ে দু'জনেই পাওয়াতে আরও বেশী রকম গেল, তখন জাতের তফাৎ নিয়ে অশান্তি হত না দু'টি পরিবারে। প্রতিমার মা বড় জোর বলত মাথা-কপাল চাপড়ে—জাত ধম্মোও নিলে মধুসূদন! কিন্তু বরণডালা সাজিয়ে বেজাত জামাইকে সাদরে সাগ্রহে অভ্যর্থনাও যে করত সন্দেহ নেই—তার চাকুরে মেয়ের বিনা খরচায় পাওয়া চাকুরে জামাই। পাওনা-গণ্ডায় ঘাটতির আপসোস মহেশের বাবা সামলে উঠতো রোজগেরে বৌ পেয়ে—যার দেড় দু'বছরের রোজগার ছাপিয়ে যাবে একসঙ্গে পাওয়ার প্রত্যাশাকে। মিলনের জন্য উন্মুখ, উদ্‌গ্রীবও হয়ে উঠেছিল দু'জনেই। তবু পর হয়েই দূরে দূরে তাদের থাকতে হল কেন—এক অনিশ্চিত কালের জন্য, প্রতিমা ভেবে পায় না।

জব্বলপুর রওনা হবার আগের দিন সন্ধ্যায় মহেশ বিদায় নিতে এসে চা খেতে

চেয়েছিল—খোলা ছাতে ঘামেভেজা জামা খুলে খালি গায়ে পাটিতে পা ছড়িয়ে পিছনে হেলে দুহাতে ভর দিয়ে বসে। দিনের অবসানে সন্ধ্যার বিচিত্র পরিবর্তনগুলি তখন সবে ঘটতে শুরু করেছে আকাশ ও পৃথিবীতে। পৃথিবীতে আলো জ্বালা নিষেধ, সন্ধ্যাদীপের শিখা বাইরে থেকে নজরে পড়লেই জরিমানা, জেল। চাঁদ ও তারা মানুষের হুকুম না মেনে আলোছায়ার ঝিকিমিকি খেলা শুরু করেছে। মৃদু বাতাস সস্নেহে মুছে নিয়ে যাচ্ছে দুজনের সারাদিনের কাজের শ্রান্তি আর ঘাম। ও বাড়ির কাঁকলাস কিশোরটার বাঁশের বাঁশীতে ছড়িয়ে পড়েছে আথালি পাথালি মাথা কপাল কোটা ব্যথার কাকুতি। ভয়ে তারা অবশ হয়ে গিয়েছিল। কথা জড়িয়ে গিয়েছিল তাদের। নির্বাক স্তব্ধতায় মরিয়া হয়ে উঠেছিল তারা। কিন্তু নিজের হাত দিয়ে অপরের হাতটি পর্যন্ত ছুঁতে তারা একজনও ভরসা পায়নি, অপরজনের মনে কষ্ট দেবার ভয়ে।

এক বছরের মধ্যে পারমানেণ্ট করে দেবে বলেছে।

ওদের কথা কি—?

যেদিন পারমানেণ্ট হব, সেদিন ছুটে আসব—ছুটি দিক না দিক। আজ যাই খেঁদি—কেমন যেন খারাপ লাগছে।

বলে মহেশ পালিয়ে গিয়েছিল! তার মুখের ভাষার মানে বুঝতে অসুবিধা হয়নি প্রতিমার। তার নিজেরও অসহ্য লাগছিল প্রতিটি মুহূর্ত। বিদায় নেবার আগের দিন নির্জন ছাতে পরস্পরের সঙ্গ অসহ্য হয়ে ওঠা আর খারাপ লাগা একই কথা।

ঠিকে ঝি আহ্লাদীর ছেলেটা একটানা কেঁদে চলেছে—রোয়াকের কোণে এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে। ছমাসের বাচ্চাটাকে সাথে নিয়েই সে কাজ করতে আসে, ঘরে ছেলে ধরবার তার লোক কেউ নেই। কাজে ফাঁকি দেয় না, একপাশে ছেলেটাকে ফেলে রেখে কাজ করে যায়, একটানা কান্না শুনেও ফিরে তাকায় না, শুধু প্রাণপণে চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে। মাঝে মাঝে তফাৎ থেকেই বাচ্চাটাকে উদ্দেশ্য করে বলে, এই যে সোনা! এই যে সোনা! এই যে সোনা!

প্রতিমা মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে বলে, একটু সামলে নাও ছেলেকে আগে।

তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাত ধুয়ে আহ্লাদী বাচ্চাকে কোলে নিয়ে মাই দিতে বসে।

গোড়ায় জানলে ওকে প্রতিমা রাখত না। প্রথম দুদিন বাচ্চাটাকে আহ্লাদী সঙ্গে আনেনি—কোথায় কার কাছে ফেলে এসেছিল কে জানে! ছেলেটা মেঝেতে পড়ে কাঁদে বলেও আহ্লাদী যেন অপরাধী হয়ে থাকে। অন্য ঝিদের তুলনায় সে তাই আশ্চর্যরকম নরম, ভালভাবে কাজ করতে উৎসুক!

আপিসের বেলা হয়ে গেছে, স্নানের ঘরে তাড়াতাড়ি গায়ে মুখে একটু সাবান ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে প্রতিমা ভাবে, বিয়েটা যদি তারা সেরেই ফেলত মহেশ জব্বলপুর

যাবার আগে, একটা বাচ্চা যদি তার হত আহ্লাদীর মতো, আর আপিসের মেঝেতে বাচ্চাটাকে ফেলে রেখে তাকে কাজ করতে হত পেটের দায়ে—'

সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে প্রতিমার। পেটের দায়ে মানুষ কি করতে পারে আর মানুষকে কি করতে হয়, ভাবতে গেলেই গত মহাদুর্ভিক্ষের ভয়াবহ স্মৃতি শুধু এই শহরের বুকে যতটা প্রকট হয়েছিল চোখের সামনে তার ছবি নাড়া খায়—আজও তাজা হয়ে আছে মনের মধ্যে। পেটের দায়ের বাস্তব চেহারা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার নিজের অভিজ্ঞতায়। চাকরির রোমান্স নিঃশেষে উপে গিয়েছে। এ খুসীর চাকরি নয়, আত্ম-প্রতিষ্ঠার। নিজের আর আপনজনদের পেটের দায়েই তার চাকরি—নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে। বুড়ো দীনেশ রোগে অশক্ত হয়ে পড়েছে, তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে আপিস থেকে এক মাসের ছুটি ও এক মাসের বেতন দিয়ে। কুড়ি বছর বয়সে শুরু করে একত্রিশ বছর একটানা কাজ করে যাওয়ার কি অপূর্ব পুরস্কার! প্রতিমার রোজগারে আজ সংসার চলছে, এক বছরের বেশী। মাইনে বেড়েছে দশটাকা। আর অনেক পরে কাজে লাগলেও ইতিমধ্যেই দুটো ইনক্রিমেণ্টে মীণার বেড়েছে পঞ্চাশ,—তার বেলা দশ টাকা। কি আর করবে, কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে ফষ্টিনস্টি করাটা তার আয়ত্ত হয়নি। তাই তার শুধু কাজের মাইনে। কাজটা সুসম্পন্ন হওয়া আপিসেরই প্রয়োজন, তাকে দিয়ে ভালভাবেই কাজ চলছে, এইটুকু তার দাম। পুরুষ কাউকে রাখতে হলে অনেক বেশী মাইনে দিতে হত, এও তার একটা রক্ষাকবচ।' অন্য দাম না দিয়েই সে তাই রেহাই পেয়েছে। নইলে হয়তো ঘোষ সায়েবের সঙ্গে গাড়িতে যেতে অস্বীকার করার পরদিন থেকেই চাকরি আর তাকে করতে হত না।

স্নানের ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে মনের ভাব বদলে যায়। মুখে এক কলি গানও গুণগুণিয়ে ওঠে। কাল থেকে সে ছাড়া ছাড়া ভাবে উত্তেজনা বোধ করছে। সবার সঙ্গে তার জীবনকেও এলোমেলো অর্থহীন ব্যর্থতায় ভরে দিয়ে চলেছে যে কুচক্রীরা, তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ গত ক'বছরে স্থায়ী হয়ে গেছে তার মধ্যে, মহেশ আসছে এ খবরের ক্ষমতা ছিল না সাময়িক ভাবেও তা কাটিয়ে দেয়। মেঘের ফাঁকে রোদ ওঠার মতোই তার উল্লাস জাগছিল আবার ঢেকে যাচ্ছিল।

আজকালের মধ্যেই আসবে লিখেছে মহেশ। আর কিছু লেখেনি। চাকরি থেকে সে যে ছাঁটাই হয়েছে প্রতিমা তা জানে। মহেশ কিন্তু জানায়নি। কেন জানায়নি কে জানে! কি ভেবেছে মহেশ? কি স্থির করেছে? জানবার জন্য ছটফট করে প্রতিমার মন। এতদিন ধরে যত চিঠি লিখেছে তাকে, ভবিষ্যতের কথা এড়িয়ে গিয়েছে সবগুলিতে। মাঝে মাঝে শুধু লিখেছে যে অন্য ডিপার্টমেণ্টে ট্রানস্ফার হয়ে গিয়ে স্থায়ী চাকরি পাবার আশা আছে।

তাড়াহুড়ো করে স্নান সারতে পারে না প্রতিমা, তাই তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গুঁজে খাওয়া সারতে হয়। দীনেশের এসব ছিল টাইম-বাধা কাজ। ঘড়ি ধরে নাইতে যেত, মগ গুণে মাথায় জল ঢালত, খেতে সময় লাগত না এক মিনিট বেশী বা কম, রান্নার পদ বেশী হলেও নয়, কম হলেও নয়। এতটুকু ব্যস্ততা দেখা যেত না

দীনেশের, আস্তে চালানো কলের মতো ধীরে সুস্থে নাওয়া-খাওয়া সেরে, জামা জুতো পরে, ছাতাটি বগলে নিয়ে ঠিক সময়ে আপিসে রওনা হত! সেও হয়ত ওরকম হতে পারবে, আরও কয়েক বছর চালিয়ে যাবার পর। নাইতে যাবার আগে তার যে অদ্ভুত আলস্যটা আসে, উঠি উঠি করেও উঠতে পারে না, চটপট স্নানটা সেরে নেবে ভেবেও স্নানের যে আরামটা নেশার মতো পেয়ে বসায় কিছুতে স্নান সংক্ষিপ্ত করতে পারে না, সে আলস্য আর আরামের নেশা হয়তো একদিন তার কেটে যাবে। চাকরিতে বাপের মতো হয়ে চেহারাতেও হয়তো বাপের মতো হয়ে যাবে ততদিনে—গোলগাল মোটা।

আগের চেয়ে সে অবশ্য রোগাই হয়ে গেছে এ ক'বছরে, মোটা হবার কোন সূচনা এখনো দেখা দেয়নি।

প্রতিমা তাড়াতাড়ি আপিসের কাপড় পরছে, মহেশ এসেছে খবর পেঁছল। প্রতি মুহূর্তে সে তার আবির্ভাব প্রত্যাশা করেছিল, তবু তার মনে হল যেন এক পরম বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। সর্বাঙ্গ কিছুক্ষণ শিথিল অবশ হয়ে রইল তার রোমাঞ্চের পর। চোখ বুজে ঢোক গিলে মাথায় সে একবার ঝাঁকি দিয়ে নিল। কি বিশ্রী, কি অস্বাভাবিক এই উগ্র কামনা নিয়ে এত দীর্ঘকাল একজন মানুষের অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় দিন গোনা, দেহমন যা এমনভাবে ক্ষয় করে আনে। কাপড় ঠিক করে নিয়ে ঘর থেকে বেরোতে যাবে প্রতিমা, আরেকটু দেরী করতে হল। হঠাৎ চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল এক পশলা।

মহেশ রোগা হয়নি, আরও শক্ত সমর্থ সুশ্রী হয়েছে চেহারা। গাল ভরে ওঠায় তার মুখের চামড়া একটু রুক্ষ হওয়াতে বেশ জবরদস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

ফিরে এলে শেষ পর্যন্ত?

বিশ্বাস হচ্ছে না?

সবে তারা কথা শুরু করেছে, দীনেশের ভাঙ্গা গলার আওয়াজ ভেসে আসে, দশটা বাজে খেঁদি। আপিসে লেট হয়ে যাবে।

মহেশের সর্বাঙ্গে ব্যাকুল দৃষ্টি বুলাতে বুলাতেই নীচু গলায় প্রতিমা বলে, চলো বেরিয়ে যাই, কোথাও বসে কথা বলা যাবে নিশ্চিন্ত মনে। আপিস কামাই করেছি জানলে বাড়িতে সবাই খেয়ে ফেলবে প্যানপেনিয়ে, পাছে চাকরি যায়।

আপিস যাবে না? মহেশ জিজ্ঞেস করে রাস্তায় নেমে।

আজ আপিস যাব? প্রতিমা বলে ভর্ৎসনার সুরে, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতেই সারাদিন কেটে যাবে না? অনেক ঝগড়া আছে। প্রথমে বল দিকি, একটিবার ছুটি নিয়ে এলে না কেন? বারবার লিখলাম, তবু?

দুচার দিনের জন্য আসতে ইচ্ছা করতো না! সাতদিনের বেশী ছুটি দিল না একসঙ্গে। তা ছাড়া—

তা ছাড়া—?

নাঃ। এমনি।

আশ্চর্য হয়ে মুখ তুলে প্রতিমা মহেশের মুখের দিকে তাকায়। তাকে কিছু

বলতে শুরু করে হঠাৎ থেমে গিয়ে মনের কথা মনে রেখে দেবার স্বভাব তো ছিল না মহেশের। মহেশের মুখে অন্যমনস্কতার ছাপ তাকে আহত করে। প্রায় চার বছর পরে দেখা—এখনো পাঁচ মিনিট পূর্ণ হয়নি।

চাকরির কথাটাও বলতে গিয়ে বলতে পারছে না মহেশ, প্রতিমা বুঝতে পারে।

মহেশকে এক কাপ চাও দেওয়া হয়নি মনে ছিল প্রতিমার। চায়ের দোকান সামনে পড়ায় সে মহেশকে ভেতরে নিয়ে যায়। সে নিজেও চা খাবে। চাকরিতে ঢুকে চায়ের পিপাসা অদ্ভুত রকম বেড়ে গেছে প্রতিমার। পেলেই খায়, ভাত খাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যে খেতেও বাধে না। মাঝে মাঝে অম্বলে বুক জ্বলে—তবু। স্কুল কলেজ আপিসের টাইম, দেশী রেস্টুরেণ্টটি প্রায় খালি। চায়ে গুড়ের গন্ধ। মহেশ মুখ বাঁকায়। প্রতিমা নির্বিচারে খেয়ে যায়, তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

এইখানে এতক্ষণ পরে মহেশ চাকরির কথা বলে। তার কথার ঝাঁজে চমক লাগে প্রতিমার।—কিভাবে ঠকালো দ্যাখো। দুবছর আগে পারমানেণ্ট চাকরি পেয়েছিলাম একটা, রিজাইন দিতে চাওয়া মাত্র মাইনে বাড়িয়ে দিল, এক রকম কথা দিল যে, নিশ্চয় পারমানেণ্ট করে দেবে। আজ এক কথায় ছাঁটাই। বললে, এখানকার লেবার এক্সচেঞ্জ চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে। চার পাঁচদিন ধন্না দেবার পর কাল এক ইউরোপীয়ান ফার্মে পাঠিয়েছিল। ম্যানেজার বলল, ষাট টাকার চাকরি একটা দিতে পারি। ষাট টাকা!—

চার পাঁচ দিন'—? প্রতিমা সংশয়ভাবে প্রশ্ন করে।

আমি এসেছি দিন সাতেক। ভেবেছিলাম একটা কিছু ঠিক করে নিয়ে তারপর—।

টেবিলের সস্তা শ্বেত পাথরে কনুই রেখে দুজনে মুখোমুখি বসে থাকে চুপ করে। মহেশের তীব্র আতঙ্ক সে টের পায়, ছোঁয়াচ লেগে কেঁপে কেঁপে যায় তারও বুক। এ-তো সহজ কথা নয়! এমনভাবে হতাশ, দিশেহারা হয়ে গেছে মহেশ! মহেশ ছাঁটাই হয়েছে একথা আগে জানলেও তার তো বিশেষ ভাবনা হয়নি। সে ধরে নিয়েছিল, যুদ্ধের চাকরি গেছে তো গেছে, মহেশ আরেকটা চাকরি জুটিয়ে নেবে, নয়তো অন্য কিছু করবে। এই কদিনের চেষ্টায় চাকরি জোটেনি বলেই এমন ভয় পেয়ে গেছে মহেশ, এমন উতলা হয়ে উঠেছে! এমনভাবে ভেঙে পড়েছে তার আত্মবিশ্বাস! এতকাল পরে বাড়ি ফিরে দুটো দিন বিশ্রাম করেনি, একটা কিছু ঠিক করে না নিয়ে তাকে মুখ দেখাতে চায়নি সাতদিনের মধ্যে!

প্রতিমা খুব দমে যায়। সহানুভূতিতে বুক তার ভরে ওঠে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা অদ্ভুত গর্ব আর উল্লাস সে অনুভব করে অনেকদিন পরে, চার বছরের প্রতীক্ষাক্লিষ্ট ঝিমানো হৃদয় নতুন সুখ ও গৌরবে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তার জন্য, তারই জন্য মহেশের এই বিব্রত, বিপন্ন অবস্থা। চাকরি স্থায়ী নয় বলে চার বছর তাকে কষ্ট দিয়ে চাকরি হারিয়ে এসে দিশেহারা হয়ে গেছে মহেশ, পাগলের মতো একটা কিছু ঠিক করার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছে চারদিকে। কিন্তু সাতদিনের বেশী দূরে থাকতে পারেনি। ব্যর্থ হয়ে, হতাশ হয়ে তারই কাছে ছুটে এসেছে সান্ত্বনার জন্য, দরদের জন্য। মমতায় অবশ্য বুকটা টনটন করে প্রতিমার, কিন্তু সে কি করে

ঠেকাবে পুলকের রোমাঞ্চ, নোংরা গরম চায়ের দোকানে যদি বাস্তব হয়ে ওঠে তার মানস বাসর, ট্রাম, বাসের আওয়াজ যদি গান হয়ে ওঠে তার কানে!

কেন ভাবছ তুমি? প্রতিমা বলে দূরদের অনুযোগে, একটা কিছু হবেই। দুটো মাস নয় ঘরেই বসে রইলে, কি এসে যায়? এত ব্যস্ত হবার কি হয়েছে?

কি হয়েছে? এতক্ষণ পরে এই প্রথম বিশ্রী একটু হাসি ফোটে মহেশের ঠোঁটে, দু'মাস ঘরে বসে থাকলে—না-খেয়ে মরবে না সবাই?

প্রতিমা সরে যায়। সবাই মরে যাবে না খেয়ে, এই আতঙ্কে উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছে মহেশ—তার জন্য নয়! ক্ষীণ স্বরে কোন মতে বলে, তোমার বাবা তো পেনসন পান—?

মহেশ দু'চোখে অবিশ্বাস্য বিস্ময় নিয়ে তাকায় প্রতিমার দিকে।—বাবা? প্রায় এক বছর হল বাবা মারা গেছেন, জানো না তুমি?

প্রতিমা জানত না। মহেশ কোন চিঠিতে এ খবরটা তাকে জানায়নি। মহেশ চলে যাবার পর প্রথম দিকে ন'মাসে ছ'মাসে দু'চারবার অল্প-সময়ের জন্য প্রতিমা তাদের বাড়ি গিয়েছিল, তারপর নিজের জীবনচক্রে পাক খাওয়ার ধাক্কা সামলে চলতেই এমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে আর যাওয়াও হয়নি, খোঁজ নেবার তাগিদও সে অনুভব করেনি বিশেষ। আপনজনকে আপন ভাবা হয়ে ওঠেনি তার, তারা মরল কি বাঁচল ভাববার অবসরও হয়নি। মহেশই তার মন জুড়ে ছিল কিন্তু তার বাড়ির লোকেরা একটুকু স্থান পায়নি সেখানে। এমন স্বার্থপর সে? কান দুটি গরম হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে প্রতিমার লজ্জায়—ক্ষোভে।

তুমি তো লেখোনি কিছু। প্রতিমা বলে মরিয়া হয়ে সরল ভাবে। বাবার অসুখ হল, বিছানা নিলেন, চাকরি গেল। সেই থেকে আমি একা সংসার চালাচ্ছি। সোজা ঝঞ্ঝাট! এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। মামাতো বোনের বিয়ে হল, সে বিয়েতে পর্যন্ত যেতে পারলাম না—আমি যে কি অবস্থায় আছি।

প্রতিমার চোখ ছলছল করে এসেছে দেখে মহেশ বিব্রত, শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাকে বিব্রত, শঙ্কিত হতে দেখে প্রতিমা আত্মসম্বরণ করে। প্রশ্ন করে—বাস্তব, যুক্তিসঙ্গত।

তিনশো টাকা মাইনে পাচ্ছিলে। কিছু জমাওনি?

জমাইনি? সাতশো টাকা ধার জমিয়েছি! আমি একবার রাগ করে বাবাকে লিখেছিলাম, বড় বেশী খরচ হচ্ছে। বাবা তার জবাবে এক মাসের খরচের হিসাব পাঠিয়েছিলেন। সাত জনের দু'বেলার মাছ—একপোয়া! ছোটকুর জন্য একপোয়া দুধ, পেট ভরে না বলে আন্দেকের বেশী বার্লি মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। আফিম খান বলে বাবা আগে দেড় সের দুধ খেতেন, সেটা কমিয়ে দেড় পোয়া করেছেন। আর—

মহেশ সজোরে মাথায় ঝাঁকি দেয়, পরের মাস থেকে আরও পঁচিশ টাকা বেশী পাঠাতাম—অবশ্য নিজের খরচ কমিয়ে।

কথা যেন শেষ হয়ে যায় তাদের। আপিস কামাই করে সারাদিন মহেশের সঙ্গে

কথা বলবে ভেবেছিল প্রতিমা, সাড়ে দশটার সময় সে আর কথা খুঁজে পায় না। ট্রাম মোটরের শব্দকে তলিয়ে দিয়ে কিছুদূর থেকে এক মিছিলের আওয়াজ ভেসে আসে। চায়ের দাম মিটিয়ে তারা ফুটপাথে নেমে দাঁড়ায়। প্রৌঢ় যুব কিশোর সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা এগিয়ে এসে সামনে দিয়ে চলে যায়, গায়ে তাদের ব্যাজ আঁটা। এরা সবাই শিক্ষক, দেশের সবচেয়ে নিরীহ গোবেচারি অল্পে-সন্তুষ্ট শান্তশিষ্ট মানুষ। তারা আজ মরিয়া হয়ে দল বেঁধে শহরের পথে মিছিল করেছেন। ঠিক সামনে ফুটপাথ ঘেঁষে রিক্‌সার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে ঘর্মাক্ত রিক্‌সাওয়ালা। পান বিড়ি সিগ্রেটের দোকানে অল্প একটু জায়গায় পাঁচজন লোক ঘেঁষাঘেঁসি করে বসে হাতে বিড়ি বানাতে বানাতে, চোখ তুলে তুলে মিছিল দেখছে। ঝাঁটা হাতে যে তিনটি মেথরানী উপর তলার ব্যাঙ্কের ফুটপাথ-ঢাকা অলিন্দের থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে উদাস উপেক্ষার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মিছিলের দিকে, বার বার তাদের দিকেই তাকায় প্রতিমা। তিন জনেই যে ওরা জননী সে টের পায়—কম বয়সী ছিপছিপে মেয়েটা পর্যন্ত!

হঠাৎ প্রতিমা ব্যগ্র ভাবে নীচু গলায় বলে, আমি দেড়শো পাই, তুমি যদি ষাট টাকার ওই চাকরিটা নাও—গলা বন্ধ হয়ে যায় তার। ঠোঁট কামড়ে সে মাথা নামায়! মহেশের কাছে থেকে কোন সাড়া না পেয়ে মুখ তুলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে ভাবে, ভাগ্যে তার কথা মহেশ শুনতে পায়নি!

আমি আজ যাই খেঁদি?

আচ্ছা।

পরশু আসব। কাল একটা এপয়েণ্টমেণ্ট আছে। দেখি কি হয়।

পরশুই এসো। বিকালে এসো—ছটার সময়।

আচ্ছা।

মিছিলের পিছনের ট্রামে উঠে মহেশ যেন কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে ফুটবোর্ডে—দরজার মাঝখানের রডটা আঁকড়ে ধরে, অন্য মানুষের শরীরগুলির সঙ্গে সেটে গিয়ে। ফিরে সে তাকায় না, একবারও না।

প্রতিমা চায়ের দোকানে ঢুকে আরেক কাপ চা খায়। হাত ঘড়িতে সময় দ্যাখে এগারটা প্রায় বাজে। পৌঁছতে সাড়ে এগারটা হবে। মিছামিছি আপিস কামাই করে কোন লাভ আছে কি? তার চেয়ে নয় লেট হবে। মীণা তো প্রায়ই লেট করে আসে, সে নয় একদিন লেট হবে। আপিস যদি সে না যায়, কি করার আছে তার, কোথায় সে যাবে, সারাটা দিন কাটাবে কোথায়, কি নিয়ে?

চায়ের দাম দিয়ে প্রতিমা বাসে ওঠে। বাসে যত ভিড় হোক, বসতে পাওয়া যায়। প্রায় সবগুলি আসনের উপরে লেডিজ সিট লেখা থাকে—লেডি কেউ উঠলেই কণ্ডাক্টর পুরুষদের উঠিয়ে দিয়ে লেডিকে বসিয়ে দেয়। দেহে ভীরু কাপুরুষ হস্তার্পণ থেকে বাঁচা যায় বসতে পেলে।

আপিসের কাছে গিয়ে কিন্তু সে বাস থেকে নামে না। একটা দারুণ অনিচ্ছা, কঠোর প্রতিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। জীবনে আর সবকিছু তার বাতিল হয়ে

যাবে, শুধু থাকবে আপিস? দুজনের কথা তার মনে পড়েছে, আপিসে দিন কাটাবার অভ্যাস যখন হয়নি তখন যাদের যে কোন একজন সঙ্গে থাকলে দিন যে কোথা দিয়ে কেটে যেত টেরও পেত না— শুধু গল্প আর কথায়। কতকাল দেখা হয়নি ওদের সঙ্গে। আজ আপিসে না গিয়ে মিনতি আর সুধার বাড়িতেই ভাগাভাগি করে কাটিয়ে দেবে দিনটা।

গলির মধ্যে মিনতিদের বাড়ি। ভেতরে ঢুকে প্রতিমার চোখ পড়ে, মিনতির বড় ভাই মাখন বারান্দায় খেতে বসেছে। এতদিন পরে প্রতিমাকে দেখে সে নির্জীবের মতো বলে, অনেকদিন পর এলেন।

আপিস যাননি?

আপিস? যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে আবার আপিস কিসের?

কেন, আপনার তো যুদ্ধের চাকরি ছিল না?

সোজাসুজি না হোক, তাই ছিল বৈকি। যুদ্ধের জন্য কাজ বেড়েছিল, বেশী লোক নিয়েছিল। এখন কাজ কমেছে, ছাড়িয়ে দিয়েছে।

মাখনের বৌ আসছিল, কণ্ট্রোলের মোটা ছেঁড়া ছোট কাপড় পরা। পাতের সমস্ত ভাত মাখন ডাল দিয়ে মাখছে, থালায় আর শুধু একটু ঝিঙে কুমড়োর তরকারি। বাটি থেকে জলের মতো পাতলা আরেকটু ডাল মাখনের বৌ তার পাতে ঢেলে দেয়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নির্জীবের মতো প্রতিমাকে বলে, ভাল আছেন?

ম্লান বিষণ্ণ তার মুখ।

ঘরে থেকে মাখনের মা কথা শুনছিলেন, বেরিয়ে এসে প্রতিমাকে বলেন, আর বোলনা মা, চারিদিক থেকে লেগেছে। জামাইকেও নাকি ছাড়িয়ে দেবে দু'একমাসের মধ্যে।

মিনতিও ওই কথাই বলে যায় আগাগোড়া এতদিন পরে সখীর সঙ্গে দেখা, বলার যেন তার আর কথা নেই।

এবারেই গেছি আমি, মিনতি বলে, সেই অজ পাড়াগাঁয়ে শ্বশুর বাড়ি, সেখানে পাঠিয়ে দেবে বলছে। অ্যাদ্দিন চাকরি ছিল, মাসে মাসে খরচ দিয়েছে, শ্বশুর বাড়ি থাকতে লজ্জা করেনি—চাকরি গেলে একদিনও থাকতে পারবে না, অপমান বোধ হবে। আমাকে দেশে পাঠিয়ে নিজে মেসে হোটেলে থেকে চাকরির চেষ্টা করবে। আমি কত বলি, তুমি হোটেলে থাকতে চাও থাকো, আমি এখানে থাকলে দোষ কি? তা রাখবে না। বেশি বলতে গেলে চটে যায়। এমন বিশ্রী মেজাজ হয়েছে আজকাল—

প্রতিমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সমস্ত বাড়ি থমথম করছে জমাট বিষাদ। মিনতির কথায় শুধু হতাশা, দুর্ভাবনা, ভয়। বেলা তিনটে চারটে পর্যন্ত এ বাড়িতে থাকবে ভেবেছিল প্রতিমা, আধঘণ্টার মধ্যেই বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমে সে হাঁপ ছাড়ে।

সুধার কাছে যাবার ইচ্ছাটা অনেকখানি উপে গিয়েছে। সেখানে গিয়েও যদি একটু হাসি আনন্দের বদলে এমনি বিব্রত সঙ্কটাপন্ন মানুষের হতাশার কাহিনী শুনতে হয়? শুনতে হবে কি না জানবার তাগিদটাই যেন তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ট্রামে উঠিয়ে দেয়।

সুধা থাকে শহরের আরও উত্তরে, স্বামীর সঙ্গে ভাড়াটে বাড়িতে। মিনতির অনেক আগেই সুধার বিয়ে হয়েছিল তার তিনটি ছেলে মেয়ে, গত বছরখানেকের মধ্যে সংখ্যাটা যদি আর না বেড়ে থাকে।

ধীরেন নিজেই দরজা খুলে দেয়। বাড়িটা শূন্য, নিঝুম মনে হয় প্রতিমার।

সবাইকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি ওমাসে।

হঠাৎ ?

ধীরেন একমুহূর্ত চুপ করে থাকে। বোধ হয় তার মনে পড়ে এই মেয়েটি সুধার প্রিয়তমা সখী, তার সঙ্গেও এর পরিচয় আত্মীয়তার মতো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

ব্যাপার হল কি, একটা বড় বিপদে পড়ে গেলাম। আপিসে হঠাৎ ডিগ্রেড করে দিলে, মাইনে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেল। আমার কাজের দোষ দেখালে কতকগুলি, কিন্তু আসল কথা হ'ল লড়াই থেমে গেছে, একটা ছুতো করে মাইনে কমিয়ে দিল। রিজাইন দেই তো দেব, ওই মাইনেতে অন্য লোক নেবে। ভেবেছিলাম রিজাইন দেব, কিন্তু—

ধীরেন একটু হাসে। করুণ নয়, মর্মান্তিক জ্বালা ভরা হাসি। দেখলাম, ওটাকায় বাসা ভাড়া করে থাকা যায় না, অগত্যা সবাইকে পাঠিয়ে দিলাম দেশে। আগাম ভাড়া দেওয়া আছে বাড়িটার, নিজে তাই এ মাসটা আছি।

আপিস যান নি ?

আজ ছুটি। বড় মালিক মশায় কাল নরকে গেলেন, তাঁর সম্মানে ছোটমালিক মশায় আজ ছুটি দিয়েছেন।

মাথা ঘুরছিল প্রতিমার! আপিসে পার্টিশনের ছোট ঘুপচিটির মধ্যে নিজের অভ্যস্ত চেয়ারটির জন্য মন তার উতলা হয়ে ওঠে, ওই খানে সে যেন আড়াল হতে পারবে জগৎ থেকে, কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম পাবে।

প্রতিমা সোজা আপিসে চলে যায়। বাড়িতে দীনেশের অসুখের জন্য দেড়টার সময় আপিসে আসার কৈফিয়ৎ উপরওলা বিশ্বাস করে, আপিস ফাঁকি দেবার স্বভাব প্রতিমার নয়।

সারাদিনের শ্রান্তি প্রতিমাকে কাবু করতে পারে না, আপিস থেকে ফিরবার সময় শ্রান্তিতে বরং তার দেহমন শান্ত হয়ে যায়। উদার ক্ষমাশীল হয়ে ওঠে মনটা। ক্ষমা অবশ্য সে করে না চক্রীদের, যাদের চক্রান্ত জীবনটা তার দুঃখের তান্ডবে পরিণত করেছে, কিন্তু নিজের মর্মের শিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে অর্থহীন ভাব-প্রবণতার আত্মরতিকে এখন সে প্রশ্রয় দেয় না। তার নিজের জীবনের সমস্যা ও ব্যর্থতা বৃহৎ ও ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে যায় অসংখ্য জীবনে, নিজেকে ভুলে সে ভাবতে থাকে অন্য সংখ্যাহীন মানুষের কথা।

বাড়ির সদরের চৌকাঠ পার হবার সময় আহ্লাদীর ছেলের কান্না শুনতে পায় না আজ। প্রতিমা আশ্চর্য হয়, ভাবনায় পড়ে যায় আহ্লাদী তাহলে আজ কামাই করেছে, কাজে ফাঁকি দিয়েছে। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, উনুন ধরানোর কাজগুলি

হয়তো এখনো স্থগিত রেখেছে বাড়ির লোক আহ্লাদীর আসবার আশায়, সারাদিন খেটে খেটে এসে এই শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে এখন তাকে আবার ওই সব কাজে হাত লাগাতে হবে।

কলতলা থেকে বাসনের পাঁজা নিয়ে আহ্লাদী রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে প্রতিমা দেখতে পায় ভেতরে ঢুকেই, তারপর তার চোখ পড়ে বারান্দার কোণে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় শোয়ানো ঘুমন্ত শিশুটার দিকে।

বাসন রেখে এসে আহ্লাদী বলে, জ্বর হয়েছে দিদিমণি, গা-পোড়া জ্বর। অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

কাজ করতে এলি কেন তুই? ধমক দিয়ে বলে প্রতিমা।

না এলে তো মাইনে কাটবে। খাব কি? আহ্লাদী বলে দাঁতে দাঁত কামড়ে।

প্রতিমা বারকয়েক তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নেয়।

তোর স্বামী কি কাজ করে?

এতদিন এখানে কাজ করছে, প্রতিমা কোনদিন তার ঘরের খবর একটিও জিজ্ঞেস করেনি। আহ্লাদী চোখ নামায় মুখের তীব্র আক্রোশের ভঙ্গিটা তার নরম হয়ে আসে।

কলে খাটে। একটু থেমে যোগ দেয়, একজনের রোজগারে চলে না দিদিমণি।

একথা যেন বলার দরকার ছিল, কামাই করলে মাইনে কাটা যাবে বলে জ্বরে করেনি। আহ্লাদী চোখ নামায়। মুখের তীব্র আক্রোশের ভঙ্গিটা তার নরম হয়ে দিন চালানোর দায়ে আহ্লাদী ছেলে নিয়ে বাসন মাজতে আসে তার ঘরে এ তো চিরদিন সে জানত, কিন্তু সে যে কেমন দায় আজকের মতো এমন মর্মে মর্মে কি জানতে পেরেছিল সে কোন দিন? যাতাকলে নিজের জীবনটা পিষে যাচ্ছে জেনেছে বলে, মহেশ, মিনতি, তার স্বামী, মাখন, তার মা, বৌ, সুধা ধীরেন এদের জগতের জীবনগুলি পিষে যাচ্ছে অনুভব করেছে বলে, তবেই না আজ তার মনে পড়েছে এমন কত আহ্লাদী আর তার স্বামী আছে যারা গুড়ো হচ্ছে এই পেষনে? অন্ধকারে ছোট মেয়ের ভয় পাওয়ার মতো অদ্ভুত এক অন্ধ আতঙ্ক জাগে প্রতিমার। কোলের ছেলে মাটিতে ফেলে আহ্লাদীকে তার বাসন মাজতে হয়, তবু একবেলা কামাই করলে সে তার মাইনে কাটে, এই পাপের ফল কি ফলছে তার জীবনে? আহ্লাদীদের অভিশাপ কি লেগেছে মিনতিদের, সুধাদের, মাখনের মা-বৌদের জীবনে?

টিচার

রাজমাতা হাই স্কুলের সেক্রেটারি রায়বাহাদুর অবিনাশ তরফদার ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত টিচারদের কিছু সদুপদেশ দেওয়া স্থির করল। বুড়ো বয়সে এমনিতেই তার ঘুম হয় কম, তার ওপর এই সব যাচ্ছেতাই খাপছাড়া ব্যাপারে মাথা গরম হয়ে যাওয়ায় কদিন আর ঘুম হয়নি। টিচাররা ধর্মঘট করবে বেতন কম বলে, বেতন বাকি বলে, এটা সেটা হরেক রকম অসুবিধা আছে বলে চাকরি করতে! বাপের জন্মে রায়বাহাদুর এমন কথা শোনেনি। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তারা কি মজুর না ধাঙ্গড় যে ধর্মঘট করবে?

শুধু তার স্কুলে এসব গোলমালের সম্ভাবনা ঘটলে সে অবশ্য ব্যাপারটা গ্রাহ্য করত না! দুটো ধমক দিয়ে একটা মিষ্টি কথা বলে, সকলকে খেপাচ্ছে কোন মাথা পাগলা ইয়ং টিচারটি সন্ধান নিয়ে তাকে একচোট মজা দেখিয়ে সব ঠিক করে দিতেন অনায়াসে। কিন্তু সারা বাংলাদেশের সব স্কুলের টিচাররা জোট বেঁধেছে সম্মেলন করছে। খেতে পায় না ব্যাজ পরছে! করুক, পরুক। যা খুশি করুক অন্য স্কুলের টিচাররা, তার স্কুলে সে ওসব বিশ্রী কাণ্ড ঘটতে দেবে না, ও সব হীনতা স্বার্থপরতা স্বেচ্ছাচারিতা ঢুকতে পারবে না তার পবিত্র শিক্ষায়তনে।

স্বার্থ ভুলে, বিলাসের লোভ জয় করে, স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যকে হাসিমুখে বরণ করে, বিদ্যালয়ের মহান আদর্শ যারা গ্রহণ করেছে, দেশের যারা ভবিষ্যৎ মেরুদণ্ড তাদের গড়ে তোলার বিরাট দায়িত্ব পালন যাদের জীবনের ব্রত, বুনো রামনাথ যাদের গর্ব ও গৌরব, তুচ্ছ দুটো পয়সার জন্য, সামান্য দুটো অসুবিধার জন্য, তারা নিজেদের নামিয়ে আনবে, আদর্শ চুলোয় দেবে, শিক্ষা-দীক্ষাহীন অসভ্য মজুর-ধাঙ্গড়ের মতো হাঙ্গামা করবে, তা কখনো হতে পারে না, রায়বাহাদুর তা বিশ্বাস করে না। মোটামুটি এই ধরনের সদুপদেশ রায়বাহাদুর শোনাল শনিবার স্কুল ছুটি হবার পর। অবশ্য অনেক ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে, দমক-গমক-মূর্ছনা আমদানি করে, গুরু-গম্ভীর চালে।

'আপনারা কি বলেন?'

কে কি বলবে? সকলে চুপ করে থাকে। রায়বাহাদুরের ধৈর্য বড় কম, বিশেষত এখন এত লম্বা বক্তৃতা দেবার পর এই গরম এক ফোঁটাও আছে কি না সন্দেহ, কেউ কিছু বলতে গেলে হয়তো গালাগালি দিয়ে বসবেন, গালে চড় বসিয়ে দেওয়াও আশ্চর্য নয়। কিছু বলবার দরকারও ছিল না। টিচারদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে এটা

অফিসিয়াল মিটিং নয়, রায়বাহাদুরের নিজস্ব সদুপদেশ দানের সভা। চুপচাপ বসে শোনাই এখানে যথেষ্ট।

প্রৌঢ় হেডমাস্টার শশাঙ্ক কেবল একবার মাথা চুলকিয়ে বলে, 'আজ্ঞে তা বৈ কি। শিক্ষক-জীবনের মহান আদর্শের কথা কি তারা ভুলতে পারে।'

সভার শেষে শশাঙ্ক একান্তে আবার বলে, 'গত মাসের বাকি মাইনেটার জন্য একটু, যে-রকম দিনকাল, সংসার চালানোই—'

'কে উস্কানি দিচ্ছে জানেন?'

কবছর আগে হলে শশাঙ্ক হয়তো দু-একটা নাম উচ্চারণ করে ফেলত। কিন্তু শশাঙ্কবাবুও আর সে শশাঙ্কবাবু নেই, অনেক বদলে গেছে!

'আজ্ঞে, উস্কানি কে দেবে। একজন দুজনের উস্কানির ব্যাপার নয়, আপনি তো জানেন, দেশ জুড়ে এরকম চলছে।'

স্কুলের বাগানের দিকে চেয়ে থেকে রায়বাহাদুর বলে, 'গিরীন খুব পলিটিক্স করে বেড়ায় না কি?'

বুকটা ধড়াস করে ওঠে শশাঙ্কের, গিরীন তার জামাই। মনে মনে আরেকবার গিরীনকে অভিশাপ দিয়ে বলেন 'পলিটিক্স করে না। মিটিং ফিটিং হলে হয়তো কখনো শুনতে যায়। আর স্কুলে পলিটিক্স নিয়ে কিছুই হয় না।'

'হয় না? সেদিন স্ট্রাইক করে ছেলেরা স্কুলের মাঠে যে মিটিং করল?'

'আজ্ঞে সেটা ঠিক পলিটিক্যাল মিটিং নয়। প্রোটেস্ট মিটিং মাত্র। কলকাতায় স্টুডেন্টদের ওপর গুলি চালানো হল, তারই প্রোটেস্ট—'

'কলার কাঁদিটা বাত্তি হয়েছে না? এবার কেটে ঝুলিয়ে রাখলে পেকে যাবে দু-একদিনের মধ্যে, কি বলেন?'

'কাল মালীকে বলব। রাতারাতি যেন চুরি হয়ে যায় না, দেখবেন।' রায়বাহাদুর হাসল।

সন্ধ্যার পর গিরীন বাড়িতে আর সঙ্গে দেখা করতে গেলে রায়বাহাদুর আশ্চর্য হল না। গিরীনের সম্পর্কে তার প্রশ্নে ভড়কে গিয়ে শশাঙ্ক নিশ্চয় তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে দোষ কাটাতে, কথায় কথায় তাকে জানিয়ে দিয়ে যেতে যে ভুলচুক যদি সে করেই থাকে তিনি যেন ক্ষমা করে নেন, এবার থেকে সে সাবধান হবে। তাই যদি হয়, তবে ভালই।

গিরীন কিন্তু ওসব কথার ধার দিয়েও যায় না। খুব বিনীত ও নম্রভাবে পরদিন তার ছোট ছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন জানায়। রায়বাহাদুর অবশ্য বুঝতে পারে তার মানেও তাই। খানিকটা স্পষ্টভাবে জানানোর বদলে ইঙ্গিতে জানানো যে সে অনুগতই, রায়বাহাদুর যা অপছন্দ করেন তা থেকে সে তফাত থাকবে, তাকে চটাবে না।

'অন্নপ্রাশন? ছোট ছেলের? তা বেশ। কিন্তু আমি নেমন্তন্নে যাই না, বুড়ো শরীরে সয় না ও-সব। রায়বাহাদুর অমায়িকভাবে হাসে।

'আপনাকে পায়ের ধুলো দিতেই হবে।'—গিরীন বলে নাছোড়বান্দার জোরালো

অনুনয়ের সুরে, 'সকাল সকাল গিয়ে আশীর্বাদ করে আসবেন শুধু, একটু ফলমূল মুখে দেবেন। সবাই আশা করছি, মনে বড় আঘাত পাব না গেলে।'

রায়বাহাদুর যেতে রাজী হয়েছে ধরে নিয়েই যেন একটু ইতস্তত করে গিরীন আবার বলে, 'একটা কথা বলি আপনাকে, দোষ নেবেন না। খেলনা বা উপহার কিছু নিয়ে আসবেন না খোকার জন্য। আমাদের বংশের রীতি আছে, কোন কাজে রক্তের সম্পর্ক ছাড়া কারো কাছে সামান্য উপহারও নেওয়া চলবে না। ঠাকুরদা না তার বাবা অভিশাপ দিয়ে গিয়েছেন, একগাছি তৃণ নিলে নাকি বংশের সর্বনাশ হবে।'

'বলো কি হে?'

একটা দুশ্চিন্তা কেটে যায়, অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে গেলে কিছু দিতে হবে এ চিন্তাটা ছিল রায়বাহাদুরের। এবার একটু ভেবে গিরীনের একান্ত আগ্রহ দেখে, রাজী হয়ে বলল, 'এত করে যখন বলছ—'

সে কিছু খাবে না, কিন্তু এই সুযোগে মিষ্টি প্রভৃতি তার সঙ্গে কি দেবে না গিরীন? রায়বাহাদুর ভাবে। অনেকেই দেয়।

প্রায় দশটায় রায়বাহাদুর গিরীনের বাড়ি পৌঁছল। বাড়ি দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল, ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন উৎসবের চিহ্ন না দেখে আর বেশী। এত ছোট এত পুরানো এমন দীনহীন চেহারায় একতলা পাকা বাড়ি হয়, রায়বাহাদুর জানত না কারণ, এর চেয়েও খারাপ বাড়ি চারিদিকে অসংখ্য ছড়ানো থাকলেও সে কোনটার দিকে কখনো তাকিয়ে দেখেনি—এ ধরনের বাড়ির অধিবাসী কস্মিনকালেও তাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে সাহস পায়নি। ছেলের অন্নপ্রাশন রীতিমতো একটা উৎসবের ব্যাপার। তার ছেলের অন্নপ্রাশনে ব্যান্ড বেজেছিল, মেয়ের ছেলের অন্নপ্রাশনে সে অন্তত শানাই বাজায়। লোক গিজগিজ করে তার বাড়িতে, ছেলের বেলা বেশী হোক, মেয়ের ছেলের বেলা কম হোক, গিজগিজ করে। গিরীনের বাড়িতে লোক আছে বলেই মনে হয় না। ভেতর থেকে শুধু ভেসে আসে ছোট একটা ছেলে বা মেয়ের কান চেরা কান্না।

গাড়ির আওয়াজে বেরিয়ে এসে গিরীন তাকে অভ্যর্থনা জানায়, 'যথাসাধ্য আয়োজন করেছি, দোষত্রুটি ক্ষমা করবেন।'

যথাসাধ্য আয়োজন? বৈঠকখানার ভাঙা তক্তাপোশে, বিছানো ছেঁড়া ময়লা সতরঞ্চির এক প্রান্তে কুণ্ডলী-পাকানো ঘেয়ো কুকুরের মতো দলা পাকিয়ে বসে আছে খালি গায়ে জবুথবু একটা মানুষ, মেঝেতে লোমওঠা বিড়ালটা ছাড়া আর কোন জীবন্ত প্রাণী নেই ঘরে। তক্তাপোশ ছাড়া বসবার আসন আছে আর একটি, কেরাসিন কাঠের একটা টেবিলের সামনে কালিমাখা একটি কাঠের চেয়ার। দিনে বৈঠকখানা হলেও ঘরটি যে রাত্রে শোবার ঘরে পরিণত হয় তার প্রমাণ, গুটানো কাঁথা মশারির বাণ্ডিলটা জানালায় তোলা রয়েছে, তক্তাপোশের নীচে ঢুকিয়ে আড়াল করে গোপন করে ফেলবার বুদ্ধি বোধ হয় কারো মাথায় আসেনি।

'ইনি আমার বাবা', গিরীন পরিচয় করিয়ে দেয়, 'দুবছর ভুগছেন। আর বছর

ডাক্তার বলেছিলেন, কলকাতা নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেণ্ট করাতে, পেরে উঠিনি, সাত আটশো টাকার ব্যাপার।'

জবুথবু বৃদ্ধ কষ্টে চোখ মেলে তাকায়। দুটি হাত একত্র করে নমস্কার জানাবার মতোই যেন চেষ্টা করে মনে হয়। ক্ষীণকণ্ঠে কি বলে ভাল বোঝা যায় না।

'আসুন। ভেতরে চলুন।'

রায়বাহাদুরকে গিরীন বাড়ির মধ্যে একেবারে তার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। উঠান পেরিয়ে যাবার সময় এদিক ওদিক তাকায়, তাকিয়ে রায়বাহাদুর যথাসাধ্য আয়োজনের কোন চিহ্নই দেখতে পায় না। রোয়াকে একজন অল্প একটু হলুদ বাটছে, তার বাড়িতে দৈনিক রান্নার জন্য যতটা হলুদ বাটা হয় তার সিকিও হবে না। যে বাটছে তার বেশটা তার বাড়ির ঝিয়ের মতোই, তবে রায়বাহাদুর অনুমান করতে পারে মেয়েটি ঝি নয়, বাড়িরই কোন বৌ-ঝি। ওপাশে রান্নাঘরে খুন্তি দিয়ে কড়ায় ব্যান্নউন নাড়ায় রত বৌটির শাঁখা পরা হাতটি শুধু চোখের এক পলকে দেখেই কি করে যেন রায়বাহাদুর টের পেয়ে যায় যে সে গিরীনের বৌ।

চার ভিটেয় চারখানা ঘর তোলার সুযোগ থাকলেও, বৈঠকখানাটি বাদ দিলে ভেতরে ঘর মোটে দুখানা—রান্নাঘরের চালাটি ছাড়া। গিরীনের শোবার ঘরখানার নমুনা দেখেই রায়বাহাদুর বুঝতে পারে অন্য ঘরখানা কেমন, নড়াচড়ার স্থান কতটা, কি রকম আলো বাতাস আসে।

জলচৌকিতে পাতা পুরানো কার্পেটের আসনে বসে রায়বাহাদুরের দম আটকে আসে। ছোট ছেলে বা মেয়ের কান-চেরা কান্নাটা এখন খুব কাছে মনে হয়।

'কে কাঁদে?'

ছেলেটা কাঁদছে, ছোট ছেলেটা। যার মুখে ভাত–জ্বর আসছে বোধ হয় জ্বর আসবার সময় এমনি করে কাঁদে। জ্বর এসে গেলে চুপ করে যাবে।'

রায়বাহাদুর অস্বস্তি বোধ করে, এদিক ওদিক তাকায়, একটা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে মনে হয় তার। গিরীন নীরবে তাকে লক্ষ্য করে, ফাঁদে পড়া সিংহ জন্তুর দিকে শিকারী ব্যাধের মতো শান্ত নির্বিকার ভাবে মুখ তার থমথম করে মনের আপসহীন মনোভাবে।

'আপনি তো ভাল হোমিওপ্যাথি জানেন। সবাই বলে যে ডাক্তারী পাশ করেননি বটে কিন্তু আপনার ওষুধ একেবারে অব্যর্থ।' সে বলে ব্যঙ্গ ও তোশামোদের সুরে। 'ছেলেটাকে দেখে দিন না একটু ওষুধ? বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছে ছেলেটা।'

রায়বাহাদুর যেন রাজী হয়েছে তার ছেলেকে দেখে ওষুধ দিতে এমনি ভাবে দরজার কাছে গিয়ে গিরীন ডাকে, 'শুনছো? খোকাকে নিয়ে এসো শিগ্‌গির। আঃ, এসো না নিয়ে? দেরি করছ কেন?

নিজের অতিরিক্ত অধৈর্যের কৈফিয়ত দেবার জন্যই যেন রায়বাহাদুরের কাছে গিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলে, 'আর পারি না এদের সঙ্গে। আপনার সামনে আসবে যা পরে আছে তাই পরে, তাতেও লজ্জা। সম্বল তো সেই বিয়ের একখানা শাড়ি, একঘণ্টা লাগবে এখন সেখানা বার করে পরতে। আর পারি না সত্যি।'

সে এসে কৈফিয়তের বিরক্তি জানানো শুরু করতে না করতেই ছোট একটি কঙ্কাল বুকের কাছে ধরে পাঁশুটে রঙের রোগা একটি বৌ দরজা দিয়ে ঢুকছিল, এক নজর তাকিয়েই রায়বাহাদুর টের পায় পরনের কাপড় বদলে বিয়ের সময়কার একমাত্র শাড়িটি সে পরে আসেনি। এটাও সে টের পায় যে ওকে আসতে দেখেই গিরীন তার কাছে এসে শোনাচ্ছে তার বৌয়ের মানুষের সামনে বার হবার উপযুক্ত কাপড়ের অভাবের কথা। তার প্রায় পিছু পিছুই বৌটি ঘরে ঢুকেছে। মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে রায়বাহাদুরের। তার ভয় করে।

'ও তুমি এসেছ', গিরীন বলে নির্বিকার ভাবে, এইখানে শুইয়ে দাও।

রায়বাহাদুরের উলের মোজা আর পালিশ করা দামী চকচকে জুতো পরা পায়ের কাছে মেঝেটা সে দেখিয়ে দেয়। বৌ তার ইতস্তত করে, বড় বড় জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকায় তার মুখের দিকে। এত শীর্ণ বৌটি, এমন শুকনো বিবর্ণ তার রক্তশূন্য মুখ, কিন্তু তার রূপ দেখে ভেতরে ভেতরে মুচড়ে যায় রায়বাহাদুর। তার বাড়ির মেয়েরা, ফুলি ঝিটা পর্যন্ত যেন শুধু মেদ আর মাংস। গিন্নির কথা ধর্তব্যই নয়। তিনি প্রায় গোলাকার। তার মেজ মেয়ে আর মেজ ছেলের বৌ রোগা ছিপছিপে, বড় ছেলের বৌটাও ছিপছিপে ছিল বিয়ের সময়, আজকাল মুটোচ্ছে। গিরীনের ক্ষীণাঙ্গী বৌটির সাথে মিলিয়ে রায়বাহাদুর বুঝতে পারে। তার মেয়ে-বৌদের গড়নটাই শুধু ছিপছিপে, অতি বেশী মেদ মাংসেই তারা গড়া, প্রত্যেকে তারা তার গিন্নীরই সূচনা। সত্যিকারের রোগা, ক্যাংটা তরুণীকে চেয়ে চেয়ে দেখতে এত ভালো লাগে রায়বাহাদুরের এত তীব্র ইচ্ছা করে টিপে টুপে ছুনে দেখতে সত্যিকারের কঙ্কালসার তরুণীকে।

'কি করছ?'—গিরীন বলে বৌকে অনুযোগ দিয়ে, 'ওখানে শুইয়ে দাও। উনি পায়ের ধুলো ছোয়াবেন, আশীর্বাদ করবেন। ওষুধ দেবেন।'

'না! মা!' রায়বাহাদুর প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'আমি ওকে ওষুধ দিতে পারব না। ওর ভাল চিকিৎসা দরকার। ওকে তুমি ডাক্তার দেখাও, ভাল ডাক্তার দেখাও।'

'বিনা ফি'তে কোন্ ডাক্তার দেখবে বলুন?' গিরীন যেন আমোদ পেয়ে মুচকে মুচকে হাসে।

ভয় করে রায়বাহাদুরের। মাথাটা আবার ঝিমঝিম করে ওঠে। কতক্ষণ খেলা করবে গিরীন তার সঙ্গে কে জানে, তারপর এই বর্বর নিষ্ঠুর খেলার শেষে কি করবে তাই বা কে জানে। এরা বিপ্লবী, এরা খুনে এরা সব পারে। শশাঙ্কর জামাই বলে, তার স্কুলের একজন টিচার বলে বিশ্বাস করে একা একা এই ছদ্মবেশী খুনের খপ্পরে এসে পড়ে কি বোকামিটাই সে করেছে।

সব অবস্থাকে যেভাবেই হোক নিজেকে বাঁচানোর কৌশল খুঁজে বার করে কাজে লাগানোর চেষ্টা রায়বাহাদুরের মজ্জাগত। রায়বাহাদুর মাথা হেঁট করে থাকে কয়েক মুহূর্ত, সশব্দে নিশ্বাস ত্যাগ করে। হাতের তালুতে মুছে নেয় নিজের কপাল। তারপর মুখ তুলে বলেঃ

'মা, খোকাকে শুইয়ে দাওগে। কিছু তুমি ভেবো না মা। বৌমা-ই বলি তোমাকে,

গিরীন আমার ছেলের মতো। তোমার কোন ভাবনা নেই বৌমা, ছেলে তোমার ভাল হয়ে যাবে, আমি তোমার ছেলের চিকিৎসার ভার নিলাম। আমি এখুনি গিয়ে ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—'

'এখুনি যাবেন? তা হবে না, ফল টল একটু মুখে না দিয়ে গেলে বড় কষ্ট হবে আমাদের মনে। অকল্যাণ হবে আমাদের। আপনার মতো মানুষ বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—'

গিরীনের বিনয়ে বুকটা ধড়াস ধড়াস করে রায়বাহাদুরের। অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পায়ের চকচকে জুতোর দিকে। অতি কষ্টে বলে, বেলা মন্দ হয়নি। নিমন্ত্রিতেরা আর কেউ?'

'আজ্ঞে বলিনি আর কাউকে। ইচ্ছা ছিল বলবার, ভেবেছিলাম ওনার হাতের দুগাছা চুড়ি আছে তার একটা বেচে দিয়ে কয়েকজনকে বলব, স্কুল মাস্টারের স্ত্রীর হাতে শাঁখা থাকলেই ঢের। তারপর ভাবলাম ছেলের মুখে ভাতে শেষ সম্বলটুকু খোয়াবো তার চেয়ে বরং সম্বলটা থাক, ও মাসেও পুরো মাইনে না পেলে উপোসটা ঠেকানো যাবে।'

বুড়ো হলেও বুদ্ধির ধার একেবারে পড়ে যায়নি রায়বাহাদুরের। জীবনে উঠতে গিয়ে মুস্কিলে পড়তে হয়েছে অনেক বার, নিজের বুদ্ধি খাটিয়েই নিজের মুস্কিল আসান করেছে। আজকের বিপদের ধরনটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। এটাই হয়েছে ফ্যাসাদ। উদ্দেশ্যটা ধরতে পারছে না গিরীনের। নিজের দুর্দশা চোখে দেখিয়ে তার দয়া জাগাবার সাধ থাকলে চোখে এভাবে আঙুলের খোঁচা দিয়ে কি কেউ তা দেখায়, পাগল ছাড়া? তাকে বিরক্ত করে, চটিয়ে, এমন টিটকারি দেওয়ার ভঙ্গিতে দেখায়, এমন উদ্ধত বিনয়েব সঙ্গে? কাল টিচারদের সভায় কিছু না বলে গিরীন যেন ঘাড় ধরে তাকে বাড়ি টেনে এনে বাস্তব প্রতিবাদ জানাচ্ছে তার বক্তৃতার, ব্যঙ্গ করছে তাকে। কিন্তু কেন করছে সেটা তো কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না রায়বাহাদুরের। তার স্কুলের একজন টিচার কি এত বড় গাধা যে এই সহজ কথাটা বুঝতে পারে না। এভাবে তার কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ আদায় করা যায় না। এতে বরং তারই বিপদ, সমূহ বিপদ?

মুখের ভাবে গলার সুরে সহানুভূতি আনবার চেষ্টা করে রায়বাহাদুর বলে, 'তোমার অবস্থা এত খারাপ তা তো জানতাম না গিরীন। অ্যাপ্লিকেশন দিও, ওমাস থেকে দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব। তুমি ভাল পড়াও শুনেছি। আর বাকি মাইনেটাও বরং পাইয়ে দেব তোমায় সোমবার।'

গিরীন ভয় পেয়ে হাত জোড় করে বলে, 'তা করবেন না স্যার। লোকে বলবে ছেলের মুখের ভাতের ছলে আপনাকে বাড়িতে ডেকে খাতির করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়েছি, বাকি মাইনে আদায় করেছি। আমার সর্বনাশ করবেন না স্যার।'

চোখের পলক আটকে যায় রায়বাহাদুরের, ঢোক গিলতে গিয়ে দেখে সেটাও আটকে গেছে। ঘরের যে অসীম দৈন্য ভিখারীর সকরুণ আবেদনের মতো এতক্ষণ তাকে পীড়ন করছিল হঠাৎ যেন সেটা দাবিদারের শাসানির মতো ফুঁসে উঠেছে।

উঠানে তিনটি উলঙ্গ ছেলেমেয়ে খেলা করছে ধুলামাটি নিয়ে, খেলা যেন ছল ওদের, রায়বাহাদুরকে ওরা অবজ্ঞা জানাচ্ছে। ও ঘরে জ্বরো ছেলেটার কান্না ঝিমিয়ে এসেছে কিন্তু সেও যেন ভয় দেখালো রায়বাহাদুরকে, কান্না নিস্তেজ হয়ে আসা যেন ঘোষণা বাচ্চাটার যে কান্না সে চিরতরে থামিয়ে দেবে, সে মরবে, মরে দায়ী করে রেখে যাবে তাকে!

তাকে আরও শাসানো দরকার বলেই যেন গিরীনের পরিবারের আরও দুজনে এবার আসরে নামে। প্রৌঢ়া একটি স্ত্রীলোক তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে একটি কুমারী মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে আসে।

'দ্যাখ গিরীন, দ্যাখ, ধেড়ে মেয়ের কাণ্ড দেখ। ডাল ধুতে দিয়েছি, লুকিয়ে কাঁচা ডাল চিবোচ্ছে!'

গিরীনের মা থেমে যান, জিভ কাটেন। মেয়েটি পালিয়ে যায় হাত ছিনিয়ে নিয়ে। এক মুহূর্ত হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থেকে মা-ও সরে যান।

'আমি এবার উঠি গিরীন।'

'একটু বসুন।'

গিরীন বেরিয়ে যায়। গিরীন ফিরে আসবার একটু পরে সেই চুপি-চুপি ডাল-খাওয়া মেয়েটি একটি রেকাবিতে দুটি সন্দেশ, একটি কলা, কয়েক টুকরা আপেল ও শশা নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে ঘরে আসে। বাঙালী গেরস্ত ঘরের হিসাবে বিয়ের বয়স তার পেরিয়ে গেছে অনেকদিন। মেয়েটি রোগা পুষ্টির অভাবে সত্যিকারের রোগা। সত্যিকারের রোগা মেয়ের দিকে তাকাবার মোহ কিন্তু তখনকার মতো কেটে গিয়েছিল রায়বাহাদুরের, নীরবে সে দু-এক টুকরা ফল মুখে দিতে থাকে।

বৈঠকখানা দিয়ে যাবার সময় চৌকির প্রান্তের জরাজীর্ণ মানুষটি কষ্টে চোখ মেলে তাকায়, রায়বাহাদুর এক নজর দেখেই তাড়াতাড়ি চলে যায় বাইরে।

সোমবার গিরীন নোটিশ পায় বরখাস্তের নোটিশ। সে প্রত্যাশা করছিল। ক্ষমতা থাকলে ফাঁসির হুকুম দিত রায়বাহাদুর। কিন্তু একটা কথা জানে গিরীন। রায়বাহাদুর ভুলতে পারবে না, তার ভয় করবে। শিক্ষকদের দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করে শোনাতে গিয়ে একটু আটকে আটকে যাবে কথাগুলি, উচ্ছ্বাসটা হবে মন্দা, দয়া-মায়া সহানুভূতিতে নয়, ভয়ে।

একান্নবর্তী

চার ভাই, বীরেন, ধীরেন, হীরেন ও নীরেন। পরিবারের লজ্জা ও কলঙ্ক সেজ ভাই হীরেন। সে কেরানী। বীরেন ডাক্তার, ধীরেন উকিল, নীরেন দুশো টাকায় শুরুর গ্রেডে সরকারী চাকুরি পেয়েছে আর বছর। হীরেন সাতান্ন টাকার কেরানী, যুদ্ধের দরুণ পাঁচ দশ টাকা বোনাস এলাওন্স বুঝি পায়। হীরেনকে ভাই বলে পরিচয় দিতে একটু সরম লাগে ভাইদের। চার ভাই তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে তবু।

বাপের তৈরি বাড়িটাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বাজার করে রেঁধে বেড়ে, ঝি চাকর ঠাকুর, শুধু নিজেদের ভালমন্দ সুখ দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তিনটি অনাত্মীয় ভাড়াটের মতো তারা বাস করে। হঠাৎ টান পড়লে একটু চিনি, দুপলা তেল বা এক খাবলা নুন ধার নেওয়া হয়, এ সংসার থেকে ও সংসারে দান হিসাবে নয়। দুচার দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। রেশনের বা কালোবাজারের মাল আনা হলে সঙ্গে সঙ্গে নিখুঁত মাপে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বড় দু ভাই-এর বৌদের তরফের কোন আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিশেষ কোন উপলক্ষে খাবারটাবার মাছটাছ এমন জিনিস যদি এত বেশী পরিমাণে আসে যে নিজেরা খেয়ে শেষ করবার আগেই পচে নষ্ট হয়ে যাবে, বাড়তিটা ভাগ করে দেওয়া হয়। হীরেনদেরও দিতে হবে। কেরানী বলে তার বৌ এসেছে গরিব পরিবার থেকে, তার বাপের বাড়ির দিক থেকে কখনো কিছু আসে না পাঁচজনকে দেবার মতো, কখনো কিছু আসে না পাঁচজনকে দেখানোর মতো, কখনো আসবেও না, তবু উপায় কি। এটাই আসল কথা তাকে নিয়ে লজ্জা পাবার। একেবারে অনাত্মীয় ভাড়াটের মতো বাস করুক, বাস তো করে একই বাড়িতে, সবাই তো জানে সে তাদের ভাই, আত্মীয় বন্ধু পাড়াপড়শী সকলে। সেটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না কোনমতেই।

বিশেষত বুড়ী মা আছেন হীরেনের দলে। প্রায়ই তিনি অসুখে ভোগেন, সর্বদা জপতপ নিয়ে থাকেন। খান তিনি নিজের খরচে, কিন্তু তাঁর দুধটুকু জাল দেওয়া, দইটুকু পেতে রাখা, চাল ডাল তরকারিটুকু সিদ্ধ করে দেওয়া, এসব করতে হয় হীরেনের বৌকে। অসুখেবিসুকে ব্রত পার্বণে বাড়তি দরকারের জন্য বৌদের ডেকে হুকুম দেন কিন্তু রোজকার খুঁটিনাটি সেবা গ্রহণ করেন শুধু হীরেনের বৌ-এর কাছ থেকে। তাঁর রেশন কার্ড, কার্ডের মাল হীরেন পায়, মাসে দেড় মন দুমন কয়লার

দাম তিনি দেন, ঠিকা ঝির আট টাকা বেতনের দু টাকা দেন আর সাধারণভাবে সংসার খরচের হিসাব দেন দশ টাকা।

হীরেন ছাড়া সব ছেলের কাছে তিনি ভরণপোষণের মাসিক খরচও নিয়মমতো আদায় করেন কড়াকড়িভাবে। বীরেনের পশার বেশী, সে দেয় তিরিশ টাকা। ধীরেনের পশার হচ্ছে, সে দেয় কুড়ি টাকা। চাকরি হবার পর নীরেন বিশ বা পঞ্চাশ মা যা চাইতেন তাই দিত, আজকাল বড় বৌ-এর পরামর্শে দায়টা মাসিক পঁচিশ টাকায় বেঁধে দিয়েছে। নীরেনের বৌ নেই। এখন বিয়ে করেনি।

ভাইরা যখন ভাগ হয়, এক বাড়িতে উনান জ্বালাবার আয়োজন করে তিনটে, চটে লাল হয়ে গিয়েছিল নীরেন, লজ্জায় দুঃখে দাপাদাপি করে গালাগালি দিয়েছিল দাদাদের, বিশেষভাবে বড় দুজনকে। তখনও তার চাকরি হয়নি। তার খাওয়া পরা, পড়াশুনার খরচ দেওয়ার দায়িত্ব এড়াতে বিশেষ করে ভাইরা ভিন্ন হচ্ছে মনে করে আঁতে তার ঘা লেগেছিল। আরও তার পড়বার ইচ্ছা ছিল, বিলাত যাওয়ার কথাটাও নাড়াচাড়া করছিল মনে মনে। এ সময় এরকম পারিবারিক বিপর্যয় ঘটাতে তার আঁতকে ওঠার কথাই।

হীরেন তাকে বুঝিয়ে বলেছিল, 'কেন, এত ভালই হল? রোজ বিশ্রী খিটখিটে ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে। একটু দুধ, একটু করে মাছ, এই নিয়ে কি মন কষাকষি বল তো? দাদার আয় বেশী, তিনি ভালভাবে থাকতে চান। মেজদার ভাল উপার্জন হচ্ছে তিনিও খানিকটা ভালভাবে থাকতে চান। আমি সংসারে মোটে চল্লিশটা টাকা দিয়ে মজা করব, ওরা কষ্ট করবেন সেটা উচিত নয়। ভাই বলে কি কেউ কারো মাথা কিনেছে নাকি যে খাওয়াখাওয়ি কামড়াকামড়ি করেও এক সাথে থাকতে হবে ভাই সেজে? তার চেয়ে ভিন্ন হয়ে সদ্ভাবে ভায়ের বদলে ভদ্রলোকের মতো থাকাই ভালো।'

'তোমার চলবে?'

'চলবে না? কষ্ট করে চলবে। তবে অন্য দিকে লাভ হবে। মাথা হেঁট করে থাকতে হবে না, যাই খাই খুদকুড়ো হজম হবে।'

'নিজে ভিন্ন হলেই পারতে তবে এতদিন।'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ, তা পারতাম। তবে কিনা কথাটা হল এই যে—'

দুঃখী অসহায় গরিব কেরানী ভাইকে দয়া বা শ্রদ্ধা করে নয়, বড় বড় দুভাইয়ের ওপর নিদারুণ অভিমানের জ্বালায় নীরেন আরও পড়েশুনে আরও পরীক্ষা পাশ করে বড় কিছু হবার কল্পনা ছেড়ে চাকরির চেষ্টায় নেমেছিল। মার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল হীরেনের সংসারে।

চাকরি হবার পরেও, দুশো টাকার শুরুর গ্রেডের সরকারী চাকরি হবার পরেও প্রায় দুমাস হীরেনের সংসারে ছিল।

তিন সংসারের পার্থক্য ততদিনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। বড়বৌ পুলকময়ী আর মেজবৌ কৃষ্ণপ্রিয়া চটপট অদল-বদল করে নিজের নিজের সংসার সেজে ঢেলে গুছিয়ে নিয়েছে। আগেকার সর্বজনীন ভাঁড়ার ঘরটা ভেঙে-চুরে নতুন

জানালা দরজা তাক বসিয়ে পুলক করে নিয়েছে ঝকঝকে তকতকে সাজানো গোছানো আলো-বাতাস ভরা বড় আধুনিক রান্নাঘর। দেখে বুক ফেটে গেছে কৃষ্ণপ্রিয়ার আফসোসে। সে যদি চেয়ে নিত ভাঁড়ার ঘরটা রান্নাঘর করার জন্য। উনান টুনান বসানো নতুন তৈরি রান্নাঘরটা পেয়ে ভেবেছিল, খুব জেতা জিতে গেছে, ভাবতেও পারেনি দিন কয়েক বারান্দায় তোলা উনানে রান্নার কষ্ট সহ্য করে ভাঁড়ার ঘরকে এমন সুন্দর রান্নাঘর করা চলে। সেজবৌ লক্ষ্মীও তাকে ঠকিয়ে জিতে গেছে পুরানো নোংরা রান্নাঘরটা পেয়ে। মেঝেতে ফাটল আর গর্ত, কালি-ঝুল মাখা চুন-বালি খসা দেয়াল, একটু অন্ধকার কিন্তু ঘরটা মস্ত বড়, মিস্ত্রী লাগিয়ে কিছু পয়সা খরচ করলে ওই ঘরখানা দিয়েই বৌকে হারানো যেত।

চাকর বাজার করে, ঠাকুর ভাত রাঁধে, পুলকময়ী ঘরদুয়ার সাজিয়ে গুছিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, নিজে সাজে আর ছেলেমেয়েকে সাজায়, পাড়া বেড়ায়, নিন্দে করে কেরানী দেওর আর তার বৌয়ের। ধীরেন বাজার করে, ঠাকুর ভাত রাঁধে, কৃষ্ণপ্রিয়া সস্তা চটকদার আসবাব ও শাড়ি কিনে বড় বৌয়ের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দেবার চেষ্টায়, নিজের ঘরদুয়ার সাজিয়ে গুছিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, নিজে সাজে, মেয়েটাকে সাজায় অর্গ্যান বাজিয়ে গান করে, কেঁদে কেটে চিঠি লিখে ঘনঘন বড়লোক মামা-মামী মামাতো ভাইবোনেদের দামী মোটরে চাপিয়ে বাড়ি আনায় পাড়ার লোকের কাছে নিজেকে বাড়াবার জন্য, ফর্সা রঙ আর থলথলে মাংসল যৌবনের গর্বে মাস্টারনীর মতো পাড়ার মেয়েদের কাছে বর্ণনা করে পাড়ার প্রত্যেকটি মেয়ে বৌয়ের শোচনীয় রূপের অভাব, বানিয়ে বানিয়ে যা মুখে আসে বলে যায় শাশুড়ী ননদ জা দেওরদের বিরুদ্ধে।

তবু, পুলকময়ীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না বলে জ্বলে পুড়ে মরে যায়। যুদ্ধের বাজারে বীরেনের পশার বড় বেশী বেড়েছে, দু টাকার বদলে আট টাকা ফি করেও গাদা গাদা কল পাচ্ছে, ঘরে এনেছে দামী আসবাব, পুলককে দিয়েছে শাড়ি গয়না, মোটর কিনেছে সেকেন্ড হ্যান্ড, জমি কিনেছে সেকেন্ড হ্যান্ড, জমি কিনে আয়োজন করছে বাড়ি করবার। ধীরেনেরও ওকালতিতে পশার বেড়েছে বেশ, তবে বীরেনের ডাক্তারি পশারের সঙ্গে তুলনাই হয় না।

ভেবেচিন্তে কৃষ্ণপ্রিয়া হাত বাড়াল নীরেনের দিকে। মাসে চারশো পাঁচশো টাকা আনছে ছেলেটা মাইনে আর উপরিতে, বিয়ে করেনি, বৌ নেই।

নীরেনও যেন তার হাত বাড়ানোর জন্যই প্রস্তুত হয়ে ছিল। হীরেনের সংসারের অশান্তি, উদ্বেগ আর অভাবের সঙ্গে একটানা লড়াই, মা'র গুমখাওয়া একগুঁয়ে সেকেলেভাব জীবনে তার বিতৃষ্ণা এনে দিয়েছে। প্রায়ই তাকে বাজার করতে হয়, প্রায়ই তাকে গিয়ে দাঁড়াতে হয় রেশনের লাইনে, মার আবদার আব হুকুম সমানে চলেছে তারই ওপরে, আর যেন তার ছেলে নেই। তাছাড়া, সব বড় ভোঁতা, বড় নোংরা। বড় বৌ আর মেজবৌয়ের প্রায় চার বছর পরে বৌ হয়ে এসেছে লক্ষ্মী, তার ছেলেমেয়ের সংখ্যা ওদের দুজনের ছেলেমেয়ের সমান। সারাদিন সে শুধু রাঁধছে বাড়ছে ছেলেমেয়েদের খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে, বুড়ী শাশুড়ীর সেবা করছে, গাদা

গাদা জামা কাপড় সিদ্ধ করছে কপালকে দোষ দিচ্ছে, সর্বদা বলছেঃ 'মরলে জুড়োবো, তার আগে নয়।' ঘর সংসার সে সাজায় গোছায় অতি যত্নে, পুরানো বাক্স পেঁটরা, রঙচটা খাট-চেয়ার, ছেঁড়া কাপড়-জামা, ময়লা কাঁথাকানি নিয়ে যতটা সাজাতে গোছাতে পারে। রান্নাঘর ধোঁয়ায় দুবেলা—নোংরা রান্নাঘর, এ ঘরে রান্না করা ডাল ভাত মাছ তরকারি খেতে ঘেন্না করে নীরেনের। খেতে বসলে আবার প্রায়ই পুলক বা কৃষ্ণপ্রিয়ার রান্নাঘর থেকে ভেসে আসে ঘি মাংস পেঁয়াজ এলাচের গন্ধ।

'ঠাকুরপো, কাল তোমার নেমন্তন্ন। নিজে রেঁধে খাওয়াবো।'

কৃষ্ণপ্রিয়া বললে একদিন হাসিহাসি মুখে। সহজে সে হাসে না, তার দাঁতগুলি খারাপ।

'এমন অগোছাল কি করে থাকো ঠাকুরপো? ছি, ছি, চারদিকে ঝুল, খাটের নীচে নরক হয়েছে ধুলো জমে। কি ছড়িয়ে ভড়িয়ে রেখেছ সব। এতগুলো টাকা ঢালছ মাসে মাসে, ঘরটাও কি কেউ একটু সাফসুরত করে দিতে পারে না তোমার?'

তখন তখন নিজের ঝিকে নিয়ে ঝুল ঝেড়ে ধুয়ে মুছে সাফ করে কৃষ্ণপ্রিয়া, ঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়। আগে থেকেই সে ঠিক করে এসেছিল এটা সে করবে, নীরেন বুঝতে পারে। স্নান করতে যাওয়ার ঠিক আগে এসেছে পরদিন খেতে বলতে। ধুলো ঘেঁটে ঝুল মেখে ঘর সাফ করে সাবান মেখে স্নান করবে। খুশীই হয় নীরেন টের পেয়ে। খাতির পেয়ে অসুখী হবার কি আছে।

খেয়ে আরও খুশী হয় নীরেন। সব রান্নাই প্রায় ঠাকুরের, দুটি বিশেষ জিনিস শুধু কৃষ্ণপ্রিয়া রেঁধেছে। লক্ষ্মীর কোনমতে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে দায়সারা একঘেয়ে রান্না নয়। চব্বিশ ঘণ্টা ছেলেমেয়ের নোংরামি ঘাঁটা কোন মানুষের রান্না নয়, অপরিষ্কার সেঁতসেঁতে ঘরে পুরানো মলিন পাত্রে মোটকাহীন মরচেধরা টিনের কৌটার মসলার রান্না নয়। পরিবেশনে বারবার ব্যাঘাত নেই অন্য ঝামেলার, পরিবেশকের ভাবভঙ্গিতে নেই খাইয়ে দিয়ে আরেকটা হাঙ্গামা চুকিয়ে দেবার অধীরতা। পরিবেশক মাইনে করা ঠাকুর। বসে বসে ধীরেসুস্থে হাসিগল্পের সঙ্গে এক সাথে খাওয়া।

কৃষ্ণপ্রিয়া চালিয়ে যায় টানার আয়োজন, ওদিকে এতদিন পরে হীরেন আর লক্ষ্মীর সঙ্গে নীরেনের বাধতে থাকে খিটিমিটি।

মাসের শেষে আরও কয়েকটা টাকা সংসারে দরকার হলে নীরেন বলে, 'আমি টাকা দিতে পারব না। যা দিয়েছি আমার একার জন্য তার সিকিও লাগে না।'

হীরেন বলে, 'তা লাগে না। কিন্তু তুই একা মানুষ কি করবি অত টাকা দিয়ে?'

'যাই করি না।'

লক্ষ্মীর সঙ্গে বাধে অন্যভাবে, অনেক ভাবে।

'ছুটির দিন একটু দেরি করেও খেতে পারব না খুশিমতো?'

'ঠাকুর রেখে দাও, যত খুশী দেরি করে খেও। চোখ নেই তোমার ঠাকুরপো? দেখতে পাও না সেই কোন্ ভোরে উঠে জোয়াল ঘাড়ে নিয়েছি? দেড়টা বাজে, এখনো বলছ রান্নাঘব আগলে বসে থাকতে?'

'আমি যে টাকা দিই—'

'টাকা দাও বলে বাঁদী কিনেছ আমায়?'

এই দোষ লক্ষ্মীর, খাতির করে না, এতগুলি করে টাকা নীরেন ঢালে তার সংসারে, তবু। হীরেনও যেন কেমন ভাব দেখায়, ঠিক ছোট ভাই-এর মতো ব্যবহার করে তার সঙ্গে। মাসে মাসে এতগুলি টাকা সাহায্য করে ও সংসার সে চালু রেখেছে, একটু যে বিশেষ নম্রতার সঙ্গে একটু বিশেষ মিষ্টিসুরে কথা বলবে তার সঙ্গে সে চেষ্টাও নেই। মোটেই যেন কৃতজ্ঞ নয়, অনুগত নয় দুজনে। হাড়-ভাঙা খাটুনি আছে, অভাব অনটন চিন্তাভাবনা আছে, ঝঞ্ঝাট আছে অঢেল, কিন্তু সেইজন্যেই তো তাকে বেশী করে খাতির করা উচিত। তার সাহায্য বন্ধ হলে অবস্থা কি দাঁড়াবে ওরা কি ভাবে না? এত ভাবে, এ কথাটা ভাবে না। নীরেন নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায় ভেবে।

পরের মাসের পয়লা থেকে নীরেন ভিড়ে গেল কৃষ্ণপ্রিয়ার সংসারে। হীরেনকে কিছু কিছু সাহায্য করবার ইচ্ছা তার ছিল, কৃষ্ণপ্রিয়া অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে সে ইচ্ছাকে ফাঁসিয়ে দিল। বুড়ী মাকে মাসে মাসে সে চল্লিশ টাকা দেবে ঠিক হয়েছে। বুড়ী কি খাবে ও টাকাটা? হীরেনকেই দেবে। ও চল্লিশ টাকা একরকম সে হীরেনকেই দিচ্ছে। সোজাসুজি আরও দেবার কি দরকার আছে কিছু? না সেটা উচিত? ওরা তো যত পাবে ততই নেবে, কিছুতেই কিছু হবে না ওদের।

'তলে তলে টাকা জমাচ্ছে। বাইরে গরিবানা। বুঝলে না ঠাকুরপো?'

কৃষ্ণপ্রিয়াকে নিজের জন্য খরচের টাকা দিয়ে প্রতিদানে স্পষ্ট কৃতজ্ঞতা পেয়ে পুলক বোধ করে নীরেন। মাসে মাসে লক্ষ্মীর হাতে খরচের টাকা দিয়েছে, খরচ করে যা বেঁচেছে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এসেছে, লক্ষ্মী নির্বিকারভাবে আঁচলে বেঁধেছে নোটগুলি, ব্যাঙ্কের লোকেরা যেন তাকে গ্রাহ্যও করেনি। কৃষ্ণপ্রিয়ার হাতে নোটগুলি দিতেই আনন্দে সে এমন বিহ্বল হয়ে যায়! কথা বলতে গিয়ে এমন করে তোতলায়।

হেস্তনেস্ত যা হবার তা হল, পৃথিবী জোড়া মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করে তাদের পারিবারিক যুদ্ধ পর্যন্ত। যার যা দখল সে তা নিয়েছে, যে যেভাবে যার সাথে বাঁচতে চায়, সে সেইভাবে তার সাথে বাঁচবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কেনা জমিটাতে এবার বাড়ি তৈরি আরম্ভ করবে ভাবছে বীরেন। ইঁট বালি চুন সুরকি পাওয়া যাচ্ছে, লোহা এবং সিমেন্টও পাওয়া যাচ্ছে তলায় তলায়, কিছু বাড়তি খরচ আর ধরাধরি করার বিশেষ চেষ্টায়। কৃষ্ণপ্রিয়া মেয়ে খুঁজছে নীরেনের জন্যে, বাংলা দেশে একটিও মেয়ে মিলছে না পছন্দমতো, মেয়েদের যেন মেয়ে রেখে যায়নি যুদ্ধটা। মা জপতপ কমিয়েছেন। ভাবছেন তীর্থে যাবার কথা। ডাক্তার জোর দিয়ে বলেছে, গাড়ির কষ্ট আর বিদেশের অনিয়ম তাঁর সইবে না, মরে যাবেন।

'মরতেও পাব না আমি। এ হতভাগার জন্য মরবারও যো নেই আমার।' দুর্বল ক্ষীণ স্বরে বুড়ী মা কাতরিয়ে কাতরিয়ে আপসোস করেন, হঠাৎ গুম খেয়ে আশ্চর্য রকম শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি মরলে তো না খেয়ে মরবি তোরা, গুষ্টিশুদ্ধ?'

হীরেন বাহাদুরি দেখায় না, ক্ষীণ দুর্বল সুরে বলে, 'কেন অত ভাবছ বলত মা?

অত সহজে কি মানুষ মরে? দুর্ভিক্ষে দ্যাখোনি, একটু খুদ একটু ফ্যান খেতে পেয়ে কত লোক বেঁচে গেছে। তুমি এখন মরলে যেটুকু ভদ্রভাবে বাঁচছি তা থাকবে না বটে, ভদ্রত্ব ছাড়লে কি মানুষ বাঁচে না তাই বলে? চারটে ছেলেমেয়ের জন্য রোজ একপো দুধ, হপ্তায় দুদিন একপো মাছ, তাও নয় বন্ধ করব, রেশনের চাল আর চার পয়সার পুঁই শাক রেঁধে খাব। আমি বাঁচব, তোমার বৌটা বাঁচবে, ছেলেমেয়ে কটাও বাঁচবে দেখো। তবে হ্যাঁ, একথা সত্যি, এভাবে বাঁচার কোন মানে হয় না।'

'কি বললি?'

'বললাম বাঁচা কষ্ট বলে কি সাহেবের গাড়ির সামনে ঝাঁপ দিয়ে মরব? সাহেবের টুঁটিটা কামড়ে ধরে মরব। অত ভাবছ কেন? মরব না। কেউ আমরা মরব না।'

বুড়ী মা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, তীর্থে যাবার ছুতো করে এবার মরলে কেমন হয়? ভাবতে ভাবতে সামান্য একটা অসুখ হয়ে, চার ছেলের চেষ্টা বিফল করে, চৌষট্টি টাকা ফির ডাক্তারের ওষুধকে তুচ্ছ করে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি মারা গেলেন। তখন আরও শোচনীয় হয়ে পড়ল হীরেনের অবস্থা।

পুলকময়ীর ও কৃষ্ণপ্রিয়ার শাড়ি গয়না ঠাকুর চাকর, নিশ্চিত নির্ভর চালচলন, অবসর, সৌখিনতা, ভাল ভাল জিনিস খাওয়া, হাসি আহ্লাদ করা সব কিছু ঈর্ষা ক্ষোভ হতাশা হয়ে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে লক্ষ্মীর মন। মনে সে এই ভাবনার মলম দিয়ে সামলে থেকেছে যে বেশ্যারা পরম সুখেই থাকে। স্বামী পুত্র বুড়ী শাশুড়ীর জন্যে জীবনপাত করে খাটা, শাক-পাতা ডাল-ভাত পেটে গুঁজে কাজ করা, এ গৌরব ওরা কোথায় পাবে। নিজের মনে সে গজরগজর করছে, মরণ কামনা করছে শুধু গোপনে নিজেকে শুনিয়ে, হীরেনের ওপর ঝাঁঝ ঝেড়েছে শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিরদিনের চলিত দাম্পত্য কলহের মধ্যে।

কিন্তু এবার আর সইল না।

চারটি ছেলে-মেয়ের দুটি বড় হয়েছে, তারা শাক-পাতা ডাল-ভাত খেতে পারে, অন্য দুটিকেও তাই খাওয়ানো যায় কিছু কিছু, কিন্তু একটু তো দুধ চাই? একপো দুধ আসত, সেটা বন্ধ হল। সপ্তাহে দুদিন মাছের আঁসটে গন্ধ নাকেমুখে লাগত, তা আর লাগে না। যে সায়াটা ন্যাকড়ার কাজে লাগাতে হয়েছে, কৃষ্ণপ্রিয়ার মতো থলথলে যৌবন না থাক সেও তো যুবতী, বয়স তো তার মোটে সাতাশ বছর, সায়াহীন ছেঁড়া কাপড়ে দেহ ঢেকে তাকে চলতে ফিরতে হচ্ছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সবাই। কি এক কলকৌশল জেনেছে হীরেন, অভয় দিয়ে বলছে যে ভয় নেই আর ছেলে মেয়ে হবে না। এসব কি সত্যি? কখনো হতে পারে সত্যি মানুষের জীবনে? এসব ফাঁকি, এসব যুদ্ধের বোমা, এসব ভূমিকম্পের দিশেহারা পাগলামি, বাঁচতে হলে তেতলার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরতে হবে, নইলে বাঁচার কোন উপায় নেই। ছাতের আলসেয় উঠবার সময় হীরেন তাকে আটকায়। এত এলো-মেলো কথার পর এত রাত্রে তাকে ছাতে যেতে দেখে আগেই সে খানিকটা অনুমান করেছিল।

'আমি যদি মরি তোমার তাতে কি?' লক্ষ্মী বলে ঝাঁঝের সঙ্গে ছাড়া পাবার

জন্য লড়তে লড়তে হীরেনের বাহুমূলে কামড় বসিয়ে দিয়ে। হীরেন জানে লক্ষ্মীকে, ভালভাবেই জানে, সে তার চারটি সন্তানের মা।

কাঁদ কাঁদ হয়ে সে বলে, 'তুমি খালি নিজের কথাই ভাবছ লক্ষ্মী।'

চমকে থমকে যায় লক্ষ্মী। 'নিজের কথা ভাবছি? আমি মরলেই তো তোমার ভালো।'

'ভালো? তুমি মরলে আমি বাঁচবো?'

'বাঁচবে না? আমি মরলে তুমি বাঁচবে না? দাঁড়াও বাবু, ভাবতে দাও।'

বাঁচবে না? সে হার মেনে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরলে হীরেনও মরবে অন্য কোন রকমে। তাই হবে বোধ হয়। যে কষ্ট আর তার সইছে না সেই কষ্ট তো লোকটা তারই সঙ্গে সমানভাবে সয়ে আসছে আজ দশ এগার বছর। তাই বটে। লোকটা অন্য সব দিকে অপদার্থ হোক, এই এক দিকে খাঁটি আছে।

'আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। কতকাল জেগে আছি বল তো। একটু ঘুমবো আমি।'

ঘরে ফিরে গিয়ে চাদরহীন তুলো গিজগিজ করা ছেঁড়া তোশকে হীরেনের বুকে মাথা রেখে সে জেগে থাকে। হীরেনের কথা শোনে।

'সাতটা দিন সময় দেবে আমাকে লক্ষ্মী?. আমি বুঝেও বুঝিনি। যা করা দরকার করেও করিনি। মাছিমারা কেরানী তো। এই রকম স্বভাব আমাদের। যাই হোক, তুমি আমায় সাতটা দিন সময় দাও।'

'ওমা, কিসের সময়?'

'তুমি কিছু করবে না, ছাত থেকে লাফিয়ে পড়বে না—'

'আমি গিয়েছিলাম নাকি লাফিয়ে পড়তে?' লক্ষ্মী রাগ করে বলে, 'আমি যাইনি। কিসে যেন টেনে নিয়ে গিয়েছিল আমায়।'

সাতদিন সময় চেয়ে নেয় হীরেন, কিন্তু ব্যবস্থা সে করে ফেলে একদিনের মধ্যে। লজ্জায় লাল হয়ে দুঃখে ম্লান হয়ে লক্ষ্মী শুধু ভাবে যে, এত দুঃখের মধ্যে একটা খাপছাড়া পাগলামি করে বসে না জানি মনে কত দুঃখ বাড়িয়েছে সে লোকটার।

রাত নটায় হীরেন বাড়ি ফেরে। কচু সিদ্ধ আর ঝিঙে চচ্চড়ি দিয়ে দুজনে এক সাথে বসে ভাত খেয়ে ঘরে গিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে রাত এগারটার সময়। লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় ছিলে?'

'পাড়াতেই ছিলাম। রমেশ, ভুপেন আর কানাই আমারই মতো কেরানী, চেন তো ওদের? ওদের বাড়িতে। ভাল কথা, কাল ভোরে ওদের বৌরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।'

লক্ষ্মী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।—'বুঝেছি। তোমার তিন বন্ধুর তিন বউ আমাকে কাল বোঝাতে আসবে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়া কত অন্যায়।'

'না ওরা তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থা করতে আসবে, ওদেরও যাতে তেতলার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়বার দরকার না হয়।'

মোরগ-ডাকা ভোরে এল লতিকা, মাধবী আর অলকা। সঙ্গে এল এগারটি কাচ্চাবাচ্চা। আর বাজারের থলিতে ভরা চাল ডাল তরিতরকারি; বোতলে ভরা

সরষের তেল, ভাঙা টি-পটে নুন, বস্তায় ভরা আধমণ কি পৌণে একমণ কয়লা। কাঁচিদের মাই দিয়ে ছড়া গেয়ে গা চুলকে থাপড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে রাখা হল হীরেনের শোবার ঘরে! বাড়তি ছোট ঘুপছি ঘরখানা সাফ করে রাখা হল চাল ডাল তেল নুন তরিতরকারি। লতিকা উনানে আঁচ দিল, হীরেনদের রাত্রের এ'টো বাসন মাজতে গেল কলতলায়।

উনানে প্রথমে কেটলিটা চাপিয়ে সেটা নামিয়ে নিয়ে মাধবী চাপাল বড় স্যসপ্যানটা।

'আমাদেরই কম পড়ত এক কেটলি চায়ে, দুজন ভাগীদার বেড়েছে। তুমি চা খাও তো ভাই লক্ষ্মী? জানি খাও। কে না খায় চা?'

লক্ষ্মী জিভ কামড়ায়, জোরে কামড়ায়। ঘুমিয়ে না হয় স্বপ্ন দ্যাখে আবোল-তাবোল অনেক কিছু, জেগেও স্বপ্ন দেখবে। কিন্তু কোন প্রশ্ন সে করে না। দুর্বোধ্য যা তা কথার ব্যাখ্যা শুনে বুঝতে তার ইচ্ছা হয় না। এরা সবাই তার চেনা। আশেপাশে থাকে। তার মতো গরিব কেরানীর বৌ। চা রুটি খাওয়া থেকে ডাল ভাত খাওয়ার সব ব্যবস্থা এরা নিয়ে এসেছে। তার চিনিটুকু চালটুকু কালকের বাড়তি তরকারিটুকু, তেল নুনটুকু নিয়ে বাড়তি ছোট ঘরটায় জমা করেছে, নিজেদের সংগে আনা জিনিসের সঙ্গে।

লতিকা বলে, 'বাঁচলাম ভাই। তিন বাড়ির খাওয়ার জিনিস বাসনপত্র জায়গা পাই না, সব ছড়িয়ে থাকে, এ ঘরটা ছোট হোক ঘুপচি হোক, খাসা ভাঁড়ার ঘরের কাজ দেবে।'

মাধবী বলে, 'মস্ত রান্নাঘর। দুশো লোকের রান্না হয়। বাঁচা গেল।'

অলকা বলে, 'ভালই হল, তুমিই দলে এলে ভাই লক্ষ্মী। তিনজনে মিলে খরচ কমিয়েছিলাম, এবার আরও কমবে। পালা করে রাঁধব বাড়ব তারও একটা জায়গা নেই ভালমতো, না ভাঁড়ার না রান্নাঘর, কি যন্ত্রণা বল দিকি।'

অন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভয় করে লক্ষ্মীর। সারাদিন চুপচাপ থেকে রাত্রে সে হীরেনের কাছে জবাব চায়।

'লাগবে না? চারবাড়ির চারটে উনানে কয়লা পোড়ার বদলে একটা উনানে পুড়ছে। চারবাড়ির একদিনের কয়লা খরচে চারদিন না চলুক, তিনদিন তো চলবে? চারটের বদলে একটা ঝিতে চলবে। চারজনের বাজার যাওয়ার বদলে পালা করে একজনের গেলেই চলবে। চারজনের রাঁধার বদলে একজনের রাঁধলেই চলবে—চার দিনে তিন দিন ছুটি। এমন তো নয় যে অনেক দূর থেকে ভাত খেতে আসতে হবে কাউকে? চার পাঁচ হাত উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে চা ভাত খাওয়ার বদলে দশ বিশ হাত রাস্তা পেরিয়ে এসে খাওয়া এইটুকু তফাত। তার তুলনায় সুবিধা কত।'

লতিকা আজ রাঁধবে। একা যখন ছিল, নিজের বাড়িতে রোজ রাঁধতে হত, এখন একদিন রেঁধে সে তিনদিন ছুটি পায়। একদিন মানুষের খাওয়ার মতো কিছু যদি রাঁধত তো দুদিন কি রাঁধবে, কার পাতে কি দেবে ভেবে পেতো না,—আজ সে ভাল মাছ তরকারি রাঁধতে পেরেছে কোন চিন্তা ভাবনা না করেই।

তিনদিন পরে এই চারটি অনাত্মীয় পাড়াপড়শী একান্নবর্তী পরিবারের জন্য

রান্না করার ভার পায় লক্ষ্মী। বিয়ের পর একটানা তিনদিন বিশ্রাম ভোগ করা তার জীবনে এই প্রথম জুটেছে। ছেলে বিয়োতে আঁতুড়ে গিয়ে রান্নাবান্না না করতে হওয়াটা ছুটি নয়, ছেলে বিয়োনোর খাটুনি ঢের বেশী রান্নাবাড়ার চেয়ে।

আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলে, 'লতিকা, মাধবী, অলকা তোরাই আমায় বাঁচালি।' লতিকার ছেলে, মাধবীর মেয়ে, অলকার ভাই, এই তিনজনের সঙ্গে নিজের বাচ্চা দুটোকে সে দুধ খাওয়ায়। ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে সে মরতে গিয়েছিল কদিন আগে দিশেহারা হরিণীর মতো, আজ বাঘিনীর মতো বাঁচতে শুধু সে রাজী নয়, বাঁচবেই এই তার জিদ।

চালক

দোতলা বাস রাস্তা কাঁপিয়ে চলে, দুহাতে স্টিয়ারিং ধরে থাকে অজিত। গাড়ির ঝাঁকানি, স্টিয়ারিংয়ের কাঁপুনি, ইঞ্জিনের গর্জন আর গুরুগম্ভীর ভারিক্কি গতি তার মধ্যে অপূর্ব আনন্দের আলোড়ন তোলে, সর্বাঙ্গ দিয়ে সে অনুভব করে পৌরুষের সার্থকতা। ক'দিন ধরে সে বাসটা চালাচ্ছে, কিন্তু এত বড় একটা দৈত্যকে আয়ত্তে পাবার গর্ব, হাত ও পায়ের ইঙ্গিতে খুশিমতো থামানো, আস্তে বা জোরে চালানোর রোমাঞ্চ এতটুকু কমেনি, পুরনো হয়নি।

স্টার্ট দিতে, গাড়ির চলন্ত ইঞ্জিনটার একটানা দাপড়ানিতে, গিয়ার বদলাতে, স্টিয়ারিং ধরে থাকতে আর ব্রেক কষতে গিয়ে সে টের পায়, আগে সে যে ছোট বাসটা চালাত তার চেয়ে এ ইঞ্জিনের জোর কত বেশী, কত বড় আর ভারী এ-বাসটা! গাড়িতে প্যাসেঞ্জার কম হলে অজিতের মনটা খুঁতখুঁত করে বিরাট একটা ক্ষমতার যেন অপচয় ঘটছে, ছোট ছেলের কাজ করতে হচ্ছে জোয়ান-মদ্দ জবরদস্ত মানুষকে। ওপরে-নীচে গাদাগাদি করে প্যাসেঞ্জার উঠলে গাড়ি চালানোর উল্লাস তার বেড়ে যায়। একতলা বাসগুলির দিকে সে তাকায় অনুকম্পার দৃষ্টিতে। নিজেও সে যে কয়েক বছর ধরে একতলা বাস চালিয়ে এসেছে মাত্র কয়েকটা দিন আগে পর্যন্ত, তা যেন সে ভুলেই গেছে একেবারে। মন তার চিরদিন ছিল দোতলা বাসের দিকে, স্বপ্ন সফল হওয়ামাত্র একতলা বাসের দিনগুলি তুচ্ছ নগণ্য হয়ে গেছে তার কাছে। একতলা বাসের ড্রাইভারি পাবার পর যেমন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল ক্লিনার থাকার দিনগুলি।

সিনেমার সামনের স্টপে অনেক হবু প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে আছে চোখে পড়েছিল দূর থেকেই। আজ ঠিক টাইমে পৌঁছানো গেছে, সিনেমার দুপুরের শোটা সবে ভেঙেছে। এইজন্যই গাড়িটা সে এতক্ষণ থামিয়ে থামিয়ে ঢিমে চালিয়ে নিয়ে এসেছে, এখানে বোঝাই প্যাসেঞ্জার তুলে এবার জোরে চালিয়ে টাইম পুষিয়ে নেবে। সারা ট্রিপটা চলবে বোঝাই গাড়ি, ওপরে নীচে ঠেসে গিয়ে বাইরে পর্যন্ত বাদুড় ঝুলবে প্যাসেঞ্জার—ছুটির দিন হলেও প্যাসেঞ্জারের অভাব ঘটে না।

তফাত থেকে সিনেমার সামনে জমানো প্যাসেঞ্জার দেখেই অজিত হুস্ করে স্পিড বাড়িয়েছিল, স্পিডের মাথায় পিছু হেলে প্রাণপণে ব্রেক কষে গাড়ি থামায়। অ্যাক্সিডেণ্ট বাঁচাবার জন্য ছাড়া এরকম বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় খেয়ালের খাতিরে,

গাড়ির প্যাসেঞ্জাররা হুমড়ি খেয়ে ব্যথা পায়, গাড়িরও ক্ষতি হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে বাহাদুরি করার ঝোঁকটা সে সামলাতে পারে না। কন্ডাক্টর কেদার খিঁচিয়ে উঠে গাল দেয়। সে পুরানো লোক, নিয়মভঙ্গে বিরক্ত হয়। তার সহকারী ছোঁড়া উল্লাসে চেঁচিয়ে তারিফ জানায়। হবু প্যাসেঞ্জারের মধ্যে দাদা বৌদি আর তাদের দুটি মেয়েকে দেখে অজিতের খুশির সীমা থাকে না।

'মীনা! খুকু! বায়স্কোপ দেখতে এইছিলি? উঠে পড়! উঠে পড়! উঠে পড়!' মীনা ভুরু কুঁচকে ঠোঁট বাঁকায়, তার বয়স প্রায় ষোল। খুকু সবে দশে পা দিয়েছে, সে আগে আড়চোখে মা-বাবার মুখের ভাবটা দেখে নিয়ে হুট করার ভঙ্গিতে মুখ তুলে ঝাঁকি দিয়ে অবজ্ঞা জানায় স্পষ্টভাবে। অজিত চেয়ে থাকে রাস্তার অপর দিকে। বেলারানী হাতে দলা পাকানো ছোট্ট রুমালটি তিনবার নাকে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে তিনবারই নাক সিঁটকোয়।

অজিত হাই তোলে। অকারণে হর্ণটা বাজায়, পা টিপে টিপে ইঞ্জিনকে গর্জে গর্জে তোলে। আর সে তাকায় না। দাদা-বৌদি ভাইঝিদের দিকে, সোজা সামনে রাস্তায় চোখ পেতে রাখে। কনডাক্টরের ইঙ্গিত পেয়েই গাড়ি ছেড়ে দেয়।

দোতলা বাসের ড্রাইভারের এই আসনে বসে না থাকলে এ-ভুলটা সে নিশ্চয় করত না। পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে চলতে চলতে হঠাৎ ওদের দেখলে, এমনকি একতলা বাস চালাবার সময়ও ওদের বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে, আকার-ইঙ্গিতেও সে প্রকাশ পেতে দিত না যে, ওদের সে দেখেছে, ওরা তার আত্মীয়। দোতলা বাস চালানোর গর্বে আনন্দে ভুলেই গিয়েছিল ওদের কাছে সে ভদ্রলোক নয়; সে নিছক বাস-ড্রাইভার, শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের কলঙ্ক! খুশিতে আত্মহারা হয়ে নইলে কি সে রাস্তায় এত লোকের সামনে আত্মীয়তা ঘোষণা করে ওদের এমন লজ্জা দেয়—বাড়িতেও যে-চেষ্টা করার কথা দোতলা বাস চালাতে শুরু করার পরেও সে ভাবতে পারেনি? মাঝবয়সী হাবা ভদ্রলোকটিকে ব্রেক-কষা স্টিয়ারিং ঘোরানোর কৌশলে প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়ে সে ভেবেছিল তাকে এমন একটা বিরাট বাস চালাতে দেখে অবজ্ঞা করার বদলে ওরা আশ্চর্য হয়ে যাবে, সম্মান করবে তাকে।

চুলোয় যাক। দোতলা বাসে উন্নতি হয়েছে শুনেও নিজের বৌ যার নাক সিঁটকোয়, তার আবার দাদা-বৌদি ভাইঝিদের কাছ থেকে খাতিরের প্রত্যাশা!

সেটাই তার লাস্ট ট্রিপ। হিসাবমতো আগের ট্রিপটাতেই তার ডিউটি শেষ হত, ইন্দ্রজিৎ সিং সময়মতো না আসায় আরেকবার ঘুরে আসতে হয়েছে শহরের অপর প্রান্ত থেকে।

ইন্দ্রজিৎ পথেই গাড়িতে ওঠে, বাড়ির গলিটার মুখ পর্যন্ত বাস চালিয়ে নিয়ে অজিত নেমে যায়।

তখন আসন্ন সন্ধ্যা। বিড়িওয়ালা রহমত তার জন্য বেছে-রাখা কড়া শেঁকা বিড়ির প্যাকেট হাতে তুলে দিয়ে পয়সা নিয়ে হেসে বলে, 'কটা চাপা দিলে আজ?'

'এক শালাকে দিচ্ছিলাম। বাবুর হাতে রেশনের শাড়ি দেখে মায়া হল, সামলে নিলাম। বৌটা বুক চাপড়াবে।'

একসঙ্গে আটজন হাসে এ রসিকতায়, ছজন যারা বিড়ি পাকাচ্ছিল, রহমত আর অজিত। টাটকা একটা বিড়ি ধরিয়ে অজিত এগোয়—আস্তে আস্তে। হাড়ভাঙা খাটুনির পরও বাড়ি পৌঁছতে যেন তার অনিচ্ছা। দোতলা বাস চালাবার পরিশ্রম সহজ নয়, হাড়মাসে সে টের পাচ্ছে শ্রান্তি, তবু যেন মন চায় না বাড়ি পৌঁছতে। বাড়ির দুয়ার পর্যন্ত যেন তার আসল জীবনের, বাঁচার আনন্দের সীমা। তারপর শুধু কষ্ট। ভদ্র পরিবারে ভদ্রভাবে আত্মগোপন করে থাকার বিশ্রী কষ্ট। দি গ্রেট ক্যালকাটা লণ্ড্রী অ্যান্ড টেলারিং শপের কানাইয়ের সঙ্গে সে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলে। ট্যাক্সিচালক হরনামের ঘরের সামনে একহাত রোয়াকটুকুতে বসে জিগ্‌গেস করে তার ছেলেটার অসুখের খবর। বাড়ি পৌঁছানো যেন পিছিয়ে দিচ্ছে, যতক্ষণ পারে ঠেকাচ্ছে। খিদেয় পেট জ্বলছে তবু!

বাড়ির চৌকাট ডিঙালেই সে আর মানুষ থাকবে না, হয়ে যাবে হালদার পরিবারের লজ্জা, আপসোস, কলঙ্ক, জন্ম-বয়াটে, ম্যাট্রিক পাশে অক্ষম, বিড়ি ফোঁকা, দেশী খাওয়া কাঠখোট্টা ভূত—এককালীন মোটর ক্লিনার; অধুনা বাস-ড্রাইভার।

সদর পেরিয়েই অজিত সামনে পড়ে বুড়ো বাপের। সেঁতসেঁতে উঠানের চেয়ে আধ-হাত উঁচু বারান্দায় সেকেলে বেঢপ শক্ত কাঠের চেয়ারে বসেছিল রসিক হালদার, হাতে গড়গড়ার নল। অজিতের মা মোক্ষদা দু-তিন দিন অন্তর আছড়ে কলকে ভাঙে—টানাটানির সংসারে তামাক খেয়ে, দুটাকা সের তামাক খেয়ে, পয়সা নষ্ট করা তাঁর সয় না। গড়গড়া বা নলটা মোক্ষদা ভাঙেন না। এইজন্যে ভাঙেন না যে, ওসব নতুন কিনতে পয়সা লাগে অনেক এবং কেনা যে হবেই পৃথিবী চুলোয় গেলেও, সেও তো জানা কথাই। কলকে সস্তা।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

রসিক বলে গম্ভীরভাবে, কথার আগে ও পরে গড়গড়ার নলে জোরে জোরে টান দিয়ে।

অজিত আশ্চর্য হয়ে যায়। তার সঙ্গে কথা বলার জন্যই কি রসিক আজ এখানে ঘাঁটি আগলে বসে আছে? নতুন কি দোষ করেছে, নতুন কি কলঙ্ক লেপেছে হালদার পরিবারে, অজিত ভেবে পায় না। দাদা-বৌদি-ভাইঝিরা এসে কি নালিশ করেছে প্রকাশ্য রাজপথে তাদের সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার অমার্জনীয় স্পর্ধার বিরুদ্ধে? রসিক কি তাকে সতর্ক করে দেবে যাতে ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম কাজ না করে?

'বলুন।'

অজিত বলে বিস্ফোরণ-আটকানো বোমার মতো মৃদুস্বরে। বাবা! চার ছেলের বাবা। দুটি চাকরে আরেকটি এম-এ পড়া ছেলের জন্যই যার পিতৃত্বের পরম সার্থকতা, মোটর সাফ করা আর বাস চালানো অভদ্র ছোটলোক ছেলেটা তিন ছেলের ভদ্রজীবনে কলঙ্ক অমদানি না করে, এই যার শেষ জীবনের চরম ভয়। সে যে ভাই, এই কলঙ্ক সয়ে যাওয়াই ওদের পক্ষে অসীম উদারতা—এই যার বিশ্বাস এবং এই উদারতার জন্য তিনটি উপযুক্ত ছেলের কাছে যিনি রীতিমতো কৃতজ্ঞ। অজিত জানে, মুস্কিল

ওইখানে। তার জন্য বড় প্রাণ কাঁদে বুড়ো বাপটার। তিনি চান, ভাই তিনজনের কাছে নিজের অস্তিত্ব যতদূর সম্ভব লোপ করে, চোখ কান মুখ বুজে মাথা নীচু করে সে এই বাড়িতেই সুখে বাস করুক বৌ আর ছেলেটা নিয়ে!

সংসারে সে খরচ দেয়—কিছু বেশীই দেয় দুই রোজগেরে ভাইয়ের চেয়ে। ওদের অন্য খরচ বেশী, ভদ্রভাবে জীবনযাপনের খরচ, তাই তার চেয়ে প্রত্যেকের অনেক বেশী দেওয়া উচিত হলেও, কয়েক বছরের মধ্যে দু-এক মাস ছাড়া কোনবারেই বেশী দিতে পারেনি। দিতে পারে, অজিত জানে দিতে পারে। ব্যাঙ্কে জমানোটা একটু কমালেই দিতে পারে।

'মুখ হাত ধুয়ে চা'টা খেয়ে আয়।'

আজ যেন কেমন একটা ভাবান্তর ঘটেছে রসিকের, সে অনুভব করে। এমনভাবে রয়েসয়ে ভূমিকা করে তাকে সমালোচনা ও উপদেশ শোনানো রসিকের অভ্যাস নয়।

'চা খেয়েছি। চান করে ভাত খাব একেবারে। কি বলছিলেন?'

'তুমি বড় ব্যস্তবাগীশ!' গড়গড়াটা টানতে টানতে রসিক বলে, 'গুরুতর কথা শান্ত মনে বিচার করতে হয়।'

'আমার মন বেশ শান্ত আছে', অজিত শ্রান্তকণ্ঠে বলে, 'সারাদিন খেটেখুটে এসে চানটান করে খেয়ে বিশ্রাম না করে, সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না। কি বলছেন বলুন। নয়তো কাল বলবেন।'

'এই তো দোষ তোমার!' রসিক বলে, আপসোসের সুরে কিন্তু বেশী চটে না গিয়ে, সেটা আরও আশ্চর্য করে দেয় অজিতকে—'বিষয়ের গুরুত্ব বোঝো না তুমি। কথাটা হল কি, তুমি বরাবর অসিত সুজিতের সমান সংসার খরচ দিয়ে এসেছ। ওদের ডবল দেওয়া উচিত ছিল। যাকগে, অসিতের মেয়ের বিয়ের ভাবনা আছে, সুজিতের বৌটা নিত্য রোগী, এক মেয়ে বিয়োতে ওর হাজার টাকা খরচ—ভবিষ্যতে কি যে করবে ভগবান জানেন! আমি বলি কি, ওদের সঙ্গে তোমার কোন মিল নেই, ওরা একরকম, তুমি আরেকরকম। কি দরকার একসাথে থাকবার? আমার জন্যে আমার ভয়ে একসাথে থেকেছে, নয়তো কবে তোমায় খেদিয়ে দিত। এ অবস্থায়, আমার মতে, তোমার ভিন্ন হওয়া উচিত। ওই বাড়তি ভাঁড়ার ঘরটা তুমি রান্নাঘর করতে পার—কাল থেকে তাই হবে। কাল পয়লা না?'

'বেশ তো। তাই হবে।'

অজিতের সংক্ষিপ্ত গা-ঝাড়া জবাব বড়ই ক্ষুণ্ণ করে রসিককে।

'একবার ভাবলে না, বৌমার সঙ্গে পরামর্শ করলে না, বলে বসলে তাই হবে? তোমার এই মতিগতির জন্য—'

উদাসীন ভাবটা ত্যাগ করে এবার অজিত জোর দিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, 'সংসারের ব্যবস্থায় আমার মতিগতির প্রশ্ন কি? আমি কিছু করতে গেলে বলতে গেলেই বরং আপনিও রাগ করেন, আপনার বৌমাও ক্ষেপে যান। আপনারা পরামর্শ করে যা ভাল বোঝেন তাই করুন।'

'একি একটা কথা হল অজিত?' রসিক বলেন কাতরভাবে, 'তোমার আয় বেড়েছে

শুনে থেকে ভাবছি। সুজিতের চাকরিটাও গেল। অনেক আগেই তোমায় ভিন্ন হতে বলা বোধ হয় উচিত ছিল, ভুল করেছি মনে হয়। লেখাপড়া শিখলে না, মানুষ হলে না, ভেবেছিলাম ভাইদের সঙ্গে থাকলে সময়ে অসময়ে তবু—'

নলটা ঠোঁটের কাছে আলগোছে ঠেকে থাকে, চিন্তার অনেকগুলি রেখা ফুটে থাকে চামড়ার কুঁচকানিতে। 'বৌমাও যেন কেমন। ওরা পছন্দ করে না, আমল দেয় না, তবু বেহায়ার মতো লেপ্টে থাকবেন। নাঃ, কাল থেকেই তুমি ভিন্ন হয়ে যাও।'

'তাই হবে।'

কাল ভিন্ন রান্নঘরে ভিন্নভাবে লক্ষ্মী তার আর খোকার জন্য রান্না করবে, এটা তার কাছে অতি সামান্য ব্যাপার। বাড়িতে সে একবেলা খায়। দশ জনের সঙ্গে মিলেমিশে খাওয়া তার অভ্যাস। সেটা বাইরে হোটেলে সম্ভব হয়, বাড়িতে ভাইরা তার সঙ্গে খায় না। সময় মতো দু-একদিন হঠাৎ হাজির হয়ে আসন পেতে সবার সাথে বসে খেতে গিয়ে সে দেখেছে, খাওয়া যেন মাটি হয়ে গেল ভাইদের, পরিবেশন উদ্‌ভট হয়ে গেল, মেয়েদের, লক্ষ্মীর পর্যন্ত। পরে লক্ষ্মী ঘরে গিয়ে কেঁদে বলেছে, 'কেন তুমি বসতে গেলে ওনাদের সঙ্গে? আমি গলায় দড়ি দেব!'

সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় সামনে পড়ে সুজিতের বৌ সুমনা। পাশে সরে দেয়াল ঠেলে সরিয়ে দশ-বিশ হাত ব্যবধান সৃষ্টির চেষ্টাটা সুমনা এমন কুৎসিতভাবে করে যেন গুণ্ডার হাতে মান বাঁচাতে ভদ্রমেয়ে সতী বৌ ইঁটের দেয়ালে কবর চাইছে। সুজিতের আবার চাকরি গেছে। সুমনার স্নায়ুগত ব্যারামটা মাসখানেক হল আবার বেড়ে গেছে শুনেছিল লক্ষ্মীর কাছে, বোধ হয় মাসখানেক সুজিতের চাকরির মেয়াদ আছে এটা টের পাওয়ার পর।

আগের বার যখন বেকার ছিল সুজিত, সুমনাকে দিয়ে সে মাঝে মাঝে টাকা চেয়ে পাঠাত তার কাছে। পাঠাত লক্ষ্মীর কাছেই কিন্তু সুমনা টাকার দরকারটা জানাত তাকে, বলত, 'দাদা, দশটা টাকা চাইতে এসেছি।' মেলামেশা ছিল তখন তাদের মধ্যে। সুজিতের চাকরি হবার পর সে আর সুজিত দুজনেই কথা বলাও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। আবার বেকার হয়েছে সুজিত। কিন্তু এমন করে কেন সুমনা তা হলে? হিসাব মতো আবার তো সুমনার এখন দাদা বলে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করা উচিত। অনেক টাকা কি ব্যাঙ্কে জমিয়ে ফেলেছে সুজিত? রক্তে আগুন ধরে যায় অজিতের, হাসি পায়। মেয়েটার পরিচয়হীন পেট মোটা কোমরে একটা লাথি কষিয়ে দেবার সাধটা সে দমন করে। বলে, 'ভীষণ মদ খেয়ে এসেছি। ভয়ানক খুন চেপেছে।'

'মাগো!' সুমনা আর্তনাদ করে মৃদু অস্ফুট স্বরে, সে নিজে আর সামনের খুনেটা ছাড়া কেউ যাতে না শুনতে পায়।

এক মুহূর্তে নিজের কাছে ছোট হয়ে যায় অজিত। এইসব বিকারের বস্তা, খাপছাড়া দুঃখী জীব—এদের ওপরেও মানুষ রাগ করে!

অজিত বলে, 'বৌমা, ওষুধ খাওনি?'

সুমনা বলে, 'খেয়েছি তো।'

অজিত বলে, 'না, খাওনি। এখনি ওষুধ খাবে যাও। বোনটি আমার, মা'টি আমার, ওষুধটা রোজ খেতে হবে।

সুমনা কেঁদে ফেলে, জলকাচা মোটা শাড়ির মতো, মোচা কাটা কলাগাছের মতো অঝোরে কেঁদে ফেলে, 'দাদা, ওষুধ খেলে ঘুম পায় যে। রাগ করে যে ঘুমোলে।'

অজিত সটান ওপরে চলে যায়। এ সমস্যা তার ধরাছোঁয়ার এলাকায় নয়। সমস্যাটা স্পষ্ট হতে দিয়ে বরং বোকামিই করে ফেলেছে সে। যার শোচনীয় দুঃখে হঠাৎ মনটা মায়ায় ভিজে গিয়েছিল, কাটখোট্টা বাস-ড্রাইভার হলেও ভদ্র হালদার পরিবারের ছেলে বলেই হয়তো—সে হয়তো সিঁড়ি কটা বেয়ে নামতে নামতেই সুর পালটাবে। সরু গলার চিকণ আওয়াজে চিরে দেবে সেঁতসেঁতে উঠানের গুমোট নিশ্চল বাতাসকে, বলবে, 'সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় মেজো ভাসুর গায়ে তার হাত দিয়েছিল, মদের কি গন্ধ তার মুখে।'

এসব ভদ্র ঘরের মেয়ে বৌকে বিশ্বাস নেই।

জামা ছাড়ে অজিত। লক্ষ্মী সামনে এসে হেসে বলে, 'ওমা, আজ যে এত সকাল সকাল এলে?'

অজিত আরেকবার অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যায়। শুধু আশ্চর্য নয়, অবাকও। লক্ষ্মী তার সঙ্গে হাসিমুখে ঘরোয়া অর্থহীন কথা বলছে! শাড়ি গয়না ক্রিম পাউডার কিছু তার আজ আনবার কথা নয়, আনেওনি জানে লক্ষ্মী।

'ইস্। মুখটা শুকিয়ে গেছে তোমার। জামা কাপড় খুলে লুঙ্গিটা পরে এসে বসো। একটু হাওয়া করি। ঘেমে নেয়ে গেছ একেবারে।'

বাড়ি এসে জামাকাপড় ছেড়ে রোজ সে লুঙ্গি পরে। সে প্রক্রিয়া লক্ষ্মী তাকিয়েও দেখে না! আজ লক্ষ্মী অনুমোদনের হাসি হেসে অপেক্ষা করার ভঙ্গিতে বসে হাত নাড়ে, পা নাচায়, মাথা ঝাঁকায়।

'কি বলছ?' জিগ্‌গেস করে অজিত, আপসোসের সুরে।

'বলছি গো, বলছি। মুখ হাত ধুয়ে এস না।'

জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে মগভরা জল নিয়ে বারান্দায় মুখ হাত ধুয়ে অজিত গম্ভীর মুখে বিছানায় এসে বসে একটা বিড়ি ধরায়। 'তোমার নাকি ভাসুর ঠাকুরের সমান মাইনে হয়েছে?' লক্ষ্মী শুধোয় পাশে বসে, তার ডান হাতে বিড়ির আগুন জ্বলছে বলে বাঁ হাতটা টেনে বুকে রেখে।

'দাদার মাইনের সমান দাঁড়াবে।'

'ওমা! কোথায় যাবো!' লক্ষ্মী যেন মূর্ছা যাবে। মূর্ছা যাবার বদলে সে খানিকক্ষণ নেতিয়ে পড়ে থাকে অজিতের বুকে। তারপর বলে, 'ঠাকুরপোর চাকরি গেছে জানো?'

'তাই নাকি?'

'চেপে চুপে রেখেছিলেন কথাটা, তা এ কি আর লুকোনো যায়? সুমির রকমসকম দেখেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল।'

অজিত নীরবে হাই তোলে। একটা বিঁড়ি ধরায়।

'এসো না, শোও না দুদণ্ড। খেটেখুটে এসে কি বিশ্রাম করতেও শখ যায় না একটু? আস্তে আস্তে ঘামাচি মেরে দি, কি ঘামাচি হয়েছে গায়ে! ইস! মাগো! আর শুনেছ? বাবা বলছিলেন, ভাসুর ঠাকুর সংসারে পঁচিশ টাকা কম দেবেন বলেছেন। ওঁর নাকি নিজের খরচ বেড়েছে। ঠাকুরপো তো ছাঁটাই। বাবার কাছে নাকি দু হাজার টাকা চেয়েছে, ব্যবসা করার জন্যে। ঠাকুরপো করবে ব্যবসা! বৌ যার রোজ কাঁদে যে এর চেয়ে একটা হিজড়ের সঙ্গে বিয়ে হলে অন্তত কোর্টে গিয়ে নালিশ ফ্যাসাদ করে—'

বিদ্যুতের আলোয় ঘর স্পষ্ট, মানুষ স্পষ্ট, দৈন্য অভাব অভদ্রতা সব কিছু স্পষ্ট।

অজিত বলে, 'খিদে পেয়েছে।'

'ওমা! মাগো! খিদে পাবে না?'

খাওয়ার আয়োজন করতে করতে লক্ষ্মী বলে, 'বাবা বলছিলেন যাই হোক তাই হোক, আমার এই ছেলেটাই ভাল। সংসারে ঠিকমতো টাকা দেয়, নিজের আর বৌয়ের বাবুগিরিতে সব উড়িয়ে দেয় না।'

বারান্দায় কেউ নেই, আশেপাশে কেউ নেই, তাদের ঘরোয়া প্রেমালাপ শুনবার মাথাব্যথা কারো আছে কিনা সন্দেহ, তবু অজিতের কানের কাছে মুখ নিয়ে লক্ষ্মী ফিসফিসিয়ে বলে, 'বাবা আমায় বললেন, ছেলেদের মধ্যে তুমিই শুধু বিশ্বাসী। ওসব বাবুদের ওপর ভরসা নেই। তোমাকে ভিন্ন করিয়ে তোমার সঙ্গে থাকতে চান বাবা। যা করা উচিত তাতো তুমি করবে অন্তত, মুখ্যু হও আর যাই হও।...'

ছিনিয়ে খায়নি কেন

'দলে দলে মরছে তবু ছিনিয়ে খায়নি। কেন জানেন বাবু?'

'একজন নয়, দশজন, শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে বরবাদ হয়ে গেছে। ভিক্ষের জন্য হাত বাড়িয়েছে, ফেন চেয়ে কাতরেছে, কুত্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই করে ময়লার ভুর হাতড়েছে, কিন্তু ছিনিয়ে নেবার জন্য, কেড়ে নেবার জন্য হাত বাড়ায়নি। অথচ হাত বাড়ালেই পায়। দোকানে থরেথরে সাজানো রয়েছে খাবার, সামনে রাস্তায় ধন্না দিয়েছে ফেলে দেওয়া ঠোঙার রসটুকু, খাবারের কণাটুকু চাটবার জন্যে। হাটবাজারে রয়েছে ফলমূল তরিতরকারি, দোকানে আড়তে চাল ডাল তেল নুন লুকানো গুদামে চালের পাহাড়, বড়লোকের ভাঁড়ারে দশ বিশ বছরের ফুড—ফুড কথাটা চালু হয়েছে বাবু আপনাদের কল্যাণে, ভোঁতিকা গায়ের হোঁতিকা তাঁতিও জানে কথাটা আর কথাটার মানে। গরিবের মুখে না উঠে যে চাল ডাল তেল নুন গুদোম থেকে গুদোমে কেনাবেচা হয়ে চালান যায়, তাকে বলে ফুড। হ্যাঁ, মাছ-মাংস দুধ-ঘিও ফুড বটে। দশটা জিনিসের দশটা নাম বলতে লিখতে কষ্ট হয় বলে আপনারা ফুড চালিয়েছেন, চেঁচিয়েছেন ফুড সমস্যার বিধান চাই। তা অত কষ্টে কাজ কি ছিল। ফুড না বলে চাল বললেই হত। শুধু চাল কাঁড়া-আকাঁড়া, পোকায় ধরা, যেমন হোক চাল। মাছ-মাংস দুধ-ঘি, তেল-নুন এসব দশটা জিনিস তো চায়নি যারা না খেয়ে মরেছে। শুধু দুটি চাল দিলে হত তাদের, ফুডের জন্য মাথা না ঘামিয়ে। গাছে পাতা আছে, জঙ্গলে কচু আছে। তারা মরত না। রোজ দুটি আসেদ্ধ শুকনো চাল চিবিয়ে খেলেও মানুষ মরে না। আপনি মানবেন না, কিন্তু সত্যি মরে না বাবু। যত কেলিয়ে যাক, ধুকধুক প্রাণডা নিয়ে জীবন্ত থাকে।'

চালার বাইরে ক্ষেতখামার আম-জাম কাঁঠাল ঘেরা খড়ো ঘরগুলিতে বেলা শেষের ছায়া গাঢ় হয়ে যাচ্ছিল সন্ধ্যায়। উবু হয়ে বসে আনমনে যোগী জোর টানে তামাকের ধোঁয়ায় বুকে ভরে নিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়াটা বার করে দিতে থাকে। সামনেই টানছে তামাক আড়াল খোঁজেনি, একটু পিছু ফিরে বা একটু ঘুরেও বসেনি। এটা লক্ষ্য করবার বিষয়। তামাক সেজে আগে অবশ্য আমাকেই বাড়িয়ে দিয়েছে ডান হাতে থেলো হুঁকোটা ধরে, বাঁ হাতে সেই হাতের কনুই ছুঁয়ে থেকে। জলহীন হুঁকোয় অত কড়া তামাকের তপ্ত ধোঁয়া টানবার ক্ষমতা প্রথম বয়সে ছিল, এখন আর পারি না। সিগারেট ধরিয়ে যোগীকেও একটা অফার করেছিলাম। মৃদু হেসে সিগারেটটা নিয়ে সে গুঁজেছিল কানে।

শুনেছিলাম সে নাকি নামকরা ডাকাত, তার নামে লোকে ভয়ে কাঁপে। যে রকম কল্পনা করেছিলাম, চেহারাটা মোটেই মেলেনি তার সঙ্গে। বেঁটে খাটো লোকটা, শরীরটা খুব শক্তই হবে, আর কিছুই নয়। বাবরি ছাঁটা ঝাঁকড়া চুল পর্যন্ত নেই। জেলে হয় তো ছেঁটে দিয়ে থাকবে কদম ছাঁটা করে, এখনো বড় হবার সময় পায়নি। এদেশের রণ-পা চড়া, লাঠি ঘুরিয়ে বুলেট ঠেকানো, নোটিশ দিয়ে ধনী জমিদারের বাড়ি ডাকাতি করতে যাওয়া বড় লোকের ওপর ভীষণ নিষ্ঠুর, গরিবের ওপর পরম দয়ালু, খেয়ালী, ধূর্ত, উদার বিখ্যাত ডাকাতদের কাহিনীতে তাদের বিরাট দেহ আর অদ্ভুত অমানুষিক শক্তির কথা পড়েছি। যাদের ভীষণ আকৃতি দেখলেই লোকের দাঁত কপাটি লাগত, হুঙ্কার শুনলে কয়েক মাইল তফাতে গর্ভপাত হত স্ত্রীলোকের। বড়লোকের টাকা লুটে তারা গরিবকে বিলিয়ে দিত। দুর্ভিক্ষের সময় যোগী ডাকাতও নাকি মানুষ বাঁচাবার মহৎ কাজে নেমেছিল। সেবাও করত পথে ঘাটে মুমূর্ষুর, সুযোগ মতো চুরি ডাকাতি করে খাদ্য জুটিয়ে বিলিয়ে দিত। কয়েকটা মেয়েকে ক্রেতার কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাঁচিয়েছে শোনা যায়। সাতকোশী খালে সরকারী চালের নৌকায় ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে দুবছর জেল হয় তার।

যোগী কথার সূত্র হারিয়ে ফেলেছে বুঝে মনে করিয়ে দিলাম, 'মরছে তবু ছিনিয়ে খায়নি কেন—যে কথা বলছিলে।'

'ও, হ্যাঁ বাবু হ্যাঁ। আমি জানি কেন ছিনিয়ে খায়নি, শুধু আমি, একমাত্তর আমিই জানি। কেউ জানে না আর। আপনার মতো অনেক বাবুকে শুধিয়েছি, তারা সবাই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এটা সেটা বলেন, বড় বড় কথা। আবোলতাবোল লম্বাচওড়া কথা। আসল ব্যাপারে সেরেফ ফাঁক। বোঝেন না কিছু, জানেন না কিছু, বলবেন কি! এক বাবু বললেন, বেশীর ভাগ তো গরিব চাষী, নিরীহ গোবেচারা লোক, কোন কালে বে-আইনী কাজ করেনি। লুট করে কেড়ে নিয়ে খাবার কথা ওরা ভাবতেও পারে না। শুনলে গা জ্বলে বাবু! সাধ যায়, না-চাঁছা গালে একটা থাপড় দিয়ে কানডা মলে দিতে। বে-আইনী কাজ, বে-আইনী! যে জানে মরে যাবে কেড়ে না খেলে, সে হিসেব করেছে কাজটা আইনী না বে-আইনী, ছিনিয়ে খেলে তাকে পুলিস ধরবে, তার জেল হবে। জেলে যেতে পারলে তো ভাগ্যি ছিল তার! মেয়ে বৌকে ভাড়া দিচ্ছে, বেচে দিচ্ছে, সুযোগ পেলে তার চেয়ে কমজোরী মর-মর সাথীর গলা টিপে মেরে ফেলছে যদি এক মুঠো খুদ জোটে, তার কাছে আইন! আরেক বাবু বললেন, ওটা কি জান যোগী, ওরা সব মুখ্যু গরিব, চাষা-ভুষো মানুষ, অদেষ্ট মানে। না খেয়ে মরতে হবে, বিধাতার এই বিধান, উপায় কি—এই ভেবে মরেছে না খেয়ে, লুটে পুটে খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেনি। শুনেছেন বাবু কথা, আঁত-জ্বালানি পণ্ডিতি কথা? সাপে কাটে, রোগে ধরে, আগুন লাগে, বন্যা হয়, আকাল আসে সব অদেষ্ট বটেই তো, কে না জানে সেটা? তাই বলে সাপে কাটলে বাঁধন আঁটে না, ওঝা ডাকে না? রোগে বড়ি-পাঁচন, শিকড়-পাতা খায় না, মানত করে না? ঘরে আগুন লাগলে দাওয়ায় বসে তামুক টানে? ফসল বাঁচাতে যায় না বন্যা এলে? আকাল অদেষ্ট বলে কেউ ঘরে বসে হাত-পা গুটিয়ে মরেছে একজন

কেউ ওদের? যা কিছু আছে বেচে দেয়নি বাঁচার জন্যে, ছেলেমেয়ে, বৌ, বোন শুদ্ধ? ছুটে যায়নি শহরে, বাবুদের রিলিফখানায়? অদেষ্ট মানে, হ্যাঁ, অদেষ্টে মরণ থাকলে মরবে জানে, হ্যাঁ, তাই বলে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচতে পারলে চেষ্টা করে দেখবে না একবারটি? আরেক বাবু বললেন–'

'বাবুরা কি বলেন জানি যোগী। তোমার কথা বল।'

'শোনেন না বাবু মজার কথা, হাসি পাবে শুনলে। বললেন কি? না আধপেটা খাওয়া, উপোস দেয়া ওদের চিরকেলে অভ্যাস। ঘটিবাটি, জমিজমা তো চিরজন্মেই বেচে আসছে পেটের জন্যে। আকাল তো ওদের লেগেই আছে বছর বছর। বলতে বলতে গলা সত্যি ধরে এসেছিল তেনার, দুঃখীর তরে দরদ ছিল বাবুর। নাক ঝেড়ে, গলা খাঁকরে তারপর বললেন, বড় আকাল এল, ওরাও এই ভাবে লড়াই করল বাঁচতে, চিরকাল যেমন করে এসেছে, ঘরে ভাত না থাকলে যা করা ওদের অভ্যেস। আমি বললাম, তা নয় বুঝলাম বাবু, না খাওয়াটা ওদের অভ্যেস ছিল। কিন্তু মরাটাও কি অভ্যেস ছিল বাবু?'

যোগী হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়ে। বুঝতে পারি অনেকবার অনেককে শোনালেও এই পুরানো মর্মান্তিক রসিকতার রস তার কাছে জলো হয়নি।

'বললাম, ধরুন একটা দোকান, তাতে কিছু চাল আছে। লোক মোটে দুটো কি তিনটে দোকানে। সাতদিন উপোস দিয়ে আছে এক কুড়ি দেড় কুড়ি লোক, জানে যে চাল কটা পেলে বাঁচবে নয়তো মিত্যু নির্ঘাত। অত সব নয় নাই জানলো, পেটে তো খিদে ডাকছে। হানা দিয়ে চাল কটা ছিনিয়ে নিলে ঠেকাবার কেউ নেই। তা না করে ফেউ ফেউ করে শুধু ভিক্ষে চাইল কেন ওরা? দোকানী দূর দূর করে খেদিয়ে দিতে আবার গেল কেন অন্য জায়গায় ভিক্ষে চাইতে? এমন কত দেখেছি সহজে ছিনিয়ে নেবার খাসা সুযোগ কিন্তু ছিনিয়ে না নিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে দয়া চেয়েছে, না পেয়ে মরেছে। বাবু আমতা আমতা করে একটা জবাব দিলেন। সেই অভ্যেসের কথা, দশজনে মিলে দল বেঁধে লুট করতে কি ওরা জানতো, না কথাটা ভাবতে পেরেছে, খুদকুড়ো নিয়ে বরং মারামারি করেছে নিজেদের মধ্যে। আসল কথাটার জবাব নেই। জানলে তো বলবেন? জবাবটা জানি আমি। শুধু আমি। আর কেউ জানে না। তবে বলি শুনুন।'

'ডাকতেছ?'

ঘরের ভিতরে অন্ধকার হয়ে এসেছে, একটি প্রদীপ জ্বলতে সেদিকে নজর পড়েছিল। প্রদীপটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল কালা-পেড়ে কোরা শাড়ি পরা ঢ্যাঙা একটি যুবতী। মনে হল, যোগীর উদ্ধার করা মেয়েদের একজন নয় তো? তার পরেই খেয়াল হল, যোগী প্রায় দুবছর জেলে কাটিয়ে মোটে মাস তিন চারেক আগে জেল থেকে বেরিয়েছে।

তামাক দে।

প্রদীপটা চৌকাটে বসিয়ে দিয়ে সে তামাক সাজতে গেল।

'আমার পরিবার' যোগী বলল, 'হারিয়ে গেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে একমাস দেড়মাস ধরে খুঁজে খুঁজে বার করেছি সদরে।'

ব্যাপারটার ইঙ্গিত বুঝে চুপ করে রইলাম। বাইরে দিনের আলো নিভে গিয়ে প্রায় গোটা চাঁদটার জ্যোৎস্না তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'যা বলছিলাম বাবু। সর্বোনাশা দিনগুলির কথা জানেন তো সব, নিজের চোখে দেখেছেন সব। আপনাকে বলতে হবে না বন্ননা করে। আমি তখন হকচকিয়ে গেছি। না খেয়ে লোক পথেঘাটে মরছে দেখে মনে বড় কষ্ট। আর গায়ে জ্বালা, ভীষণ জ্বালা, সা জোতদার, নন্দ আড়তদার, সরকারী কর্তা করিম সায়েব, পুলিনবাবু—এদের কান্ডকারখানা দেখে এলাম। কোলকাতা গিয়ে পর্যন্ত কাটিয়ে এলাম সাতদিন, সাতদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে। বুঝি না ব্যাপারটা কিছু, যত ভাবি মাথা গুলিয়ে যায়, অন্নের তো অভাব কিছু নেই, এত লোক মরে কেন ছিনিয়ে না খেয়ে? গরু ছাগল তো মাঠে ঘাস না পেলে ক্ষেতে ঢোকে, মার খেয়ে নড়তে চায় না সহজে, বাগানে ফুলগাছ খায়, ঘরের চালা থেকে খড় টেনে নেয়। এগুলো মানুষ হয়ে করছে কি? ধান-চাল লুট করি দু-এক জাগায়, বিলিয়ে দি এদিকওদিক, মন মানে না। একা আমি দু-চারজনকে নিয়ে লুটেপুটে কটাকে খাওয়াবো? বাঁধা দল আমার ছিল না বাবু কোন কালে, পেশাদার ডাকাত আমি নইকো, যাই বলুক লোকে আর পুলিসে আমার নামে অকথা কুকথা। আপনার কাছে লুকাবো না, মাঝে মাঝে দল গড়ে হানা দিয়ে লুট করেছি টাকা-পয়সা, গয়না-গাটি, মারধোর করেছি, কিন্তু মানুষ একটা মারিনি বাপের জন্মে, বাপ যদি জন্ম দিয়ে থাকে মোকে। কাজ ফতে করে দল ভেঙে দিয়েছি ফের। টাকা পয়সার বদলিতে ধান চাল লুটের জন্য দল একটা গড়তে চাইলাম, স্যাঙাতেরা কেউ স্বীকার পেল না দুজন ছাড়া। ডাকাতি করব সোনাদানার বদলে ধান চালের জন্যে, তাও আবার বিলিয়ে দেব, শুনে ওরা ভাবল হয় মাথাটা মোর বিগড়ে গেছে একদম, নয় তামাসা করছি ওদের সাথে। দুজন যারা এল, তারা ছোকরা বয়সী, ওস্তাদ বলে মোকে মানত। দুজনকে নিয়ে মোটা দাঁও কি মারব বলুন. ছুঁক ছাঁক দু-দশ মন আলতো পেলে কেড়ে নি, বিলোতে গিয়ে শুরু করতে না করতে ফুরিয়ে যায়। দেশ জুড়ে সবার পেটের চামড়া চামচিকে, কজনকে দেব আমি। ভাবলাম দুত্তোর! এ শখের কের্দানি দেখিয়ে আর কাজ নেই। মোর দুমুঠো বালির বাঁধে কি এই মড়কের বন্যা ঠেকানো যাবে? তার চেয়ে এক কাজ যদি করি তবে হয়তো ফল হবে কিছুটা। না খেয়ে মরছে যারা তাদের শেখাতে হবে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচতে। নিজের পেট ভরাবার ব্যবস্থা নিজে যদি না ওরা করতে পারে আমার গরজ! না, কি বলেন বাবু?'

সদরের মন্দ বস্তি থেকে খুঁজে উদ্ধার করে আনা যোগীর পরিবার ফুঁ দিতে দিতে কল্‌কে এনে দেয়। কল্‌কের আগুনে লালিয়ে লালিয়ে ওঠা তার ভোঁতা লম্বাটে মুখে মন্দ মেয়ের বস্তির জীবনের কোন ছাপ চোখে পড়ে না. বরং শান্ত নিশ্চিন্ত নির্ভর খুঁজে পাই।

'সেই থেকে বসে আছেন', যোগী বলে কল্‌কেটা হুঁকোয় বসিয়ে. তার পরিবার

দাঁড়িয়ে থাকে কথা শেষ হবার অপেক্ষায়, 'একটু চা দিয়ে যে ভদ্রস্থতা করব তার ব্যবস্থা নেই গরিবের ঘরে। দুটো চিঁড়ের মোয়া খাবেন বাবু, নতুন গুড়ের টাটকা মোয়া?'

ভদ্র অতিথিকে নিয়ে তার বিপন্ন ভাব অনুভব করে বলি, 'খাব না? এতক্ষণ বলতে হয়। জোর খিদে পেয়েছে, আমি ভাবছি কি ব্যাপার, মুড়ি চিড়ে কিছু কি নেই যোগীর, খেতে বলছে না।' যোগীর পরিবারের হাসিটা আধা দেখতে পাই প্রদীপের আলোয়।

'সদরে রিলিফখানা খুলেছে, খিচুড়ি বিলি করে। সটান গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। সেজেগুজে গেলাম, ছেঁড়া নেংটি পরে, উদলা গায়ে, মোচদাড়ি না কামিয়ে। তবু অন্নের অভাব তো ভোগ করিনি কোন একটা দিন দু-চার বছরের মধ্যে, ওসব কাঁকলাসের সাথে কি মিশ খায় মোর। আড়চোখে আড়চোখে তাকায় সবাই, ভাবে যে এ আবার কোত্থেকে এল। ঝোলের মতো ট্যাকটেকে পাতলা খিচুড়ি যে বিলোয় সে ব্যাটাচ্ছেলে মোকে দেখলেই বলে, 'হারামজাদা, তুই এখানে কেন, খেটে খাবি যা। মেয়েছেলে দু-একটা দেখে শুনে ভাব জমাতে চেষ্টা করে মোর সাথে, ভাবে যে মোর বুঝি সংগতি আছে অন্তত দু-চার বেলা খাবার—চুপি চুপি শার্ট গায়ে দিয়ে ধুতি পরে শহর ঢুঁড়তে বেরুবার সময় হয়তো বা দেখে ফেলতে পারে। কান্না পেত বাবু মেয়েছেলে কটার রকম দেখে। মেয়েছেলে। হাড়ে জড়ানো সিঁটে চামড়া, তাতে ঘা-প্যাঁচড়া। আধ-ওঠা চুলের জট খ্যাপার মতো চুলকোচ্ছে উকুনের কামড়ে। মাই বলতে লবঙ্গের মতো শুকনো বোঁটা, পাছা বলতে লাঠির ডগার মতো, খোঁচানো হাড্ডি। আর কি দুর্গন্ধ গায়ে, পচা ইঁদুর, মরা সাপের মতো। তাদের চেষ্টা পুরুষের মন ভুলিয়ে একটা বেলা একটু খাওয়া যোগাড় করা পেট ভরে।'

যোগী গুম খেয়ে থাকে যতক্ষণ না তার পরিবার ডালায় আট-দশটা চিড়ার মোয়া আর ছোটখাট নৈবিদ্যের মতো নারকেল নাড়ু সাজিয়ে এনে আমার সামনে ধরে। পরিবারটিও তার রোগা ঢ্যাংগা ছিপছিপে—তবে সুস্থ। কোরা কাপড়ের ভাঁজে ছোট মাই, আবার সন্তান আসতে চাইলে যা সুধায় ভরে উঠবে অনায়াসে।

মারাত্মক গুম খাওয়া ভাবটা কেটে যায় যোগীর। ওর দিকে তাকিয়েই বলে, 'বাবুকে কি রাক্ষস ঠাওরালি নাকি, আঁ? দুটো মোয়া, দুটো। নাড়ু রেখে তুলে নিয়ে যা সব। গেলাস নেই তো কি হবে, ঘটিটা মাজা আছে, টিউবওয়েলের জলের কলসী থেকে জল এনে দে ঘটিতে।' একটু থেমে বিনয়ের সুরে হঠাৎ অন্য একটা কৈফিয়ত সে বলে তার পরিবারকে, 'মাছ আর আজ আনা হল না, বিন্দি।'

'মাছের তরে মরছি।' বিন্দি এতক্ষণে এবার প্রথম মুখ খোলে ঝঙ্কার দিয়ে।

'সবাইকে বলি, ছিনিয়ে নিয়ে খাও না? এসো, আমরা সবাই মিলে ছিনিয়ে নিয়ে খাই। ব্যাপার বুঝছো তো, মোদের খিচুড়ি ভোগের জন্যে যে চাল ডাল আসে তার বেশীর ভাগ চোরাগোপ্তা হয়ে যায়, নইলে খিচুড়ি এমন নুনজলের মতো লাগে? এমনিও মরব, ওমনিও মরব, এসো বাঁচার তরে লড়াই করে মরি। কর্তারা ভোজ খাবেন মোরা না খেয়ে মরব। কেড়ে খাই এসো। এমনি ভাবে কত করে কত রকমে

বুঝিয়ে বলি, কেউ যেন কান দেয় না কথায়। কান দেয় না ঠিক নয়, কানে যেন যায় না কথা। ঝিমোতে ঝিমোতে বলে, আঁ, আঁ, কি বলছিলে? বলে আবার ঝিমোয়। জলো খিচুড়ি একচুমুকে খাবার খানিক পরে যদি বা কেউ কেউ একটু উৎসাহ দেখায়, একটু জ্বালা জানায় যে সত্যি এত অন্ন থাকতে তারা না খেয়ে মরবে এ ভারি অন্যায়—বিকালে তারা নিঝুম হয়ে যায়। রিলিফখানায় সারি দিতে আগু-পিছু নিয়ে কামড়াকামড়ি করে, ছোট এক মগ সেদ্ধ চাল ডালের ঝোলের জন্যে—ছিনিয়ে নিয়ে পেট ভরে ডালভাত খাবার জন্যে কারো উৎসাহ দেখি না।

'একদিন খবর পেলাম, রিলিফখানার জন্যে মোটামতো সরকারী চালান আরেকটা এয়েছে অ্যাদ্দিন পরে, সাত দিন কেন পুরো আধ মাস সত্যিকারের ঘন খিচুড়ি বিলানো চলবে। কিন্তু দেখে শুনে তখন অভিজ্ঞতা জন্মে গেছে বাবু। যত চালান আসুক, একটা দিনের বিলানো খিচুড়িও সত্যিকারের খিচুড়ি হবে না, চাল ডাল বেশীর ভাগ চলে যাবে চোরাবাজারে। সদরে জানা চেনা লোক ছিল ক'টা। মানে আর কি, আপনার কাছে ঢাকঢাক গুড়গুড় করব না, শহরের চোর, ছ্যাঁচড়, গুন্ডা, বজ্জাত, চোরাগোপ্তা ছোরামারা গোছের লোকের সর্দার কজন আর কি। ওপরওলাদের সাথে খাতির ছিল ওদের, ওদের ছাড়া চলে না সরকারী বে-সরকারী বড়কর্তাদের চোরা-কারবার। ওদের একজন একটা ব্যাপারে সাথে ছিল মোর কবছর আগে, বড় বাঁচান বাঁচিয়েছিলাম দু-দশ বছরের জেল থেকে। একটু খাতির করল, খানিকটা মাত্তর। ওর মারফতে আর দু-চারজনকে জড়ো করে, তারাও চিনত জানত মোকে, চাল চেলে, ভাঁওতা মেরে কান্ড করিয়ে দিলাম একটা রেলের ইস্টিশানে। চাদ্দিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। চালানী চাল ডাল সব গেল রিলিফখানার গুদামে, শেষ বস্তাটি।

'বল্লে না পিত্যয় যাবেন বাবু, পুরো চারটে দিন ঘন খিচুড়ির সাথে একটা করে আলুসেদ্ধ খেল ভিখিরির দলকে দল সবাই। আদ্দেক লোককে দিতে না দিতে ফুরিয়ে গেল না খিচুড়ি, কেউ বলল না ধমক দিয়ে, ওবেলা আসিস, এখন ভাগ্ শালার ব্যাটা শালা। আর এটাই আসল কথা মন দিয়ে শোনেন বাবু। ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচবার কথা যারা কেউ কানে তোলেনি, দুটো দিন দুবেলা এক মগ চাল ডাল আর একটা করে আলুসেদ্ধ খেয়ে সকলে কান পেতে শুনতে লাগল, আমার কথা, সায় দিতে লাগল যে এই ঠিক, এ ছাড়া বাঁচবার উপায় নেই। মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বজ্জাতরা, কেড়ে নিতে হবে সব, পেট পুরে খেয়ে বাঁচতে হবে দুবেলা। আমি যা বলি, সবাই সায় দিয়ে তা বলে। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারি না, মাথা গুলিয়ে যায়। পরদিন যেন উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। পরের দিন তাদেরই কজন আমার কাছে এসে বলে যে তারা গুদোম থেকে চাল ডাল ছিনিয়ে নিতে রাজী, নিজেরা রেঁধে-বেড়ে খাবে। আমি অ্যাদ্দিন জপাচ্ছি তাদের, আমাকে ঠিকঠাক করে চালাতে হবে কখন কি ভাবে কোথায় কি করতে হবে গুদোম থেকে মালপত্তর সব লুটপাট করে নিতে হলে।

'কি বোকামিটাই করলাম সেদিন বাবু। ভাবলাম কি, এমন আবোলতাবোল ভাবে নয়, মাঝে মাঝে তিন বন্দুকওলা জমিদারের বাড়ি হানা দেবার আগে যেমনভাবে দল

গড়েছি শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম দিয়ে, তেমনিভাবে এদের গড়ে তুলব টাকা-পয়সা লুটতে নয়, ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচবার কায়দা। এই না ভেবে পিছিয়ে দিলাম সবাইকে নিয়ে দেওয়াটা কদিনের জন্যে। রাতারাতি মিলিটারি লরিতে চালান হয়ে গেল রিলিফখানার গুদোমের আদ্দেক মাল। পরদিন সেই রঙ করা জ'লো খিচুড়ি।

'তাতে যেন জোর বেড়েছে মনে হল সকলের দল বেঁধে ছিনিয়ে খাওয়ার সাধটার। মোকে ঘিরে ধরে শ' দেড়েক মাগীমদ্দ বলতে লাগল, চলো না যাই, ছিনিয়ে আনি ধান চাল। বাচ্চাগুলো পর্যন্ত তড়পাতে লাগল।

'বৈকুণ্ঠ সা'র গুদোমে কম করে তিন হাজার মন চাল আছে জানতাম। চালান দেবার ব্যাপার কত্তাদের সাথে ভাগ বাঁটোরায় মীমাংসা না হওয়ায় ব্যাটার গুদোমে মাল শুধু জমছিল মাসখানেক। গুদোমটার হদিশ টদিশ নিয়ে কালক্ষণ সুযোগ ঠাহর করতে দুটো দিন কেটে গেল। যখন বললাম কিভাবে কি মতলব করেছি সা'র গুদোমের জমানো অন্ন ছিনিয়ে নেবার, তেমন যেন সাড়া এল না সবার কাছ থেকে। শুধু তাদের নয়, চাদ্দিকের কম করে হাজারটা ভুখা মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-কাচ্চাদের বাঁচবার উপায় হবে বললাম, সায় এল কেমন মন-মরা ঝিমোনো মতন।

'পরদিন কেউ যেন কান দিল না আমার কথায়। জ'লো খিচুড়ি বাগাবার ভাবনায় সবাই যেন ফের আবার মসগুল হয়ে গেছে, আর কিছু ভাববার ক্ষেমতা নেই, মন নেই!

'সেদিন বুঝলাম বাবু কেন এত লোক না খেয়ে মরেছে, এত খাবার হাতের কাছে থাকতে ছিনিয়ে খায়নি কেন: একদিন খেতে না পেলে শরীরটা শুধু শুকোয় না, লড়াই করে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার তাগিদও ঝিমিয়ে যায়। দুচার দিন একটু কিছু খেতে পেলেই সেটা ফের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দুদিন খেতে না পেলে ফের ঝিমিয়ে যায়। তা এতে আশ্চর্য কি। এ তো সহজ সোজা কথা। কেউ বোঝে না কেন তাই ভাবি। শাস্তরে বলেনি বাবু অন্ন হল প্রাণ? খেতে না পেলে গরু দুধ দেয়, না বলদ জমি চষে? কয়লা না খেয়ে ইঞ্জিন গাড়ি টানে? মহাভারতে সেই মুনির কথা আছে। না খেয়ে তপ করেন, একদিন দ্যাখেন কি, গর্তের মুখে পুতুল মতো জ্যান্ত জ্যান্ত মানুষ ঝুলছে ঘাসের শিকড় ধরে, শিকড়গুলি দাঁতে কাটছে ইঁদুর। মুনি বললে, করছ কি তোমরা সব, ইঁদুরে শিকড় কাটছে দেখছ না, গর্তে পড়বে যে ধপাস করে? খুদে খুদে লোকগুলি বললে, বাপু মোরা তোমার পূর্বপুরুষ। বংশে শুধু তুমি আছ। তুমি হলে এই শিকড়টা, যা ধরে মোরা ঝুলছি, হা দ্যাখো নীচে নরক। শিকড় যিনি কাটছেন চোখা ধারাল দাঁত দিয়ে, তিনি হলেন ধম্মো মশায়। বিয়ে কর, পুত্তুর জন্মাও, মোদের বাঁচাও নরক থেকে। মুনি ভড়কে গিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে করলে এক রাজার মেয়েকে, রাজভোগ খেয়ে পুষ্টু মেয়ে, চটপট ছেলে হবে, পূর্বপুরুষ উদ্ধার পাবে। বছর কাটে দুটো তিনটে, গব্ভো হয় না রাজার মেয়ের। মুনি চটে বলে, একি কাণ্ড বল তো বৌ, তুকি বাঁজা নাকি? রাজার মেয়ে বলে ঝঙ্কার দিয়ে, নজ্জা করে না বলতে? উপোস করে শুকনো কাঠি হয়ে উনি বনে গিয়ে তপস্যা করবেন, একরাত্তির খেতে শুতে বসবাস করতে পারবেন না বিয়ে করা বৌয়ের সাথে, ফের বলবেন যে ছেলে হয় না কেন, বৌ তুমি বাঁজা নাকি।

নজ্জা করে না? না খেয়ে খেয়ে নিজে বাঁজা হয়েছো, শক্তি নেই, খ্যেমতা নেই, বৌকে বাঁজা বলতে নজ্জা করে না? কথার মানে বুঝে, তপস্যা করে যে সোজা কথা বোঝেনি, সেটা চট করে বুঝে নিয়ে মুনি ঠাকুর তাড়াতাড়ি গিয়ে বিত্তি চায় রাজার কাছে। দুধ-ঘি, লুচি-মাংস, পোলাও কালিয়া খায় পেট ভরে যত খেতে পারে। বললে না পিত্যয় যাবেন বাবু, এক বছরে ছেলে বিয়োয় মুনির বৌ—'

'রাত হয়নি? যেতে হবে না বাবুকে দেড়কোশ পথ?' যোগী ডাকাতের পরিবার এসে বলে।

মনে হয়, সত্য কি মিথ্যা জানি না মেয়েটার গড়ন এমন রোগাটে ছিপছিপে বলেই বোধ হয় আগামী মাতৃত্ব এতখানি স্পষ্ট হয়েছে। মনে হয় তিন-চার মাসের মধ্যে যোগী ডাকাতকে সে ছেলে বা মেয়ের বাপ করবেই। জ্যোৎস্নায় গেঁয়ো পথে চার মাইল দূরের স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবি, যোগী কি এতই বোকা, সে এত জানে আর এই সহজ সত্যটা জানে না খুব কম করেও ক'টা মাস অন্তত লাগে মেয়েমানুষের মা হয়ে ছেলে বা মেয়ে বিয়োতে?

আমার দেশের মাটিতে আমি সমান তালে চলতে পারি না যোগীর সাথে। আলের বাঁকে হোঁচট খাই, কাটা ধানের গোড়ার খোঁচায় ব্যথা পাই, কাঁচা মাটির রাস্তায় উঠতে দেড় হাত নালায় পড়ে যাই। যোগী সামলে সুমলে টেনে নিয়ে চলে আমায়। তার মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারি আমার হিসাবনিকাশ বিশ্লেষণের ভুল। যোগী ডাকাত মহাভারতের সেই মুনি নয়। স্বর্গ নরক তার কল্পনায় আছে কি নেই সন্দেহ। বংশ রক্ষায় সে মোটেই ব্যগ্র নয়। ইংরেজের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে খুঁজে খুঁজে মন্দ বস্তি থেকে হারানো বৌকে ফিরিয়ে এনে সে আজ শুধু এই কারণে অখুশী হতে নারাজ যে বৌ তার যে ছেলে বা মেয়ের মা হবে সে তার জন্মদাতা নয়। সে বাপ হবে তার পরিবারের বাচ্চার, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক সেটা। আজেবাজে খেয়ালে—যে-সব খেয়াল তাদেরি মানায়, তাদেরি ফ্যাসান, যারা ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার প্রবৃত্তিটা পর্যন্ত কেঁচে দিয়ে মারতে পারে লাখে লাখে মা-বাপ ছেলে-মেয়ে—অনর্থক অখুশী হতে রাজী নয় মানুষ।

তার পরিবার খেতে না পেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল তো? যে ভাবে পারে খেতে পেয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছে তো। তারপর আর কোন্ কথা আছে?

ধান

অন্ধকার উৎকর্ণ হয়ে আছে ধানের গোলাটা ঘিরে, মাঝরাত্রির চাঁদডোবা অন্ধকার। সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়ে গাঢ়তর ছায়ায় মিশে যাবার চেষ্টা করছে অর্ধ-উলঙ্গ মূর্তিটা, শ্বাসরোধ করে দু'চোখে অন্ধকার ভেদ করে আবিষ্কারের চেষ্টা করছে প্রহরীর গোপন উপস্থিতি। অত্যন্ত ভয়ে উত্তেজনায় টান টান হয়ে গেছে অর্ধ-উলঙ্গ দেহটা।

পাহারা নেই? এ দিনে ধানের গোলা, প্রাণের গুদাম, পাহারাশূন্য? এটা ধাঁধার মতো লাগে পাঁচুর কাছে। নিশ্চয় ঘুমিয়ে আছে পাহারাদার অন্তরালে আরামের ব্যবস্থা করে, নয় কর্তব্যে ফাঁকি দিয়েছে স্ফূর্তির জন্য কোথাও গিয়ে। মানুষ যখন ধানের জন্য উন্মাদ, গা-ঘেঁসা মরণ ঠেকাতে দিশেহারা, মরিয়া, গোলাভরা ধান তখন অরক্ষিত রেখে দিতে পারে শরৎ হালদার?

কাঁধের ঝোলা নামিয়ে রাখে পাঁচু, ঝোলা থেকে বার করে চকচকে দা, তারার আলোয় ঝিকমিক করে ওঠে তার ধার। গোলার যেটা পিছন দিক, দু'তিন হাত তফাতেই এক ইটের দেওয়াল, সেইখানে সেঁতসেঁতে শেওলায় জমানো আবর্জনায় দাঁড়িয়ে সিমেণ্টের ভিত্তির আধ হাত উচুতে গোলার মাটি-লেপা চাঁচের বেড়া কাটতে সুরু করে। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে, আওয়াজ বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে সিঁদ দেয় সঞ্চিত জীবনের ভাণ্ডারে। ছোট খাট গর্ত হলেই যথেষ্ট, সেই ফুটো দিয়েই শস্যকণা ঝুর ঝুর করে বেরিয়ে আসবে। তার থলি ভরে যাবে। উপোস-জ্বরের শান্তি ঘটিয়ে কাল অন্নপথ্য করবে সে আর বুঁচি!

দেয়াল ভেদ হয়। ধান গড়িয়ে আসে না। ডান হাতটা পাঁচু সবখানি ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে, ছড়ে যায় কেটে যায় হাতের চামড়া। গোলার মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে ধান খোঁজে। দু'চারটে ধান পড়ে আছে মেঝেতে, গোলা ধানশূন্য!

হাত বার করে এনে হতভম্ব পাঁচু ভাবে, এ কেমন ধাঁধা, কিসের পরিহাস! কালও ধান ছিল গোলায়, কি করে কোথায় উধাও হয়ে গেল ধান? পাপী সে, চোরছেঁচর, তার স্পর্শেই কি শূন্য হয়ে গেল ধানের গোলা?

মণ্ডল সাঁতরা ভৌমিকরা ভোর ভোর গাঁ-শুদ্ধ লোক জুটিয়ে এনে শরৎ হালদারের ধানের গোলায় চড়াও হবে, টেনে বার করবে তার মজুত, সবার সামনে ওজন করে ন্যায্য দামে বেচে দেবে গাঁয়ের উপোসী মানুষদের—এ পরামর্শ চুপে চুপে শুনেছিল

পাঁচু। খিদেয় খ্যাপা মানুষগুলি হানা দেবার আগে নিজের ঝুলিটা ভরে নেবার ফিকিরে এসেছিল! সব মিথ্যে হয়ে গেল!

নিজের কপালে জোরে চাপড় মারে পাঁচু। দু'চোখ তার ফেটে যায় জল আসার তাগিদে। তার ঝুলি নয় ভরলো না তার দুরদৃষ্ট, শ' দেড়শ' মানুষ যে হাঁ করে আছে কাল কিছু ধান পাবার আশায়, কাকে তারা অভিশাপ দেবে!

সোনা মণ্ডল আপসোস করে বলে, রাতারাতি পাঁচশো মণ ধান সরিয়ে ফেলল, কেউ টের পেলে না? শুধু পরামর্শই হল, কেউ নজর রাখলে না? আমি নয় গেছিলাম কুটুমবাড়ি—

ঋষি পাণ্ডা বলে, কেন গেলে? নিশ্চিন্দি হয়ে তুমি কুটুমবাড়ি যেতে পার, মোরা ঘুমোতে পারি না নিশ্চিন্দি হয়ে?

ঋষি তোকে আমি—আগুন বর্ষণ করে সোনা মণ্ডলের চোখ।

পরাণ ভৌমিক বলে, কেন? কেন ধমকাবে ওকে? দায়িক মোরা সবাই নই? রাতারাতি পাঁচশো মণ ধান সরাবে কুথা দিয়ে কেমন করে তুমি ভাবলে। মোরা ভাবতে পারি না রাতারাতি কুঁথা দিয়ে কেমন করে পাঁচশো মণ ধান সরাবে?

তা বটে, হক্ কথা।—চোখের নিমিষে শান্ত অনুতপ্ত হয়ে যায় সোনা মণ্ডল, মোদের সবার খেয়াল করা উচিত ছিল হালদার মশায় মস্ত ঘুঘু। কিন্তুক কি ব্যাপারটা বল দিকি, এ্যাঁ! কুথা সরালো, কেমন করে সরালো ধান?

এই কথাই ভাবে সবাই। ছেলে বুড়ো মুখ চাওয়া চাওয়ি করে, মূক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ধাঁধাঁ যাই হোক, ভুল যাই হয়ে যাক, শরৎ হালদারকে টেনে এনে ছিঁড়ে ফেলা য়ায়। ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলা যায় বুড়ী কচি মেয়ে পুরুষ যে আছে তার বাড়িতে—আগুন দিয়ে ছাই করে দেওয়া যায় তার বাড়ি। পাকা দালান তো তার একটা ভিটের তিন খানা ঘর, বাকী বাঁশ কাঠ খড়ের মহাল আগুন দিলেই দাউ দাউ করে জ্বলবে। সেই আগুনের আঁচে পুড়ে না যাক গলে যাবে পাকা দালানের লোহার সিন্দুকের সোনা।

কিন্তু তাতে তো আর ধান মিলবে না। সে হবে শুধু প্রতিহিংসা।

ফিরে চলে যাচ্ছিল সবাই আপসোস বুকে নিয়ে, মিছামিছি হাঙ্গামা করার স্বভাব তাদের নয়, বাংলা দেশের মানুষ কখনও প্রমাণ ছাড়া শাস্তি দেয় না। শরৎ হালদারের কি দুর্মতি হল, কি খেয়াল চেপে গেল একটু বাহাদুরী করার, গোমস্তা সে পাঠিয়ে দিল তার প্রতিনিধি হিসাবে বজ্জাত লোকগুলিকে দু'চারটে ধমক ধামক দিতে!

ধান পেলে সোনা মণ্ডল? উল্লাসে উত্তেজনায় বিকৃত ব্যঙের সুরে চেঁচিয়ে বলল নারায়ণ তার ফতুয়ার বোতাম আঁটতে আঁটতে, বলি ধান পেলে গোলায়?

ফিরে যাচ্ছিল, ফিরে যেত সবাই, এই উৎকট ধিক্কারে গুম খেয়ে গেল গাঁয়ের শ'দেড়েক পুরুষ। অসহ্য বিস্ময়ে তাকালো দু'চোখে জ্বলন্ত প্রশ্ন নিয়ে।

গোমস্তা নারায়ণের কি অত খেয়াল আছে, চিরকাল মানুষ ঠেঙিয়ে সে তিরস্কার দূরে থাক, পেয়েছে পুরস্কার।

আবার সে চেঁচায়, বলি গোলার ধান ন্যায্য দরে বাঁটোয়ারা করলে না সোনা মণ্ডল?

ধান কোথা গেল নারাণ? সোনা মণ্ডল প্রশ্ন করল জোরালো গলায়। এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে সে চুল মুঠো করে ধরল নারায়ণের, ডান হাতে মুঠো করে ধরল তার বুকের ফতুয়া, টেনে আনল সবার মধ্যে।

ধান কোথায় গেল?

আমি—আমি—হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল নারায়ণ। দম আটকে শ্বাস টেনে বিহ্বল হয়ে ভয়ার্ত কান্না।

এক ধাক্কায় তাকে উঠানে ফেলে দিল সোনা মণ্ডল। মুখ বাড়িয়ে থুতু ফেলল তার মুখে। ধারালো দা বাগিয়ে কোপ দিতে ছুটে যাচ্ছিল জোয়ান মজিদ, বাঁ হাতে সাপটে ধরে তাকেও আটকাল।

বলল, দুৎ! ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করব না।

সুবল মশাল জেবলেছে। এগিয়ে গেছে হালদারের গোয়াল ঘরের চালায় আগুনের ছোঁয়াচ দিতে। সোনা মণ্ডল ছুটে গিয়ে মশাল কেড়ে নিল।

কি পোড়াবী? ঘরবাড়ি? ঘরবাড়ি কি শত্তুতা করেছে মোদের সাথে? ঘর পুড়বে মিছামিছি, শত্তুর পালাবে, কাল মিলিটারী এনে গুলির চোটে ভুলিয়ে দেবে রাইকিশোরীর নামটা!

সোনা মণ্ডলের গালে একটা চড় বসিয়ে দেয় নগেন কুণ্ডু, তার আশা-ভরসা, টাকা খরচ ব্যর্থ হয়েছে। মুকুলের দিকে তাকিয়েই তার জ্ঞান ফিরে আসে, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেয় দিগ্‌ বিদিক জ্ঞান হারিয়ে, এঁদো ডোবার পাশ দিয়ে পড়ি-মরি ভাবে ছুটে অদৃশ্য হয়ে যায় আম-বাগানে। মুকুল আর বটুক তার পিছু। তিনবার হাঁক দেয় সোনা মণ্ডল গলা চড়িয়ে চড়িয়ে, মুকুল আর বটুক অনিচ্ছায় থেমে ফিরে আসে।

সোনালী তাজা রোদ উঠে গেছে ততক্ষণে। খানিক দূরে সরকারী সড়ক দিয়ে আওয়াজ তুলে তুলে ধুলো উড়িয়ে নন্দীপুরের বোঝাই বাসটা চলে গেল। আজ দেরী করেছে, সদর থেকে ভোর চারটায় ছেড়ে আরও আগে গাঁ ঘেঁষে বাসটা বেরিয়ে যায়, ওঠানামার যাত্রী না থাকলে থামেও না।

বাসটা যেন থেমেছিল এদিকে রাস্তাটা যেখানে বড়পাড়ার ঘরবাড়ির আড়ালে। টিনের ছোট বাক্সটি হাতে ঝুলিয়ে উল্লাসকে আসতে দেখা যায়। মামলাবাজি ব্যবসা উল্লাসের, অনেক উকীল-মোক্তারের চেয়ে তার অনেক বেশী উপার্জন! সম্প্রতি এগার জন চাষীর নামে একদিনে হালদার সতরটা মামলা শুরু করেছে, তাই নিয়ে বড়ই ব্যস্ত হয়ে আছে, গাঁ আর সদর করে বেড়াচ্ছে হরদম্‌।

জমায়েৎ দেখে সে তফাতেই থমকে দাঁড়ায়। হালদারের বাড়ির সামনে ভিড় জমাটা শুভ চিহ্ন নয়। দিনকাল সুবিধে নয়।

কুক্ষণে অসময়ে বাস থেকে নেমেছিল উল্লাস, ক্ষুব্ধ ব্যাহত মানুষ-গুলির সামনে এসে পড়েছিল, তার বিরুদ্ধে যাদের বুকে বহুদিনের জমা করা পুঞ্জ পুঞ্জ ঘৃণার

আগুন! সোনা মণ্ডলের গালে চড় মেরেও কুণ্ডু ছুটে পালিয়ে বেঁচে গিয়েছে, কারণ মানুষটা সে যেমন হোক সে তাদেরই মানুষ, সাথে এসেছিল একই উদ্দেশ্যে, তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সঞ্চিত ছিল না যে হঠাৎ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে একটা দোষ করলেই বারুদের মতো ফেটে পড়বে। সবাই জানে, ওবেলাই হয়তো দেখা যাবে সোনা মণ্ডলের দাওয়ায় বসে সে কলকে ফুঁকছে, মাপ চেয়ে মিটিয়ে নিয়েছে ব্যাপারটা।

কিন্তু উল্লাসের ওপর বড় রাগ তাদের, বহুদিন ধরে মনগুলি জর্জরিত অভিশাপ হয়ে আছে। হঠাৎ গর্জন করে ওঠে আড়াইশো লোক, তাতে তলিয়ে যায় সোনা মণ্ডল আর অন্য কয়েকজন ঠাণ্ডামাথা মানুষের প্রতিবাদ। চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যায় ফন্দি-ফিকিরের জালবোনা, মানুষের পর মানুষকে পথে নামানোর অধ্যবসায়, শিশির ভেজা ঘাসে চিৎ হয়ে উল্লাসের দৃষ্টিহীন পলকহীন চোখ মেলা থাকে আকাশের দিকে। বাতাসে উড়ে যায় ছিঁড়ে কুটিকুটি করা দলিল পত্র, নোটের তাড়াটা পর্যন্ত কেউ ছোঁয় না, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

জানালার ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে যায় শরৎ হালদারের, বন্দুক ধরা হাতটা পর্যন্ত থর থর কাঁপতে থাকে।

ফুঁপিয়ে কাঁদে মেয়ে বিনু, ছেলের বৌ রাধা গা থেকে গয়না খোলার ব্যস্ততায় আলগা অনন্তটা টানাটানি করে যেন খুলতে পারে না, হালদার-গিন্নী মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে সিন্দুর মাখা লক্ষ্মীর পটটার সামনে, দাঁতে দাঁতে চেপে মূক হয়ে থাকে হালদারের দুই যোয়ান ছেলে।

খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে কখন লোক গেছে থানায় খবর দিতে, এখনো এল না নৃপেন দারোগা দলবল নিয়ে। এমনি বিপদে দয়া করে ছুটে আসার অগ্রিম মূল্য নিয়ে রেখেছে, তবু।

হালদারের জন্য জীবন দেয় উল্লাস, এই তার শেষ কাজ। কিন্তু জীবন দিয়েও যেন অপকার করে যায় শেষবারের মতো। শূন্য গোলা দেখে ক্রোধে, ক্ষোভে, ফুসতে ফুসতে ফিরেই যেত ধৈর্যহারা মরিয়া মানুষগুলি, হালদারের বাড়ি চড়াও হত না। ধান তারা লুটতে আসেনি, কিনতে এসেছিল গায়ের জোরে—তার বেশী আর কিছু করার কথা ছিল না। উল্লাসের অনেক দিনের পুরানো পাওনা ঝোঁকের মাথায় মিটিয়ে দিয়ে মনের গতি যেন ঘুরে গেছে তাদের। গোলার ধান কোথায় গেল, এ প্রশ্নের জবাব হালদারের কাছেই আদায় করার সাধ জেগেছে।

জবাব চাই, ধান কি হল। জবাব দিতে হবে হালদারকে।

উঠানে দালানের সামনে তারা ভিড় করে দাঁড়ায়। ডাকে, হালদার মশায়, হালদার মশায়!

দরজা জানালা ভেতর থেকে বন্ধ। কিছুক্ষণ কারো সাড়াশব্দ মেলে না। তারপর ধীরে ধীরে জানালার একটা পাট খুলে গিয়ে শিকের ফাঁকে দেখা যায় বড় মেয়ে বিনুর ভয়ার্ত মুখ।

বাবা বাড়ি নেই।

বাড়ি আছে, লুকিয়ে আছে, গর্জন করে ওঠে তারা, আসতে বলো হালদার মশায়কে, নইলে দরজা ভেঙে ফেলব।

বন্দুক তোলে হালদার, বড় ছেলে ঠেকিয়ে রাখে। বলে, একটা বন্দুক কি হবে? আরও ক্ষেপে যাবে সবাই।

বোনকে সরিয়ে সে জানালায় দাঁড়ায়। বলে, কি চাই সোনা মণ্ডল?

গোলার ধান কোথা গেল? মোরা কিনতে এয়েছি ধান।

ধান নেই, বেচে দিয়েছি।

কাকে বেচলে? কখন বেচলে?

জগৎ কুণ্ডুকে বেচে দিয়েছি। রাত্রে ধান নিয়ে গেছে।

বেচে দিয়েছ! গাঁয়ের লোক না খেয়ে মরছে, তুমি ধান বেচে দিয়েছ!

জানালায় পাট ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেয় বড় ছেলে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে জানালা নয়, দরজাই খুলে দিতে হয় পরাণ ভৌমিক আর সোনা মণ্ডলকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার জন্য। রাতারাতি পাঁচশো মণ ধান সরিয়ে নিয়ে গেছে সাতকুঁড়ার জগৎ কুণ্ডু, কিন্তু গাঁয়ের লোক কেউ টের পায়নি, এটা সহজে বিশ্বাস করতে চায়নি তারা। দালানের তিনটে কোঠা খুঁজে দেখার দাবি করেছে।

শুধু দু'জন ভেতরে আসবে—এই শর্তে দরজা খুলেও দিতে হয়েছে।

ঘরে ফিরে পাঁচু কাপড়ে বাঁধা আধসেদ্ধ ভেজা চালগুলি টুকরিতে ঢেলে রাখে। বুঁচি খুসী হয়ে বলে, আ মর! কোথাকার কুড়োনো চাল?

পাঁচু হাসে। উনান থেকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে দালানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল হালদারের বড় বৌ, হাঁড়ি থেকে আধসিদ্ধ চালগুলি পাঁচু ছেঁকে তুলে কোঁচরে বেঁধে এনেছে।

গভীর রাত্রে লরি-এসেছিল জগৎ কুণ্ডুর. দশজন লোক নিয়ে। সরকারী রাস্তায় থেমেছিল লরি।

ইঞ্জিন না চালিয়ে নিঃশব্দে লরিটা ঠেলে আনা হয়েছিল হালদারের বাড়ির কাছে, হাতে হাতে গোলার ধান কিছুক্ষণের মধ্যে উঠে এসেছিল লরিতে, আবার ঠেলে লরি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বড় রাস্তায়।

দিনের বেলায় প্রকাশ্যে কতবার এসেছে লরিটা, ধান-চাল নিয়ে গেছে গাঁয়ের লোকের চোখের সামনে দিয়ে, তখনো মরিয়া হয়ে ওঠেনি গাঁয়ের লোক পেটের জ্বালায়। লরির চাকার অনেক দাগের সঙ্গে মিশে গিয়েছে গত রাত্রির আনাগোনার নতুন দাগ।

জগৎ কুণ্ডুর তিনটে আড়ত, একটা গাঁয়ে, একটা নন্দীপুরে, একটা সদরে। তার কোনটাতেই যায়নি ধান নিয়ে লরিটা, বড় সড়ক ধরে ক্রোশ দুই নন্দীপুরের দিকে গিয়ে বাঁয়ে মোড় ঘুরেছিল অন্য রাস্তায়, হাজির হয়েছিল তিন ক্রোশ তফাতে নদীর ধারে পলাশডাঙায়।

ধান-চাল চোরা চালানের এখানে একটা ঘাঁটি আছে কুণ্ডুর।

জানে অনেকেই, এক রকম প্রকাশ্যভাবেই চোরা চালান চলে। গোপনতা শুধু এতটুকু যে, সরকারীভাবে ব্যাপারটা স্বীকৃত হয় না।

টিনের চালা, সিমেণ্ট করা মেঝে। অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে ধানগুলি মেঝেতে ছড়িয়ে ঢেলে ফেলা হয়। এক কোণে অল্প কিছু চাল পড়েছিল মেঝেতে, চাল ও তুষের গুঁড়ো। বোঝা যায় গুদামে চাল জমা হয়েছিল, সম্প্রতি সরানো হয়েছে, এখনো মেঝে ঝাঁট দেওয়াও হয়নি। অলস স্তিমিত চোখে তাকায় নারায়ণ, শস্যের গন্ধ তার নাকে লাগে না, নাক ভোঁতা হয়ে গেছে। ছোট ঝাঁটাটি হাতে নিয়ে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে রাজু, মা ও মেয়ে। ধান গুদাম-ঘরে তুলতে যে কটি দানা পথে মাটিতে ঝরে পড়বে, ঝেঁটিয়ে ওরা কুড়িয়ে নেবে। খেয়ে বাঁচবে।

ধান যারা আগে গুদামে তুলেছিল, তাদের একজন বোঝা থেকে কিছু ধান হাত বাড়িয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দেয়, আড় চোখে চেয়ে হাসে। রাজু তার শীর্ণ মুখে খুশির ভাব ফোটাতে চেষ্টা করে। মাটিতে ঝরে পড়া শস্যকণা কুড়িয়ে নেবার একচেটিয়া অধিকার দিয়েই তাকে কিনতে পেরেছে নারায়ণ। তার ওপর এই দয়া, খেলার ছলে আরও দুটি বেশী শস্য ছিটিয়ে দেওয়া!

ছোট ঘাট, খেয়া পারাপার হয়, কয়েকটি নৌকা আসে যায়, কয়েকটি ঘাটে বাঁধা থাকে, মেয়ে পুরুষ নাইতে বা জল নিতে আসে। সকালে ধানচালের গুদামটির গায়ে লাগানো কেরোসিনের দোকানের বারান্দায় চেয়ারে বসে নারায়ণ ঝিমোয়, বান্দা মেপে মেপে কেরোসিন বেচে। তেল দিতে যেন হাত ওঠে না তার, পয়সা নিয়ে দু'ফোঁটা তেলও যেন দেয় অনিচ্ছায়। সবাই পায় না তেল, পাওনা তেলের দশভাগের এক ভাগও পাবে না, তেল ফুরিয়ে যায়! এটা লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান, দশ টিনে দু'টিন এমনিভাবে বাঁধা দরে বেচে ঠাট বজায় রাখতে হয়। বাকীটা নির্বিবাদে বেচা যায় চোরা দরে।

নৌকার মাঝি এসে দাঁড়ায়। হাই তুলে নারায়ণ বলে, দেশপুরের কলে পেঁৗছে দিবি ধান।

মাঝি বলে, দিনে বোঝাই দিতে বাবু বারণ করেছে না?

দুত্তোরি বারণ করেছে, নারায়ণ ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই বলে, তোল তুই। কি হবে? কোন শালা কি করবে?

তা ঠিক, কিছুই হয় না, কেউ কিছু বলে না, সবার চোখের ওপর বুক ফুলিয়ে চোরাই ধান চাল চালান দেওয়া যায়।

কিন্তু চিরদিন কি যায়? চিরদিন কি মানুষ মুখ বুজে থাকে, কিছু বলে না!

ওরা কারা আসছে দল বেঁধে? কেরোসিনের খদ্দের? কেরোসিনের খদ্দের তো এমন দল বেঁধে আসে না। সুধীর, কানাই, জৈনুদ্দীনদের দেখা যাচ্ছে। একটা কিছু হাঙ্গামা করতে আসছে। নারায়ণ সজাগ হয়ে ওঠে।

তোমার গুদামে চোরাই ধান আছে।

তুমি কে হে বাবু? আমার গুদামে কি আছে না আছে, তোমার তাতে কি?

সুধীরের মেজাজ বিগড়েই ছিল, সে চিৎকার করে বলে, আবার চোখ রাঙায়! বাঁধো ব্যাটাকে, কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলো থানায়।

সুধীর বলে, থামো, থামো। দারোগা বাবু আসুক। ধান রয়েছে, আসামী রয়েছে, এতো আর চাপা দেওয়া চলবে না।

থানার দারোগা বিধুভূষণ এসে পৌঁছতে পৌঁছতে খবর ছড়িয়ে প্রকাণ্ড ভিড় জমে যায়। উৎসুক, উত্তেজিত হয়ে জনতা প্রতীক্ষা করে কি ঘটে দেখবার জন্য। এতকাল ধরে এমন খোলাখুলিভাবে এখান দিয়ে ধান চালের বে-আইনী চালান চলে আসছে যে, লোক প্রায় খেয়াল করতেই ভুলে গিয়েছিল কারবারটা আইনসঙ্গত নয়। নারায়ণের মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখ তার পিট পিট করে। এ অঘটন তার কল্পনায় ছিল না। সুধীর কানাইরা যে দল বেঁধে এসেছিল, সেটা সে গ্রাহ্যই করেনি, থানায় খবর গেছে শুনে মনে মনে একটু হেসেই ছিল বরং। কিন্তু দেখতে দেখতে যে ভাবে চারিদিক ভেঙে এসে জমা হয়েছে মানুষ, খুশির উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে প্রতীক্ষা করছে পুলিস এসে তাকে কি ভাবে বেঁধে নিয়ে যাবে দেখবার জন্য, তাতে ভড়কে গিয়েছে নারায়ণ। কিছু তার হবে না শেষ পর্যন্ত সে জানে। তবু একটা অদ্ভুত আতঙ্ক চাপ দিচ্ছে হৃৎপিণ্ডে, দম যেন আটকে আসবে। জনতার এই ভয়ঙ্কর বিরোধী মূর্তি সে জীবনে কখনো দ্যাখেনি।

বিধুভূষণও ভড়কে যায় ব্যাপার দেখে।

বলে, কি ব্যাপার, কি ব্যাপার, হয়েছে কি! ভিড় কিসের!

বলে, ধান? চোরাই ধান ধরা পড়েছে? তাই নাকি। তা এত ভিড় কেন?

বলে, কি হে পরাণ, ব্যাপারটা কি?

আমি কি জানি, নারায়ণ বলে, কর্তা ধান পাঠাল—

আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। শুনেছি সব। প্রায় ধমক দিয়ে বলে বিধুভূষণ লোকটার মূর্খতায় সে চটে যায়! কর্তাকে আবার টানবার চেষ্টা কেন এর মধ্যে? বিধুভূষণ যেন জানে না কে তার কর্তা, কে ধান পাঠিয়েছে!

সুধীর কানাইদের বলে বিধুভূষণ, ওহে তোমরা ভিড় ভাগাও, তোমরাও যাও। ধরিয়ে দিয়েছো, এবার যা করার আমায় করতে দাও।

সুধীর কানাইরা নড়ে না। ভিড় এক পা পিছু হটে না।

সুধীর বলে, সবার সামনে ধান দেখুন, সাক্ষীদের নাম টাম লিখুন—

ব্যাটাকে গারদে পুরুন!—একজন চেঁচিয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে একটা সিগারেট ধরায় বিধুভূষণ, সুধীরদের দিকে, পিছনের জনতার দিকে, দু'চার বার তাকায়, তারপর নারায়ণকে বলে, গুদামটা খোলো তো হে। কত ধান আছে?

দরজা খুলে একবার উঁকি দিয়ে দেখেই বাইরে থেকে তালা এঁটে সিল করে দেওয়া হয়, লেখালেখি হয় বিবরণাদি সাক্ষীর নাম ধাম, তারপর একজন পুলিসকে গুদামের সামনে মোতায়েন রেখে নারায়ণকে নিয়ে বিধুভূষণ চলে যায়।

ভিড়ের মানুষ তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফেরে।

সেইদিন জগৎ কুণ্ডু যায় সদরে, হাজিরা দেয় জোনসের বাংলায়। জোনস একা থাকে, তার মেম থাকে কলকাতায়। শহর ছেড়ে সে নড়ে না, টাকা চেয়ে পাগল করে

তোলে জোনসকে। না দিয়ে উপায় থাকে না, বড় মুস্কিল হয় টাকার ব্যাপারে কড়াকড়ি করলে।

পরদিন দেখা যায় কেরোসিন তেলের দোকানের সামনে চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে নারায়ণ। পুলিসের তত্ত্বাবধানে গুদামের ধানগুলি থানার কাছে এক চালা ঘরে চালান হয়ে যায়, সেঁতসেঁতে মাটির মেঝেতে জমা হয়। খড়ের চালার অনেকগুলি ফোকর দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারে মেঘম্লান আকাশের আলো।

সুধীর কানাইরা কয়েকজন দেখা করতে যায় বিধুভূষণের সঙ্গে, জিজ্ঞাসা করে কি ব্যাপার হল?

বিধুভূষণ বলে, খোঁজ খবর রাখবে না কিছু, হাঙ্গামা বাধিয়ে বসবে। কান্ডাকান্ড জ্ঞান আছে তোমাদের? লাইসেন্স আছে নারায়ণের, জগৎবাবু ওর নামে পারমিট করিয়ে রেখেছিলেন। নারায়ণেরও বুদ্ধি বেশী, আরে বাবা তুই লেজিটিমেট এজেন্ট সরকারের, জগৎবাবু তোর লাইসেন্স পারমিট সব করে রেখেছেন না রাখেননি, সে খবরটাও তুই জানিস না?

ধানটা তা হলে সরানো হল কেন?

তোমাদের জন্য, বিধুভূষণ অনুযোগের সুরে বলে, এ ধানটা নিয়ে হাঙ্গামা করলে তোমরা, ফের যদি হানা দাও নারাণের গুদামে, গোলমাল কর। আমার হেফাজতে রাখার হুকুম হয়েছে।

এযুক্তি ভল। দারুণ অসন্তোষ বুকে নিয়ে ফিরে যায় সুধীরেরা। মেঘ ঘনিয়ে আসে আকাশ কালো করে। বৃষ্টি নামে অজস্র ধারে। আবার রোদ ওঠে, আবার বৃষ্টি হয়। রাত্রে শেয়াল ঘুরে যায় ধান রাখা চালাটার চারপাশে। ভ্যাপসা একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে অসহ্য ওঠে সে গন্ধ। তারপর একদিন সদরে চালান দেবার ব্যবস্থা হলে চালাটার দরজা খুলে দেখা যায়, ধানগুলি পচে গেছে।

দীঘি

সন্ধ্যার কুয়াশা নামছে।

ছাড়া ছাড়া কুয়াশা আলতোভাবে দীঘির জল ছুঁয়ে থাকে। আস্তে আস্তে পাক দিয়ে ওঠে, নড়ে চড়ে বেড়ায়, বাতাসে ভেসে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে জল মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে। এপাড়ে জমিদারের গোয়াল থেকে গাঢ় ঘুঁটের ধোঁয়া মন্থর গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে, অদূরে গাঁয়ের চেহারা সন্ধ্যার ছায়া, কুয়াশা আর ঘুঁটের ধোঁয়ায় আবছা হয়ে এসেছে।

দীঘল লম্বাটে দীঘি যে নেহাৎ কম এমনি তা নয়, লম্বার তুলনায় কম। দক্ষিণের পাড় বাঁধের মতো উঁচু, ওদিকে খুঁড়ে যেতে যেতে নাকি এক সারিতে তফাতে তফাতে তিনটি দেবমূর্তিতে ঠেকে কোদালে বাধা পড়েছিল। সেই লাইনে সীমা হয়েছিল দক্ষিণ তীরের। বিশালতর চৌকোণা না হয়ে দীঘি তাই এরকম লম্বাটে হয়ে আছে। পাঁচ পুরুষ আগে খোঁড়া দীঘি। জলদ উদ্ভিদ ভরে গেছে দীঘির বুক জলের নীচে, সকালে বেলা বেড়ে আর বিকালে বেলা পড়ে এসে সূর্যের আলো যখন খানিক তেরচা ভাবে পড়ে, টলটলে স্বচ্ছ জলের নীচে যেন এক অদ্ভুত গাঢ় সবুজ রহস্যপুরীর আবরণ খুলে যায়। উত্তর বা দক্ষিণ তীরে দাঁড়ালে এটা হয়। পূর্ব পশ্চিম তীরে দাঁড়ালে ঝলমলে আলোয় চোখে শুধু ধাঁধাঁ লাগে।

তিন তীরে ঘাট, দক্ষিণ ছাড়া। প্রকাণ্ড বাঁধানো ঘাট, চওড়া' সিঁড়ি। আজ ভেঙে-চুরে গেছে, বড় বড় ফাটল ধরেছে, ইঁট খসে পড়েছে। তবু অনেকের শোয়া-বসার মতো অটুট সমতল ঠাঁই আজও মিলবে অনেক ঘাটের চত্বরে।

হাসিতুল্লা চুপ করে বসে থাকে ঘাটে। শূন্য নির্জন চারিদিক, নির্জনতাই যেন ঘন হয়েছে ছায়া আর কুয়াশার রূপে। অজু করে গামছা বিছিয়ে নামাজ পড়েছিল হাসিতুল্লা, তারপর থেকে বসে আছে। অল্প বেলা থাকতে যখন সে পৌঁছেছিল এখানে, তখনও জনমানুষহীন ছিল ঘাট, দীঘির আশে পাশে মানুষ চোখে পড়েনি। শিং ভাঙা বুড়ো একটু গরু শুধু চরছিল দক্ষিণের উঁচু বাঁধে। গাঁয়ের দিকে দু'চারজন মানুষকে দেখা গিয়েছিল এদিক ওদিক চলাফেরা করতে, তারাও যেন লুকোচুরি খেলছিল আপন মনে, এ ঘরের আড়াল থেকে বেরিয়ে খানিক দৃশ্যমান থেকে আড়াল হয়ে যাচ্ছিল গাছপালা ঝোপঝাড় বা অন্য বাড়ির পিছনে। দীঘির পানে কেউ এগিয়ে আসেনি। নারী পুরুষ ছেলে মেয়ে একজনও নয়।

বেশী তফাৎ নয় গাঁয়ের এদিককার ঘর ক'খানা। মুখহাত ধুতে জল নিতেও

আসেনি মেয়েপুরুষ একজন। দীঘির জল কি খারাপ হয়ে গেছে? বিষাক্ত বলে বর্জন করেছে সকলে? কি স্পর্ধা!

দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে হাসিতুল্লা, অনেক দূরের গাঁ থেকে। জমিদার ডাক দিয়েছে, জরুরী হুকুম, আজের মধ্যে এসে পেঁছানো চাই যেমন করে হোক, কোন অজুহাত চলবে না। এমনি আহ্বানের জন্য বাপের আমল থেকে প্রস্তুত হয়েই থাকে হাসিতুল্লারা। আরো আগে দিনে দিনে পেঁছতে পারত হাসিতুল্লা, রওনা দিতে দেরী হয়ে গেল বিবির জন্য। তার বিবির জ্বর খুব বেড়েছে।

জোরে জোরে একটানা হেঁটেছে বিশ্রামের জন্য না দাঁড়িয়ে, বসে থাকতে আরাম লাগছে বেশ। খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়েছে চারিদিকের অদ্ভুত স্তব্ধতা আর নির্জনতায়। যতবার সে এসেছে এ গাঁয়ে, সকালে বিকালে যখন তাকিয়েছে দীঘির দিকে, আশেপাশে মানুষ দেখে এসেছে চিরদিন, শুনে এসেছে মানুষের গলার আওয়াজ। গাঁয়ের লোক দীঘির জলে স্নান করে, ঘাটে বসে জটলা পাকায়, দীঘি ঘেঁষে চলাচল করে, পাশের মাঠে গরু বাঁধে ছেলে ছোকরারা, খেলাধুলো হৈ চৈ করে। সুদীর্ঘ দীঘিটি ওপাড়ের জমিদার বাড়িকে তফাৎ করে রাখে গাঁয়ের জীবন থেকে। গাঁয়ের জীবন দীঘির এ তীরে পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হতে জমিদার কখনো বারণ করেনি।

কি ব্যাপার তবে? একটা লোক নেই আশে পাশে যে তাকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করে হাসিতুল্লা।

জমিদার বাড়িও কেমন যেন নিঝুম, আঁধার আঁধার। দু'একটা আলো জ্বলছে, গোয়াল থেকে ঘুঁটের ধোঁয়া উঠছে, কোন সাড়াশব্দ নেই। উঠি উঠি করেও হাসিতুল্লা বসে থাকে। কান খাড়া করে রাখে পূজার বাজনার আওয়াজের জন্য। পুঁটলিটা পাশে পড়ে আছে, পাকা বাঁশের মোটা লাঠিটা সে শক্ত করে ধরে থাকে। লাঠি ধরা মুঠির মতো কঠিন তার মুখ। দু'পুরুষ তাদের লাঠির মালিক জমিদার, জমিদারের মান রাখার জন্য এই লাঠি।

অনেক দেরীতে পূজার বাজনা বাজে জমিদারের গৃহমন্দিরে। বাজনায় যেন তেমন জোর নেই, জমকালো আওয়াজ নেই। মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায় হাসিতুল্লার।

যখন সে ওঠে তখন রাত্রি হয়ে গেছে। কুয়াশার জন্য আজ ঠান্ডা কম। ঠান্ডাকে ডরায় না হাসিতুল্লা, মাঘের ঠান্ডাকেও নয়, এতো অঘ্রাণের হিম। জগতে কাউকে ডরায় না হাসিতুল্লা, কিছুকে ডরায় না, তার লাঠিখানা হাতে থাকতে। তবে কিনা সন্ধ্যাবেলা জনহীন দীঘির ঘাটে গা ছম ছম করে, সেইসব কিছুর জন্য যা জগৎ ছাড়া, তার জানা চেনা মাটির পৃথিবীর যা নয়।

অমনি একটা কিছুর মতোই ছায়াটা কাছে আসে।

একটু শিউরে ওঠে দেহটা হাসিতুল্লার। ক'বার সে তাড়াতাড়ি পলক ফেলে চোখের।

ছালাম।

মানুষের গলার আওয়াজ। হাসিতুল্লা স্বস্তি বোধ করতে থাকে।

কন থে আইলা মিয়া? আরে, হাসিতুল্লা নাকি!

চিনবার নারলাম তুমারে।

রোজেনালিরে চিন?

অ'—তুমি রোজেনালির চাচা। চিনছি। ইস্টিমারে তুমি পিটাইছিলা ফিরিঙ্গিটারে, হাজত গেছিলা। ছাড়া পাইলা কবে?

রও মিয়া, হাসাইও না। কোন সালের কথা কও জাননি? ছাড়া পাইলাম, নিকা করলাম, ব্যাটা বেটি পয়দা করলাম দু'গা, তুমি আইজ জিগাও ছাড়া পাইলাম কবে। ঘুমাইয়া ছিলানি দুই দশ সাল?

আরও তিনটে ছায়া এসে যোগ দেয় রোজেনালির চাচার সঙ্গে। এবার অন্য ভয় জাগে হাসিতুল্লার, কে জানে কি মতলব এদের। লাঠিটা সে শক্ত করে ধরে।

পথ ছাড়। পথ ছাইড়া দাও।

পথ ছাড়াই আছে।—নবাগত একজন বলে।

পথ ঠেকাইছে কেডা? রোজেনালির চাচা বলে ভোতা সুরে, মন চায় যাওগা, ঠেকামু ক্যান? জিগাইলাম কি, আইছ ক্যান? না আইলে ভাল করতা, বদ কাজে আইছ। ধানের পাওনা ভাগ মোরা নিমু। মরুম বাঁচুম খোদারে জানাইয়া থুইছি। কয়ডারে মারবা তুমি, কয়জনারে ঠেকাইবা? মিছা আইছ বাই, বদ কামে আইছ। ফিরয়া যাও, ঘরে ফিরয়া যাও।

আরেকটা ছায়া বলে, খাতির পাইবা না, মিছা আইছ। কত বন্দুক পুলিস আনছে, তোমারে পাত্তা দিব?

দীঘির ঘাটে চারজন কয়েকমুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝখানে একেবারেই যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল, আচমকা মহাসমারোহে পূজার বাজনা বেজে উঠে জমিদার বাড়িতে, ঢোল, কাঁসি, ঘণ্টা।

হাসিতুল্লা যেন বুকে জোর পায় খানিকটা। বলে, নিমকহারামি করুম না।

কার নিমক খাইছ তুমি? কিসের নিমকহারামি?

হাসিতুল্লা নীরবে এগিয়ে যেতে চাইলে—তামুক খাইয়া যাও। যা মন চায় কইরো তুমি, তামুক খাইয়া যাও।

পথ ছাড়, পথ ছাইড়া দাও!—চিৎকার করে ওঠে হাসিতুল্লা, বাঁশের লাঠিটা বেকায়দায় ঘুরিয়ে দেয় মাথার ওপর দিয়ে, তারপর ছুট দেয় দীঘির উত্তর পূব কোণায় জমিদারের গোয়াল ঘরের দিকে।

এরা খানিক দাঁড়িয়ে থাকে। ধিক্কারজনক একটা আওয়াজ করে নটবর বলে, কই নাই হালার পুত বুঝবো না? পাগড়ী বাইন্ধা চৌকিদারী কইরা খায় আর একখান লাঠি দিয়া বোরে পিটায়, মস্ত মরদ! বলতে বলতে তার মাথা বিগড়ে যায়, ক্রুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করে, ফালডা দিয়া বিঁধলা না ক্যান হারামজাদারে? জাত-ভাই বইলা? নামাজ করে বইলা?

একটা লোহার রড়, ঘষে ঘষে একটা ডগা ছুঁচালো করে বর্শার মতো মারাত্মক অস্ত্র করা হয়েছে, সেটা ছিল দরগা সেখের হেফাজতে। এ খোঁচা সয়না দরগা সেখের,

হাতের ওই অস্ত্রটা দিয়েই সে ঘায়েল করতে যায় নটবরকে। রোজেনালির চাচা বাঁ হাতে বাগিয়ে নেয় ডান্ডাটা, ডান হাতে একটা চড় কষিয়ে দেয় দরগা সেখের গালে।

বলে, ইয়ের পুত, তোরে কইছিলাম কি?

দরগা চুপ করে থাকে। তার বয়স মোটে বাইশ তেইশ।

—কইছিলাম না বৌয়ের বুকে সেক দিবি মালসায় আগুন জ্বালাইলা, কামের কামে মন নাই, বিবাদ করে। তোমারে কই নটু বাই, যা তা কও ক্যান? জাত বাই! লাঠি দিয়া মাথা ভাঙবো, জাতভাই!

খানিক চুপ করে থেকে বলে, আল্লা!

লেঠেল যত জমা হয়েছে কাছারী বাড়ির পিছন দিকে পুরানো মণ্ডপ-চত্বরে তার বহর দেখে বিশেষ আশ্চর্য হয় না হাসিতুল্লা। ব্যাপার সে খানিক আন্দাজ করেছিল দীঘির ঘাটেই। কে না আন্দাজ করতে পারে আজকের দিনে! চারিদিকে অনেক ঘটনা ঘটছে। এরকম ঘটনা।

এখানে আসর বসে যাত্রা গান কবি কীর্তনের মস্ত চৌকো পাকা ভিত, গোল মোটা থাম, নীচু ছাদ, চারিদিক খোলা। বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে চারিদিক তাদের থাকার জন্য। ইস্টিমারের ডেকের মতো কাঁথা-কাণির বিছানা পড়েছে সারা মেঝে জুড়ে। একরাতের হানাদারি লাঠিবাজীর ব্যাপার নয়। চারিদিকে কাছে দূরে গাঁয়ে গাঁয়ে বজ্জাতি জুড়েছে চাষী প্রজারা, ব্যাপার সোজাও নয়, সহজে মিটবারও নয়।

লণ্ঠনের আলোয় চেনা চেনা মুখ খোঁজে হাসিতুল্লার চোখ, তার রক্তে সাড়া লেগেছে স্বধর্মী এতগুলি মানুষের কথাবার্তার গুঞ্জনে, এরা ছাড়া কে বুঝবে লাঠি খেলতে জানা লাঠিয়ালদের, লড়ায়ে সৈন্যদের প্রাণের আত্মীয়তা।

তারপর কয়েকটা চেনা মুখ, কয়েকজন জানা মানুষ মেলে কিন্তু একটু দমিয়ে দেয় হাসিতুল্লার প্রথম উৎসাহ। এরা কেন তাদের দলে? এরা তো লড়ায়ে লেঠেল নয়! পিছন থেকে একলা মানুষের মাথায় লাঠি মেরে কাদের ফেরার হয়ে আছে, সোনা জেল খেটেছে চুরির দায়ে। খুন জখম চুরি ডাকাতি মেয়ে লুটের লেঠেল এরা, এরা তো লড়ায়ে লেঠেল নয়! ব্যগ্র হয়ে হাসিতুল্লা অন্য চেনা মুখ খোঁজে, অন্য জানা মানুষের সন্ধান করে। যারা তার নিজের জাতের লেঠেল, মনিব হুকুম দিলে মরবে জেনেও একা পঞ্চাশ জনের মহড়া নেয়, কিন্তু দুর্বল অসহায়ের উপর, আঁধার রাতে চুপি চুপি পিছন থেকে শত্রুকে মারার হুকুম মনিব দিলেও সে হুকুম অমান্য করে।

নাজু ওস্তাদেরে দেহিনা?

আসে নাই।

বড় আলি?

তেনাও আসে নাই।

লালপুরের গোপেন?

আইছিল, চুপে চুপে ভাগছে! ডরাইছে বুঝি ব্যাপার দেইখা।

মনে মনে বলে হাসিতুল্লাঃ ডরাইছে! লালপুরের গোপেন ডরাইছে. তুমি মস্ত বীরপুরুষ!

মুখ গোমড়া করে বসে থাকে হাসিতুল্লা। যে জমায়েতকে গোড়ায় আপন মনে হয়েছিল, ঘনিষ্ঠ হয়ে আর তাদের আত্মীয় ভাবতে পারছে না। সকলের যে সমবেত গুঞ্জন উল্লসিত করেছিল, কি কথা আর কেমন হাসি ঠাট্টা দিয়ে তা তৈরী জেনে মনটা বিগড়ে গেছে। কাল এরা পুলিস দলের সাথে হানা দিয়েছিল কোদপুর গাঁয়ে। একটা মোটে মেয়ে ছিল গাঁয়ে, একটু হাবাটে পাগলা মতো, তবে কাঁচ বয়েস, খাপসুরৎ চেহারা। হাসিতুল্লার কাণের কাছে ক'জন বলাবলি করে মেয়েটাকে নিয়ে অন্যের মজা করার গল্প, তারা ভাগ পায়নি। শূন্য গাঁয়ে হঠাৎ কোথা থেকে এসে মেয়েটা ছেনুদ্দীন মন্ডলের ঘরের দাওয়ায় খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে কি রকম হাবার মতো তাকিয়েছিল, কে প্রথম টেনে নিয়ে গিয়েছিল, শেষে কে ঘর থেকে বেরিয়ে কি রকম ভংগীতে আপসোস করে বলেছিল, মরে গেছে!

দাড়িতে হাত বুলায় হাসিতুল্লা, মাথাটা এদিক ফেরায় ওদিক ফেরায়, যেন ফাঁদে পড়েছে। এদের সে জানে। ভাল করে জানে। মগজে এদের শয়তানের বাসা, শত্তুর ভয়ে আঁধারে লুকিয়ে থাকে, খুঁজে বেড়ায় একা অসহায় মেয়েছেলে, এমনি করে কষ্ট দিয়ে মেরে সুখ পায়। বাইরে যদি মেয়ে না মেলে, নিজের বাড়িতে উলঙ্গ করে খুঁটিতে বেঁধে মারে বাড়ির মেয়ে বৌকে।

কুর্তা পরা গগন আসে ক্রুদ্ধমূর্তিতে, ধমক বলে ফের হল্লা শুরু করছে? আস্তে আস্তে কথা কও কইলাম!

গোমস্তার চোখরাঙানিতে চুপ মেরে যায় এতগুলি মরদ লাঠিয়াল। হাসিতুল্লার প্রাণটা জ্বালা করে।

এ কাদের সাথে ভিড়ছে সে! চাপা গলায় কথা সুরু হয় গগন চলে যেতেই। গগনের বিরুদ্ধেই নালিশের কথা। তার ধমকানির বিরুদ্ধে নয়, তাদের পাওনা টাকায় সে যে মোটা ভাগ বসায়, তাদের খাওয়া দাওয়া পান তামুকের বরাদ্দে ভাগ বসায়, তারই বিরুদ্ধে।

কত্তারে কও না গিয়া? না তো নায়েব বাবুরে? হাসিতুল্লা বলে তাদের।

তুমি কওনা গিয়া? কানমলা খাইয়া আসবা!

হাসিতুল্লা এদিক ওদিক খোঁজে গগনকে, কর্তাবাবু নয় তো নায়েব বাবুকে সে সেলাম জানাবে। দুপুরুষ এ সেলাম জানাবার সম্মান তারা ভোগ করে এসেছে। গতবার যখন সিথুয়ার চরে বিবাদে পুলিসের সাথে লড়তে এসেছিল সে আর বড় আলি, গোপেনেরা, জমিদারবাড়ি বেশী রাতে পৌঁছেও তাকে খবর পাঠাতে হয়নি, কর্তাবাবু নিজে নেমে এসে সেলাম নিয়েছিল, বলেছিল, আইছ হাসিতুল্লা? ওই হালারা চরে পুলিস আনছে, হাত করছে পুলিসেরে, আমার মান রাখনের ভার তোমার।

আজ গগন তাকে দেখেও দেখল না!

জমিদার বাড়ির অদূরে কলাবাগানের পাশে পুলিসের তাঁবু পড়েছে। এগার

বিঘা জমি নিয়ে জমিদারের নাম করা কলাবাগান, বাবুর খোঁড়া ছোট ছেলেটার সখের বাগান, কত রকম কলা যে কাঁদির পর কাঁদি ফলে যায়। গাঁয়ের মানুষ দেখতে পারে চেয়ে চেয়ে, কোনদিন চাখতে পারে না, পূজাপার্বনে প্রসাদ বিতরণের সময় যদি দুএক টুকরা জুটে যায়।

বৈঠকখানায় দারোগা, কয়েকজন জোতদার, ছোট জমিদার নিয়ে কর্তার বৈঠক। কর্তার হাতে গড়গড়ার নল, দারোগা বাবুর মুখে সিগারেট। কাঁচের গেলাসে রঙীন পানীয়। পর্দা ঠেলে থমকে দাঁড়ায় হাসিতুল্লা।

কেরে তুই!

সেলাম কর্তা। ডাক দিছেন, আইছি।

আরে ব্যাটা হারামজাদা—

দারোগা বাবুর হুংকার থামিয়ে কর্তা বলে, হাসিতুল্লা, গগনের কাছে যাও! এখানে কি? একজন পুলিস তাকে হাত ধরে টেনে নামিয়ে দেয় বারান্দার নীচে।

এদিক ওদিক চেয়ে কাছারি-বাড়ির নির্জনতম দিকে গিয়ে একা একটু বসতে চায় হাসিতুল্লা। রুদ্ধ ঘরের ভিতরে সে চাপা কান্না শোনে মেয়েছেলের!

রাত্রির গাঢ় কুয়াশার দিকে চেয়ে হাসিতুল্লা বলে, আল্লা।

গায়েন

গান গেয়ে ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষকে এতকাল কাঁদিয়ে আসছে যে লোকটা, তার ফোকলা মুখে গালভরা হাসি দেখলে জগৎ যেন বদলে যায়। পাকা টুলটুলে খুশির ফলটি ফেটে গেছে হঠাৎ, এখন থেকে পৃথিবীতে আর আনন্দের অভাব হবে না। এই বুড়ো বয়সে গায়ের চামড়ার রঙটাতেও যেন তার পালিশ আছে ঘন পুলকরসের।

সম্প্রতি কিছুকাল জের চলেছে বিষণ্নতার, মন খারাপের।

শিংমাছের ঝোল দিয়ে ভাত বেড়ে দেয় আমোদ, বলে, কাঁদছ কেন? হেথা হোথা গাইতে যাও, ফিরে এসো মুখটা হাঁড়ি। মারে নাকি ধরে ধরে?

মুখে হাসি ভাঙে। হাতের গরাস নামিয়ে রাজেন সুর করে বলে,—

সাধে কি কেঁদে মরি, ছিঁড়ে দাড়ি,
মেয়্যার হয় না শ্বশুরবাড়ি,
জগৎজনা দেয় টিটকারি,
বুড়ো রাজেনের গলায় দড়ি—

মুখ ছোট হয়ে আসে আমোদের, চোখ হয় বড় বড়। এতদিনে তবে জানা গেল—গায়ন সেরে ফিরে এসে রাজেন দাসের মন গুমরিয়ে থাকার কারণ! আর কোন খুঁৎ পায়নি, বড় মেয়ে ঘরে রাখার ছুতোয় এবার সবাই টিটকারী জুড়েছে, অপদস্থ করতে চাইছে রাজেনকে। কে করছে, কারা উদ্যোগী, জানে আমোদ। এখনো এই বুড়োর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যারা মাথা তুলতে পারে না, এই বুড়োর আসরে লোক ভেঙে পড়ে, কিন্তু যাদের আসর খাঁ খাঁ করে শ্রোতার অভাবে!

বিদেয় কর। মোকে বিদেয় কর শীগ্‌গির! বলে আমোদ মনের দুঃখে কাঁদে।

কি যন্তনা, সে কথা নয়! রাজেন বলে ভড়কে গিয়ে, মনে কথা এল, গেয়ে দিলাম, একটু তামাসা হল নিজের সাথে—তোর কথা মোটে নয়। তবে কিনা চিন্তা একটা জেগেছে। ভাবি কি, এবার বুঝি মোর বিদেয় নেবার পালা, ক্ষমতা কমে আসছে।

ইস্‌!

হাঁ। আসর তেমন জমাতে পারি না, উসখুস্‌ করে লোকে, ইদিক উদিক চায়, খুক খুক কাসে, সিকনি ঝাড়ে। না বলে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন, চোখে দেখি টের পাই।

দু'চার গ্রাস ভাত খায় রাজেন।—মোর হয়ে এয়েছে নাকি কে জানে!

বলোনি ওকথা!

না বললে চলছে কিসে? তিন কুড়ি তো হয়ে এল বয়েস।

শ্রোতার হৃদয়ের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলছে রাজেন দাস, কি ভয়ানক কথা এটা! জগৎ যেন স্তব্ধ হয়ে শুনতে চায় এটা কি ব্যাপার, অরণ্য নাকি খুঁজে পাচ্ছে না বাতাস, সাড়া তুলতে পারছে না মর্মরধ্বনি? রাজেন দাসের গানে সাড়া দিচ্ছে না মানুষ? যতই অসম্ভব হোক, কিছুদিন থেকে আসর সত্যই জমাট বাঁধছে না রাজেনের। গোলার হাটে হাজার মানুষ, গঞ্জের মেলার অগুণতি লোক, নন্দী বসুর উৎসবে সদর ঝাঁটিয়ে জড়ো করা ছেলেবুড়ো, মূক হয়ে শুনে গেছে আগাগোড়া, শুধু শুনে গেছে। অভিভূত হয়ে থমথম করেনি জনতা, আবেগে উত্তাল হয়ে ওঠেনি, বিনা সর্তে সমবেত ভাবে তার হাতে তুলে দেয়নি অশ্রু নিয়ন্ত্রণের শেষ ক্ষমতা। একবার নয়, একদিনের একটি আসরে নয়, এমনি ঘটে আসছে আজকাল।

রাজেন টের পায়। এই করেই তার জীবন কাটল, পাতলা কটা হয়ে এল ঘন কালো চুল, ভাঁটা ধরল দেহের শক্তিতে। জনতা তার চিরদিনের প্রেয়সী, কাঁধে ঘুরিয়ে উড়ুনি কোমরে বেঁধে কোঁচা ঝুলিয়ে বরবেশে সবার মধ্যে দাঁড়ালেই সে বক্ষলগ্না প্রিয়ার মতো অনুভব করে সমাবেশের হৃৎস্পন্দন, শুনতে পায় মনোরঞ্জনের ফরমাস, জানতে পারে হাসি কান্নার আবেগ, আবেশ, বিহ্বলতার গভীরতা। কবে গায়নে শুধু একঘেয়ে পচা নোংরামির রস পরিবেশন বন্ধ করেছিল গুরুর সঙ্গে বিদ্রোহ করে, গাইতে শুরু করেছিল পুরানো কথা নিজের মতো লিখে নিয়ে, মাঝে মাঝে তারই মধ্যে স্বদেশিয়ানার বুকুনি ঢুকিয়ে দিতে দিতে কবে পুরাণকথা ছেড়ে চলে এসেছিল দেশের কথায়, সব তার স্মৃতিতে জড়িয়ে গেছে। কত রাত কত চোখের কত জলে সে বসুমতী ভিজিয়েছে দেশমায়ের দুঃখের কাহিনী গেয়ে! পুলিস ধরে জেলে দিয়েছে তাকে, জরিমানা করেছে।

কবি-জীবন তার সার্থক হয়েছে এই বুড়ো বয়সে, ধন্য হয়েছে চরম রূপে, বন্যা আর দুর্ভিক্ষের গায়ন করে। প্রথম বন্যা নিয়ে গেয়েছিল গোলার হাটে, ভয়ে ভয়ে। একেবারে চলতি ব্যাপার, তখনো মুছে যায়নি বন্যার চিহ্ন দেশ থেকে বা মানুষের মন থেকে, জের থামেনি সর্বনাশের, একেবারে কাঁচা ঘা, জমবে কি গান? মানুষ তো চটবে না তাদের মারাত্মক দুর্ভাগ্য নিয়ে ছড়া গাঁথার বাহাদুরীতে, কাঁচা ক্ষতে খোঁচা দিয়ে আসর জমানোর চেষ্টার পাগলামিতে? গান শুরু করার পরেই কোথায় ভেসে গিয়েছিল ভয়-ভাবনা, দ্বিধা-সঙ্কোচ, পাগল হয়ে মানুষ শুনেছিল মাঝ রাত্রি পার করে, কেঁদেছিল মানুষ শিশু ভেসে যাওয়া মানুষ মায়ের সজল চোখে বাছুর-মরা গাভীর গলায় হাত বুলানোর বর্ণনায়, হেসেছিল মানুষ ভুঁড়িওলা নায়েববাবুর তৃতীয় পক্ষের আদরিণী বৌয়ের ধাক্কায় খাট থেকে মেঝের বন্যার জলে পড়ে হাবুডুবু খাবার কল্পনায়, ক্ষোভে নিঃশ্বাস ফেলেছিল মানুষ সরকারী রিলিফের নির্লজ্জ অব্যবস্থায়। সাড়া পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে।

গঞ্জের মেলায় প্রথম গেয়েছিল দুর্ভিক্ষ ধরে, বিরাট আসরে, জনসমুদ্রে। মাঠের

ধান কোথায় গেল, মানুষের খাবার কে সরালো, অসহায় মানুষ কি ভাবে কেঁদে কঁকিয়ে উপোস দিয়ে উজাড় হল, মায়ের বুকে শিশু মল, বাপ মেয়ে বেচল, স্বামী বৌ বেচল, সাদা রাজার রাজ্য কেমন ছেয়ে গেল সাদা কঙ্কালে। রাত ভোর করে এনেছে রাজেন দাস, পাঁচ সাত হাজার মানুষের হৃদয়ে যেন ঝড় বইয়ে নিয়ে গেছে দুঃখের, হতাশার-- চোখ শুকনো থাকতে দেয়নি একজনেরও।

তিরিশ বত্রিশ বছরের গায়ন-সাধনার চরম পুরস্কার, পরম সিদ্ধি। বড় সে ছিল, সেরা সে ছিল কবির মধ্যে—একমাত্র, অদ্বিতীয় কবি বলে তারপর লোকে মেনে নিল তাকে। আর কেউ নেই, অন্য সবাই তুচ্ছ, প্রসাদ পাবার যোগ্য নয় রাজেন দাসের। সাফল্যের নেশায় নিজেও যেন কেমন মাতাল হয়ে গেল রাজেন। সেরা কবি গায়ক হয়েও দুঃখ তার ঘোচেনি কোনদিন, অনটন কাটিয়ে স্বচ্ছলতার স্বপ্নই শুধু দেখেছে সে চিরকালঃ এমনি অদ্ভুত কল্পনাতীত জনপ্রিয়তার মধ্যেই দারিদ্র্য দূর করার স্বপ্ন। তা জনপ্রিয়তার স্বপ্নটা সফল হল, খেয়াল হল না কিছু টাকা পয়সা করার কথাটা। যে যা দেয়, যখন যা পায়, তাই নিয়ে খুসী হয়ে আসর মাতিয়ে বেড়াতে লাগল দুর্ভিক্ষের কথায়, চাষীর দুঃখে।

এমনি রাজেন দাসের প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হয়েছে একজন। হরিখালির নরহরি। শিষ্য সে হলেও হতে পারত রাজেন দাসের, সবে সে প্রৌঢ় বয়সে পা দিয়েছে, কিন্তু শিষ্য সে নয়। গুরু তার কালিগঞ্জের ভূতনাথকেও বলা যায়, গাংপোতামার ভূষণকে বললেও অন্যায় হবে না, আটৌনার বিভূতির সঙ্গেও নাকি তাকে দেখা গেছে দু'এক বছর।

বাপের ঠিক নাই, গুরুর ঠিক থাকে?

রাজেন বলে দাওয়ায় সমাগত বন্ধু, ভক্ত আর শিষ্যদের। বলে ছড়া কেটে দেয় ছ'আট লাইন বেঠিক বাপের ছেলে কেন বার বার গুরু ধরে গুরু ছাড়ার ব্যারাম হয়, তারই ব্যাখ্যায়। অনায়াসে গড়গড় করে ছড়া বলে যায় রসালো এবং ঝাঁঝালো, দ্রুত তালের সুর আর ছন্দ ঠিক রেখে, শেষ দু'লাইন দুলে দুলে রয়ে রয়ে রসায়ঃ

যখনি বলে গুরুকে বাপ,
তখনি ভাবে কে মোর বাপ!

গাইছে কিন্তু বেশ, পুরানো ভক্ত শশী বলে বাপঘটিত গুরুমারা রসিকতার রসটা মরে এলে, বেশ একটু তোলপাড় করেছে। বড় ছেলেটা শুনে এল সেদিন হাটতলার পয়লা বোশেখের সভাটায়—সুতো কলের লোকেরা করেছিল। বলল কি যে, বেশ গাইছে। তেজে গাইছে, জোরদার গান, বলচে নাকি যে ফের মন্বন্তর এলে কেউ মরো না, কাঁদাকাটা করো না, ফ্যান চেও না, কদম কদম বাড়িয়ে গিয়ে যার গুদামে চাল আছে তাকে গাছের ডালে ফাঁসি দিয়ে—

রসকস নেই, বাজে! সজনী বলে। তার শীর্ণ মুখে বার্ধক্যের ছাপ পড়বার আগে নেমে এসেছে রোগের মরণের আবির্ভাব ঘোষণার মতো কালিমা। ধুঁকে ধুঁকে সে বলে, আমি শুনে এয়েছি পরশু। সদর থেকে ফিরছি সাঁঝের বেলা, মামলাটার তারিখ ছিল, তা দিনভোর টালবায়না করে শুনানী হল কচু, ফের তারিখ পড়ল

সাতাশে, হাকিমগুলো মরে না? ধলাঘাটে নেমেছি ফেরি ইস্টিমার থেকে সাঁঝ পেরিয়ে, ভাবছি যে তিন কোশ পাড়ি দেব না রাতটা কাটিয়ে দেব মাথা গুঁজে হেথা সেথা পারি, দেখি যে লোকে লোকারণ্য ঘাটের পাশে গুয়ারবাগান মাঠটা। কি ব্যাপার? না, নরহরির কবিগান। বাইরে চাঁদ অস্ত যাওয়া তক্, চারটে ঢোলক, দুটো ব্যায়লা, একটা বাঁশী, সাগরেদ বুঝি জন আষ্টেক—গাইলে বেশ। তা রসকস নেই। শুধু ওই এক কথা, যে মরে সে মরে, তার পাত্তা মেলে না, চুপচাপ মরা পাপ! মরো না, মারো! যে মারতে চায় তোমায়, তুমি তাকে মারো!

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল রজনী, রোগ যন্ত্রণা দুর্বলতা সব ভুলে যেন গায়ন শুরু করে দিয়েছে। চারিদিক চেয়ে সে লজ্জিত হয়ে থেমে যায়।

গোঁয়ার।—অসন্তুষ্ট রাজেন বলে, গোঁয়ার গোবিন্দ। গায়নের বোঝে ছাই। এতো বাবু বক্তিমে নয়, হৈ হৈ রৈ রৈ করে গালগলা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে গেলেই হল! এ রসের ব্যাপার।

তবু ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে বুকটা। মনে মনে সে ভাল করেই জানে, দশজনে যা চায় তাই আসল, আর সব মিছে। তার ভাল বোঝায় কিছু আসে যায় না। চালার জীর্ণ টিনে এক ঝাঁক পাখি উড়ে এসে বসে, নখের আঁচড়ের সঙ্গে কিচির মিচির আওয়াজ তুলে ঘরের বিষণ্ণ আবহাওয়া মুখরিত করার চেষ্টাই যেন শুরু করে দেয়। হঠাৎ উড়ে যায় কোথায়। ঘরে বসে সে কি বুঝে আসেনি শুনতে পায় না অসংখ্য মানুষের অস্ফুট গুঞ্জন, চিরদিন কি সহজে বুঝে আসেনি সে ভাষা? কোথা থেকে কি নতুন মানে আসতে পারে তার দেশের লোকের প্রাণের ভাষায় সে যার মানে বুঝতে পারে না?

কদমপুরে বায়না আছে কাল। রাজেন বলে আচমকা।

কি ধরবে? আমোদ শুধায় সাগ্রহে।

ভাবছি কি, রাজেন যেন পরামর্শ চায় মেয়ের কাছে, মন্বন্তরের পুরানো গায়নটা ধরি। টাকা সের চাল হয়েছে. উপোস শুরু হয়েছে, ফের দুর্ভিক্ষ লাগবে বলছে সবাই। দুটো চারটে কথা অদল বদল করে নিলে লাগসই হবে মনে করি—নাকি?

আমোদ উৎসাহ বোধ করে। দীপ জেবলে টিনের পুরানো বাক্সটি খোলে। খাতার কাগজে বাক্সটি ঠাসা। রাজেন দাসের সারা জীবনের গানের ভান্ডার—জীর্ণ হয়ে হয়ে ছিঁড়ে গলে যাবার উপক্রম করেছে, কিছু কাগজ পোকায় কেটে নষ্ট করে দিয়েছে।

হাতে তৈরী মোটা হলদে কাগজের খাতায় মন্বন্তরের গানের খসড়া রাজেনের হাতের গোটা গোটা হরফে লেখা। এটা অবলম্বন করে গান চলে, আসরে গাইতে গাইতে আসে অনেক স্বতঃস্ফূর্ত কথা, অনেক নতুন মিল নতুন পদ—সেইখানেই বাহাদুরী কবি গায়কের। আমোদ পড়ে পড়ে শোনায়, মাথা নেড়ে নেড়ে রাজেন শোনে মশগুল হয়ে তাকে ঘিরে সত্য হয়ে উঠতে থাকে বিরাট জনসমাবেশ, অদল বদল নতুন কথা আর পদযোজনা চলতে থাকে মনের মধ্যে, গত দুর্ভিক্ষের এই মর্মান্তিক রূপ আজকের শ্রোতাদের সামনে ধরার মোট কৌশলটা ঠিক হয়ে যায়। নতুন একটি প্রস্তাবনা জুড়ে দেবে। তাতে থাকবে আবার দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের ছায়াপাতের কথা।

তারপর এ গানে যা কিছু ঘটেছে বলে বর্ণনা আছে, সে সব ঘটবে বলে সামনে ধরা। লাখ মানুষ কিভাবে মরছে সে বর্ণনা আছে এ গানে, তাকে বদল করে, লাখ মানুষ কিভাবে মরতে যাচ্ছে, সেই বর্ণনায় পরিণত করা। হৃদয় মুচড়ে যাবে মানুষের। আসর কাঁদবে!

চোখ জ্বলজ্বল করে রাজেনের, উৎসাহে সে সিধে হয়ে বসে।

আসর কিন্তু কাঁদে না। মন দিয়ে শোনে। শুধু শোনে।

রাজেনের নামে পাঁচ ক্রোশ দূরের গাঁ থেকে লোক এসেছে কবিগান শুনতে, কদমপুরের হাইস্কুলের লাগাও মাঠ ভরে গিয়েছে। এখনো গলার যে জোর আছে রাজেনের, আসরের শেষ প্রান্তের লোকটিও শুনতে পাচ্ছে তার প্রতিটি কথা। শোনার যে অসীম আগ্রহ নিয়ে মানুষ আসে তা যেন আশীর্বাদের মতো, গোড়াতেই অল্পেই জমে যায় আসর—নিজের আগ্রহ আর প্রত্যাশা দিয়েই নিজেদের মুগ্ধ করে ফেলে শ্রোতারা। প্রথমে জমজমাট হয়ে উঠেছিল অসহায় মানুষের নিরুপায় মরণের সকরুণ ভূমিকা আর মানুষরূপী দানবের খেলার ছলে সেই মারণযজ্ঞ আরম্ভের বর্ণনা, সুরে ও কথার বাঁধুনিতে আরও মুগ্ধ করেছিল সমবেত হৃদয়মন, সভা গম গম করছিল ঔৎসুক্যে, নড়ে চড়ে ভাল করে জেঁকে বসেছিল সবাই। খুশি হয়েছিল রাজেন, পুরোমাত্রায় আত্ম-বিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল, এ তার চেনা লক্ষণ। আসরকে সে হাতের মুঠোয় পেয়েছে। এখন খুশি মতো হাসাতে কাঁদাতে যা খুশি করতে পারে। সভার এই ঘন দানা-বাঁধা ঔৎসুক্য আরও নিবিড়ভাবে এ রস পাবার জন্য, যাব স্বাদ সে দিয়েছে।

কিন্তু কেমন যেন ওলোটপালট হয়ে যায় হিসাব নিকাশ, ধীরে ধীরে বিগড়ে যেতে থাকে সভার মতিগতি। অস্থিরতা বাড়ে, অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে রাজেনের মর্মান্তিক বর্ণনা। আধবুড়ো একজন উঠে দাঁড়ায় হঠাৎ. মুখে তার খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, বিস্ফারিত চোখ, সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে। তীব্র তীক্ষ্ম আর্ত কণ্ঠে সে বলে, রাজেন দাস! বলি ও রাজেন দাস! তাতো বুঝলাম, সর্বনাশ তো হচ্ছে, কি করি তার উপায় বলো! বাঁচি কিসে বাৎলে দাও!

এ এক হিসাবে জয় রাজেনের, তার শক্তির পরিচয়। কিন্তু এতো চায়নি রাজেন দাস। মানুষকে আবেগে পাগল করার শক্তি তার চিরদিনই আছে—অন্য কবিওয়ালাবও কম বেশী আছে। তাতেই তো রাজেন দাসের আসল সার্থকতা নয়। আবেগে পাগল হবে, হৃদয়মন ভরেও যাবে, তবে না যথার্থ আসর জমল। এ আসরের তৃপ্তি নেই, যা চায় তা পায়নি আসরের লোক, তাদের প্রাণ ভরেনি। আরও কিছু চায় তারা রাজেন দাসের কাছে। কি চায়?

হৈ চৈ ওঠে চারিদিকে। কেউ বলে হাঁ হাঁ, কেউ বলে, বসে পড়, বসে পড়। ধীরে ধীরে যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে এদিক ওদিক তাকায় লোকটি, তারপর বসে পড়ে। রাজেনের মনে পড়ে তার ঘরের দাওয়ায় পুরানো ভক্ত শশীর ব্যবহারের কথা। নরহরির গায়নের কথা বলতে সেও এমনি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ যেন চেতন ফেরায় এদিক ওদিক চাইতে চাইতে লজ্জা পেয়ে এমনি ভাবে বসে পড়েছিল।

আসর আর তেমন জমে না। যে জমাবে আসর প্রাণের ছোঁয়াচ দিয়ে, তার প্রাণেই উদ্বেগের আলোড়ন!

সকালে ম্লান মুখে বাড়ি ফেরে রাজেন, জ্বরের রোগীর মতো চেহারা করে। এক রাত্রে পায়ের তলা থেকে তার যেন মাটি সরে গেছে। অসম্মান করেনি কেউ, তার কবিত্ব-শক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েই আছে চারিদিক, আবার তার গায়ন থাকলে এমনি দূর থেকে লোক এসে ভিড় করবে আসরে, তবু বিস্বাদ হয়ে গেছে জীবন রাজেনের। চরম পরাজয়ে হিম হয়ে গেছে বুক!

ভেবোনা বাবা, মনে কষ্ট কোরো না। নতুন গান বাঁধ।

কি গান বাঁধব?

নরহরিটরি পারে তোমার সাথে? অন্যভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বলে আমোদ, ভারি খ্যামতা! করুক যত পারে শত্তুরতা, নিন্দে করে বেড়াক। তোমার কাছে কল্‌কে পেতে দেরী আছে। নতুন গান বাঁধো—

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খিঁচড়ে ওঠে রাজেন, নতুন গান বাঁধো! নতুন গান বাঁধো! এ তোর বেনুন রাঁধা কিনা, বাঁধলেই হল। ভেতর থেকে গান না এলে বাঁধব কি?

বোবা বৌ বিছানা নিয়েছে ক'বছর, মেয়ে ছাড়া গায়ের ঝাল ঝাড়বার আর কেউ নেই। সেই কবে অতল দয়ার রূপে প্রেম এসেছিল কবির খেয়ালে, নটবরের বোবা মেয়েটাকে বিয়ে করেছিল রাজেন, দুটি ছেলে দুটি মেয়ের সংসার। বড় ছেলে কিছু লেখা পড়া শিখে চাকরি করছে বিদেশে, খবর করে না। আরেক ছেলে গোল্লায় গেছে। এক মেয়ে গঞ্জনা খেয়ে মরছে শ্বশুরবাড়ি। এমন দেশজোড়া নাম তার কবি বাপের, সে তুলনায় অনেক প্রত্যাশা করে কিছুই তারা পেল না। আরেক মেয়ে ঘাড়ে ঝুলছে। দু'বিঘে জমিজমা হল না, দুটো পয়সা জমল না, পুরোনো জীর্ণ রয়ে গেল ঘরবাড়ি। কি হল? কি হল রাজেন দাসের জীবনে? কিছুই সে করতে পারল না কোনদিকে।

তেমন জমেনি শুনলাম মদনপুরে? শশী বলে আপসোস জানিয়ে। শুনে বুক পুড়ে যায় রাজেনের।

বয়স তো হলো।—আঁপসোস জানিয়ে বলে সজনী।

রাজেন উঠে যায়।

সেদিন খবর আসে, গোলার হাটে নরহরির গান। ক'দিন ছটফট করছিল রাজেন, খবর শুনে গুম খেয়ে যায়। গানের খসড়ার টিনের তোরঙ্গটি খুলে চুপ-চাপ বসে থাকে বেলা দুপুর তক্। তারপর হঠাৎ উঠে তাড়াতাড়ি নেয়ে খেয়ে নেয়, ফোকলা মুখে পান চিবুতে চিবুতে জামা গায়ে দিয়ে পায়ে আঁটতে থাকে ক্যাম্বিসের জুতো।

বোবা বৌ হাতের ইসারায় কাছে ডাকে, ইসারায় কি যেন বলে।

আচমকা হাসি ভাঙে রাজেনের মুখেঃ

আনব গো আনব। তোমার তামাক পাতা আনব।

যাচ্ছ কোথা? আমোদ সুধায়।

যাচ্ছি কোথা? নরহরির গান শুনতে যাচ্ছি।

তুমি যেচে যাচ্ছ ওর আসরে!

শুনে আসি। দেখে আসি।

নরহরির আসরে আচমকা রাজেনের আবির্ভাব সত্যই অঘটন, চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। সাধারণ একজন শ্রোতার মতই দশজনের মধ্যে বসে পড়তে যাচ্ছিল, কর্তা ব্যক্তি ক'জন এগিয়ে এসে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে সম্মানের স্থানে বসিয়ে দিল। একজন তখন হারমোনিয়মে সাধারণ গান ধরেছে।

নরহরি মাটি পর্যন্ত মাথা নামিয়ে ভূতপূর্ব গুরুকে প্রণাম জানায়, কিন্তু কাছে আসে না, কথা বলে না। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক হলেও তারা পরস্পরের নামে টিটকারী দেয়, পরস্পরকে ছোট করে। তবে গুরু গুরুই, গাল দিতে হলেও তাকে প্রণাম জানিয়েই গাল দিতে হবে! গানের শুরুতে নরহরি প্রণাম জানাল ছড়ায়—

হাতে ধরে গান শেখালে
দিও না অভিশাপ!
দুটি পায়ে প্রণাম জানাই,
যে গুরু সে বাপ।

কবি-গানের মন্থরগতি, ধীরে ধীরে নানা আঁকা-বাঁকা পথে নানা বিপথে নানা বাহুল্য-বৈচিত্র্য সংগ্রহ করতে করতে এগিয়ে চলে, আস্তে আস্তে আসর জমে। নরহরি প্রথমে আরম্ভ করে দুর্দিন ঘনিয়ে আসার গান—মনে মনে রাজেন বলে চোর! গুরুমারা বিদ্যাই শিখেছ বটে তুমি। দুঃখের দিনের ছবি ভয়াবহ হয়ে উঠতে না উঠতে পাশ কাটিয়ে নরহরি গায়ঃ কোমর বাঁধো ভাই!

একটু থতমত খেয়ে ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকে রাজেন।

করুণ হয়ে ওঠে নরহরির মরণের গান, হৃদয়ে মোচড় দেয় তার রসালো, ঝাঁঝালো পদগুলি, কিন্তু চোখে জল আনে না, কাঁদায় না। অসহায় হতাশায় ফেটে যাবার উপক্রম করে না বুক। ক্রোধে, ক্ষোভে তপ্ত হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস, হাতগুলি যেন এগিয়ে এগিয়ে যেতে চায় নরহরির ডাকেই সায় দিয়ে শিশুখেকো মেয়েখেকো মানুষ-খেকো বাক্ষসগুলির টুঁটি ধরে টেনে ফাঁসি লটকে দিতে—

ছাড়ো মিছে আশ
রাজার সেপাই দেয় কিরে ভাই
(মুখে) তুলে ভাতের গ্রাস।

বারংবার উন্মাদনা ফেটে পড়ে সভায়। মুখ টান টান। চোখে চোখে আগুনের ঝিলিক।

সহকারীকে সুর ধরিয়ে দম নিতে বসতে যাবে নরহরি, রাজেন তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে। বলে, নরহরি তুই মোর গুরু! তোকে প্রণাম করি! তুই মোর গুরু!

হাত বাড়িয়ে সে পা ছুঁতে যায় নরহরির। নরহরি ঠেকিয়ে রাখে। ওরে বাপরে, অপরাধ হবে, পা ছুয়োনা বাপ। মরে যাব!

তবে বল মোর মেয়াকে লিবি? তোকে ছাড়া আর কারো হাতে দিয়া দেব না!

দু আঙুল কানে ঢুকিয়ে নরহরি বলে, বোলো না বাপ। শুনতে নাই, তোমার মেয়া আমার বুন!

ছেলেমানুষী

ব্যবধান টে‘কেনি। হাত দুই চওড়া সরু একটা বন্ধ প্যাসেজ বাড়ির সামনের দিকটা তফাত রেখেছে, দুবাড়ির মুখোমুখি সদর দরজাও এই প্যাসেজটুকুর মধ্যে। পিছনে দুবাড়ির ছাদ এক, মাঝখানে দেয়াল উঠে ভাগ হয়েছে, মানুষ-সমান উ‘চু। টুল বা চেয়ার পেতে দাঁড়ালে বড়দের মাথা দেয়াল ছাড়িয়ে ওঠে।

ব্যবধান টে‘কেনি। কতটুকু আর পার্থক্য জীবনযাপনের, সুখদুঃখ হাসিকান্না আশা-আনন্দের, ঘৃণা-ভালবাসার। সকালে কাজে যায় তারাপদ আর নাসিরুদ্দীন, অপবাহ্ণে ফিরে আসে অবসন্ন হয়ে। ব্যর্থ স্বপ্ন, উৎসুক কল্পনা দিন দিন ক্রমে ওঠে একই ধরনের, ক্ষোভ দিনে দিনে তীব্র হয় দুটি বুকে একই শক্তির বিরুদ্ধে। ইন্দিরা আর হালিমা যাপন করে বন্দী জীবন—রাঁধে বাড়ে বাসন মাজে স্বপ্ন দ্যাখে আর অকারণ আঘাত মুখ বুজে সয়ে চলে অবুঝ নিষ্ঠুর সংসারের। ইন্দিরার কোলে একদিন আসে গীতা। পরের বছর অবিকল তারই বেদনাকে নকল করে হালিমা পৃথিবীতে আনে হাবিবকে।

যদিবা টি‘কতে পারত খানিক ব্যবধান, দুরন্ত দুটি ছেলে মেয়ে মানুষের তৈরি কোন কৃত্রিম দূরত্ব মানতে অস্বীকার করে তাও ভেঙে দেয়। কাছে আনে পরিবার দুটিকে। অন্তরঙ্গ করে দেয় ইন্দিরা আর হালিমাকে।

একদিন একটি শুভলগ্নে দুটি ছেলে মেয়ের বিয়ে হয় পাড়ায়। গীতা পায় নতুন খেলা। মার শাড়ি ভাঁজ করে সে পরে, সি‘দুরের টিপ আর চন্দনের এলোমেলো ফোঁটা আঁকে কপালে আর গালে, পাড় দিয়ে বাবার লাল টুথব্রাশটির মুকুট এ‘টে সে কনে সাজে হাবিবের। কপালে চন্দন লেপে গলায় গামছা পাকানো উড়ুনি ঝুলিয়ে দিয়ে হাবিবকে বরবেশে সেই সাজিয়ে দেয়। শাশুড়ীর অভিনয় করতে হয় ইন্দিরা আর হালিমা দুজনকেই। উলু দিয়ে বরণ করতে হয় জামাইকে ইন্দিরার, বৌকে হালিমার। খাবার আনিয়ে জামাই-আদরে বৌ-আদরে দুজনকে খাওয়াতে হয় মুখে খাবার তুলে দিয়ে। নইলে নাকি খায় না নতুন বর-বৌ। থেকে থেকে দুজনে তারা ফেটে পড়ে কৌতুকের হাসিতে। তাতে রাগতে রাগতে হঠাৎ বিয়ের কনের লজ্জা-সরম ভুলে গিয়ে মেঝেতে হাত পা ছুঁড়ে কান্না শুরু করে গীতা। তারপর থেকে তাদের হাসতে হয় মুখে আঁচল গুঁজে।

মাকে নকল করে গীতা হাবিবকে ডাকে, 'ওগো? ওগো শুনছ? জামাই। এই জামাই! ডাকছি যে?'

হাবিব বলে, 'অ্যাঁ?'

'অ্যাঁ কি? অ্যাঁ না। বলে কি গো?'

হালিমা আর ইন্দিরা ঢলে পড়ে পরস্পরের গায়ে।

মুখ ভার করে থাকে পিসী। হালিমা বাড়ি ফিরে যাওয়ামাত্র বলে, 'এ সব কি কাণ্ড বৌমা?'

'কেন পিসীমা?'

'চা খাওয়ালে, বেশ করলে। তা চা যে খেয়ে গেল কাপে মুখ ঠেকিয়ে, কাপটা শুধু ধুয়ে তুলে রাখলে সব বাসনের সাথে? গঙ্গা জলের ছিটেও দিতে পারলে না? ভিন্ন একটা কাপ রাখলেই হয় ওর জন্যে। জাতধর্মো রইল না আর।'

'গঙ্গা জলে ধুয়েছি।'—ইন্দিরা অনায়াসে বানিয়ে বলে।

এ বাড়িতে নাসিরুদ্দীনের মায়েরও মুখ ভার।

'ও বাড়ি থাকলেই পারতে? এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ওরা পছন্দ করে কিনা কে তা জানে।'

হালিমাও হাসিমুখে বলে, 'চা না খাইয়ে ছাড়লে না। দেরি হয়ে গেল।'

'তুমি তো খেয়ে এলে চা খুশি মনে। তুমি দিও তো একদিন কেমন খায়?'

'চা তো খায়!'

সব কাজ পড়ে আছে সংসারের, সময় মতো শুরু হয়নি। নাসিরের মার আসল রাগ কেন হালিমা জানে, তাই জবাব দিতে দিতে সে চটপট কাজে লেগে যায়: বিশেষ কিছুই আর শুনতে হয় না তাকে।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা যায় ছোট নাতনীকে কোলে নিয়ে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে নাসিরুদ্দীনের মা আর ছোট নাতি কোলে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে তারাপদর পিসী গল্প জুড়েছে সুখদুঃখের।

ব্যবধান টেঁকেনি।

কাজ সেরে দুপুরে হালিমা যেদিন একটু অপরাধিনীর মতোই এসে বসে, সেদিনও নয়। মৃদু অস্বস্তির সঙ্গে বলে হালিমা, 'একটা কাণ্ড হয়েছে ভাই।'

'ওমা, কি হয়েছে?'

'তোমার মেয়ে একটু গোসত খেয়ে ফেলেছে। আজ আমাদের খেতে হয় জানো। হাবিব খেতে বসেছে, আমি কিছুতে দেব না, বেটি এমন নাছোড়। হঠাৎ পাত থেকে নিয়ে মুখে পুরে দিলে।'

'কিছু হবে না তো?' ইন্দিরা বলে চমকে গিয়ে।

হালিমার মুখ দেখে তারপর ইন্দিরা হাসে, বলে, 'কি যে বলি আমি বোকার মতো। হাবিবের কিছু হবে না, ওর হবে! খেয়েছে তো কি আর হবে, ওইটুকু মেয়ে। কাউকে বোলো না কিন্তু ভাই।'

'তাই কি বলি?' হালিমা স্বস্তি পায়—'বাব্বা; আমি জানি না? ও রোজ

আলিসাব আর তার বিবি এসে কি দাবড়ানি দিয়ে গেল। হাবিব তোমাদের সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দিয়েছে, প্রসাদ খেয়েছে, এ-সব কে যেন কানে তুলে দিয়েছিল।'

'শোন বলি তবে তোমায় কাণ্ডখানা।'—ঘরে কেউ নেই, তবু ইন্দিরা কাছে সরে নীচু গলায় বলে, 'হাবিব অঞ্জলি দিয়েছে বলে পিসীর কি রাগ! উনি শেষে পঞ্জিকা খুলে আবোলতাবোল খানিকটা সংস্কৃত আউড়ে পিসীকে বললেন, সরস্বতী পুজোয় দোষ হয় না, শাস্ত্রে লিখেছে। তখন পিসী ঠাণ্ডা হয়ে বললে, তাই নাকি!'

শান্ত দুপুর। ফিরিওলা গলিতে হেঁকে যাচ্ছে, শাড়ি-সায়া-সেমিজ চাই। দুজনে তারা খড়ি নিয়ে মেঝেতে কাটাকাটি খেলতে বসে। হাই ওঠে, বুজে আসে চোখ। চোখে চোখে চেয়ে ক্ষীণ শ্রান্ত হাসি ফোটে দুজনের মুখে। আঁচল বিছিয়ে পাশাপাশি একটু শোয় তারা—দুটি স্ত্রী, দুটি মা, দুটি রাঁধুনী, দুটি দাসী।

ঘুমোয় না। সে আরামের খানিক সুযোগ জোটে বেলা যখন আরও অনেক বড় হয় গরমের দিনে। আজকাল শুধু একটু ঝিমিয়ে নেবার অবসর মেলে। ঝিমানো চেতনায় ঘা মারে স্তব্ধ দুপুরের ছাড়াছাড়া শব্দগুলি। তার মধ্যে সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে থাকে ছাতে হাবিব আর গীতার দাপাদাপির শব্দ।

ব্যবধান টেঁকেনি। কেন যে সেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আচমকা এমন ভয়ানক এমন বীভৎস রূপ নিয়ে, কেন এত হানাহানি খুনোখুনি চারিদিকে বোঝে না তারা, থতমত খেয়ে ভড়কে যায়, দুরু দুরু করে বুক। সেবার মাঝে মাঝে বুক কেঁপেছিল সাইরেনের আওয়াজে জাপানী বোমার দিনগুলিতে, দূরে থেকে হাওয়ায় ভর করে উড়ে আসা অনিশ্চিত বিদেশী বিপদের ভয়ে। তার চেয়ে ব্যাপক, ভয়ানক সর্বনাশ আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে দেশের বুকে, শহর জুড়ে, পাড়ায় ঘরের দুয়ারে। বুকের জোরালো ধড়ফড়ানি থামবার অবকাশ পায় না আজ, বাড়ে আর কমে, কমে আর বাড়ে।

তবে কথা এই যে, এটা মেশাল পাড়া। নিজেরাই বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে যতটা নিরুপায় নয় তার চেয়ে অনেক বেশী মরিয়ার মতো। এতেই অনেকটা ভরসা খাড়া আছে মারাত্মক আতঙ্ক গুজব আর উস্কানির সোজাসুজি প্যাঁচালো আর চোরাগোপ্তা আঘাত সয়ে, যে আঘাত চলেছেই। বাস্তব একটা অবলম্বনও পাওয়া গেছে সকলে মিলে গড়া পিস-কমিটিতে, বিভ্রান্ত না করে যার জন্মলাভের প্রক্রিয়াটাও জাগিয়েছে আস্থা। কারণ, বড় বড় কথা উথলায়নি সভায় আদর্শমূলক ভাবোচ্ছ্বাসে, মিলনকে আয়ত্ত করার চেষ্টা হয়নি শুধু মিলনের জয়গান গেয়ে, এই খাঁটি বাস্তব সত্যটার উপরেই বেশী জোর পড়েছে যে এ পাড়ায় হাঙ্গামা হলে সবার সমান বিপদ, এটা মেশাল পাড়া।

হয়তো এ পাড়ায় শুরু হবে না সে তাণ্ডব, কে জানে। চারি দিকে যে আগুন জ্বলেছে তার হলকাতে ছ্যাঁকা লেগে লেগেই মনে কি কম জ্বালা। সবহারা শোকাতুর দিশেহারা আপন জনেরা এসে অভিশাপ দিচ্ছে, বলছে মারো, কাটো, জবাই করো শেষ করে ফ্যালো। এ এসে ও এসে বুঝিয়ে যাচ্ছে মারা ছাড়া বাঁচার উপায় নেই।

অনেক কালের মেশামিশি বসবাস। হয়তো তেমন ঘনিষ্ঠ নয় মেলামেশা সবার মধ্যে, সেটা আসলে কিন্তু এটা শহর বলেই। পাখা সবারি পঙ্গু, মানুষকে হাঁস

মুরগী করে রাখা মর্জি মালিকের। পাখা ঝাটিয়ে চলতে হয় জীবনের পথে।

'তাই তো বলি পাখি নাকি আমরা,' হালিমা বলে মুখোমুখি জানলায় দাঁড়িয়ে, 'তাড়া খেয়ে খেয়ে আজ এখানে কাল সেখানে উড়ে বেড়াব? গাছের ডালে বাসা বানাব?'

'আর বোলো না ভাই,' ইন্দিরা বলে, 'মাথা ঘুরচে কদিন থেকে। এসব কি কাণ্ড। অ্যাঁ কি রাঁধলে?'

তেমন প্রাণখোলা আলাপ কিন্তু নয়, কদিন আগের মতো। গলায় মৃদু অস্বস্তির সুর দুজনেরি; চোখ এড়িয়ে সন্তর্পণে জানালা দুটির একটি করে পাট খুলে কথা কইছে, কাজটা যেন অনুচিত, আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ। দুজনের বাড়িতেই আচমকা আশ্রয় নিতে আত্মীয়স্বজনেরা আবির্ভাব ঘটেছে বলেই নয় শুধু, বাড়ির মানুষ বারণ করে দিয়েছে মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতা—অন্তত সাময়িক ভাবে।

'কি যে হবে ভাবছি।'

'দুধে নাকি বিষ মেশাচ্চে গয়লারা। দুধ জ্বাল দিয়ে আগে বেড়ালটাকে খানিকটা খাওয়াতে হয়, ছেলেপিলেরা খিদেয় কাঁদে, দেওয়া বারণ। আধঘণ্টা বেড়ালটা কেমন থাকে দেখে তবে ওরা পায়। রুটি আনা বন্ধ করেছেন। রুটি যারা বানায় তাদের মধ্যে তোমরাই নাকি বেশী। একটুকরো রুটি আর চা জুটত সকালে, এখন শুধু একটু গুড়ের চা খেয়ে থাকো সেই একটা দুটো পর্যন্ত।'

'এত লোক বেড়েছে, ডাল তরকারি ছিটে ফোঁটা এক রোজ থাকে, আর এক রোজ একদম সাফ। ভাতেও টান পড়ে।'

'আজ চিঁড়ে খেয়েছি নুন দিয়ে। গুড়ও নেই।'

চোখে চোখে চেয়ে খানিক মাথা নীচু করে থাকে দুজন। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় জানালার পাটদুটো।

ছেলে-মেয়ের সংখ্যাও বেড়ে গেছে দুবাড়িতে। অন্য অঞ্চল থেকে উৎখাত হয়ে তারা বড়দের সঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মুখ চেনাচিনিও হয়নি বড়দের মধ্যে, কিন্তু ছেলেমেয়েদের কে ঠেকিয়ে রাখবে? তাদের মেলামেশার দাবি রাজনীতির ধার ধারে না, আপস অনুমতির তোয়াক্কা রাখে না, জাতধর্মের বালাই মানে না। স্কুল নেই, লেখাপড়া নেই, বেড়ানো নেই, বাড়ির এলাকার বাইরে যাওয়া পর্যন্ত বারণ। বড়দের মুখ অন্ধকার, বাড়িতে থমথমে ভাব, মুমূর্ষু রোগী থাকলে ঘন ঘন ডাক্তার আসবার সময় যেমন হয়। ওরা তাই করে কি, হাবিব আর গীতার নেতৃত্বে নিজেরাই আয়োজন করে মিলেমিশে খেলাধুলো করার। বাড়িতে ঠাঁই নেই, নিজেরাই তৈরি করে নেয় খেলাঘর। হাঙ্গামা করতে হয় না বেশী, বাইরের প্যাসেজে দুপাশের দেয়ালে দুটো পেরেক পুঁতে একটা কাপড় টাঙিয়ে দিতেই প্যাসেজের শেষের অংশটুকু পরিণত হয়ে যায় চারিপাশে ঘেরা ছোটখাট একটা ঘরে। কিছু চাল ডাল ডাঁটাপাতা যোগাড় হয়েছে। গীতা এনে দিয়েছে ছোট তোলা উনুনটি আর তেলমশলা! তরকারির অনটনে সবার মন খুঁতখুঁত করতে থাকায় হাবিব এক ফাঁকে বাড়ির ভেতর থেকে সরিয়ে এনেছে কিছু আলু পেঁয়াজ আর একটা আস্ত বেগুন। জোরালো পরামর্শ চলছে, সব কিছু দিয়ে এক কড়া খিচুড়ি রাঁধা অথবা খিচুড়ি, ভাজা, তরকারি সবই রাঁধা

হবে। রান্নার ভার নিয়েছে মেহের, তার বয়স ন-দশ বছর, এই বয়সেই বড়দের আসল রান্নার কাজে তাকে সাহায্য করতে হয় বলে তার অভিজ্ঞতার দাবি সবাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে।

কিন্তু উনুনে তাদের আঁচও পড়ে না, রান্নাও শুরু হতে পায় না। টের পেয়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে দুবাড়ির বড়রা। মেহেরের বাপের নিকা-বৌ নুরুন্নেসা মেয়ের বেণী ধরে মাথা টেনে গালে চড় বসায়। পুষ্পর মাসীমা এক ঠোনায় রক্ত বার করে দেয় ভাগ্নীর ঠোঁটে। কান ছাড়াতে হাত পা ছোঁড়ে গীতা, লাথি লাগে তারাপদর পেটে। হাবিব কামড় বসিয়ে দেয় নাসিরুদ্দীনের হাতে। বাচ্চাদের কাঁদাকাটা বড়দের হৈ চৈ মিলে সৃষ্টি হয় আওয়াজ, প্রতিবেশীরা ছুটে এসে কি হয়েছে জানতে চেয়ে বাধিয়ে দেয় রীতিমতো হুল্লোড়, প্যাসেজের মুখে গলিতে জমে ওঠে লাঠি রড ইঁট হাতে ছোটখাট ভিড়।

কয়েক মুহূর্ত, আর কয়েক মুহূর্তে স্থির হয়ে যাবে মেশাল পাড়ার ভাগ্য—জীইয়ে রাখা শান্তি অথবা অকারণে ডেকে আনা সর্বনাশ। কান্না ভুলে বড় বড় চোখ মেলে ছেলেমেয়েরা চেয়ে দ্যাখে বড়দের অর্থহীন কাণ্ড।

ভলাণ্টিয়ার সঙ্গে নিয়ে পিস-কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক দুজন ছুটে আসায় অল্পের জন্য হাঙ্গামা ঠেকে যায়। সম্পাদক দুজন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন।

ভিড়ে ভাঙন ধরে। দু-চার মিনিটের মধ্যে ভলাণ্টিয়াররা ভিড় সাফ করে দেয়।

তখন যুগ্ম-সম্পাদক দুজন পরামর্শ করে ভলাণ্টিয়ারদের পাঠান পাড়ায় পাড়ায় সত্য ঘটনা প্রচার করতে। এমন স্পর্শকাতর হয়ে আছে মানুষের মন যে এরকম তুচ্ছ ঘটনাও দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়তে পারে মারাত্মক গুজব হয়ে।

বিকালে একটা লরি আসে পুলিস ও সৈন্যের ছোট একটি দল নিয়ে। চারিদিক তখন শান্ত। বুটের আওয়াজ তুলে কিছুক্ষণ তারা এদিক ওদিক টহল দেয়। এ বাড়ির দরজায় ঘা মেরে, এর ওর দোকানে ঢুকে, জিজ্ঞাসা করে কোথায় গোলমাল হয়েছিল। জবাব শোনে আশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য যে কোথাও গোলমাল হয়নি। ক্রুদ্ধ অসন্তুষ্ট মনে হয় তাদের, আগমন কি তাদের অনর্থক হবে? গলির মোড়ে নিতাই-এর দোকানের একপাশে তক্তাপোস পেতে চারজন সশস্ত্র সৈন্যের ঘাঁটি বসিয়ে লরি ফিরে যায় বাকি সকলকে নিয়ে। নতুন এক সশঙ্ক অস্বস্তিবোধ ছড়িয়ে পড়ে মেশাল পাড়ায়। সাঁজবাতির আগেই বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাট, মানুষ গিয়ে ঢোকে কোটরে, শূন্য হয়ে যায় পথ।

এ বাড়ি থেকে কথা শোনা যায় ও বাড়ির। কিন্তু কথার আদানপ্রদান বন্ধ হয়ে গেছে। চুপিচুপি দু-এক মুহূর্তের জন্য মুখোমুখি জানালার পাটও একটু ফাঁক হয় না। এ বাড়ি ভাবে ও বাড়ির জন্য মিলিটারি এসে পাড়ায় বসেচে, কি জানি কখন কি হয়। ছেলেমেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ। ঘরের সেলে তারা কয়েদ।

ছাত ভাগ করা দেয়ালের এপাশ থেকে গীতা বলে, 'আসবি হাবিব?'

'মারবে যে?'

'না, পিসীর ঘরে চুপি চুপি খেলব।'

'পিসী বকবে তো?'

'দূর। রান্না করে নেয়ে আসতে পিসীর বিকেল বেজে যাবে।'

ছাতের সিঁড়ির মাঝে বাঁকের নীচু লম্বাটে কোটরটি পিসী বহুদিন দখল করে আছে, তার নীচে দোতলায় কল-ঘর। লম্বা মানুষ এঘরে দাঁড়ালে ছাতে মাথা ঠেকবে। পিসীর নিজস্ব হাঁড়িকুঁড়ি কাঠের বাক্স কাঁথাবিছানায় কোটরটি ভরা। কুশের আসন পেতে এ ঘরে পিসী আহ্নিক করে। আমিষ-রান্নাঘরে একবার ঢুকলে স্নান করে শুদ্ধ হবার আগে পিসী আর এ ঘরে আসে না।

ঘরের মধ্যে এ ভাবে লুকিয়ে চুপি চুপি কি খেলা করবে, হাবিবকে নিয়ে এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগ দেবার উপায় নেই, ওদেরও ডাকা যায় না এখানে। তাই নতুন খেলা আবিষ্কার করে নিতে হয়।

'দাঙ্গা দাঙ্গা খেলবি?' গীতা বলে।

'লাঠি কই? ছোরা কই?' প্রশ্ন করে হাবিব।

গীতা বলে, 'দাঁড়া।'

গীতা চুপি চুপি অস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। তারাপদর খুর আর ছুরি। খুরটি পুরানো, কামানো হয় না, কাগজ পেন্সিল দড়ি কাটার কাজেই লাগে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কষ্টে গীতা ভেতর থেকে দরজার ছিটকিনি এঁটে দেয়। হাবিবের চেয়ে সে একটু ঢ্যাঙা।

'তুই আকবর আমি পদ্মিনী। আয়!'

খেলা, ছেলে-খেলা। অসাবধানে কখন যে সামান্য কেটে যায় একজনের গা অপরের অস্ত্রে।

'মারলি?'

ব্যথা পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে সে প্রতিশোধ নেয় অপরের গায়ে। জেদি দুরন্ত ছেলেমেয়ে দুজন, ব্যথায় রাগে অভিমানে দিশেহারা হয়ে কাটাকাটি হানাহানি শুরু করে ভোঁতা খুর আর ভোঁতা ছুরি দিয়ে। সেই সঙ্গে চলে গলা ফাটিয়ে আর্ত কান্না। ইন্দিরা পিসীমারা ছুটে আসে, কলরব করে। ছুটে আসে ওবাড়ির হালিমা নুরুন্নেসারা। তারা সিঁড়িতে উঠে পিসীর কোটরের দরজার সামনে ভিড় করে থাকায় তারাপদ ও বাড়ির অন্য পুরুষদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সিঁড়ির নীচে।

সদর দরজায় বাড়ির অন্য পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে নাসিরুদ্দিন হাঁকে, 'তারাপদ'!

দুটি মাত্র শিক বসানো ছোট্ট একটি খোপ আছে পিসীর ঘরে। একসময় একজনের বেশী দেখতে পারে না ভেতরের কান্ড। এক নজর ভেতরে তাকিয়ে ইন্দিরা আর্তনাদ করে উঠে, 'মেরে ফেলল! মেয়েটাকে মেরে ফেলল গো!'

দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে চেঁচায়ঃ 'খোল! খোল! দরজা খোল! খুনে ছোঁড়া দরজা বন্ধ করে খুন করছে মেয়েটাকে। দরজা খোল!'

হালিমাও এক নজর তাকিয়ে অবিকল তেমনি সুরে আর্তনাদ করে ওঠে, 'মেরে ফেলল! ছেলেটাকে মেরে ফেলল!'

দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে চেঁচায়, 'খোল! খোল! দরজা খোল! খুনে ছুঁড়ী দরজা বন্ধ করে খুন করছে ছেলেটাকে! দরজা খোল্।'

পিসী চেঁচায়, 'হায় হায় হায়। সব ছোঁয়াছুঁয়ি করে দিলে গো!'

নীচে থেকে নাসিরুদ্দীন হাঁকে, 'তারাপদ! আমরা অন্দরে ঢুকব বলে দিচ্ছি!'

পিসীকে ঠেলে সরিয়ে ইন্দিরা আর হালিমা একসঙ্গে পাগলিনীর মতো খোপের ফোকর দিয়ে ভেতরে তাকাতে চায়, মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি হয়ে যায় দুজনের। আক্রমণে উদ্যত বাঘিনীর মতো হিংস্র চোখে তারা পরস্পরের দিকে তাকায়।

ভেতরে ততক্ষণে গীতা আর হাবিবের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়েছে। বাইরের হট্টগোলে চুপ হয়ে গেছে তারা। কিন্তু লড়াই থামায়নি, আগে কে হার মানবে অপরের কাছে! নিঃশব্দে মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি কামড়া-কামড়ি করে। ভেঙে চুরমার হয়ে যায় পিসীর হাঁড়িকুঁড়ি।

'হায়, হায়! সব গেল গো, সব গেল!'

নাসিরুদ্দিনকে ওপরে ডেকে আনে তারাপদ।

সেই লাথি মেরে দরজা ভাঙে। দরজাটা ঠিক ভাঙে না, ছিটকিনিটা খসে যায়।

ওপর ওপর চামড়া কাটাকুটি হয়েছে খানিকটা, কিছু রক্তপাত ঘটেছে। নিজের নিজের সন্তানকে বুকে নিয়ে কিছুক্ষণ ইন্দিরা আর হালিমা ব্যাকুল দৃষ্টি বুলিয়ে যায় তাদের সর্বাঙ্গে। তারপর প্রায় একই সময় দুজনে মুখ তোলে চোখে অকথ্য হিংসার আগুন নিয়ে। দুজনেই যেন অবাক হয়ে যায় অপর কোলে আহত নির্জীব অপরের সন্তানটিকে দেখে, বহুকাল ভুলে থাকার পর দুজনেই যেন হঠাৎ আবিষ্কার করেছে অন্য জনও মা, তার সন্তানেব গায়েও রক্ত।

বাইরে আবার ভিড় জমেছিল। আবার অনিবার্য হয়ে উঠেছিল সংঘর্ষ। তারাপদ আর নাসিরুদ্দিন দুবাড়ির এই দুই কর্তাকে পাশাপাশি সামনে হাজির করতে না পারলে পিস-কমিটি এবার কোনমতেই ঠেকাতে পারত না সর্বনাশ।

আইডিন লাগিয়ে নাইয়ে খাইয়ে দুবাড়িতে শুইয়ে রাখা হয় হাবিব আর গীতাকে। ছুটির দিন, ঢিমে তালে সংসারের হাঙ্গামা চুকতে চুকতে এমনিই দুপুর গড়িয়ে যেত আগে, এখন আবার বাড়তি লোকের ভিড়। বিকেলের দিকে কিছুক্ষণ আগে পরে দুবাড়িতে খোঁজ পড়ে ছেলেমেয়ে দুটির।

খোঁজ মেলে না একজনেরও।

আবার তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয় বাড়ি, আনাচ কানাচ, চৌকির তলা। গীতা বাড়িতে নেই। হাবিব বাড়িতে নেই।

শঙ্কায় কালো হয়ে যায় দুবাড়ির মুখ। কিছুক্ষণ গমগম করে স্তব্ধতা, তারপর ফেটে পড়ে মুখর গুঞ্জন।

এবাড়ি বলে বুক চাপড়েঃ 'শোধ নিয়েছে। ভুলিয়ে ভালিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে হয় গুম্ করে রেখেছে, নয়—'

ও বাড়ি প্রতিধ্বনি তোলে মাথা কপাল কুটে।

তারাপদ বলে, 'গীতা নিশ্চয় আছে তোমার বাড়িতে নাসির।'

নাসিরুদ্দীন বলে, 'হাবিবকে তোমরা নিশ্চই গুম করেছ তারাপদ।'

এবার আর রোখা যায় না, আগুনের মতো গুজব আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে! এত চেষ্টা করেও উস্কানিদাতারা এ মেশাল পাড়ার শান্তিতে দাঁত ফোটাতে পারেনি, এমনি একটা সুযোগের জন্য তারা যেন ওত পেতে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে বাড়ি দুটোর সামনে জড়ো হয় দুদল উন্মাদ মানুষ। এরা এ বাড়িতে চড়াও হবে, ওরা এ বাড়িতে। কিন্তু দল যখন দুটো তখন আগে বাইরে রাস্তায় লড়াই করে অন্য দলকে হটিয়ে জয়ী হতে না পারলে কোন দলের পক্ষেই বাড়ি চড়াও হওয়া সম্ভব নয়।

মারামারি হবেই। সেটা জানা কথা। আগেই বেধে যেত, পিস্-কমিটির চেষ্টায় শুধু দুদশ মিনিটের জন্য ঠেকে আছে।

যুগ্ম-সম্পাদক বলেন, 'আমরা তল্লাস করাচ্ছি বাড়ি।'

জনতা সে কথা কানে তোলে না। তাদের শান্ত রাখতে গিয়ে গালাগালি শোনে, মারও খায় কয়েকজন ভলান্টিয়ার। তবু তারা চেষ্টা করে যায়। গলির মোড়ের সৈন্য চার জন চুপচাপ বসে আছে।

এমন সময় কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওই যে হাবিব! ওই যে।'

আরেকজন চেঁচায়, 'ওই তো গীতা!'

সকলের দৃষ্টিই ছিল নীচের দিকে, এ অবস্থায় কে চোখ তুলে তাকাবে ওপরে। কারো নজরে পড়েনি যে, নাসিরুদ্দীন আর তারাপদর বাড়ির চিলেকুঠির ছাত থেকে কিছুক্ষণ ধরে পাশাপাশি একটি ছেলে ও মেয়ে মুখ বাড়িয়ে নীচের কান্ডকারখানা লক্ষ্য করছে। ছাত ভাগ করা দেয়ালের দুপাশে দুবাড়ির ছাতের সিঁড়ির চিলেকুঠি একটাই। কখন যে তারা দুজন চুপি চুপি সকলের চোখ এড়িয়ে ওই নিরাপদ আশ্রয়ে খেলতে উঠেছিল! মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে কয়েকজন কলরব করে ওঠে, 'পাওয়া গেছে! দুজনকেই পাওয়া গেছে।'

সবার চোখের সামনে হারানো ছেলে মেয়ে দুটোর অকাট্য জলজ্যান্ত আবির্ভাব হল বলেই যে মারামারি ঠেকান যেত, তা নয়। হিংসায় উত্তেজনায় জ্ঞান হারিয়ে যারা খুনোখুনি করতে এসেছে, অনেকে তারা জানেও না ওদের দুজনকে নিয়েই আজকের মতো গন্ডগোলের সূত্রপাত। হঠাৎ এই খাপছাড়া ঘটনায়, দুদলেরই কিছু লোক চঞ্চল হয়ে সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠায়, ব্যাপারটি কি জানবার জন্য যে কৌতূহল জাগল জনতার মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে পিস-কমিটির সম্পাদক দুজন সেটা কাজে লাগিয়ে ফেলায় ঘটনার মোড় ঘুরে গেল।

জনতা সাফ হয়ে যাবার অনেক পরে আবার লরি বোঝাই মিলিটারি এল।

বহুক্ষণ সার্চ চলে নাসিরুদ্দীন আর তারাপদর বাড়িতে, গুম করা ছেলেমেয়ে দুটির সন্ধানে। হালিমা আর ইন্দিরার গা ঠেসে দাঁড়িয়ে ভীত চোখে তাই দেখতে থাকে গীতা আর হাবিব।

হারাণের নাতজামাই

মাঝ রাতে পুলিস গাঁয়ে হানা দিল।

সঙ্গে জোতদার চন্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতি। কয়েকজন লেঠেল।

কনকনে শীতের রাত। বিরাম বিশ্রাম ছেঁটে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে তিনটি দিনরাত্রি একটানা ধান কাটার পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছিল। পালা করে জেগে ঘরে ঘরে ঘাঁটি আগলে পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা। শাঁক আর উলুধ্বনিতে আকস্মিক আবির্ভাব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল গ্রামের কাছাকাছি পুলিসের আবির্ভাবের। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিস সমস্ত গাঁ ঘিরে ফেলবার আয়োজন করলে হারাণের ঘর থেকে ভুবন মন্ডল সরে পড়তে পারত, উধাও হয়ে যেত। গাঁ শুদ্ধ লোক যাকে আড়াল করে রাখতে চায়, হঠাৎ হানা দিয়েও হয়তো পুলিস সহজে তার পাত্তা পায় না। দেড়মাস চেষ্টা করে পারেনি, ভুবন এ গাঁ ও গাঁ করে বেড়াচ্ছে যখন খুশি।

কিন্তু গ্রাম ঘেরবার, আঁটঘাট বেঁধে বসবার কোন চেষ্টাই পুলিস আজ করল না। সটান গিয়ে ঘিরে ফেলল ছোট হাঁসতলা পাড়াটুকুর কখানা ঘর যার মধ্যে একটি ঘর হারাণের। বোঝা গেল আঁটঘাট আগে থেকে বাঁধাই ছিল।

ভেতরের খবর পেয়ে এসেছে।

খবর পেয়ে এসেছে মানেই খবর দিয়েছে কেউ। আজ বিকালে ভুবন পা দিয়েছে গ্রামে, হঠাৎ সন্ধ্যার পরে তাকে অতিথি করে ঘরে নিয়ে গেছে হারাণের মেয়ে ময়নার মা. তার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল না কোন পাড়ায় কার ঘরে সে থাকবে। খবর তবে গেছে ভুবন হারাণের ঘরে যাবার পরে! এমনও কি কেউ আছে তাদের এ গাঁয়ে? শীতের তে-ভাগা চাঁদের আবছা আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষীদের, জানা যাবেই, এ বজ্জাতি গোপন থাকবে না।

দাঁতে দাঁত ঘসে গফুরালী বলে, 'দেইখ্যা লমু কোন হালা পিঁপড়ার পাখা উঠছে। দেইখ্যা লমু।'

ভুবন মন্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না সালিগঞ্জ গাঁ থেকে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে ভুবন এতদিন গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্টকে কলা দেখিয়ে, কোনও গাঁয়ে সে ধরা পড়েনি। সালিগঞ্জ থেকে তাকে পুলিস নিয়ে যাবে? তাদের গাঁয়ের কলঙ্ক তারা সইবে না। ধান দেবে না বলে কবুল করেছে জান, সে জানটা দেবে এই আপনজনটার জন্যে।

শীতে আর ঘুমে অবশপ্রায় দেহগুলি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। লাঠি সড়কি দা কুড়ুল বাগিয়ে চাষীরা দল বাঁধতে থাকে। সালিগঞ্জে মাঝরাতে আজ দেখা দেয় সাংঘাতিক সম্ভাবনা।

গোটা আষ্টেক মশাল পুলিস্ সঙ্গে এনেছিল, তিন চারটে টর্চ। হাঁসখালি পাড়া ঘিরতে ঘিরতে দপ দপ করে মশালগুলি তারা জেবলে নেয়। দেখা যায় সব সশস্ত্র পুলিস, কানাই ও শ্রীপতির হাতেও দেশী বন্দুক।

পাড়াটা চিনলেও কানাই বা শ্রীপতি হারাণের বাড়িটা ঠিক চিনত না। সামনে রাখালের ঘর পেয়ে ঝাঁপ ভেঙে তাকে বাইরে আনিয়ে রেইডিং পার্টির নায়ক মন্মথকে তাই জিজ্ঞেস করতে হয়, 'হারাণ দাসের কোন বাড়ি?'

তার পাশের বাড়ির হারাণ ছাড়াও যেন কয়েক গণ্ডা হারাণ আছে গাঁয়ে। বোকার মতো রাখাল পাল্টা প্রশ্ন করে—'আজ্ঞা, কোন্ হারাণ দাসের কথা কন্?'

গালে একটা চাপড় খেয়েই এমন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রাখাল, দম আটকে আটকে এমন সে ঘন ঘন উঁকি তুলতে থাকে যে, তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাই অনর্থক হয়ে যায় তখনকার মতো। বোবা হাবা চাষাগুলো শুধু বেপরোয়া নয়, একেবারে তুখোড় হয়ে উঠেছে চালাকিবাজীতে।

এদিকে হারাণ বলে, 'হায় ভগবান!'

ময়নার মা বলে, 'তুমি উঠলা কেন কও দিকি?'

বলে কিন্তু জানে যে তার কথা কানে যায়নি বুড়োর। চোখে যেমন কম দেখে, কানেও তেমনি কম শোনে হারাণ। কি হয়েছে ভাল বুঝতেও বোধ হয় পারেনি, শুধু বাইরে একটা গণ্ডগোল টের পেয়ে ভড়কে গিয়েছে। ছেলে আর মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেওয়া গেছে চটপট, এই বুড়োকে বোঝাতে গেলে এত জোরে চেঁচাতে হবে যে প্রত্যেকটি কথা কানে পৌঁছবে বাইরে যারা বেড় দিয়েছে। দু-এক দণ্ড চেঁচালেই যে বুঝবে হারাণ তাও নয়, তার ভোঁতা ঢিমে মাথায় অত সহজে কোন কথা ঢোকে না। এই বুড়োর জন্য না ফাঁস হয়ে যায় সব।

ভুবনকে বলে ময়নার মা, 'বুড়া বাপটার তরে ভাবনা!'

ভুবন বলে, 'মোর কিন্তু হাসি পায় ময়নার মা।' ময়নার মা গম্ভীর মুখে বলে, 'হাসির কথা না। গুলিও করতে পারে। দেখন মাত্তর। কইবো হাঙ্গামা করছিলেন, তাড়াতাড়ি একটা কুপি জ্বালে ময়নার মা। হারাণকে তুলে নিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতের আঙুলের ইশারায় তাকে মুখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে। তারপর কুপির আলোয় মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিদারুণ আপসোসে ফুঁসে ওঠে, 'আঃ! ভাল শাড়িখান পরতে পারলি না?'

'বলছ নাকি?' ময়না বলে।

ময়নার মা নিজেই টিনের তোরঙ্গের ডালাটা প্রায় মুচড়ে ভেঙে তাঁতের রঙীন শাড়িখানা বার করে। ময়নার পরণের ছেঁড়া কাপড়খানা তার গা থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এলোমেলো ভাবে জড়িয়ে দেয় রঙীন শাড়িটি।

বলে, 'ঘোমটা দিবি। লাজ দেখাবি। জামায়ের কাছে যেমন দেখাস।' ভুবনকে

বলে, 'ভাল কথা শোনেন, আপনার নাম হইল জগমোহন, বাপের নাম সাতকড়ি। বাড়ি হাতিপাড়া, থানা গৌরপুর।'

নতুন এক কোলাহল কানে আসে ময়নার মার। কান খাড়া করে সে শোনে। কুপির আলোতেও টের পাওয়া যায় প্রৌঢ় বয়সের শুরুতেই তার মুখখানাতে দুঃখ দুর্দশার ছাপ ও রেখা কি রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে। ধুতি পরা বিধবার বেশ আর কদমছাঁটা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে পুরুষালী ভাব।

'গাঁ ভাইঙ্গা রুইখা আইতেছে। তাই না ভাবতেছিলাম ব্যাপার কি, গাঁর মাইনষের সাড়া নাই।'

ভুবন বলে, 'তবেই সারছে। দশবিশটা খুন জখম হইব নির্ঘাত। আমি যাই, সামলাই গিয়া।'

'থামেন আপনে, বসেন', ময়নার মা বলে, 'দ্যাখেন কি হয়।'

শ'দেড়েক চাষী চাষাড়ে অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছে দল বেঁধে। ওদের আওয়াজ পেয়ে মন্মথও জড়ো করেছে তার ফৌজ হারাণের ঘরের সামনে—দু-চারজন শুধু পাহারায় আছে বাড়ির পাশে পিছনে, বেড়া ডিঙিয়ে ওদিক দিয়ে ভুবন না পালায়। দশটি বন্দুকের জোর মন্মথের, তার নিজের রিভলভার আছে। তবু চাষীদের মরিয়া ভাব দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছে স্পষ্টই বোঝা যায়। তার সুরটা রীতিমতো নরম শোনায়—স্রেফ হুকুমজারির বদলে সে যেন একটু বুঝিয়ে দিতে চায় সকলকে উচিত আর অনুচিত কাজের পার্থক্যটা, পরিণামটাও।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে সে জানায় যে, হাকিমের দস্তখতী পরোয়ানা নিয়ে সে এসেছে হারাণের ঘর তাল্লাস করতে। তাল্লাস করে আসামী না পায়, ফিরে চলে যাবে। এতে বাধা দেওয়া হাঙ্গামা করা উচিত নয়, তার ফল খারাপ হবে। বে-আইনী কাজ হবে সেটা।

গফুর চেঁচিয়ে বলে, 'মোরা তাল্লাস করতে দিমু না।'

প্রায় দুশো গলা সায় দেয়, 'দিমু না!'

এমনি যখন অবস্থা, সংঘর্ষ প্রায় শুরু হয়ে যাবে, মন্মথ হুকুম দিতে যাচ্ছে গুলি চালাবার, ময়নার মার খ্যানখেনে তীক্ষ্ম গলা শীতার্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে বেজে উঠল, 'রও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না। মোর ঘরে কোন আসামী নাই। চোর ডাকাইত নাকি যে ঘরে আসামী রাখুম? বিকালে জামাই আইছে, শোয়াইছি মাইয়া জামাইরে। দারোগাবাবু তাল্লাস করতে চান, তাল্লাস করেন।'

মন্মথ বলে, 'ভুবন মণ্ডল আছে তোমার ঘরে।'

ময়নার মা বলে, 'দ্যাখেন আইসা, তাল্লাস করেন। ভুবন মণ্ডল কেডা? নাম তো শুনি নাই বাপের কালে। মাইয়ার বিয়া দিলাম বৈশাখে, দুই ভরি রুপা কম দিছি ক্যান, জামাই ফিরা তাকায় না। দুই ভরির দাম পাঠাইয়া দিছি তবে আইজ জামাই পায়ের ধুলা দিছে। আপনারে কমু কি দারোগাবাবু মাইয়াটা কাইন্দা মরে। মাইয়া যত কান্দে, আমি তত কান্দি—'

'আচ্ছা, আচ্ছা'—মন্মথ বলে, 'ভুবনকে না পাই, জামাই নিয়ে তুমি রাত কাটিও।'

গৌর সাউ হেঁকে বলে, 'অত চুপে চুপে আসে কেন জামাই, ময়নার মা?'

গা জবলে যায় ময়নার মার। বলে, 'সদর দিয়া আইছে। তোমার একটা মাইয়ার সাতটা জামাই। চুপে চুপে আসে, মোর জামাই সদর দিয়া আইছে!'

গৌর আবার কি বলতে যাচ্ছিল, কে যেন আঘাত করে তার মুখে। একটা আর্ত শব্দ শুধু শোনা যায়, সাপেধরা ব্যাঙের একটি মাত্র আওয়াজের মতো।

ময়নার রঙীন শাড়ি ও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মন্মথের, পিচুটির মতো চোখে এঁটে যেতে চায় ঘোমটা পরা ভীরু লাজুক কচি চাষী মেয়েটার আধপুষ্ট দেহটি। এ যেন কবিতা। বি. এ. পাশ মন্মথের কাছে, যেন চোরাই স্কচ হুইস্কির পেগ, যেন ম্যাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে একফোঁটা টসটসে দরদ। তার রীতিমতো আপসোস হয় যে যোয়ান মর্দ মাঝবয়সী চাষাড়ে লোকটা এর স্বামী, ওর আদরেই মেয়েটার এই আলুথালু বেশ!

তবু মন্মথ জেরা করে, সংশয় মেটাতে গাঁয়ের দুজন বুড়োকে এনে সনাক্ত করায়। তার পরেও যেন তার বিশ্বাস হতে চায় না! ভুবন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে যতটা সম্ভব নিরীহ গোবেচারী সেজে। কিন্তু খোঁচা খোঁচা গোঁপদাড়ি ভরা মুখ, রুক্ষ এলোমেলো একমাথা চুল, মোটেই তাকে দেখায় না নতুন জামায়ের মতো। মন্মথ গর্জন করে হারাণকে প্রশ্ন করে, 'এ তোমার নাতনীর বর?'

হারাণ বলে, 'হায় ভগবান!'

ময়নার মা বলে, 'জিগান মিছা, কানে শোনে না, বদ্ধ কালা।'

'আ!' মন্মথ বলে।

ভুবন ভাবে এবার তার কিছু বলা বা করা উচিত।

'এমন হাঙ্গামা জানলে আইতাম না কর্তা।। মিছা কইয়া আনছে আমারে। সড়াইলের হাটে আইছি, ঠাইরেন পোলারে দিয়া খপর দিলেন, মাইয়া নাকি মর মর, তখন যায় এখন যায়।'

'তুমি অমনি ছুটে এলে?'

'আসুম না? রতিভরি সোনারুপা যা দিব কইছিল, তাও ঠেকায় নাই বিয়াতে। মইরা গেলে গাও থেইকা খুইলা নিলে আর পামু?'

'ওঃ! তাই ছুটে এসেছ? তুমি হিসেবী লোক বটে।' মন্মথ বলে ব্যঙ্গ করে। আর কিছু করার নেই, বাড়িগুলি তাল্লাস ও তছনচ করে নিয়ম রক্ষা করা ছাড়া। জামাইটাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া চলে সন্দেহের যুক্তিতে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু হাঙ্গামা হবে। দুপা পিছু হটে এখনো চাষীর দল দাঁড়িয়ে আছে, ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায়নি। গাঁয়ে গাঁয়ে চাষাগুলোর কেমন যেন উগ্র মরিয়া ভাব, ভয় ডর নেই। ঘরে ঘরে তাল্লাস চলতে থাকে। একটা বিড়াল লুকানোর মতো আড়ালও যে ঘরে নেই, সে ঘরেও কাঁথাকানি হাঁড়িপাতিল জিনিসপত্র ছত্রখান করে খোঁজা হয় মানুষকে।

মন্মথ থাকে হারাণের বাড়িতেই। অল্প নেশায় রঙীন চোখ। এ সব কাজে বেরোতে হলে মন্মথ অল্প নেশা করে, মাল সঙ্গে থাকে কর্তব্য সমাপ্তির পর টানবার জন্য—চোখ তার রঙীন শাড়িজড়ানো মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না। কুরিয়ে কুরিয়ে

তাকায় ময়নার কুড়ি বাইশ বছরের যোয়ান ভাইটা, উসখুস করে ক্রমাগত। ভুবনের চোখ জ্বলে ওঠে থেকে থেকে। ময়নার মা টের পায়, একটু যদি বাড়াবাড়ি করে মন্মথ, আর রক্ষা থাকবে না!

মেয়েটাকে বলে ময়নার মা, 'শীতে কাঁপুনি ধরেছে, শো না গিয়া বাছা? তুমিও শুইয়া পড় বাবা। আপনে অনুমতি দ্যান দারোগাবাবু, জামাই শুইয়া পড়ুক। কত মানত কইরা, মাথা কপাল কুইটা আনছি জামাইরে'—ময়নার মার গলা ধরে যায়, 'আপনারে কি কমু দারোগাবাবু—'

ময়না ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভুবন যায় না।

আরও দুবার ময়নার মা সস্নেহে সাদর অনুরোধ জানায় তাকে, তবু ভুবনকে ইতস্তত করতে দেখে বিরক্ত হয়ে জোর দিয়ে বলে, 'গুরুজনের কথা শোন, শোও গিয়া। খাড়াইয়া কি করবা? ঝাঁপ বন্ধ কইরা শোও।'

তখন তাই করে ভুবন। যতই তাকে জামাই মনে না হোক, এরপর না মেনে কি আর চলে যে সে জামাই? মন্মথ আস্তে আস্তে বাইরে পা বাড়ায়। পকেট থেকে চ্যাপ্টা শিশি বার করে ঢেলে দেয় গলায়।

পরদিন মুখে মুখে এ গল্প ছড়িয়ে যায় দিগ্‌দিগন্তে, দুপুরের আগে হাতি-পাড়ার জগমোহন আর জোতদার চন্ডী ঘোষ আর বড় থানার বড় দারোগার কাছে পর্যন্ত গিয়ে পেঁছায়। গাঁয়ে গাঁয়ে লোকে বলাবলি করে ব্যাপারটা আর হাসিতে ফেটে পড়ে, বাহবা দেয় ময়নার মাকে! এমন তামাসা কেউ কখনো করেনি পুলিসের সঙ্গে, এমন জব্দ করেনি পুলিসকে। কদিন আগে দুপুরবেলা পুরুষশূন্য গাঁয়ে পুলিস এলে ঝাঁটা বঁটি হাতে মেয়ের দল দিয়ে ময়নার মা তাদের তাড়া করে পার করে দিয়েছিল গাঁয়ের সীমানা! সে যে এমন রসিকতাও জানে, কে তা ভাবতে পেরেছিল?

গাঁয়ের মেয়েরা আসে দলে দলে, অনিশ্চিত আশঙ্কা ও সম্ভাবনায় ভরা এমন যে ভয়ঙ্কর সময় চলেছে এখন, তার মধ্যেও তারা আজ ভাবনা চিন্তা ভুলে হাসিখুশিতে উচ্ছল।

মোক্ষদার মা বলে একগাল হেসে গালে হাত দিয়ে, 'মাগো মা ময়নার মা, তোর মদ্যি এত?'

ক্ষেন্তি বলে ময়নাকে, 'কিলো ময়না, জামাই কি কইলো? দিছে কি?'

লাজে ময়না হাসে।

বেলা পড়ে এলে, কাল যে সময় ভুবন মন্ডল গাঁয়ে পা দিয়েছিল প্রায় সেই সময়, আবির্ভাব ঘটে জগমোহনের। বয়স তার ছাব্বিশ সাতাশ, বেঁটে খাটো যোয়ান চেহারা, দাড়ি কামানো, চুল আঁচড়ানো। গায়ে ঘরকাচা সার্ট, কাঁধে মোটা সুতির সাদা চাদর। গাঁয়ে ঢুকে গটগট করে সে চলতে থাকে হারাণের বাড়ির দিকে, এপাশ ওপাশ না তাকিয়ে, গম্ভীর মুখে।

রসিক ডাকে দাওয়া থেকে 'জগমোহন নাকি? কখন আইলা?'

নন্দ বলে, 'আরে শোন, শোন, তামুক খাইয়া যাও।'

জগমোহন ফিরেও তাকায় না।

রসিক ভড়কে গিয়ে নন্দকে শুধোয়, 'কি কাণ্ড বুঝলা নি?'

'কেমনে কমু?'

অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দুজনে।

পথে মথুরের ঘর। তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা আছে জগমোহনের। নাম ধরে হাঁক দিতে ভেতর থেকে সাড়া আসে না, বাইরের লোক জবাব দেয়। ঘরের কাছেই পথের ওপাশে একটা তালের গুঁড়িতে দুজন মানুষ বসে ছিল নির্লিপ্তভাবে, একজনের হাতে খোঁটা শুদ্ধ গরু-বাঁধা দড়ি।

তাদের একজন বলে, 'বাড়িতে নাই। তুমি কেডা, হারামজাদাটারে খোঁজ ক্যান?'

জগমোহন পরিচয় দিতেই দুজনে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

'অ! তুমিও আইছ ব্যাটারে দুই ঘা দিতে?'

তা ভয় নেই জগমোহনের, তারা আশ্বাস দেয়, হাতের সুখ তার ফসকাবে না। কাল সন্ধ্যায় গেছে গাঁ থেকে, এখনো ফেরেনি মথুর, কখন ফিরে আসে ঠিকও নাই, তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না জগমোহনকে! মথুর ফিরলে তাকে যখন বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে বিচারের জন্য, সে খবর পাবে। সবাই মিলে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলার আগে তাকেই নয় সুযোগ দেওয়া হবে মথুরের নাক কানটা কেটে নেবার, সে ময়নার মার জামাই, তার দাবি সবার আগে।

'শাউড়ি পাইছিলা দাদা একখান!'

'নিজের হইলে বুঝতা।' জগমোহন জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে, চলতে আরম্ভ করে। শুনে দুজনে তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অবাক হয়ে!

আচমকা জামাই এল, মুখে তার ঘন মেঘ। দেখেই ময়নার মা বিপদ গনে। ব্যস্তসমস্ত না হয়ে হাসিমুখে ধীরে শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানায়, তার যেন আশা ছিল, জানা ছিল, এ সময় এমনি ভাবে জামাই আসবে, এটা অঘটন নয়। বলে, 'আস বাবা আস। ও ময়না, পিড়া দে। ভাল নি আছে বেবাকে? বিয়াই বিয়ান পোলামাইয়া?'

'আছে।'

আরেকটুকু ভড়কে যায় ময়নার মা। কত গোসা না জমা আছে জামাইয়ের কাটা ছাঁটা এই কথার জবাবে। ময়নার দিকে তার না-তাকাবার ভঙ্গিটাও ভাল ঠেকে না। পড়ন্ত রোদে লাউমাচার সাদা ফুলের শোভা ছাড়া অর কিছুই যেন চোখ চেয়ে দেখবে না শ্বশুরবাড়ির পণ করেছে জগমোহন? লক্ষণ খারাপ।

ঘর থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় হারাণ হাঁকে, 'আসে নাই? হারামজাদা আসে নাই? হায় ভগবান!'

'নাতিরে খোঁজে,' ময়নার মা জগমোহনকে জানায়, 'বিয়ান থেইকা দ্যাখে না, উতলা হইছে।'

ময়নার মা প্রত্যাশা করে যে নাতিকে হারাণ সকাল থেকে কেন দ্যাখে না, কি হয়েছে হারাণের নাতির, ময়নার ভায়ের, জানতে চাইবে জগমোহন কিন্তু কোন খবর জানতেই এতটুকু কৌতূহল দেখা যায় না তার।

'খাড়াইয়া রইলা ক্যান? বস বাবা বস।'

জগমোহন বসে। ময়নার পাতা পিঁড়ি সে ছোঁয় না, দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসে।

'মুখ হাত ধুইয়া নিলে পারতা।'

'না, যামু গিয়া অখনি।'

'অখনি যাইবা?'

'হ। একটা কথা শুইনা আইলাম। মিছা না খাঁটি জিগাইয়া যামু গিয়া। মাইয়া নাকি কার লগে শুইছিল কাইল রাইতে?'

'শুইছিল?' ময়নার মার চমক লাগে, 'মোর লগে শোয় মাইয়া, মোর লগে শুইছিল, কার লগে শুইব?'

'ব্রহ্মাণ্ডের মাইনষে জানছে কার লগে শুইছিল। চোখে দেইখা গেছে দুয়ারে ঝাঁপ দিয়া কার লগে শুইছিল।'

তারপর বেধে যায় শাশুড়ী-জামায়ে। প্রথমে ময়নার মা ঠাণ্ডা মাথায় নরম কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু জগমোহনের ওই এক গোঁ! ময়নার মাও শেষে গরম হয়ে ওঠে। বলে, 'তুমি নিজে মন্দ, অন্যেরে তাই মন্দ ভাব। উঠানে মাইনষের গাদা, আমি খাড়া সামনে, এক দণ্ড ঝাঁপটা দিছে কি না দিছে, তুমি দোষ ধরলা। অন্যে ত কয় না।'

'অন্যের কি? অন্যের বৌ হইলে কইতো।'

'বড় ছোট মন তোমার। আইজ মণ্ডলের নামে এমন কথা কইলা, কাইল কইবা যুয়ান ভায়ের লগে ক্যান কথা কয়।'

'কওন উচিত। ও মাইয়া সব পারে।' শুধু গরম কথা নয়, ময়নার মা গলা ছেড়ে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগমোহনের চোদ্দপুরুষ। হারাণ কাঁপা গলায় চেঁচায়, 'আইছে নাকি? আইছে হারামজাদা? হায় ভগবান, আইছে?' ময়না কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ছুটে আসে পাড়াবেড়ানি নিন্দাছড়ানি নিতাই পালের বৌ আর প্রতিবেশী কয়েকজন স্ত্রীলোক।

'কি হইছে গো ময়নার মা?' নিতাই পালের বৌ শুধায়, 'মাইয়া কাঁদে ক্যান?'

তাদের দেখে সম্বিৎ ফিরে পায় ময়নার মা, ফোঁস করে ওঠে—'কাঁদে ক্যান? ভাইটারে ধইরা নিছে, কাঁদব না?'

'জামাই বুঝি আইছে খবর পাইয়া?'

'শুনবা বাছা শুনবা। বইতে দাও, জিরাইতে দাও।'

ময়নার মার বিরক্তি দেখে ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে মেয়েরা ফিরে যায়। তাকে ঘাঁটাবার সাহস কারো নেই। ময়নার মা মেয়েকে ধমক দেয়, 'কাঁদিস না। বাপেরে নিয়া ঘরে গেছিলি, বেশ করছিলি, কাঁদনের কি?'

'বাপ নাকি?' জগমোহন বলে ব্যঙ্গ করে।

'বাপ না? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্মো দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ

করছে, ধান কাটাইছে। না তো চণ্ডী ঘোষ নিত বেবাক ধান। তোমারে কই জগ্‌দা, হাতে ধইরা কই বুইঝা দ্যাখো, মিছা গোসা কইরো না।'

'বুইঝা কাম নাই। অখন যাই।'

'রাইতটা থাইকা যাও। জামাই আইলা, গেলা গিয়া, মাইনষে কি কইব?'

'জামায়ের অভাব কি। মাইয়া আছে, কত জামাই জুটবো।'

বেলা শেষ হতে না হতে ঘনিয়ে এসেছে শীতের সন্ধ্যা। অল্প অল্প কুয়াশা নেমেছে। ঘুঁটের ধোঁয়া ও গন্ধে নিশ্চল বাতাস ভারি। যাই বলেই যে গা তোলে জগমোহন তা নয়। ময়নার মারও তা জানা আছে যে, শুধু শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে যাই বলেই জামাই গট গট করে বেরিয়ে যাবে না। ময়নার সাথে বোঝাপড়া, ময়নাকে কাঁদানো, এখনো বাকি আছে। যদি যায় জামাই, মেয়েটাকে নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়ে তারপর যাবে। আর কথা বলে না ময়নার মা, আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। ঘরে কিছু নেই. মোয়ামুড়ি কিছু যোগাড় করতে হবে। থাক না থাক সামনে ধরে দিতেই হবে জামায়ের।

চোখ মুছে নাক ঝেড়ে ময়না বলে ভয়ে ভয়ে, 'ঘরে আস।'

'খাসা আছি। শুইছিলা তো?'

'না, মা কালীর কিরা, শুই নাই। মায় কওনে খালি ঝাঁপটা দিছিলাম, বাঁশটাও লাগাই নাই।'

ঝাঁপ দিছিলা, শোও নাই। বেউলা সতী!'

ময়না তখন কাঁদে।

'তোমার লগে আইজ থেইকা শেষ।'

ময়না আরও কাঁদে।

ঘর থেকে হারাণ কাঁপা গলায় হাঁকে, 'আসে নাই? ছোঁড়া আসে নাই? হায় ভগবান!'

থেমে থেমে এক একটা কথা বলে যায় জগমোহন, না থেমে অবিরাম কেঁদে চলে ময়না, যতক্ষণ না কান্নাটা একঘেয়ে লাগে জগমোহনের, তখন কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে। মুড়িমোয়া যোগাড় করে পাড়া ঘুরে ময়নার মা যখন ফিরে আসে, ময়না তখন চাপা সুরে ডুকরে কাঁদছে। বেড়ার বাইরে সুপারি গাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা। সারাদিন পরে এখন তার দুচোখ জলে ভরে যায়। জোতদারের সাথে, দারোগা পুলিসের সাথে লড়াই করা চলে, অবুঝ পাষণ্ড জামাইয়ের সাথে লড়াই নেই!

আপন মনে আবার হাঁকে হারাণ, 'আসে নাই? মোব মরণটা আসে নাই? হায় ভগবান!'

জগমোহন চুপ করে ছিল, এতক্ষণ পরে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে শালার খবর।— 'উয়ারে ধরছে ক্যান?'

ময়নার কান্না থিতিয়ে এসেছিল, সে বলে, 'মণ্ডলখুড়ার লগে গোঁদলপাড়া গেছিল, ফিরতি পথে একা পাইয়া ধরছে।'

'ক্যান ধরছে?'

'কাইল জব্দ হইছে, সেই রাগে বুঝি।'

বসে বসে কি ভাবে জগমোহন, আর কাঁদায় না ময়নাকে। ময়নার মা ভেতরে আসে, কাঁসিতে মুড়ি আর মোয়া খেতে দেয় জামাইকে, বলে, 'মাথা খাও, মুখে দাও!'

আবার বলে, 'রাইত কইরা ক্যান যাইবা বাবা? থাইকা যাও।'

'থাকনের যো নাই। মা দিব্যি দিছে।'

'তবে খাইয়া যাও? আখা ধরাই? পোলাটারে ধইরে নিছে, পরাণডা পোড়ায়। তোমারে রাইখা জুড়ামু ভাবছিলাম।'

'না, রাইত বাড়ে।'

'আবার কবে আইবা?'

'দেখি।'

উঠি উঠি করেও দেরি হয়। তারপর আজ সন্ধ্যারাতেই পুলিস হানার সেইরকম সোর ওঠে কাল মাঝরাত্রির মতো। সদলবলে মন্মথ অবার আচমকা হানা দিয়েছে। আজ তার সঙ্গের শক্তি কালের চেয়ে অনেক বেশী। তার চোখ সাদা।

সোজাসুজি প্রথমেই হারাণের বাড়ি।

'কি গো মন্ডলের শাশুড়ী,' মন্মথ বলে ময়নার মাকে, 'জামাই কোথা?'

ময়নার মা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'এটা আবার কে?'

'জামাই।' ময়নার মা বলে।

'বাঃ, তোর তো মাগী ভাগ্যি ভাল, রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে! আর তুই ছুঁড়ী এই বয়সে—'

হাতটা বাড়িয়েছিল মন্মথ রসিকতার সঙ্গে ময়নার থুতনি ধরে আদর করে একটু নেড়ে দিতে। তাকে পর্যন্ত চমকে দিয়ে জগমোহন লাফিয়ে এসে ময়নাকে আড়াল করে গর্জে ওঠে, 'মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন!'

বাড়ির সকলকে, বুড়ো হারাণকে পর্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামী নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মতো না হলেও লোক মন্দ জমেনি। দলে দলে লোক ছুটে আসছে চারিদিক থেকে, জমায়েত মিনিটে মিনিটে বড় হচ্ছে। মথুরার ঘর পার হয়ে পানা পুকুরটা পর্যন্ত গিয়ে আর এগোনো যায় না। কালের চেয়ে সাত আট গুণ বেশী লোক পথ আটকায়। রাত বেশী হয়নি, শুধু এগাঁয়ের নয়, আশেপাশের গাঁয়ের লোক ছুটে এসেছে। এটা ভাবতে পারেনি মন্মথ। মন্ডলের জন্য হলে মানে বুঝা যেত, হারাণের বাড়ির লোকের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে! মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।

ময়না তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়েই রক্ত মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করে জগমোহনের। নব্বই বছরের বুড়ো হারাণ সেইখানে মাটিতে মেয়ের কোলে এলিয়ে নাতির জন্য উতলা হয়ে কাঁপা গলায় বলে, 'ছোঁড়া গেল কই? কই গেল? হায় ভগবান!'

পারিবারিক

ভাবতে ভাবতে মা আবার বলে, কেউ স্টেশনে গেল না, জামাই মানুষ—ইতোমধ্যেই মা দু'তিনবার কথাটা বলেছে, বনমালী একবার। আলোচনাও হয়ে গেছে যেটুকু হবার। এবার আর কেউ কান দেয় না কথাটায়। নন্দিনীর মনেই বিষয়টা সবার বেশী গুরুত্ব পাওয়া স্বাভাবিক, সেই আরেকবার বলে, পা তো আছে, চলে আসবে। কে যাবে এ বিষ্টিতে? নতুন তো নয়! নিশ্চিন্ত ভাবেই বলে নন্দিনী, মিষ্টি করে একটু হেসে। বেশী যে পুরানো নিখিল তা নয়, তবে বাড়ির লোকের দুর্ভাবনা সামলানোর দায়িত্ব তো তারই! যদিও আগের মতো দুর্ভাবনা শত আনকোরা জামাইও বোধ হয় কোন বাড়িতেই আনতে পারে না আর, বাস্তব ওসব বাড়াবাড়ি চেপে পিষে শেষ করে দিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে মা আবার বলে, দু'তিনবার বলা কথাই বলে, কার ওপর রাগ করে সে শ্লেষ্মায় ভাঙা গলা চড়ায় ঠিক বোঝা যায় না,—চিঁচিংঙা খাবে জামাই চিঁচিংঙা? বলি, জামাই এসে শুধু চিঁচিংঙা খাবে?—

খেতে হলে খাবে! এবারও নন্দিনীই কথা কয়, সবাই যা খায়, তাই খাবে! খাবে খাবে, সব খাবে!—রাখাল ক্রুদ্ধ আপসোসের সঙ্গে মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, ধর্ম ভাসিয়ে দিলে থাকে কিছু! ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে-নিতে না পারলে কোন জাত টেঁকে।

কেউ কান দেয় না।

বাজার কাল করে রাখা হয়নি। যদি আসে নিখিল ভোর ভোর এসেই পৌঁছবে, বাজার করার যথেষ্ট সময় থাকবে। আগে থেকে বেশী ও বিশেষ বাজার করে রাখলে যদি সে না-ই আসে! ফেলা অবশ্য যাবে না কিছুই, খাবার লোকের সংখ্যা মোটেই কম নয় বাড়িতে কিন্তু খরচ তো আছে, অকারণ বাড়তি খরচ। আজ না এলে কাল হয়তো নিখিল আসবে।

আজ যদি আসে, বৃষ্টি মাথায় করেই একজন কেউ বাজার যাবে। যা পায়।

তবে বাজার আজ বসবে না। এ এক সর্বনাশা দারিদ্র্য ঘনিয়ে এসেছে চারিদিক থেকে অকথ্য অদ্ভুত। তিন তিন জন চাকরি করে বাড়িতে আরও দু'জন এই কদিন আগেও করত—বেকার হয়েছে খুবই সম্প্রতি, একজনের স্থায়ী গভর্নমেণ্ট সার্ভিস। আজ অবস্থা দাঁড়িয়েছে প্রায় নুন আনতে পান্তা ফুরোবার মতো। মোট জড়িয়ে

নেহাৎ কম হয় না মাসিক উপার্জন, দুশো টাকার বেশী, কিন্তু এখন আগুন লেগেছে জিনিসপত্রে সব যে মাসের গোড়ার দিকেই চড় চড় করে পুড়ে যায় প্রায় তার সবটাই, অর্ধেকের বেশী যে বাকি আছে মাসটা, সেটা কিসে চলবে কেউ ভেবে পায় না!

অসুখ বিসুখও যেন পাল্লা দিয়েছে। অসুখ সংসারে লেগে থাকেই, চিরদিন থেকেছে সবার বাড়িতে, কিন্তু এ যেন রোগের নিত্য বাজারহাট, সমারোহ।

কাগজে বিজ্ঞাপনে উপদেশ ছাপা হয়, অপব্যয় কোরো না, অদরকারী কিছু কিনো না, টাকার দাম বাড়বে, পরে জিনিস সস্তা হবে, এখন শুধু জমাও!

নন্দিনী খিল খিল করে হাসে, কি জমাবে দাদা? খোলামকুচি? অদরকারী জিনিস যেন কেউ কিনতে পারে!

রাখাল বড় ভাই, সে হাসে না। বুড়োটে বাপ বনমালী, সেও নয়। মেজ ভাই দিব্যেন্দু যেন মাথা নেড়ে সায় দিতে দিতেই শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সেজ অসীম নিঃশব্দে হাসে, অল্পদিন আগে ছাঁটাই হওয়া এবং তার কিছুকাল আগে বিয়ে করে থাকা সত্ত্বেও! জোরে হাসে, কল্যাণ, সুমতিরা। নন্দিনীর বলার ভঙ্গিটা বড়ই হাস্যজনক ছিল।

পারিবারিক গালগল্পের বা সবাই মিলে কাগজ পড়ার বৈঠক নয়, সকাল বিকাল ওরকম জমাট বাঁধার মতো গরুত্ব কোন পবিবারের আছে কিনা কে জানে! বাইরে শেষরাত্রি থেকে মুষল ধারে বৃষ্টি, তাই। বাড়ির কাঁচা অংশের খড়ো ঘর দুখানার এবং রান্নাঘর ও গোয়ালঘরের চালা সারাই হয়নি চার বছর, জলে ভেসে গেছে। গোয়ালটা শূন্য, বছর দুই গরু নেই, চালাটা বর্ষার জলে গলে গেলেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু দুদুভাগে ভাগ করা চালা ঘর দুটির চারিটি শোয়া বসার কামরা থেকে বিছানাপত্র জামা কাপড় সব সরিয়ে আনতে হয়েছে বাড়ির এই পাকা অংশে। সাত বছর আগে, যুদ্ধের গোড়ার দিকের সেই ইংরাজী একচল্লিশ সালের মধ্যে যে পয়লা বৈশাখটি ছিল, সেদিন ভিত্তি পত্তন করে, তিন মাসের মধ্যে দুখানা পাকা ঘর তুলে দিয়েছিল ঠাকুর্দা প্রিয়রঞ্জন। দিয়ে, দুমাসের মধ্যে মারা গিয়েছিল। সারাই, চুণকাম কিছুই আর হয়নি এ পর্যন্ত, তবু আকাশটা বর্ষা হয়ে ভেঙে পড়লেও এ দুখানা ঘরে জল পড়ে না। বাতাস থাকলে অবশ্য দুটো জানলা দিয়ে ছাঁট আসে, আলকাতরা মাখানো তক্তা জোড়া দেওয়া জানালার পাট বন্ধ করলেও। জানালা দুটির সংস্কার করার কথা গম্ভীর ভাবে আলোচনা হয়েছে অনেকবার, কিন্তু কাজে এ পর্যন্ত কিছু হয়নি।

পাশাপাশি দুখানা ঘর, মাঝের দেয়ালে প্রকাণ্ড একটা দরজা। লম্বা একটা হল করার সাধই যেন ছিল প্রিয়রঞ্জনের, মাঝখানে দেয়াল তুলে ভাগ করতেই চায়নি, কিন্তু সেটা অবাস্তব অনর্থক সাধ বলে দুটো ঘর করতেই হয়েছে। জিদ বজায় রাখার জন্যই যেন বুড়ো লম্বায় চওড়ায় খাপছাড়া এই সাই দরজাটি বসিয়ে গেছে, কপাট খুলে রাখলে যেন মনে হয় ঘর বুঝি দুটি নয়। ইটের চেয়ে অনেক বেশী দাম কাঠের। আর কি মানে হয় বুড়োর পাগলামির?

ঘর দুটিতে থাকে বড় রাখাল আর মেজ দিব্যেন্দু। রাখালের ছেলেমেয়ে এক

পাল, দিব্যেন্দুর কিছু কম। ঘর নিয়ে দিব্যেন্দু সব চেয়ে বেশী ঝগড়া করেছিল বলেই বোধ হয় তার ঘরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ সমান চাঁচের বেড়ায় আড়াল করে বনমালী বসবাস করে। বাড়ির মা, বনমালীর স্ত্রী, স্বামীর কাছে বহুকাল শোয় না। সে যেমন শীর্ণ, চুল ওঠা কপালে তার যেমন চওড়া সিঁদুর, তেমনি সে পেট রোগা। চালা ঘরেই সে থাকে, পুবের ঘরটায়। ঘরের পিছনেই ডোবা আর জঙ্গল, বেতবন।

বর্ষা সবাইকে কাঁচা অংশ থেকে পাকা অংশে আনলে মাঝের দরজায় মরচে ধরা শিকলটা অগত্যা খুলতে হয়। বনমালী চাঁচের বেড়ার ওদিক থেকে বেরিয়ে আসে এদিকে, তার অংশের পাশের জানালায় ছাঁট আসে বৃষ্টির মতো। গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জির ওপর আঠারো বছরের পুরানো গরমকোট চাপিয়ে কলাব ফুটো কম্ফটার জড়িয়ে সে যেন বীরের মতো আত্মরক্ষার যুদ্ধ করে।

নন্দিনী কাগজ পড়ে সকালে।

গতকালের মফঃস্বল এডিসন শহরের পরশুর কাগজ।

কাগজ এলে টানাটানি হয়। একজনের হাতে কাগজ ধরা থাকে, পিছন থেকে তিন চার জোড়া চোখ কাগজের পৃষ্ঠা হাতড়ায়। নেহেরু মেনেছে? জিন্না? দাঙ্গা কমেছে না বেড়েছে? কি ঘোষণা গান্ধীর প্রার্থনায়? জেলা শহরের গা-ঘেঁষা গাঁ ধুলচারিতে নুরুল হোসেন আর রাঘব আচার্য যে দুটো নৌকা আর এগারজন গুন্ডাকে দড়ি বেঁধে রাখায় হৈ চৈ পড়ে গেছে শহরে সে খবরটা কি ছাপিয়েছে কাগজে? কল্যাণ পাঠিয়েছিল খবরটা, তাদের কল্যাণ! সাতগাঁর গুলি চালাবার খবরটা—ধানের জন্য তিনটা চাষা খুন আর একুশটা জখম—হাবিজুলের বৌটার ওপর—?

নন্দিনী টাটকা কাগজের কাছে ঘেঁষে না। ওরকম ছাড়া ছাড়া ভাসা ভাসা খবর পড়ায় তার তৃপ্তি নেই। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে সে তার অল্প বিদ্যা নিয়ে নীচু ক্লাশে বাংলা শেখায়, হাজিরা নিয়ে বড় কড়াকড়ি। সেক্রেটারি কুমুদবাবু একটু তাকে আদর করতে চেয়েছিল, প্রথমে হেড মাস্টার মশায়ের ঘরে, তারপর জেলা বোর্ডের অফিসে তার খাস কামরায়।

হাজিরার কড়াকড়ি চলছে, ক্লাশ নেবার খুঁটিনাটি কৈফিয়ৎ। কবে জবাব দেয় ঠিক নেই।

অনেকক্ষণ তন্ন তন্ন করে কাগজ না পড়লে, শুধু মাউণ্টব্যাটনের খবর নয় বিজ্ঞাপন পর্যন্ত বুঝে শুনে না পড়লে তার ভাল লাগে না।

খবর আর বিজ্ঞাপন সব এক ধাচের ধর্ম-শক্তি বৃদ্ধি এবং যৌন শক্তি বৃদ্ধি।

পড়তে পড়তে খিল খিল করে হেসে ওঠে বটে, পরিবারের কাউকে রাগায় কাউকে হাসায় বটে, বুকটা তার জ্বলে যায়। এমন একটা কাগজও কি এই স্বাধীনতা পাওয়া দেশে হয় না যাতে সত্যি খবর সত্যি বিজ্ঞাপন ছাপে?

কেন মিছে খবরটা কি ছেপেছে?

অর্ধেক মিছে খবর, কত খবর বাদ দিয়েছে!

বড় গাল দিয়ে লেখে নিজেদের যেন কোন দোষ নেই। ঝগড়া তো আরও বাড়বে ওতে!

বাড়ুক। আমরা সইব না আর। কেন সইব? ব্যাটাদের মেরে লোপাট করে—ও খবরটা কিন্তু মিছে। রাজপুরে একটা জোতদারের ঘরও পোড়ায়নি। তুই জানলি কি করে পোড়ায়নি? মিছেমিছি একপাল লোককে কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে এসেছে! ওরা তো স্বদেশী করেনি যে ধরবার জন্য—

রাজপুরে গিয়েছিলাম না কাল? কোন জোতদারের ঘর পোড়েনি। বরং কটা চাষীর ঘরে আগুন দিয়েছিল।

খবরের কাগজের খবর আর মন্তব্য নিয়ে রোজই ভাসা ভাসা কথাবার্তা হয়। ধীরে ধীরে একটা পারিবারিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। চারিদিকে এত সব বিরাট ঘটনা দুর্ঘটনার সমারোহ, এই ছোট্ট শহরেও যার ঢেউ এসে লাগে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের জীবনের সঙ্গে যোগ আছে অনুভব করে, কি হল কি হবে জানবার আগ্রহ সকলের মনেই। কেমন একটা অসন্তোষ, অতৃপ্তি জাগে কাগজ পড়ে। আরও কি জানতে চায়, কি ভাবে জানতে চায়, কেন জানতে চায় ভাল বোঝে না কেউ, শুধু মনে হয় কেমন যেন একপেশে ব্যাখ্যা মন্তব্য নির্দেশ কাগজটার, খবর পরিবেশনেও। ছাঁটাই বাছাই করা ঘুরিয়ে বলা সত্য মিথ্যার মেশাল দেওয়া ঘণ্টের মতো, মন পোড়ানো ঝাল দেওয়া।

দেরীতে আসা বছরের প্রথম খাঁটি বর্ষা একটু অপ্রস্তুতে ফেলেছে সকলকে। রান্না চড়াবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখা গেছে, এবছর আর কোন মতেই কাঁচা ঘরে রান্না করা সম্ভব নয় বৃষ্টির সময়, রাঁধতে হলে এই পাকা ঘরের মধ্যেই আয়োজন করতে হবে। কয়লার ছোট আলগা উনানটা এনে ভিজে কাঠ জ্বালিয়ে ডাল ভাত সিদ্ধ করার আয়োজন খানিকটা এগিয়েছে। শহরে কয়লা মেলে না, একটা কেলেঙ্কারি হব হব হয়েছে কয়লা চালান ও বিতরণের ব্যাপারে শহরের কর্তা ব্যক্তিদের নিয়ে—ধামা চাপা পড়ে যাবে। বাজার আজ হবে না জানা কথাই। ডাল ভাত হলে চিচিংগার চচ্চড়ি হবে। তরিতরকারির মধ্যে অদ্ভুত রকম সস্তা চিচিংগা, ঝিঙাও প্রায় অর্ধেক দামে বিকোয়। সকালে তরকারির ঝুড়িতে শাক রাঁধার জন্য আগের দিনের সঞ্চয় করা ডাঁটা মুলোর পাতাগুলি আর চিচিংগা থাকে—লুকানো একটা পটোল বা ছোট একটা কানা বেগুন কোন কোন দিন দেখা যায়।

স্কুল হয়তো ছুটিই হয়ে যাবে আজ, বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত অফিস কাছারিও বসবে না। ঝড় বাদলেও হাকিম হুকিম ছাড়া সবার কাছারি যাওয়ার আজ্ঞা আছে কিন্তু ওনারা নিজেরা যান না বলে না গেলেও চলে। সরকারী দপ্তরগুলিতে সব কিছুর সঙ্গে এসব কড়াকড়িও শিথিল হয়ে এসেছে, নিয়মকানুন মানার দিকে নজর দেবে কে, সবাই যখন পচন বাড়াতে ব্যস্ত, তাতেই যখন লাভ। রাখালেরও আগের দিনের তাগিদ নেই, সুনীল নতুন কাজে ঢুকেছে, তারও না। তবে বিমলকে যেতে হবে যথা সময়ে, তার বেসরকারী চাকরী।

হঠাৎ বৃষ্টি ধরে গেলে ছুটতে হবে সকলকেই—নুন ভাত তো পেটে দেওয়া চাই। তাছাড়া, খিদেও তো আছে।

আমরা বাঁচবো? বাঁচবো না—ধ্বংস হয়ে যাব। ধর্ম ভুলে গেছি, ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে পারি না—যে জোর দেখায় তার সঙ্গেই আপস। কি করে বাঁচবো? তরিতরকারির ঝুড়িটার দিকে চেয়ে থেকে রাখাল চড়া গলায় ঘোষণা করে, ঘরে ধোঁয়া বলেই যেন তার কথার মানে অস্পষ্ট করে রুখবে।

সবাই শোনে, কেউ কান দেয় না। শুধু চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খাওয়া তো নয়, অনেক কিছুই জীবন অতিষ্ঠ করে তুলে সর্বদাই তাকে দিয়ে কথাটা ঘোষণা করাচ্ছে। কত শোনা যায়?

ছেলেপিলে কাঁদে ককায়, ঝগড়া করে, চলতে থাকে তাদের সামলানো, শান্ত করা—কেমন যেন সমারোহ ছাড়াই! আগের দিনে ঘরবাড়ি সরগরম হয়ে উঠত বাচ্চাদের চেঁচামেচি কাঁদাকাটার সঙ্গে তাদের আওয়াজ ছাড়িয়ে ওঠা বড়দের বিরক্তির ঝঙ্কার মিশে। তেমন বিরক্ত কেউ যেন আর হয় না, এমন অসহ্য হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকা, তবু অথবা হয় তো সেই জন্যেই—আশ্চর্য এক ধৈর্য এসেছে সবার মধ্যে, অপরূপ এক সহ্য শক্তি। তবে সে রকম আদরও কেউ আর করে না, বাচ্চা কাচ্চাকে হরদম বুকে চেপে চুমু খেয়ে সোনা আমার মাণিক আমার বলে বলে আবেগে গলে গিয়ে এবং গলিয়ে দিতে ব্যাকুল হয়ে—কল্পনার মোটা সোটা অমন সুন্দর কোলের ছেলেটার পর্যন্ত ভাবাবেগের বাজারে দর নেই। এখনো মাই ছেড়ে রোগা বিচ্ছিরি হতে পারেনি ছেলেটা, বুকে দুধও পায় মোটামুটি—কল্পনার স্বাস্থ্য অসাধারণ ভাল ছিল।

আধ ভেজা কাপড় পরে আছে কল্পনা, এখানে ওখানে ছেঁড়া। তা ছেঁড়া কাপড় সবাই পরে, যে অবস্থায় পৌঁছবার অনেক আগেই কাঁথা ন্যাকড়া হয়ে যেত ধুতিশাড়ী, সে অবস্থাতেও! তবে, একটু জ্বর এসেছে কল্পনার এই যা। এসেছে দিন তিনেক।

দালানে মেলা বড় বৌ অতসীর শাড়ীখানা শুকিয়েছে। রেশনের নতুন শাড়ী।

দাও না দিদি ভিজে কাপড়টা ছাড়ি? শীত করছে।—হঠাৎ কল্পনা অনুরোধ জানিয়ে বসে, একটু যেন দাবীর মতো জোরের সঙ্গে। মনে তার একটা জ্বালা ছিল।

নেয়ে উঠে আমি পরব কি?

জ্বরতপ্ত মুখ আরও লাল হয়ে ওঠে কল্পনার।—

এবারও রেশনের কাপড়টা তো কায়দা করে—মরুক গে যাক।

ঝিমিয়ে পিছিয়ে যায় কল্পনা। জ্বরের দুর্বলতায় নয়, কলহ করার তেজ জ্বরে বাড়ে বই কমে না,—কিন্তু কেমন যেন উৎসাহ পায় না মনের মধ্যে!

কি কায়দা শুনি? ঘাড় তোলে অতসী, কিসের কায়দা? শোন দিকি কথা একবার!

শঙ্কিত চোখে নন্দিনী চেয়ে থাকে। কিন্তু আর এগোয় না বিবাদ, চোখে চোখে খানিক তাকিয়ে থেকে দুজনে ঝামটা মেরে শুধু মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ঝগড়াঝাঁটিরও যেন কি হয়েছে আজকাল। জমে না!

ভিজে কাপড় পরে আছো? বলতে পারো না? বললে একখানা শুকনো কাপড় তোমার জোটে না? নাও, এটা পরো।

কল্যাণ মেজ বৌদিকে একখানা সরুপাড় ধুতি এগিয়ে দেয়।

কল্পনা হেসে বলে, ধ্যেৎ।

কেন? কি হয় পরলে? নন্দিনী বলে, কত সধবা থান পেলে বর্তে যাচ্ছে! কল্পনার বড়ই শীত করছিল, দ্বিধাভরে বলল, পরব?

তার দ্বিধা আর অস্বস্তি দেখে নন্দিনী ধুতিটা নিয়ে নিজের পরণের শাড়ীখানা ছেড়ে ফেলল। শাড়ী তার আরও আছে, তবে একটু ভাল শাড়ী সে কখানা, সর্বদা পরতে মায়া হয়। তাছাড়া, কিছুক্ষণের জন্যও ধুতি পরে থাকার কথা ভাবতে তার নিজেরও যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। ওটাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

বেলা দশটা নাগাদ বৃষ্টি কমে এল। সুনীল চিচিংগা চচ্চড়ি দিয়ে পাতলা খিচুড়ি খেয়ে তখন বেরোবার উপক্রম করছে। ভাল ছাতিটা সে নিয়ে যাবে, না বাড়ির দরকারে রেখে যাবে, এই দাঁড়িয়েছে পারিবারিক সমস্যা। দেরী তার হয়েছে, আর একটু দেরী করে দেখবে বৃষ্টি ধরে কি না? সৌভাগ্যের বিষয়, আপিস বাড়ি থেকে বেশী দূরে নয় সুনীলের, মোটে দশ-বার মিনিটের পথ। বৃষ্টি একবার ধরলে সেই ফাঁকে ছাতি ছাড়াই চলে যেতে পারবে, আরেক দফা বর্ষণ শুরু হবার আগেই।

বাড়ির আর দু'জন আপিস যাত্রীও ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছে।

এমন সময় নিখিল এল সাইকেল রিকসায়। ভিজে সে চুপসে গেছে, তার জিনিসপত্রও রেহাই পায়নি। জিনিস সে সামান্যই সঙ্গে এনেছে, মোটে দু'দিন থাকবে। দশ দিনের ছুটি, তার মধ্যে তিনটে দিনই আসা যাওয়ার জন্য বরাদ্দ। দেশে নিজের বাড়িতে তিন দিন থাকতে হয়েছে, এক রাত্রি গেছে, সেখান থেকে এখানে আসতে। নন্দিনী আগে থেকে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকলে ভাল হত, তা সে তো আর হবার নয়। সাতমাস বলে নয়, শুধু, এপথে রাত্রে মেয়েছেলের যাতায়াত যেমন জঘন্য তেমনি বিপজ্জনক।

রিক্সাচালক ছোঁড়াটা আরও বেশী ভিজেছে, পিঠের কাছের দু'ফালা হয়ে ছেঁড়া খাঁকি ময়লা সার্টটা এঁটে গিয়েছে পিঠের চামড়ার সঙ্গে। ব্যাগ আর বিছানা ঘরে পৌঁছে দিয়ে সে ঘরের মধ্যেই দরজার চৌকাঠের কাছ ঘেঁসে পরিবারটির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে জামাটা খুলে নিঙড়ে নেয়, কাপড় চিপে চিপে জল ঝরায়। জামা দিয়ে গা মুছে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকে। বৃষ্টি থামার জন্য একটু অপেক্ষা করাই বোধ হয় তার মতলব।

বেশী পয়সার লোভেই সে অবশ্য এই বৃষ্টিতে নিখিলকে পৌঁছে দিতে রাজী হয়েছে, তবু তাকে রাস্তায় নেমে যেতে যেন বলা যায় না, অন্ততঃ কিছুক্ষণ দাঁড়াতে না দিয়ে।

শুধু রাখাল নীচু গলায় বলে, ব্যাটা মুসলমান কিনা না জেনে?

সে কথায় কেউ কান দেয় না।

ইলিশ মাছ দু'টি হাতে করেই নিখিল নেমেছিল। মস্ত দুটো ইলিশ, বেশ চওড়া।

মাছ এনেছো? মা যেন আশীর্বাদ করে জামাইকে।

ভিজে কাপড় ছেড়ে নিখিল বনমালীর এক পায়ের পাতায় এক হাতের একটি আঙুল ছুঁইয়ে প্রণাম পর্ব শেষ করে, আর কারো পায়ের দিকে তাকিয়েও দেখে না।

বলে, খারাপ হয়ে গেছে বোধ হয় মাছ দু'টো।

সেটা টের পাওয়া যাচ্ছিল।

খারাপ হয়ে যাবে না? নন্দিনী বলে মুখ ভার করে, এভাবে আনলে কখনো মাছ থাকে?

একটু বরফ পেলাম না। থলিটাতে বড় বড় বরফের চাকা ভরে—

ভেজে আনলেই হতো!

আসবার সময়েই কিনে নিলাম বাজার থেকে। ভাবলাম বরফ কিনে—

যাক, বেশ করেছো। দুধ ছাড়া চা খেতে হবে কিন্তু। শুধু এইবার—পরের বার দুধ এসে যাবে। তোমার জন্য চিনি তোলা আছে, গুড়ের চা নয়।

এবার নন্দিনী হাসলো।

ধর্ম্ম

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ দুজনের বেধে যায়। তীক্ষ্ম ধারালো কথায় পরস্পরকে এরা কুচি কুচি করে কাটতে থাকে, মুখের সঠিক সূক্ষ্ম ভঙ্গি সমর্থন করে চলে কথাকে, ভিতরের জ্বালার তাপে আর আক্রোশের চাপে ফর্সা মুখ দুটি লাল হয়ে যায়—তমসার বেশী হয়। সৌম্যেনের দাড়ি কড়া, অনেক যত্নে কামানোর পরেও কূপের ভিতর থেকে লোমের গোড়া উঁকি দেয়।

তমসা বেশ ফর্সাই।

গলা তাদের চড়ে না, বরং কথার ধার বাড়বার সঙ্গে আওয়াজ কমে আসে। চাপা হিসহিসানির মতো শোনায় সময় সময়, তাদের ভেতরে যেন সাপ আছে, ঝগড়া করছে সেই সাপ দুটি, তারা নয়। বুদ্ধি চোখা, জটিল চিন্তা নিয়ে দ্রুত পাক দেওয়া মনের অভ্যাস, চিন্তার স্পীডও অনেক। গলার জোরে গায়ের ঝাল ঝাড়বার দরকার তাদের হয় না, গালাগালি তো একেবারেই অচল। নতুন নতুন বলার কথা খুঁজে না পেয়ে একটিমাত্র খোঁচার পিছনে তেজ ঢেলে দিতে হয় না, সবটুকু, যা মনে আসে, তাই বলতে হয় না। বিশ্লেষণমূলক সমালোচনা চলে, কথা কাজ ও ব্যবহারের শত খুঁটিনাটি ত্রুটিবিচ্যুতির;—একে প্রমাণ করে অপরের স্বার্থপরতা, ঔদাসীন্য, অবিবেচনা, আলস্য, অপটুতা, অকর্মণ্যতা, অন্যায়, অবিচারকে, না বোঝাকে, স্নেহ-মমতা ভালবাসার অভাবকে। হৃদয়মন টুকরো টুকরো হয়ে যায় দুজনের। জীবনের সমস্ত সঞ্চিত ক্ষতে রক্ত ঝরতে থাকে।

তমসা কেঁদে থামে। অথবা থেমে কাঁদে।

সৌম্যেন থামে, যে কোন বই তুলে উল্টো সোজা যে ভাবে হোক খুলে মুখের সামনে ধরে গুম হয়ে থাকে।

খানিক পরে একজন কথা কয়,—সহজ স্বাভাবিক সাধারণ কথা। কোনদিন তমসা, কোন দিন সৌম্যেন।

আরম্ভ হওয়ার একমুহূর্ত আগেও যেমন যুদ্ধের ইঙ্গিতটুকুও থাকেনি তাদের কথায় ব্যবহারে, শান্তিও তেমনি শুরু হয় বিনা ভূমিকায়।

হাসি আসে, মাধুর্য আসে শান্তিতে। যতটা সম্ভব। টুকিটাকি খিটিমিটির মধ্যে যুদ্ধের জের টেনে চলবার মতো অন্ধ একগুঁয়ে তারা নয়, চাপা যখন পড়ল সংঘাত তখন তা চাপা দিয়ে রাখবার মতো উদারতা তাদের আছে। ভাল তারা

দুজনেই, মন তাদের ছোট নয়, হৃদয় বড় কঠিন। কোমল অনুভূতি, ব্যাপক প্রেমভাব, মৃদুতম স্পর্শে সমবেদনার সাড়া, আধ্যাত্মিক ত্যাগপ্রেরণা, মার্জিত বিনয় ও নম্রতা, ভদ্রতা, সভ্যতা, বিদ্যা, জ্ঞান, বুদ্ধির সমাবেশ ঘটেছে তাদের মধ্যে। তারা কি পারে মিছামিছি পরস্পরকে ব্যথা দিতে?

তবু হঠাৎ তারা মরিয়া হয়ে পরস্পরকে কুচি কুচি করে কাটে দিনে রাত্রে কয়েকবার,—তিক্ত বিস্বাদ হয়ে যায় জীবন; দুজনেই ভাবে, এর চেয়ে মরণ ভাল।

দুজনেই ভাবে, কেন এমন হয়? অনেক স্বপ্ন সফল হয়নি জীবনে, অনেক আশা স্বপ্ন হয়ে গেছে, অনেক বিশ্বাস ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে বাস্তবের আঘাতে—তাই বলে অমন অশান্তি, এমন তিক্ততা কেন দুর্বহ করে তুলবে তাদের জীবনকে? যা আছে তাও তো একেবারে তুচ্ছ নয়, অকিঞ্চিৎকর নয়। হাসি ও মাধুর্যভরা নিবিড় শান্তি দুচার ঘণ্টা তো সার্থক করে রাখছে আংশিক জীবনকে—যা আছে, যা পাওয়া গেছে তারই মূল্যে। সমস্ত জীবনটা কেন অর্থহীন হয়ে গেছে? কেন দিবারাত্রি সুখে দুঃখে, হাসিকান্নায় মহাশূন্যে নির্ভরহীনতার আতঙ্কের মতো এই ভয়াবহ শূন্যতাবোধ জেগে থাকছে যে, সব মিছে—এই শেষ?

মাঝে মাঝে নিজের মনকে জবাব দিয়ে বোঝাবার জন্যই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তারা ভাবে, জীবনটাই বুঝি এমনি ছেলেখেলার ব্যাপার, বিশ্রী।

প্রতিবিধানের সাধ্যমতো চেষ্টা করে।

'সিনেমায় যাবে?'

'চলো যাই।'

বেশ কাটে কয় ঘণ্টা।

'সনৎ বিশেষ করে যেতে বলেছে কিন্তু।'

'না গিয়ে উপায় আছে?'

বেশ কাটে কয়েক ঘণ্টা।

'রবিবার ডাকলে হয় না ওদের? নীলাকে পাওয়া যাবে গান গাইতে।'

বেশ কাটে কয়েক ঘণ্টা।

'মোটে বারো দিন ছুটি। তবু চলো, ঘুরে আসি। অনেক দিন বাইরে যাওয়া হয়নি।'

'টাকা?'

'সে হয়ে যাবে।'

বেশ কাটে ন'টা দিন দিদির বাড়িতে, পাহাড়ে, বনে, ঝরনায়। কিন্তু সে তো কতকগুলি ঘণ্টা, কয়েকটা দিন! ঘুষ দিয়ে কি জীবনকে বাগানো যায়!

সুনীল সৌম্যেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। মনোবিজ্ঞানে বিদেশী ডিগ্রী নিয়ে এসে দেশী কলেজে ইংরেজী সাহিত্য পড়ায়। সে বলে, 'না, এটা কোন বিশেষ মানসিক রোগের লক্ষণ নয়। কি জানিস, আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের এটা বৈশিষ্ট্য। ঝগড়া করে কেঁদেকেটে আদর চায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব মেয়ে এক রকম।'

আদর চায়? আদর? ঝগড়া আর কাঁদাকাটার পর আদর তো তমসা পায় না. চায়ও না। কে জানে! সৌম্যেন ভাবে, কে জানে! ঝগড়ার পর আদর করতে যায় পরদিন তমসাকে।

'এ আবার কি তামাসা?' তমসা বলে তাকে।

পাতলা কাঠির তক্তা গেঁথে, সাদা পেণ্ট মাখিয়ে, দুভাগ করা দোতলা। ওপাশের বাড়িতে নির্মল দস্তিদার থাকে। সৌম্যেনের সমবয়সী, বিদ্যা মাত্র দুবার বি. এ ফেলের, চাকরী অনেক নীচুস্তরের সৌম্যেনের চাকরীর তুলনায়, আয়টা সামান্য কিছু বেশী উপরি নিয়ে। স্ত্রীর নাম নলিনী, বয়সে দু'তিন বছরের ছোট হবে তমসার। রূপসী বেশীই হবে সব হিসেবে। আশ্চর্য এই, ছেলে আর মেয়ে দুটি দুজনের প্রায় একবয়সী।

নলিনী বলে, আপনি যদি মুখ্য হতেন দিদি আমার মতো, সই পাতাতাম আপনার সাথে।

নির্মল অতটা সরল নয়। সৌম্যেনের দাম্পত্য ব্যাপার নিয়ে সোজাসুজি উপদেশ ঝাড়বার সাহসও তার হয় না। ঈশপের মতো গল্পচ্ছলে সে দাওয়াই বাৎলে দেয়। একবার নয়, অনেকবার। যে কোন প্রসঙ্গে গল্পটা টেনে আনতেও অসুবিধা হয় না. বিজ্ঞাপন-লেখকদের মতো এবিষয়ে সে নিরঙ্কুশ এক্সপার্ট।

'বলছেন তো দিন আরেক কাপ। ওতে আর কি। দু'চার কাপ বেশী চা খাওয়া অভ্যাসও হয়ে গেছে আজকাল।......সুন্দর চা করেন আপনার স্ত্রী, ভাগ্যবান মশায় আপনি......আগে ছিল না। আগে—মানে ওই বেশী চা খাবার অভ্যাসের কথা বলছি। সকালে এক কাপ, বিকালে এক কাপ বাঁধা। এক কাপ যদি বেশী চেয়েছি কোনদিন, সর্দি টর্দি হলে পর্যন্ত—সেকি কাণ্ড মশাই, একেবারে যেন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে মারতে উঠতেন। সে রণচণ্ডী মূর্তি তো দ্যাখেননি দাদা। আর শুধু কি চা এক কাপ বেশী চাইলে? ও লেগেই আছে উঠতে বসতে, পান থেকে চুণটি খসবার যো ছিল না, দেয়াল ফাটিয়ে দিত চেঁচিয়ে।'

চায়ে চুমুক দেবার আরাম ভোগ করে নিয়ে তারপর সে শিউরে ওঠে অতীতের স্মৃতিতে, 'বাপস! কি দিন গেছে!' তারপর সে গম্ভীর হয়। সৌম্যেন জানে, গম্ভীর হয়ে এবার সে কি বলবে। তবু সে আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করে, অনেকবার বলা কথাটা এবার সে কি বলে শুনবার জন্য। 'দোষ ছিল আমারি। বোঝার দোষ। জীবনটা তো ছিনিমিনি খেলা নয়, আপনিই বলুন দাদা? আনো, খাও, সুখ কর, তাকে কি সংসার বলে? মানুষের আত্মা আছে, তার তো একটা অবলম্বন চাই? নইলে শুধু খেয়ে দেয়ে ফুর্তি করার জন্য সংসার হলে কি সুখ শান্তি থাকে সে সংসারে? মনটা বিগড়ে গেল একেবারে, ভাবলাম সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব। ভাবতে ভাবতে ধর্মে কেমন মতি হল একটু, বাড়িতেই অল্পবিস্তর চর্চা শুরু করলাম। সামান্য পুজো আচ্চা জপ-তপ, সংসারে কি বলে গিয়ে তাই যথেষ্ট। বলব কি আপনাকে, সংসারের চেহারা যেন আমার বদলে গেল দু'দিনে। জাঁড় শিকড় ছোঁয়ালে সাপ

যেমন মিইয়ে যায়, উনি ঠিক তেমনি ঠান্ডা ভালমানুষ হয়ে গেলেন। সত্যি কথা দাদা, কুঁদুলে মেয়েমানুষ হল সাপের মতো, ধম্মো কম্মো ছাড়া তাদের বশ করার উপায় নেই। এখন, দেখুন না, দশ কাপ চা চাইলে বানিয়ে দেবে ঠিক, কথাটি কইবে না।'

সৌম্যেন তমসার কাছে গিয়ে বলে, 'ধর্মে তো আমরা বিশ্বাস করিই, ধর্মের কর্তারা যাই বলুন আমাদের একেলেদের সম্বন্ধে। ধর্মকর্মে আমাদের অবিশ্বাস নেই, কি করে ধর্মকর্ম করব তাই জানিনে বলে মুস্কিল।'

'কিন্তু আজ ধর্মের কথা কেন? সন্ন্যাসী হবে নাকি?' তমসা জিজ্ঞাসা করে।

'ইচ্ছা হয়।'

'তা হবে না? চাকরী করা, সংসার করার কত কষ্ট!'

দুজনের বেধে যায়, কুচি কুচি করে কাটে তারা পরস্পরকে। কাঠের দেয়ালের ফাঁক ফোকর দিয়ে ঘরে সঞ্চারিত হয় ধূপের মৃদু গন্ধ। নলিনী ফুল জল দিচ্ছে পটের দেবতাকে, স্নান করে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে।

নির্মলের পাঁচ বছরের মেয়ে মণি প্রসাদ এনে দিয়ে তাদের থামায়। কয়েকটি বাতাসা, কয়েক টুকরো শশা ও কয়েক কোয়া কমলা। ছোট রেকাবিটিতে ছিটেফোঁটা চন্দনের গন্ধ। দুজনে তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

নির্মলের সঙ্গে আত্মীয়তার যে অনুভূতি গড়ে উঠছিল সেটা আবার নতুন করে স্পষ্ট অনুভব করে দুজনেই। সেই সঙ্গে নিজেদের মনে হয় বড় নিরুপায়।

পাতলা কাঠের পার্টিশন। একটা ফাঁকের কাছে এসে নলিনী বলে, 'একটা কথা শুনবেন দিদি? পুজোআচ্চা ধম্মে কম্মে একটু মন দিন। আপনি মন দিলে, ওনারও মন আসবে। দুজনে শান্তি পাবেন। আমাদের লাগতো না আগে? চুলোচুলি কাণ্ড হত না? পট আনিয়ে নিত্যি পুজো করি। পুজো মানে ওই দুটো ফুল আর জল দেয়া আর কি। চান টান করে শুদ্ধ হয়ে মনটা ঠিক করে নিয়ে কোনদিন ওঁনাকে দিয়ে করাই। আর ছোটখাটো নিয়ম-নীতি পালন করি। উনি যেন বদলে গেছেন, একেবারে নতুন মানুষ। রাগারাগি করেন না বললে হয়।

বলে সে সরল ভাবেই, হৃদ্যতার সঙ্গে। তবু একটু ঈর্ষা ও ব্যঙ্গের ভাব উঁকি মারে অন্তরাল থেকে। বসে গল্প করে সুখদুঃখের, মোটা গয়নার মতো মোটা সুখের, মাটিতে চেপে বসার মতো মোটা দুঃখের। জ্বালাতন পোড়াতন হয়ে গেল সে সংসারে। বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই, আরাম নেই, শান্তি নেই। তবে মেয়েমানুষের আর কি চাই। এতেই মেয়েমানুষ ধন্য। স্বামীপুত্র রেখে যেতে পারলেই হয়।

'জ্বালাতন পোড়াতন কিসে হলেন তবে?'

'ওমা! সামলাতে হয় না সব? আপনি হন না? অত লাগেন কেন কত্তার সঙ্গে তবে?

নির্মলেরাও ছুটিতে বেড়াতে যায়। দেশের বাড়িতে যুদ্ধের কবছরও নিয়মিত গিয়েছে, এবারও যাবে। তার দেশের পথে এক ট্রেনে একই দিনে দূরবর্তী স্বাস্থ্য-

নিবাসের উদ্দেশে সৌম্যেনেরা রওনা হবে শুনে নির্মল দারুণ খুসী আর উৎসাহিত হয়ে উঠল।

'আপনাদের নামতে হবে, দুটো দিন থেকে যেতে হবে আমাদের বাড়িতে। কোন হাঙ্গামা নেই, স্টেশনে নামবেন, আবার স্টেশন থেকে গাড়িতে উঠবেন। দুটো দিন শুধু কষ্ট করবেন।'

বাড়িতে তার গাই বিইয়েছে। ক'মাস খাঁটি দুধ খাওয়াবে। যুদ্ধ শেষ হলেও দেশের অবস্থা খারাপ বটে, তাই বলে টাটকা মাছ তরকারী কি আর অতিথিকে সে খাওয়াতে পারবে না অল্পবিস্তর দুটো দিন। স্টেশন থেকে মোটে চার মাইল, ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যায়। কোন কষ্ট হবে না। স্টেশন-মাস্টার আবার নির্মলের নিজের বোনাই। দরকার হলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখবে আধ-ঘণ্টা, ভিড় হলে শোবার জায়গা করে দেবে। এ সুযোগে দেশের বাড়িতে পায়ের ধুলো একবার না দিলে সৌম্যেনদের সে ছাড়বে না।

ওদের এত উৎসাহের মানে ভাল বোঝে না, কিন্তু তাদের দুদিন অতিথি পাবার জন্য ওদের আগ্রহ প্রায় মুগ্ধ করে দেয় সৌম্যেন আর তমসাকে। ট্রেনে খানিকটা মানে বোঝা যায়।

'সদরের ম্যাজিস্ট্রেট মুখার্জি সায়েবকে তো আপনি চেনেন?' নির্মল বলে কথায় কথায়।

'জানা শোনা ছিল।'

'কাল আসবেন আমাদের গাঁয়ের স্কুল দেখতে। দেখা হবে আপনার সঙ্গে।' নির্মল বলে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে।

'ওর কাছে আপনার কি কোন দরকার—?' সৌম্যেন বলে, ফাঁদের সন্দেহে বিব্রত হয়ে।

'আরে রাম রাম।' সোজা হয়ে উঠে বসে নির্মল। 'ওসব ভাববেন না। সভাটভা হবে, উনি আসবেন, দেখাসাক্ষাৎ হবে আপনার সঙ্গে, তাই বলছি। আমি কমিটিতে আছি কিনা। স্কুলের গ্রাণ্টটা কিছু বাড়াতে অনুরোধ করা হবে।'

মানে খানিকটা বোঝা গেলেও তাতে নিমন্ত্রণের আন্তরিকতায় খুব বেশী সন্দেহ হয় না। ছাঁচে ঢালাই মানুষ নির্মল, কিন্তু লোক খারাপ নয়।

ভোরে তারা নামে। স্থানটি ছোট, তার তুলনায় স্টেশনটি সত্যই খুব বড়। নির্মলের নিজের বোনাই স্টেশন-মাস্টারটিকে খোঁজাখুঁজি করেও না পাওয়ায় নির্মল রীতিমতো ক্ষুব্ধ ও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তার এ অপমানে যেন খুসী হয়েই নলিনী বলে, 'তোমারি তো বোনাই!'

স্টেশন থেকে লাইনের পাশাপাশি বাঁধানো লাল রাস্তা গেছে অনেক দূর, রোগা ঘোড়া দুটি টকর টকর করে গাড়ি টেনে চলে। সকালের শান্ত রোদে এদিকে রেলের লাইন আর ওদিকে ক্ষেত মাঠ, ছাড়া ছাড়া ঘরবাড়ি ও অস্থায়ী খড়ের ছাউনি দেখতে বেশ ভাল লাগে। সামনে কিছু দূরে চোখে পড়ে কারখানার উঁচু চোঙা।

'আমাদের গাঁয়ের জমিদার রামপ্রাণ চৌধুরী, তার মিল। মিলে কি সব হাঙ্গামা চলছে শুনছিলাম!'

পথ দক্ষিণে বেঁকে গেছে মিলের গেটের সামনে দিয়ে। কাছাকাছি গিয়ে তাদের ঘোড়ার গাড়িকে থামাতে হয়। মিলের গেটের দিকে মুখ করে পাশাপাশি রাস্তা বন্ধ করে আছে একটা লরী, থেকে থেকে গর্জন করে উঠছে ইঞ্জিন, কিন্তু এগোতে পারছে না! লরীর সামনে থেকে গেট পর্যন্ত গাদাগাদি করে শুয়ে আছে মানুষ। পুরুষ ও নারী। চারিদিকে ভিড় করে আছে আরও অনেক লোক।

নির্মল দেখিয়ে দিল, 'উনি চৌধুরী মশায়।'

খদ্দরের কোট গায়ে মোটা ভুঁড়িওলা মানুষটি, হাতে দামী কাঠের মোটা লাঠি। দুপাশে ও পেছনে তার সাঙ্গপাঙ্গের সঙ্গে ডজন খানেক পুলিস। থেকে থেকে চৌধুরী গর্জন করছেঃ 'চালাও চালাও উপরসে চালাও। চাপা দে দেও শালা লোককো!'

লরীর ইঞ্জিন গর্জন করে উঠছে। লরীর একহাত সামনের শায়িত মানুষ একটু নড়ছে না। ইঞ্জিনের গর্জন কমে যাচ্ছে। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে সৌম্যেন আর তমসা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। তমসার ছোট ছেলেটা কাঁদে, নলিনী তাকে থামাতে চেষ্টা করে, তমসার খেয়ালও থাকে না। তখন হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে অবস্থার। ইঞ্জিন একেবারে থামিয়ে দিয়ে লরীর ড্রাইভার নীচে নেমে আসে।

'নামলি যে হারামজাদা?' রামপ্রাণ গর্জে ওঠে।

'আমি পারব না। আপনি চালান।'

রামপ্রাণের প্রাণে বোধ হয় আর সয় না। অকথ্য একটা কথা বলে সে হাতের লাঠি বসিয়ে দেয় লরী-চালকের মাথায়। সে ঘুরে পড়ে গেলে তার দিকে এক নজর না তাকিয়েই এগিয়ে গিয়ে রামপ্রাণ আথালি পাথালি পিটতে থাকে শায়িত পুরুষ ও মেয়েদের।

তমসার মাথাটা বোধ হয় বিগড়ে যায় দেখে। মুখে চেঁচায়, 'একি! একি! কাজ করে আরও অদ্ভুত। ঘোড়ার গাড়ির দরজা খুলে তড়াক করে নেমে ছুটে গিয়ে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে রামপ্রাণের মোটা শরীরটা।

'কি করছেন আপনি?'

নিজেকে মুক্ত করে রামপ্রাণ বলে, 'তুমিই বুঝি সরোজিনী?'

'না। আপনি মানুষ না পশু?'

সৌম্যেন লরী চালকের মাথায় রুমাল চেপে ধরেছিল। সে ডেকে বলে, 'শুনছো? ছোট সুটকেশে ছেঁড়া কাপড় আছে আমার, খানিকটা ন্যাকড়া ছিঁড়ে আনো তো।'

বিকালে স্কুলের সভায় সৌম্যেনের যাওয়া হয় না। রামপ্রাণ চৌধুরীর মিলের অদূরে প্রতিবাদ সভা হবে, গাঁয়ের অর্ধেক লোক সেখানে ছোটে। সৌম্যেনও যায়।

বড় ছেলেটাকে নলিনীর কাছে রেখে ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে তমসাও সঙ্গে যায় সৌম্যেনের।

শ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেও তারা রাত জেগে কথা বলে। পরের বাড়ির নতুন আবেষ্টনীতে যেন নতুন করে তাদের বিয়ে হয়েছে। সুখদুঃখের কথাই বলে। নিজের নিজের নয়। অনেকের সুখদুঃখের কথা।

আপদ

চাল নেই? বাঃ, বেশ!

সকালবেলা কি শুভ সংবাদ! স্বাধীনতা পাওয়ার বাসি পচা সংবাদটার মতো। জর্জর প্রাণে আরেক দফা জ্বর এনে দেয়।

রাত্রে নলিনী খবরটা চেপে গিয়েছিল। আপিস ফেরত কেরানী বেচারাকে তখন ও-খবরটা জানিয়ে আর লাভ কি। কালো বাজারে ছাড়া চাল নেই। হলই বা সে সরকারী কেরানী, স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকারের বেতনভুক্ত। রাতারাতি চাল-বাড়ন্ত সমস্যার সমাধান করার সাধ্য তার নেই। নলিনীর মতে, সরকার স্বাধীন বলেই কেরানীদের দাসত্বের ডিগ্রি চড়েছে। তার যুক্তি আর ব্যাখ্যা একটু তির্যক ও রসালো হয়, কারণ সে কথাগুলি রসিকতা করেই বলে। এত চড়া তার ক্ষোভ যে বেশী তেতে লোহা জ্যোতির্ময় হওয়ার মতো তার প্রাণের জ্বালা ব্যঙ্গ হয়ে বিচ্ছুরিত হয়!

আমি কি করব? নলিনী আলগোছে বাঁকা হাসি হেসে বলে, তোমরা স্বাধীন হয়েছ, আমরা তো হইনি। আমরা ঘরের কোণে হাঁড়িই ঠেলছি। হাঁড়ি চড়াবার ব্যবস্থা তোমরাই বাদ দিয়েছ, আমরা করব কি?

কেউ যেন তাকে কিছু করতে বলেছে! এই রকম ঢং হয়েছে নলিনীর কথার— শুধু আজকাল নয়, অনেকদিন থেকে। আগে অন্য কথায় ঠোক্কর দিত, আজকাল কথায় কথায় এই স্বাধীনতার কথা তুলে খোঁচায়। কথা আরম্ভ করে 'আমি' দিয়ে, পরক্ষণে তা দাঁড়ায় 'আমরা ও তোমরা'র ব্যাপারে।

সে যেন কণাদ রায়ের বৌ নয়, তার ছেলেমেয়ের মা নয়, তার সংসারের গিন্নী নয়, সে ভিন্ন একটা জাতের এবং কণাদ অন্য একটা জাতের প্রতিনিধি।

ঘরে চাল নেই এ কি নতুন কিছু ব্যাপার? প্রায়ই একরকম চাল থাকে না প্রায় সকলের ঘরেই। নলিনী এমনভাবে খবরটা দেয় যেন তারই পরামর্শে গভর্নমেণ্ট ঘরে ঘরে চালের অনটন ঘটিয়েছে, লোভী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চাল, আটা কাপড়-চোপড় সিকেয় তোলার সরকারী ষড়যন্ত্রে সেও যেন একজন অংশীদার। সেই যেন এই বিশ্বাসঘাতকের জগতে সবার সেরা বিশ্বাসঘাতক।

ঘরের কোণে হাঁড়ি ঠেলে বলে? অন্যদের হাতের কাছে পায় না, একমাত্র পুরুষ তাকেই পায় বলে?

কিন্তু তাকে পুরুষ মনে করে কি নলিনী? কথা শুনে সন্দেহ জাগে!

আজকেই চাল ফুরুলো? বিষ্যুদবার পর্যন্ত যেতো না?

পেট বাড়েনি দুটো?

বাড়িতে লোক বাড়েনি, পেট বেড়েছে দুটো। পেট! কথার কি ছিরি নলিনীর! পাকিস্তান থেকে দু'জন আত্মীয় এসে ঘাড়ে চেপেছে বটে এবং তাদের পেট ভরাতে হওয়ায় রেশনের আইনী চাল-আটা মঙ্গলবারেই শেষ হয়েছে। রেশন কার্ড সংগ্রহের হাঙ্গামা চুকলে আশা করা যায় ভবিষ্যতের সপ্তাহে আবার বিষ্যুদবার পর্যন্ত সরকারী বরাদ্দ খাদ্য টানা চলবে। শুক্রবার সকালে নলিনী মনে করিয়ে দেবে ঘরে একদানা চাল নেই, একগুঁড়ো আটা নেই—তার আগে নয়। সে চোরাবাজারে যাবে চালের সন্ধানে। বার বার এই কথা ভেবে বুকে বল পাওয়া যাবে যে মোটে তিনটি দিন, শুধু আজ কাল পরশু, শুক্র শনি আর রবিবারটা চোরা চালে কোন রকমে চালান—হিসেব করে, আরও কম খেয়ে, কোন রকমে।

সোমবারে আবার রেশন মিলবে!

নলিনী মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে ইট-সুরকি-সিমেণ্টের নূতন গাঁথনিটার দিকে। বাড়ির পাশে কি তাড়াতাড়ি যে গড়ে উঠছে সিনেমা হাউসটা। ওষুধের নেশার মতো সস্তা আনন্দের জলো দু'টি ঘণ্টার জন্য বিব্রত অতিষ্ঠ মানুষ পয়সা দিচ্ছে, সে লাভে ভাগ বসাতে একদিন দেরিও যেন সইবে না।

তাড়াতাড়ি গড়ে তোলো, রোশনাই জ্বালো, দুয়ার খুলে দাও—কিছু একঘেয়ে ন্যাকামি, কিছু রেডিও মার্কা মাছি ওড়া সুরের ভনভনানি, কিছু দেশপ্রেম আর বিপ্লবী নায়ক-নায়িকার বাসরঘরের বিপ্লবে সমাপ্তি, এরই জন্য ভিখারির মতো মেয়ে-পুরুষ এসে ভিড় করুক টিকিট ঘরের দরজায়।

নিজের চিন্তায় চমক লাগে কণাদের—এ তার স্বকীয় নয়, নলিনীই এমনি করে বলে। চোখে কি জল নলিনীর? না চকচক করছে মনের জ্বালায়?

কি ভাবছ জানি, নলিনী ভারি গলায় বলে, নিজের পেটে পুরিনি আমি সব। কাল রাত্রে উপোস গেছে আমার।

আচমকা মুখ ফিরিয়ে সে মুচকে হাসে, মেয়েরা উপোস দিলে আগে মাছের একটা আঁশ দাঁতে কাটত। মাসের ন'দশ তারিখ হল মাছের গন্ধও আসে না বাড়িতে। কি করি বল? তোমরা স্বাধীন হয়েছ—

থলি দাও। দুটো দিও, বাজারটাও সেরে আসব।

থলি নিয়ে কণাদ পালিয়ে যায়।

কিছুদিন আগেও কণাদ বোঝাত, তর্ক ও রাগারাগি করত। শেষে বলত, তুমি কি বুঝবে, তুমি মেয়ে মানুষ, তোমার ত্যাগ নেই, ধৈর্য নেই, তুমি স্বার্থপর।

সম্প্রতি সে আর উৎসাহ পায় না। যত সহজ ভেবেছিল অত সহজ নয় ব্যাপার, না স্বাধীনতার প্রশ্ন না তার প্রতি নলিনীর অদ্ভুত জ্বালার মানে বোঝা।

ছোট ভাই চেঁচিয়ে পড়ছে, এমনি চেঁচিয়ে সেও একদিন পড়ায় মন বসাত, আলস্য কাটাত। পূর্ব-বঙ্গের পলাতকা আত্মীয়া দু'টি, মা ও মেয়ে, সেঁতসেঁতে উনানটুকুর

কোণে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছে—সবাইকে খেতে দিয়ে নলিনী যে কাল না খেয়ে ছিল সেই বিষয়ে কি? অথবা নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে? কাকীমা আর খুকীকে এখানে রেখে রমেশকাকা ছেলেকে নিয়ে হোটেলে উঠে যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে সেজন্য কণাদের কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। তবু কাকীমা আর খুকীকে তার মারতে ইচ্ছা হচ্ছে।

এত সকালেই সিনেমা হাউসটার কাজ শুরু হয়ে গেছে, সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ চলবে। মিস্ত্রী আর কুলিরা কি রকম মজুরি পায়? ভালই পায় নিশ্চয়, দিন ভালই চলে নিশ্চয়, নইলে কথায় কথায় স্ট্রাইক করার এত তেজ কোথায় পেত! হলদে কার্ডে ওদের রেশন পর্যন্ত বেশী বরাদ্দ করা হয়েছে দেশের এমন সংকটের সময়ে। ভবিষ্যৎ গড়বার বা ভাঙবার এই সন্ধিক্ষণ, ওরা যদি শুধু আদায় করার ফিকির ছেড়ে এই দুর্দিনে—

এ যেন মুখস্থ করা চিন্তা, তোতাপাখির মতো শুধু আবৃত্তি করা নিজের মনে, পরের কাছে। নিজের মনও আর সায় দিতে চায় না। ইট গেঁথে গেঁথে নূতন দালান উঠেছে, তার এতদিনের পুরানো বিশ্বাসের ইমারত পড়ছে ভেঙে ভেঙে। ভালই যদি দিন চলে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর তেজ যদি বাড়ে, উদয়াস্ত খেটে কেন মরবে মানুষ?

নিজেই কি সে খাটত?

এসব কথা শুনে নলিনী বলে, বোকো না বেশি। এতটুকু আশা ভরসা থাকলে মানুষ যেন কষ্ট সইতে নারাজ হয়। ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আধপেটা খেয়ে প্রাণপাত করে না মানুষ একটু সংস্থানের জন্য? মানুষ ভূত কি না সুখে থাকতে নিজেকে কিলোবে! ত্যাগ ত্যাগ করে তোমরা সবাইকে সন্ন্যাসী বানাতে চাইছ!

তোমরা! তাকে 'তোমরা' ছাড়া সম্বোধন করতে নলিনী ভুলে গেছে। দেশকে ভালবাসে বলে নলিনী বড় শ্রদ্ধা করত তাকে, নিজেকে উজাড় করে উন্মুখ অতল ভালবাসায় তার জীবন ভরে রাখত। নলিনী ভুলে গেছে আজও সে দেশকে ভালবাসে।

কত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে, কত অল্পদিনে!

যুদ্ধ, বোমার ভয়, দুর্ভিক্ষ হাসিমুখে হেলায় পিছনে ঠেলে দিয়েছে, কিসের সমস্যা কিসের কি, তুমি আছ আমি আছি! একটি মেয়েকে জন্ম দিতে সব ভুলে গেছে নলিনী।

তবু তাকে এতভাবে বাঁচিয়ে চলে কেন নলিনী? রাত্রে কেন তাকে জানায় না ঘরে চাল নেই, সে না খেয়ে পেটের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে পাশে এসে শুয়েছে? আদর করতে চেয়ে কাছে টানায় খানিকক্ষণ সে কাঠ হয়ে শুয়েছিল, হাত সরিয়ে দিয়েছিল। কত দুঃখ আর ক্ষোভের সঙ্গে নলিনীকে তখন তার মনে হয়েছিল স্বার্থপর, এখন নিজের সেই জ্বালার কথা ভেবে লজ্জায় কণাদের মরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে সাধ যায়। সারাদিন খেটে মেয়েকে মাই খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে নলিনী শুয়েছিল অন্যদিনের মতোই, সে টেরও পায়নি যে তার একমুঠো ভাত জোটেনি।

তারপর নিজেই নলিনী পাশ ফিরে তার গলা জড়িয়েছিল। এটাও তার নলিনীর স্বার্থপরতাই মনে হয়েছিল।

সকালে এখন আকাশে সূর্য উঠেছে, নোংরা রাস্তায় মানুষের ঠাসাঠাসি ভিড়, বাজারে তার পাশে দাঁড়িয়ে নলিনীর মতোই রোগা ফোলা চোখ মুখ, আলুথালু কুৎসিত শিথিল ভঙ্গিতে শাড়ি জড়ানো বস্তির একটি সস্তা বেশ্যা আধপোয়া কুচো চিংড়ি কিনছে। ভগবান আছেন বলে আর ভরসা নেই কণাদের, সত্য আর আদর্শও হয়তো নেই, তবু কণাদ নিজের কাছে স্বীকার করে যে এখনও নলিনীকে সে স্বার্থপর বলেই ভাবছে। নলিনী জানে তার জন্যই তার সব, বর্তমানের খাওয়া-পরা ও ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরাম-বিরাম। তাকে শুধু বাঁচিয়ে রাখতে নলিনী তাকে রাত্রে চালের কথা না বলে তাকে ঘুমোতে দেয়, তাকে বেশি চটানো উচিত নয় ভেবেই উপোসী, অবশ দেহটাকে পাশ ফিরিয়ে শীর্ণ হাত দু'টিকে তার গলায় জড়িয়ে দেয়! সে বাঁচলে, সে খুশি থাকলে তবেই নলিনীর স্বার্থ বজায় থাকবে!

নিজের এ চিন্তায় সে কোন গলদ খুঁজে পায় না। কিন্তু নলিনী স্বার্থপর—এই সত্যটা নিজের অপরাধের মতো তাকে পীড়ন করে। এ স্বার্থপরতায় দোষ কোথায় নলিনীর?

এটাই তো নিয়ম সংসারের, বাস্তব জগতের! ঘরে ঘরে সব নলিনীদের বেলাতেও তো একই হিসাব। স্বামীর কাছে ভাত কাপড় আর আশ্রয় চাইবে, স্বামীকে স্নেহযত্ন খাতির করবে—এর মধ্যে অনিয়মটা কি?

গলদ কি তারই মূল্যবোধে?

নলিনী তাকে উপলক্ষ করে তার মন সকলকে আজকাল খোঁচায় বলে, চারিদিকের দুরবস্থার জন্য দায়ী করে বলে, সংসারের চলতি নিয়মে নলিনীর চলাটাও একটা খুঁত হয়ে উঠেছে তার কাছে?

আ মরণ!

চাপা মেয়েলি গলা তীব্র ভর্ৎসনায় ফোঁস করে উঠে কণাদকে চমকে দেয়। তার মুখ লাল হয়ে যায়।

ভাবনায় তলিয়ে গিয়ে সে শুধু ভুলে যায়নি যে এটা বাজার, সেই সস্তা বস্তির বেশ্যাটির দিকে যে হাঁ করে বিহ্বলের মতো চেয়ে আছে এটাও খেয়াল ছিল না!

ছোট বকুলপুরের যাত্রী

গাড়িটা ঘণ্টাখানেক লেট করেছে।

ঠিক সময়ে পৌঁছলেও অবশ্য প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়, স্টেশনের তেলের বাতিগুলি তার আগেই জ্বালানো হয়। প্ল্যাটফর্মে অল্প কয়েকজন মাত্র যাত্রী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিল, শঙ্কিত ও স্তব্ধভাবে। আরও গভীর রাত্রের ট্রেনের জন্যও এ স্টেশনে সাধারণত আরও অনেক বেশী যাত্রী জড়ো হতে দেখা যায়। আজ একদল সিপাই প্ল্যাটফর্মে যাত্রীর অভাব পূর্ণ করেছে।

গাড়ি দাঁড়ায় মিনিট দেড়েক। এই সময়টুকুর ব্যস্ততা এবং কলরবও আজ স্টেশনে ঝিমানো মনে হয়, তারপর গাড়ি ছেড়ে যাবার দু-চার মিনিটের মধ্যেই অদ্ভুতভাবে স্টেশন এলাকা যাত্রীশূন্য হয়ে ছমছমিয়ে আসে। গাড়ি থেকে যারা নেমেছে তারা কোনদিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি গেটে টিকিট দিয়ে পথে নেমে যায়—এত লোকে যে টিকিট কাটে এবং সদর গেটে টিকিট দাখিল করে স্টেশন ছাড়ে এও এক অসাধারণ ব্যাপার বটে। চারিদিকে এক নজর তাকালেই টের পাওয়া যায় যে বাড়ির টান আজ সকলের হঠাৎ বেড়ে যায়নি, স্টেশন এলাকা ছেড়ে তফাত হবার তাগিদেই যাত্রীদের এত তাড়া।

পথে নেমেও কেউ দাঁড়ায় না। স্টেশনের লাগাও তে-রাস্তার মোড়, দু-তিনটি দোকানে মাত্র আলো জ্বলছে, বাকিগুলি বন্ধ। চায়ের দোকানের আলোটা সবচেয়ে উজ্জ্বল, সাধারণত এসময় দোকানটা লোকে প্রায় ভরা থাকে, আজ একরকম শূন্য পড়ে আছে। প্রকাণ্ড বাঁধানো বটগাছের তলায় দুজন চাষী কিছু তরিতরকারি সাজিয়ে বসে আছে, কিন্তু ঢিণ্ডি বেগুনের দরটা জিজ্ঞাসা করার কৌতূহলও যেন আজ কারো নেই।

স্টেশনের বাতির মতোই মিটমিট করে দিবাকরের চোখ। সে এদিক ওদিক তাকায়। চোখের পলকে পলকে তার জানা চেনা স্টেশনটি যেভাবে যাত্রীশূন্য হয়ে যেতে থাকে সেটা যেন ম্যাজিকের মতো ঠেকে তার কাছে। একদল সশস্ত্র সিপাইয়ের দখলে স্টেশনের চেহারা যে অভিনব হয়েছে এটা তার খাপছাড়া লাগে না। এ দৃশ্য দেখা অভ্যাস আছে। কাল এখানে যে ব্যাপার ঘটে গেছে তার বিবরণও সে গাড়িতে শুনেছে। এরকম দৃশ্যই সে প্রত্যাশা করছিল। 'দেখলি ব্যাপার?'

বাচ্চাটাকে বুকে চেপে আন্না চাপা গলায় বলে, 'দেখব আবার কি? হাঙ্গামা

হয়েছে, পাহারা বসেছে, না তো কি থেটার হবে? হাবার মতো দাঁড়িয়ে থেকোনি, যাই চলো।'

বিড়ি সিগারেট টানতে টানতে ক-জন বাবুমতো লোক একান্ত বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যাত্রীদের লক্ষ্য করছিল, নামধামও জিজ্ঞাসা করছিল দু-একজনকে। স্টেশন যাত্রীশূন্য হয়ে আসায় এতক্ষণে দিবাকরদের দিকে তাদের নজর পড়ে। মাঝবয়সী বেঁটে লোকটি মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'চাষাভুষো বাজে লোক, যেতে দাও।'

তার খদ্দর পরা ছোকরাবয়সী সঙ্গীটি পান-রাঙা মুখে আরও দুটো পান পুরে চিবুতে চিবুতে আন্নার দিকে চেয়ে থাকে, আচমকা প্যাচ করে পিক ফেলে হাত উঁচিয়ে আঙুল ঠেরে দিবাকরকে কাছে ডাকে, 'এই! শোন!'

দিবাকর অবশ্য দেখেও দ্যাখে না, শুনেও শোনে না। পুটুলিটা বগলে চেপে দড়ি বাঁধা হাঁড়িটা ঝুলিয়ে আন্নাকে সঙ্গে নিয়ে গুটি গুটি এগোতে থাকে।

ওরা জন তিনেক তখন সামনে এসে দাঁড়ায়।

'টিকিট আছে?'

'আছে।'

শার্টের বুক পকেট থেকে দিবাকর দু-খানা টিকিট বার করে দেখায়। 'কোথা যাবে?'

'আজ্ঞে ছোটবকুলপুর যাব।'

শুনে তারা যেন একটু চমকে যায়। পানখোর ছোকরা আবার প্যাচ করে খানিকটা পিক ফেলে। গতকালের হাঙ্গামায় প্ল্যাটফর্মের লাল কাঁকরে খানিক রক্তপাত ঘটেছিল, ছোঁড়া যেন পানের পিক দিয়েই তার জের টেনে প্ল্যাটফর্মটা রাঙা করে দিতে চায়। দিবাকরও পান ভালবাসে, রাস্তায় পুরো চার পয়সার তৈরি পান কিনেছে। কাগজের ঠোঙাটা বার করে সেও একটা পান মুখে পুরে দেয়। লোকগুলির এত কাছে দাঁড়ানোর জন্যই বোধ হয় পানটা তার একটু তিতো লাগে। ওদের মাথার পিছনে দূরে কারখানাটার উঁচুতে টাঙানো নিঃসঙ্গ আলোটা তার চোখে পড়ছিল, অন্ধকার আকাশে যেন বিনা অবলম্বনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ওই কারখানার ধর্মঘট নিয়ে কাল স্টেশনের হাঙ্গামা। তিনজন নেতাকে ধরে ট্রেনে চালান দেবার সময় কয়েক শ' মজুর তাদের ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তখন গুলি চলে, রক্তপাত ঘটে। গাড়িতে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনার পর থেকে দিবাকরের আধা-চাষী আধা-মজুর প্রাণটা বড়ই বিগড়ে আছে।

বেঁটে লোকটি জিজ্ঞাসা করে, 'রাত করে ছোটবকুলপুর যাবে? সেখানকার খবর জানো সব?'

দিবাকর নির্লিপ্তভাবে বলে, 'খবর জেনেই এয়েছি বাবু। আত্মীয়-কুটুম আছে সেথা, খবর নিতে এয়েছি তারা বেঁচে আছে না স্বাধীন হয়েছে।'

বেঁটে বলে, 'ও বাবা তোমার দেখি চাটং চাটং কথা?'

'না বাবু, গরিব মানুষ কথা কোথায় পাব?'

তেমাথার পাশে দুটি খোলা গরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, কাছে মাটিতে শুয়ে জাবর কাটছে একজোড়া শীর্ণ ও শান্ত বলদ। স্টেশনের সামনে সাধারণত দু-তিনটি ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, ঘোড়া যত প্রাচীন, গাড়িগুলি ততোধিক। বেগার খাটার ভয়ে গরিব গাড়োয়ানেরা আজ গাড়িই বার করেনি। গাড়ি চেপে শ্বশুরবাড়ি যাবার মতো বড়লোক দিবাকর কোনদিন ছিল না, আজ কিন্তু সে ঘোড়ার গাড়ি চেপেই যেত—আন্নার রূপার গহনা বাঁধা দিয়ে এই উদ্দেশ্যেই সে টাকা যোগাড় করে এনেছে। ছোটবকুলপুর পোঁছতে রাত হবে এটা জেনেই তারা রওনা দিয়েছে, তবে রাত করে মেয়েছেলে আর শিশু নিয়ে তিন মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে ঘোড়ার গাড়ির আশাটা ছিল। এখন ভরসা গরুর গাড়ি।

'গাড়োয়ান কই হে!' দিবাকর ডাকে।

দুই গাড়ির দুজন মালিকেরই আবির্ভাব ঘটে। আবছা আলোয় মনে হয় একজন যেন পুরানো বটগাছটা এবং অন্যজন দোকান ঘরের বেড়া ভেদ করে কাছে এসে দাঁড়াল।

তাদের তাড়া নেই, গরুর গাড়িতে কম্পিটিশনও নেই। ধীরেসুস্থে তারা জানতে চায় দিবাকরেরা কোথায় যাবে।

'ছোটবকুলপুর।'

শুনে তারা দুজনেই ঘাড় নাড়ে। 'ওরে বাবা, রাত্রিবেলা ছোটবকুলপুর কে যাবে! সেখানে সৈন্যপুলিস গ্রাম ঘিরে আছে, রীতিমতো লড়াই চলছে।'

চারজনেই তারা সম্মুখে পথটার দিকে তাকায়। ছোটবকুলপুরের এ রাস্তা কিছুদূর গিয়ে বাঁক নিয়েছে, কিন্তু সে পর্যন্ত এখন নজর চলে না—মনে হয় বিপজ্জনক অন্ধকারেই বুঝি পথটা হারিয়ে গেছে। বাঁ হাতে কোলের বাচ্চাকে সামলে ডান হাতে আন্না দিবাকরকে এক পা পিছু ঠেলে দেয়, নিজে এগিয়ে দায়িত্ব নেয়।

'ওখান তক্ নাই বা গেলে বাবা? যদ্দুর যেতে চাও নিয়ে চলো, বাকি রাস্তা মোরা হেঁটে যাব। ভাড়া ঠিকমতো পাবে।'

রাম বলে, 'রাতের বেলা কে অত হাঙ্গামা করে, না কি বল ঘোষের পো?'

'ওমা, তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাচ্ছ!' আন্না মিষ্টি সুরে বলে, 'বাচ্চা কোলে মেয়েছেলে যাব, তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাচ্ছ।'

রাম চুপ করে থাকে। তার বয়স বেশী, সাহস কম। গগন ঘোষ বলে, 'কমলতলা তক যেতে পারি।'

তাই হোক। কমলতলা সীমা পেরিয়েও যদি নামিয়ে দেয় তবু প্রায় আধমাইল হাঁটতে হবে। পুরো দেড়ক্রোশ হাঁটার চেয়ে সে অনেক ভাল। একটা গাড়িতে বলদ জুড়লে আন্না উঠে বসে, এ কসরত তার অভ্যাস আছে। গগনের গাড়িটা নড়বড়ে, ক্রমাগত লেজ মলে তাড়া না দিলে শীর্ণ বুড়ো বলদ এক পা এগোতে চায় না। আন্না আগ্রহের সঙ্গে ছোটবকুলপুরের খবর জিজ্ঞাসা করে, তবে গাঁয়ে ঘরে পোঁছবার আগে বাপ-ভায়ের কুশল জানার আশা সে করে না। গ্রামের সাধারণ অবস্থার ঘনিষ্ঠতর বিবরণ, অনেক নতুন খবর গগনের কাছে জানা যায়। দূর থেকে তারা

শুনেছিল যে ছোটবকুলপুরের অবস্থা অতি শোচনীয়, প্রচণ্ড আঘাতে গাঁয়ের গেরস্থ জীবন তছনছ চুরমার হয়ে গেছে। গগনের কাছে শোনা যায়, ব্যাপার ঠিক তা নয়। গোড়ায় গাঁয়ের মধ্যে খুব খানিকটা অত্যাচার হয়েছিল, কিন্তু তারপর গাঁয়ের লোক এমন আঁটসাঁট বেঁধে তৈরি হয়ে জেঁকে বসেছে যে চৌধুরী বা ঘোষদের কোন লোক অন্তত দু ডজন রাইফেল ছাড়া গাঁয়ের ভেতরে ঢুকতেই সাহস পায় না। একবার মুখ খুললে গগনকে থামানো দায়। গরুর লেজ মলে মলে মুখে গরু তাড়ানোর অদ্ভুত আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে সে চারিদিকের অবস্থা বর্ণনা করে যায়, তার মতে কলিযুগ সত্যই এবার শেষ হতে চলেছে। সমস্ত লক্ষণ থেকে তাই মনে হয়। নইলে রাজায় প্রজায় এমন যুদ্ধ বাধে?

'মোরা কলির পাপী লোক, এ লড়ায়ে মোরা মরব। মোদের ছেলে-পুলেরা ফের সত্যযুগ করবে!'

অন্ধকার নিস্তব্ধ পথে বেশ সোরগোল তুলেই গাড়ি চলে। রাস্তার ধারের কোন কোন ঘরের বেদখল দাওয়া থেকে মাঝে মাঝে টর্চের আলো এসে পড়ে গাড়িতে, গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন আসেঃ 'কে যায়? কোথা যাবে?'

গগন জবাব দেয়ঃ 'ইস্টিশনের ট্রেইনের মেয়েছেলে! কমলতলা যাবে।' গাড়ি গাছপালা বাড়িঘরের আড়ালে যাওয়া পর্যন্ত টর্চের আলো আন্নার গায়ে সাঁটা থাকে, ট্রেনের প্যাসেঞ্জার নিরীহ নির্দোষ মেয়েছেলেই যে যাচ্ছে গাড়িটাতে সেটা যেন যতক্ষণ সম্ভব প্রত্যক্ষ করা চাই।

এ অঞ্চলে ঘন বসতি, গায়ে গায়ে লাগানো বড় বড় গ্রাম। তবু এখন সন্ধ্যারাত্রেই রাস্তায় প্রায় লোক চলাচল নেই। গেঁয়ো লোকের পথ চলাও খাপছাড়া রহস্যময় হয়ে উঠেছে। এই পথ ধরেই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে লোকে পাড়ি দেয়, আজ যেন চারিদিকে সকলেরই দীর্ঘ পথ হাঁটার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। রাস্তার পাশ থেকে আচমকা হয়তো একজন রাস্তায় উঠে আসে, জোরে, জোরে পা ফেলে খানিকটা এগোতে না এগোতেই আবার রাস্তার ধারের অন্ধকারেই মিশিয়ে যায়। মাত্র দুটি একটি লোকের এরকম টুকটাক খুচখাচ খুচরো চলাফেরার প্রয়োজন নির্জনতা ও স্তব্ধতাকে আরও বেশী অস্বাভাবিক করে তোলে।

কদমতলায় মস্ত ছাউনি পড়েছে। চোখ তুলে সেদিকে চেয়ে গগন মাথা চুলকায়। 'যাব নাকি এগিয়ে ছোটবকুলপুর তক্?'—গগন অনুমতি চাওয়ার সুরে বলে, দিবাকরেরাই যেন তাকে যেতে বারণ করেছে! 'চলো যাই মেয়া, তোমায় নিয়ে যাই। মাঝ রাস্তায় কেমন করে নামিয়ে দি বলো, আঁ?'

আন্না খুশী হয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, 'ভগবান মুখপোড়া একচোখা কানা, নইলে তোমার নতুন গাড়ি হত বাবা, জোয়ান বলদ হত!'

ছোটবকুলপুরের প্রান্ত ছুঁতে ছুঁতে একেবারে তিন তিনটে টর্চের আলো গরুর গাড়িতে এসে পড়ে। কিছু হাঁক ডাক শোনা যায়। বেশ বোঝা যায় গাঁয়ে ঢুকবার মুখে যারা পাহারা দিতে গেড়ে বসেছে বিদ্রোহী গ্রামটিকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে, অসময়ে গগনের গরুর গাড়ির আবির্ভাবে তাদের মধ্যে খানিকটা সানন্দ

উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। গাড়িতে শুধু দুটি বলদ, একটি গাড়োয়ান, একজন পুরুষ ও একটি মেয়েমানুষ এবং একটি বাচ্চা—সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নেই।

দেখতে দেখতে সাত আটজন গাড়িটা ঘিরে ফেলে। টুপিটা ঠিক করে বসাতে বসাতে মাঝবয়সী মোটা লোকটি, সেই বোধ হয় বেসরকারী দলপতি, গম্ভীর গলায় বলে, 'কোথা থেকে আসছ?'

গগন বলে, 'ইস্টিশনের টেরেনগাড়ির প্যাসিঞ্জার আজ্ঞা।'

'শাট্ আপ! তোকে কে জিজ্ঞেস করেছে? তোমার নাম?'

'মোর নাম দিবাকর দাস।'

'বাপের নাম? কোথায় থাক? কি কর? এদিকে এসেছ কেন?'

'বাপের নাম মনোহর দাস। তেনা স্বগগে গেছেন—তিপ্পান্নের মন্বন্তরে। রোগ ব্যারাম কিছু নয়, উপোস দিয়ে মিত্যু। হাওড়ায় থাকি, ঘনশ্যাম-বেটেনট কারখানায় মজুর খাটি। ইদিকে হাঙ্গামা শুনলাম, বৌ কাঁদতে লাগল যে তার বাপ ভাই মরেছে, না বেঁচে রয়েছে। তা ভাবলাম কি যে কারখানার ধরমঘট দু-দশ দিনে মেটার নয়, যা দিনকাল। বৌকে নিয়ে দেখে আসি শ্বশুরবাড়ির ব্যাপার কি।' সবিনয় স্পষ্ট সরল ভাষায় দিবাকর তাদের আগমনের কারণ ও বিবরণ দাখিল করে। কাঁদাকাটা করে না বলে, ভয় দিশেহারা হয়ে পায়ের তলায় আছড়ে আছড়ে পড়ে না বলে বোধ হয় তার ব্যাখ্যা এদের পছন্দ হয় না।

'পুঁটলিতে কি আছে? বোমা বন্দুক?'

'আজ্ঞে কাঁথা কাপড়।'

'তুমি যে সত্যি দিবাকর দাস, মজুর খাটো, শ্বশুরবাড়ি আসছ, কোন বদ মতলব নেই, তার প্রমাণ দিতে পার?'

'কি প্রমাণ দিব বলেন? সাক্ষী প্রমাণ তো সাথে আনিনি।'

ষোল সতের বছরের স্বেচ্ছাসেবক ফর্সা ছেলেটি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, দীর্ঘ থলথলে চেহারার প্রৌঢ়বয়সী লোকটির ধমকে বিষম খেয়ে থেমে যায়, কাসতে কাসতে বেদম হয়ে পড়ে।

আন্না বলে, 'গাঁয়ের চাষা পাড়ার দশটা লোক ডেকে পাঠাও না বাবুরা, মোকে দু-চারজন চিনবেই, গাঁয়ের মেয়া আমি।'

'সে তো চিনবে, না চিনলেও চিনবে। যাদের সঙ্গে যোগসাজস তাঁদের যদি না চিনবে তো কাদের চিনবে?'

আন্না দিবাকরের কানে কানে বলে, 'গাঁয়ের লোক ডাকতে ডরাচ্ছে, জানো?'

দীর্ঘ থলথলে লোকটি আঙুল উঁচিয়ে বলে, 'এই? কানে কানে কী কথা হচ্ছে? চুপি চুপি সলাপরামর্শ চলবে না, খপর্দার!'

'গাঁয়ে যাওয়া কি বারণ বাবু? একশো চুয়াল্লিশ রটিয়েছো?' দিবাকর প্রশ্ন করে।

কদমছাঁটা চুল লম্বাটে মাথা পাঞ্জাবি গায়ে রোগাটে চেহারার ছোঁড়াটা বলে, 'বারণ কেন, বারণ নেই। তোমরা কে, কি মতলবে এসেছ জানা গেলেই যেতে দেওয়া হবে।'

'ওসব যাতে জানা যায় তার একটা বিহিত কর বাবুরা ?'

'চোপ, তামাসা হচ্ছে, না ?'

ধমকানির চোটে দিবাকরেরা চুপ হয়ে যায়, বাচ্চাটা ককিয়ে কেঁদে উঠে প্রতিবাদ জানায়। ওদের দিকে পিছন ফিরে বসে ছেলেকে শান্ত করতে করতে আন্না তাদের মন্তব্য ও পরামর্শ শোনে। আচমকা গরুর গাড়ি চেপে হাজির হয়ে তারা যে গুরুতর ও জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে মানুষগুলি রীতিমতো বিব্রত ও বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সঙ্গের জিনিস, বেশভূষা, চেহারা দেখে আর কথাবার্তা শুনে সত্যি সত্যি টের পাবার জো নেই যে এরা সত্যিকারের নিরীহ সাধারণ, গোবেচারী চাষামজুর, মাগভাতার ছাড়া অন্য কিছু নয়, কিন্তু সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে দারুণ সন্দেহের কারণ। যে তান্ডব চলেছে ছোটবকুলপুরে কদিন ধরে, তাতে সত্যিকারের কোন ভীরু মুখ্য ছোটলোক মাগছেলে সাথে নিয়ে সাধ করে কখনো তার মধ্যে আসতে চায় ? তাও আবার হাঙ্গামার খবর জানবার পরে! বাজে লোকের এ সাহস হবে কোত্থেকে ? তার চেয়েও বড় কথা, সন্দেহের কথা, চারিদিকে এত রাইফেল বন্দুকের সমারোহ দেখেও ওরা মোটে ভড়কে যায়নি, দিব্যি নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব।

একজন নীচু গলায় বলে, 'নিশ্চয় কোন ডেঞ্জারাস লোক ছদ্মবেশে এসেছে।' আর একজন বলে, 'সার্চ করা যাক না ?'

দীর্ঘ থলথলে লোকটি হুকুম দেয়, 'এই! জিনিসপত্র নিয়ে নামো।' তার মুখের কথা খসতে না খসতে দুজনে দিবাকরকে ধরে টেনে নামিয়ে দেয়। উৎসাহ অথবা উত্তেজনার আতিশয্যে একজনের হাত থেকে পড়ে গিয়ে মুখবাঁধা মাটির হাঁড়িটা ভেঙে যায়, ছড়িয়ে পড়ে আধ হাঁড়ি জল আর তাতে কিলবিল করে গোটা ছয়েক শিং মাছ! দিবাকর গোসা করে বলে, 'দিলে তো বাবুরা, গরিবের পথ্যির দফা মেরে দিলে তো ? রুগী বৌটা এখন খাবে কি!'

'বলি ওহে দিবাকর দাস', একজন গম্ভীর মুখে বলে, 'কারখানায় খেটে খাও বললে না ? কুলি মজুরের বৌরা কবে থেকে শিং মাছের ঝোল খাচ্ছে হে ? পাঁচ ছ-টাকা শিং মাছের সের।'

'শিঙিমাছ খাওয়া মোদের বারণ আছে নাকি বাবু ?'

এ ফোড়নের অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জন করে ওঠে, 'শাট্ আপ বেয়াদপ!'

পোঁটলাটা খুলে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়, তাতে একটা অঘটন ঘটে যায়। আন্নার বাচ্চাটা রাস্তায় দু-একবার পায়খানা করেছে, নোংরা ন্যাকড়া দলা পাকিয়ে আন্না পুঁটুলির মধ্যে রেখেছিল। ঘাঁটতে যাওয়ার অনুসন্ধানীর হাতে ময়লা লেগে যায়। গন্ধে ও স্পর্শে রাগ চড়ে যাওয়ায় বেহিসাবীর মতো পুঁটলিটাতে সে বল শুট করার মতো লাথি মেরে বসে। ফলে কাদার মতো তরল পদার্থ খানিকটা তার পায়েও লাগে, ছিটকে বন্দুকের গায়েও একটু আধটু লেগে যায়। গাড়িতে বিছানো বিচালি তুলে, ছেঁড়া বস্তাটার ভাঁজ খুলে খোঁজার পর গগন আর দিবাকরের গা খোঁজা হয়। দিবাকরের শার্টের পকেট থেকে বার হয় পানের মোড়কটা।

'বাঃ, সাজা পান! দে তো একটা।'

তিনটি পান অবশিষ্ট ছিল, তিনজনের মুখে যায়। পান চিবোতে চিবোতে একজন লণ্ঠনের আলোয় পান মোড়া ছাপান কাগজটার দিকে এক নজর তাকিয়েই যেন বৈদ্যুতিক শক্ খেয়ে চমকে ওঠে। কাগজটা ভাল করে মেলে ধরে সে বিস্ফারিত চোখে বড় হরফের হেডলাইনটার দিকে চেয়ে থাকে।—"ছোট বকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি।"

নিগূঢ় আবিষ্কারের উত্তেজনায় কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'পাওয়া গেছে! ইশ্‌তেহার পাওয়া গেছে!'

ইশ্‌তেহার? তাই বটে। বিপজ্জনক ইশ্‌তেহার! যদিও দুমড়ে মুচড়ে চুন আর পানের রসে মাখামাখি হয়ে গেছে, তবু চেষ্টা করে আগাগোড়া পড়া যায়। পড়তে পড়তে চোখও কপালে উঠে যায়।

তবু তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। আর শূন্যে হাতড়াতে হবে না, মনগড়া সন্দেহ সংশয়ে জর্জরিত হতে হবে না, একেবারে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে হাতের মুঠোয়। এবার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবে।

'এ ইশ্‌তেহার পেলে কোথা?'

প্রশ্নটার যেন স্বাদ আছে এমনিভাবে আরামে জিভে জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করা হয়।

'ইশ্‌তেহার? ইশ্‌তেহারের তো কিছু জানি না! চার পয়সার পান কিনলাম, পানওয়ালা ও কাগজটাতে জড়িয়ে দিল।'

'পানওয়ালা জড়িয়ে দিল না তুমি ভেবে চিন্তে পান কিনে ইশ্‌তেহারটাতে জড়িয়ে নিলে?'

'কেন? তা কেন করতে যাব?'

'আর ঢং কোরো না। এবার আসল নাম বল দিকি।'

দিবাকর আর আন্না পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

বাগদীপাড়া দিয়ে

ভর দুপুরে দুলে বাগ্‌দী নায়েবমশাই শ্রীমন্ত সরকারের ঘরের দাওয়ায় সাগ্রহ প্রতীক্ষায় বসে আছে। ছেলের মতো যত্নে পাশে তার পাকা বাঁশের লাঠিটি শোয়ানো। অনেক তেল আর অনেক স্নেহে পাকানো সেই লাঠি, কত্তাবাবুর হুকুমে বিদ্রোহী প্রজার মাথা ফাটিয়ে রক্ত মেখে পোক্তও যে হয়নি এমন নয়।

লাঠিটা হাতে নিয়ে দুলে সেই সকালবেলা বাগ্‌দীপাড়া থেকে বেরিয়েছিল। কাছারিবাড়ি গিয়েছিল কত্তাবাবুকেই তার দুঃখ আর নালিশ জানাতে। জমিদার অনুকূল তার নালিশ নিবেদন কানেও তোলেনি। তার গুরুতর কিছু বলার আছে টের পেয়েই হুকুম দিয়েছিলঃ 'শ্রীমন্তর কাছে যা দুলে। যা বলতে চাস শ্রীমন্তকে বল। পরে আমি শুনব'খন।'

শ্রীমন্ত বলেছিল, 'কিরে দুলে! বুড়ো বয়সে আবার কোন ছুঁড়ীর সাথে 'অং' (রং) করে ফ্যাসাদে পড়েছিস নাকি? এখন বাবু আমি বড় ব্যস্ত। আমার বাড়ি যা, পুবের বেড়াটা ভেঙে গেছে, সেরে দিবি যা ততক্ষণ। কাছারির কাজ সেরে আসছি, তোর নালিশ শুনব।' পুবে হেলানো গাছের মাথা ঘেঁষা সূর্য তার মাথার উপরে আকাশের মাঝখানে চড়া পর্যন্ত দুলে নায়েববাবুর বাড়িতে বেগার খেটেছে, বাগানের বেড়া সারিয়েছে। অন্য বাড়িতে চুক্তি করে নিলে এ কাজের জন্য সে কম করে আট আনা মজুরি পেত। কিন্তু বেলগাছে দেবতা থাকেন দুলের, তিনি সর্বশক্তিমান ভগবান এবং সেইজন্যই দুলে বাগ্‌দীপাড়ায় প্রধান। ওই বেলগাছের দেবতা বা দৈত্যকে সে মানে বলেই জমিদার আর নায়েব গোমস্তা তাকে পায়ের গোলাম হতে দিয়েছে, বাগ্‌দীপাড়ায় প্রধান করেছে। বেগার তাকে খাটতেই হবে। শুধু তাকে কেন, বাগ্‌দীপাড়ার মেয়েমদ্দ কারো বেগার না খেটে রেহাই নেই।

অনেক বেলায় বাড়ি ফিরে শ্রীমন্ত বলেছিল, 'একটু বোস বাবা। চট করে নেয়ে খেয়েনি, তারপর তোর নালিশ শুনব। তোদের ভাল করতে করতে হারামজাদা আমি যে মারা গেলাম।'

দুলে সেই থেকে বসে আছে। মাঝদিনের মাথার উপরের সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিমে ঢলতে আরম্ভ করেছে। তবু নীরবে বিনা প্রতিবাদে অপেক্ষা না করে তার উপায় কি। গ্রামের বাইরে যেখানে মেয়েদের পায়ের আধখানা মলের মতো বাঁক নিয়েছে নদী সেইখানে ঘন বাঁশঝাড় জলাজঙ্গল ভরা জমিতে বাগ্‌দীপাড়া, সে

পাড়ার সে প্রধান! সেটা তো বেলগাছের দেবতা জমিদার আর নায়েববাবুর দয়াতেই। তার রাজ্যে, ওই বাগ্‌দীপাড়ায়, আজ যখন বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তার যখন খটকা লেগেছে ব্রাহ্মণ জমিদার নায়েব ভগবান ইংরেজরাজ তাকে আর কতদিন প্রধান করে রাখতে পারবে, তখন এভাবে শ্রীমন্তর বাড়ি এসে বেগার খেটে ধন্না না দিয়ে তার উপায় কি। তার রাজ্য যে যায় যায়।

খাটুনি, খিদে আর মনের কষ্টে তার মাথা ঘুরছে। আধেক দিন প্রতীক্ষা করাল, একবেলার বেশী বেগার খাটাল, এক মুঠো গুড়মুড়ি পর্যন্ত জল খেতে দেয়নি! এত বেলায় এসে তাকে বসিয়ে রেখে নিজে আরামে নাইতে খেতে গেল। তা হবে বৈকি, বেলগাছের দেবতার মতোই এরা নিষ্ঠুর। আহা, নিষ্ঠুর বলে অত্যাচারী বলেই তো এরা দেবতা!

ভুঁড়িতে আলগা করে লুঙ্গি আটকে হুঁকো টানতে টানতে শ্রীমন্ত এসে জল চৌকিটাতে ধপাস্ করে বসে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'চটপট বল দিকি কি ব্যাপার। প্যানাস্‌নি, এক কথায় বল।'

'তোদের নালিশ শুনতে শুনতে প্রাণ বেরিয়ে গেল, হারামজাদা বজ্জাতের দল। ঘুম পেয়েছে বাবু আমার।'

ঘরের ভেতর থেকে মেয়েলী কণ্ঠে ঘুমপাড়ানী ছড়া শোনে—

'আয়রে ঘুম যায় রে ঘুম
বাগ্‌দীপাড়া দিয়ে,
বাগ্‌দীদের ছেলে ঘুমোল জাল মুড়ি দিয়ে—'

মাথায় ঝাঁকি দিয়ে দুলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। বলে, 'তবে তুমি ঘুমোবে যাও। নালিশ শুনে কাজ নেই।'

শোয়ানো লাঠি হাতে তুলে দুলে উঠতে যাবে, ব্যাপার বুঝে সচেতন হয়ে শ্রীমন্ত হঠাৎ দারুণ আতঙ্কে বলে বসে, 'রাগিস কেন? তুই আর আমি কি তফাত? তুই আমার পুত্রতুল্য! আমি হলাম তোর বাপ। বাপের পরে কি গোসা করে রে ব্যাটা? কি বলছিস বল।'

'বলব কি?' দারুণ অভিমানে লাঠি আবার শুইয়ে রেখে হাত জোড় করে দুলে ব'ল, 'একদল বদবেজাত যে বাগ্‌দীপাড়া নষ্টাৎ করে দিচ্ছে সেদিকে তুমরা গা করবে না? কারখানায় খাটতে যায় সব্বোনেশে গুনো, বাগ্‌দীসমাজ ছারখারে দিলে। কি বলে শুনবে?'

'বল না, শুনি।'

'বলে, মোরাও মানুষ! রাজা মানুষ, দেবতা মানুষ, বাবুলোক মানুষ, মোরাও মানুষ! মোরা ছোট কিসে?'

'বলে তো হয়েছে কি?'

'হয়েছে কি? ঠাকুরের থানের বাঁধ কাটতে চায়, এই হয়েছে!'

ঠাকুরের থানের এই অপমানের কথা উচ্চারণ করতে হল বলেই নিজের দু-কান মলে দুলে শিউরে ওঠে।

'বলিস কিরে! কবে কাটবে?'

'অনেকে গ্‌ইগাই করেছে, তাইতে ভরসা পাচ্ছে না, নইলে কবে কেটে দিত। তবে রাতদিন জপাচ্ছে, ইয়াকে উয়াকে রাজী করাচ্ছে। বেশীদিন আর সামলান যাবে মোর ভরসা নাই। তোমরা ইবারে বিহিত কর।'

বাগ্‌দীপাড়া জলার কাছে, প্রায় জলার মধ্যেই। প্রতি বছর বর্ষায় জলার জল পাড়ায় ওঠে, আবদ্ধ জল পচতে পচতে এক আঙুল দেড় আঙুল সরতে সরতে আরেক বর্ষার আগে শুধু কিছুদিনের জন্য খানিকটা সরে যায়। তফাতে নীচু, জমির স্বাভাবিক জলা, চারিদিকে জমি উঁচু, জলা ওখানে থাকবেই। পশ্চিমে জমি শুধু একটু কম উঁচু—আগে ওই দিকে জলার কিছু বাড়তি জল বেরিয়ে যেত, বর্ষায় জল পাড়া পর্যন্ত উঠত না। বহুকাল আগে, সে কতকাল কারো আজ স্মরণ নেই, এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী পশ্চিম দিকে এক জায়গায় হাত ত্রিশ লম্বা, দশ বারো হাত চওড়া এবং পাঁচ-ছ হাত উঁচু একটি বেদী বানায়, ইঁট আর মাটি দিয়ে! তার নাকি স্বপ্নাদেশ হয় যে বাগ্‌দী সমাজের চিরদিনের কল্যাণের জন্য ওখানে শিবাই ঠাকুরের বেদী স্থাপন করতে হবে। এবং এমনি আশ্চর্য ব্যাপার, স্বপ্নাদেশের খবর শোনামাত্র জমিদার স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে টাকা আর লোক দিয়ে তাড়াতাড়ি বেদীটা বানিয়ে দেয়। মহাসমারোহে বেদীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয়. বাগ্‌দীদের মধ্যে নেশা উত্তেজনা আর উল্লাসের সীমা পরিসীমা থাকে না। সেই থেকে ওই ঠাকুরের থান তাদের সমস্ত ধর্মকর্ম সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এবং সেই থেকে বর্ষাকালে জলা ভরে উঠবার পর বাড়তি জল ঠাকুরের থান ডিঙিয়ে চিরদিনের মতো বেরিয়ে যেতে না পেরে পাড়ার মধ্যে ঢুকে জমা হতে শুরু করেছে।

ঠাকুরের বেদী জল আটকানোয় জমিদারের কি লাভ হয়েছে সেটা প্রত্যক্ষ, সবাই জানে। তবে এসব ব্যাপার জেনেও না জানাই নিয়ম। বাগ্‌দীপাড়ার মঙ্গলের জন্যই খরচপত্র করে জমিদার ঠাকুরের থান বানিয়ে দিয়েছে এটা সত্য বলে মানাই নিয়ম।

শ্রীমন্তের কিঞ্চিৎ আগ্রহ জাগে, হাই তুলে বলে, 'কি বলে জপাচ্ছে? ঠাকুরের থান তো বেগার তেভাগা নয়?'

দুলে তার ঝাঁকড়া চুল পিছনে ঠেলে দেয়। চুলে তার কটা রং ধরেছে, বিশেষ পালপার্বনে কদাচিৎ একটু তেল পড়ে। চুলে অসংখ্য উকুনের বাসা, মাঝে মাঝে যখন সে পাগলের মতো মাথা চুলকায় তখন মনে হয় রাগে বুঝি নিজের চুল ছিঁড়ছে।

'শোন তবে কি বলে। পাপ কথা মুখে উচ্চারণ করতে মোর গা কাঁপে। বলে, মোরা খাটি খাই, ছোট কিসে, মোরা সজ্জাত হব। মোরা বজ্জাতি ধরম মানবো নাই।'

'সজ্জাত কি রে?'

'ঠাকুরমশাইরা তোমরা বাবুরা যে জাত, তার চেয়ে উঁচু জাত, ভাল জাত।'

'ও, সৎ জাত! উঁচু জাত!'

দুলে মাথা হেলিয়ে সায় দেয়—'হ্যাঁ, সজ্জাত। বলে বম্ভাণ্ড সংসার পাল্টে গেছে, বামুনের চেয়ে সেরা জাত এয়েছে পিথিমিতে, মজুরের জাত, খাটিয়ের জাত। যে খাটবে সে জাতের লোক, বাস্‌। আর সব বেজাত বজ্জাত। কেন? না, তারা চোর

ছ্যাঁচড়। কেন? না যারা খাটে তাদের অন্ন চুরি করে খায়। চোর-বেজাতের দেবতা ধরম মোরা মানি না, মোরা সজ্জাত!'

বলতে বলতে দুলে বাগ্‌দী কেঁদে ফেলে, 'কুলি খাটা ছোঁড়াছুঁড়ী মোর পাড়া সমাজ বেদখল করলে গো! তুমরা এর বিহিত কর!'

ভাত খেয়ে তামাক টানতে টানতে শ্রীমন্তের ঢুল আসছিল। দুলের বিবরণ শুনে বিশেষ সে বিচলিত হয় না। বাগ্‌দীপাড়ায় আবার বিদ্রোহ! যোয়ানদের মধ্যে কিছুটা বেয়াদপি বেড়েছে এই পর্যন্ত, দুটো গুঁতো খেলে ঢিট হয়ে যাবে। সমাজের মাতব্বর নিজে অনুগত থাকে, দশজনকে অনুগত রাখে। সেজন্য দুলের নালিশের প্রতিকারের ব্যবস্থা একটা করতে হবে। কিন্তু দশজনকে বশে রাখার যোগ্যতাও অবশ্য মাতব্বরের কিছুটা থাকা দরকার। মাতব্বরের এতটা নরম হলে কি চলে?'

শ্রীমন্ত ধমকে বলে, 'কাঁদিস না ব্যাটা, মেয়েছেলের মতো কাঁদতে লেগেছে! সাধে কি তোকে কেউ মানে না?'

দুলে ভাবাবেগ সামলে মাথা উঁচু করে গর্বের সঙ্গে বলে, 'তোমরা হলে মা-বাপ, তোমাদের ঠেঁয়ে কাঁদতে পারি। না তো দুলে বাগ্‌দী কেমন মরদ দশটা গাঁয়ের মানুষ জানে।'

শ্রীমন্ত একটা অবজ্ঞাসূচক আওয়াজ করে বলে, 'মরদ যদি তো ওদের ধরে ঠেঙিয়ে দিতে পারিস না ব্যাটা?'

'উই তো মোর পোড়া কপাল!' আবার, হাঁউমাউ করে ওঠে দুলে, 'তোমরা বুঝবেনি। ই যে সামাজিক অমান্যি গো, জেতের ব্যাপার ঠেঙাব কাকে?'

সামাজিক বৈঠক ডেকে বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করার চেষ্টা কি আর করেনি দুলে, কিন্তু কে মানছে বিচার, কে মাথা পেতে নিচ্ছে শাস্তি? যাদের জাতে ঠেলবে, একঘরে করবে, তারাই যে বর্জন করেছে যে-কজন দুলের পক্ষে আছে তাদের। খুঁটিতে বেঁধে যে ঠেঙাবে, মাথা মুড়োবে, ছ্যাঁকা দেবে, তার উপায় কোথায়? ওরাই যে উলটে তাদের পিটিয়ে দেবার মতো দলে ভারি। দুলে বরং জাত-ধর্ম ঠাকুর-দেবতা চিরকালের রীতি-নীতির কথা বুঝিয়ে বুঝিয়ে, কারণে অকারণে পচাই-খাওয়া সামাজিক পরব ফুর্তির ব্যবস্থা করে, তাতে মেয়ে-মদ্দের মেলামেশার নিয়মনীতি আরও শিথিল করে, কিছুটা প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রেখেছে। নইলে সব চুরমার হয়ে যেত এতদিনে। কিন্তু—'মোর আর খেমতা নাই, ইবারে তোমরা বিহিত কর!'

শ্রীমন্তের আবার ঢুল আসে। সে বলে, 'আচ্ছা, আচ্ছা। সে হবেখন। ভারি সব মস্ত লোক, তার আবার বিহিতের ভাবনা। কে কে পাণ্ডা হয়েছে নাম বল তো? বিশে? শিবু?...'

উপরে ভাদ্র শেষের মাথা ফাটা রোদ, তলায় বর্ষার পরিপূর্ণ জলা। পুকুর ভিজে মাটি থেকে গরম ভাব উঠছে। বাগ্‌দীপাড়ার দিকে চলতে চলতে হিংসার আনন্দে চোখে প্রায় ঝাপসা দেখতে থাকে দুলে। হোক বিহিত, চরম বিহিত হোক! তার প্রতিপত্তি তার অধিকার নষ্ট হবার বদলে বাগ্‌দীপাড়াটাই যদি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তাতেও দুলের আপত্তি নেই। তার সমস্ত দেবতা অপদেবতাদের কাছে

দুলে মাথা কপাল খুঁড়ে প্রার্থনা জানায়—সজাত যারা তার তারা শত্রু, তারা ধ্বংস হয়ে যাক, দেবতার রোষ পিতৃপুরুষের কোপ জমিদার পুলিসের ক্রোধ হয়ে এসে তাদের ধ্বংস করে দিক। মনে মনে দুলে অনেক কিছু মানত করে।

বাগ্‌দীপাড়ার জল কাদা শীতকালের আগে শুকোয় না, শুকোবার আগে পচে যায়। গ্রামের বাইরে নীচু জমিতে তাদের কুঁড়ে বাঁধবার ঠাঁই, সাধ করে কোন মানুষ যেখানে কখনো থাকে না। বহুকাল আগে বাগ্‌দীরা যখন রাজার হয়ে লড়াই করত তখন রাজা জমিদারের প্রজা ঠেঙানো লেঠেল-পুলিস আর বেগারদারিব বিনিময়ে সামান্য জমি পেয়েছিল, নামমাত্র একটা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। লাঠি মাঝে মাঝে তারা আজও ধরে, তবে পেশা হিসাবে তুচ্ছ হয়ে গেছে। জমির টুকরো নানাভাবে খসে গেছে তাদের দখল থেকে, বৃত্তির বদলে পূজাপার্বনে চিড়ে মণ্ডা সিধে পায় কিন্তু রীতি হিসাবে বেগার খাটা আজও ঠিক বজায় রয়ে গেছে। আর আছে তাদের কিছুটা দুর্ধর্ষ বন্য ও বোকা করে রাখার জন্য খাওয়া পরা চলাফেরা ধর্ম-কর্ম সমাজ গড়া ইত্যাদি ব্যাপারে যে সব বর্বর রীতিনীতি ব্যবস্থা চাপানো হয়েছিল তার অবশিষ্ট পরিশিষ্ট।

আছে মানে এই যে সেদিনও ছিল, যুদ্ধের বাস্তব ধাক্কায় এখন যায় যায় অবস্থা। কাছাকাছি যুদ্ধকালীন কারখানা বসায় ধাক্কাটা লেগেছে প্রচণ্ডভাবে, জীবিকার তাগিদে বুড়ো আর মাতব্বরের বাধানিষেধ অমান্য করে কারখানায় খাটতে গিয়ে অনেকে হয়ে এসেছে পুরানো অচল সমাজ-ভাঙা বোমা। নতুন আশা আর নতুন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেয়ে কত অল্পদিনে কী অদ্ভুতভাবে যে প্রাণবন্ত সচেতন হয়ে উঠেছে অন্ধকারেবদ্ধ পশুগুলি! তারা মাতিয়ে দিয়েছে বাগ্‌দীপাড়ার পচাই খাওয়া, মেয়ে-পুরুষে যথেচ্ছাচারী, ব্রাহ্মণের ছায়া ভীরু, অপদেবতার আতঙ্কে বিহ্বল, মারামারিতে পটু, ক্ষেতমজুর জেলে মাঝি চাটাই-বোনা ঘরামি-খাটা বাগ্‌দীদের। উঁচু তলার মানুষের আচার-নিয়মের বাঁধন থেকে মুক্তি ভোগ করার ফলে এতদিন যা ছিল তাদের বর্বরতার পাশবিক সাহস—রাজার জন্য লাঠি হাতে খুন করতে খুন হতে ভয় না পাওয়া—চেতনার ছোঁয়াচ লাগা মাত্র তা পরিণত হতে আরম্ভ করেছে তেজে। আজকেই এই তেজের প্রমাণ দুলে প্রত্যক্ষ করে। দুপুরে এই প্রচণ্ড রোদে শতাধিক বাগ্‌দী মেয়েপুরুষ কোদাল খন্তা নিয়ে ঠাকুরের থান খুঁড়ছে—এক্‌পাশে চার পাঁচ হাত চওড়া সুড়ঙ্গ কাটছে বেদীতে। এ কী দুঃস্বপ্ন দেখালে ঠাকুর? এ কী সর্বনাশ ঘটালে? বাগ্‌দী সমাজের বিদ্রোহ দমনের বিহিত করতে এক সকাল সে কত্তাবাড়ি আর নায়েববাবুর বাড়ি ধন্না দিয়েছে, তার মধ্যে জগৎ ওলটপালট হয়ে গেল? অপরাধ কি হয়েছে কোন? ঠাকুরের থানে ধন্না দিতে সে কসুর করেনি, হত্যা দিয়ে পড়ে থাকতে থাকতে তার যখন মনে হয়েছে ঠাকুর নিজে ফিস ফিস করে শিস্ দিয়ে আদেশ দিলেন কত্তাবাবুর কাছে বিহিতের ব্যবস্থা করতে যাওয়ার জন্য শুধু তখনই তো সে ওদিকে ধন্না দিতে গিয়েছে!

উন্মাদের মতো ছুটে গিয়ে দুলে চিৎকার করেঃ 'সব্বোনাশ হবে, সব্বোনাশ হবে! ঠাকুরের থানে কোদাল ছোঁয়ালি?'

শিবু কোদাল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'বাবুদের ঠাকুর ঘরে নালা থাকে। মোরা একটা জল নিকাশের নালা করে দিচ্ছি। ঠাকুরের থান তোমার ঠিক রইবে।'

'পালা! পালা সব! কত্তাবাবুকে খবর দিয়ে এয়েছি, পুলিস আসছে, মিলিটারি আসছে। পালা, পালা, সব পালা!'

সকলে এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। দুলালী কাঁচ বয়সে কারখানায় খাটতে গিয়ে জাত ধর্ম সব নষ্ট করেছে। খন্তা হাতে এগিয়ে গিয়ে সে বলে, 'আরে বুড়ো তোর মরণ নাই? খপর দিছিস্? বজ্জাতি করে খপর দিছিস?'

দুলালীর খন্তার ঘায়ে মাথা ফেটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুলে। রক্তে তার রুক্ষ কটা চুলে চাপ চাপ জটা বাঁধতে থাকে। ঠাকুরের থানে নালা কাটা হলে বাড়তি বদ জলের স্রোত প্রবল বেগে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলে সকলে ধরাধরি করে দুলেকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে দেয়।

মেজাজ

চা আর ডিম ভাজা এসেছিল দুজনের জন্য, মনোরঞ্জন নিঃশব্দে দুটি প্লেটের ডিম ভাজাই নিজের মুখে পুরে দিতে থাকে। এককালে সে দারুণ কংগ্রেসী ছিল, আজকাল একেবারে চাষাভুষো বনে গেছে। অনেক দিন পরে তাকে দেখে বড় আনন্দ হচ্ছিল। ভাষাহীন খিদে দিয়ে এত সহজে সে-ই শুধু চোখের পলকে আত্মীয়তা ঝালিয়ে নিতে পারে। চাষাভুষো বনার কারণও বোধ হয় তাই।

ডিম শেষ করে সে বলে, 'তোমার তাকানি দেখে ভৈরবকে মনে পড়ছে। সেও এমনিভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে মানুষকে বিব্রত করে।'

'তোমাকে মোটেই বিব্রত বোধ হচ্ছে না। কিন্তু ভৈরব কে?'

'লক্ষ্মীপুরের একজন চাষী। তার মেজাজের অদ্ভুত গল্প শুনলে--'

'গরিব চাষী?'

'দেড় দু-বিঘে জমি হয়তো আছে। তাছাড়া ভাগে চাষ করে।'

'গল্পটা বলার আগে তবে একটা সংশয় মিটিয়ে দাও। মানুষটা চাষী, তাতে গরিব, তার মেজাজ হয় কিসে? জমি নেই, ভাত কাপড় নেই, আরামবিরাম স্বাস্থ্য নেই, দেশের মালিক সরকারের কাছে দূরে থাক গাঁয়ের মালিক জমিদারের বাজার সরকারের কাছে পর্যন্ত মানুষ বলে গণ্য হবার যোগ্যতা নেই, মেজাজের মতো এমন ফ্যাশনেবল দামী চিজ সে কোথা পেল? কিছু অর্থ সংস্কৃত আরাম বিলাস প্রভাব প্রতিপত্তি অর্থাৎ এক কথায় লোকের ওপর ঝাল ঝাড়বার অধিকার না থাকলে তো মেজাজ গজায় না—ওটা খেয়াল খুশির অঙ্গ।'

কথাটা বুঝে মনোরঞ্জন মৃদু হাসে।—'বেশ, মেজাজ না বলে রাগ বল, মাথা গরম বল। যার কিছু নেই তার ঘৃণা রাগ এসব তো কেউ কাড়তে পারবে না?'

গল্প বলতে মনোরঞ্জন পটু নয়। আমাকেই গল্পটা মনের মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়। অভিজ্ঞতার স্বাদটা অবশ্য এসে যায় মনোরঞ্জনেরই।

মাঝারি আকারের মানুষটা ভৈরব, মোটা হাড়, সিঁটকানো শক্ত চেহারা, ছোট চাপা কপালটার নীচে একজোড়া স্থির জ্বলজ্বলে চোখ। ওই চোখ দিয়ে একদৃষ্টে মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা তার স্বভাব। হুকুম শুনতে বা গাল খেতে একটু সময়ের জন্য সামনে এলেও এতে মান্যগণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বড্ডই অস্বস্তি বোধ করে, ভেতরে ভেতরে রেগেও যায় লোকটার ওপরে। প্রথমত সবিনয়েই হয়তো সে

দাঁড়িয়েছে রাখালবাবুর সামনে, হাত জোড় করে আজ্ঞে হুজুর বলেই কথা কইছে, কিন্তু মাটিতে আটকে রাখার বদলে চোখ পেতে রেখেছে সোজা রাখালবাবুর মুখে। ধমকধামক গালমন্দ নীরবেই শুনে যাচ্ছে, চিরকাল তার বাপদাদা যেমন শুনে এসেছে, কিন্তু থেকে থেকে আচমকা কি যেন ঝিলিক মেরে যাচ্ছে, ঝলসে উঠছে তার চোখে। দেখলে ভয় করে।

রাখালবাবুর মতো মস্তো লোক, খুশী হলে সে তার গলা কাটতে পারে, সেও একভাবে ভেতরে ভেতরে ভৈরবকে ডরায়!

ভয় তাকে কম বেশী সকলেই করে। তার মেজাজের খবর কারো অজানা নয়, বহুদিন থেকে নানাভাবে পরিচয় পেয়ে আসছে। ঝাঁ করে মাথায় তার রক্ত চড়ে যায় এবং সে অবস্থায় স্বয়ং থানার দারোগাবাবুকে পর্যন্ত সে যে মেরে বসতে পারে সে প্রমাণও ভৈরব দিয়েছে। গ্রাম্য আক্রোশে একজন তাকে মিথ্যে চুরির দায়ে জড়িয়েছিল, দারোগাবাবু তদন্তে এসেছে। ধমকধামক এবং দু-চারটে চড়চাপড় সে যথারীতি দিব্যি হজম করে যাচ্ছিল, দারোগাবাবু হঠাৎ একটা খারাপ রসিকতা করে বসায় সেটুকু তার সইল না, ধাঁ করে গালে একটা প্রচণ্ড থাবড়া বসিয়ে দিল! চড়চাপড় যার সইছিল গালমন্দও সইছিল একটা বদ রসিকতায় যে তার মাথা বিগড়ে যাবে, কে এটা ধারণা করতে পারে? চুরির দায় বাতিল হয়ে গেল কিন্তু জেল তাকে খাটতে হল ওই অপরাধে। বেগুন ক্ষেতে গরু ঢোকার জন্য কানাইয়ের সাথে একদিন তার বচসা, সে ঝগড়া অন্যের মধ্যে খুব বেশী হলে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াত—আচমকা লাঠির ঘায়ে সে কানাইয়ের মাথা ফাঁক করে দিল। তাতেও কি রাগ পড়ল? সেই লাঠি দিয়ে অপরাধী গরুটার মাথাতে আরেক ঘা না বসিয়ে পারল না, গরুটা গেল মরে। এই নিয়ে হল আরেক দফা জেল। এবং একটা সামাজিক হাঙ্গামা। গো-হত্যার জন্য বিধান-মতো প্রায়শ্চিত্ত সে করত, ভট্টাচার্যের কয়েকটা চটাং চটাং কথায় মেজাজ গেল বিগড়ে।

বলল, 'বামুন আছো, বামুন থাকো, গাল পেড়োনি। করবনি যাও প্রাচিত্তির। কর গে যাও একঘরে। খাটব নরক দশ জন্ম।'

কুটুমবন্ধু পাড়াপড়শী তাকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করে, তবু সামান্য কারণে আচমকা ধারণাতীতভাবে মাঝে মাঝে বেধে যায়। হেটোরা দোকানীদের সঙ্গে তো তার নিত্য হাতাহাতির উপক্রম ঘটে। মার খেয়ে খেয়ে বাড়ির লোকের প্রাণ যায়। গাল মন্দ সে বিশেষ দেয় না, খানিক গালাগালি দিয়ে সামলে যাবার মতো নরম রাগ তার কদাচিৎ হয়। তার গরম হওয়া মানেই একেবারে চরম অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া। তার বৌ কালীর হয়েছে জ্বর, হয়তো আগের দিন তার পিটুনি খেয়েই। শম্ভুর দোকানে সে বৌয়ের জন্য চার পয়সার সাগু কিনতে গেছে।

'কম দিয়েছ শম্ভু। ওজন করে দাও।'

'যাও যাও, বেশী দিয়েছি। চার পয়সার সাগু, তার ওজন চায়।'

শুনেই মেজাজে আগুন ধরে যায় ভৈরবের।

'কেন হে কত্তা? চার পয়সা পয়সা নয়? ওজন কর তুমি, বেশী হয় ফিরে নাও বেশীটা তোমার। তোমার ঠেঁয়ে ভিক্ষে চাইছি?'

দোকানে তখন ভিঁড়ের সময়, দু-চারজন ভদ্রলোকও আছে। শম্ভু মুখ বাঁকিয়ে শোলোক বলে, 'চার পয়সার সাগু খায়, বৌ ডিঙিয়ে শাউড়ী পায়!'

ভৈরব সাগু ছুঁড়ে মারে শম্ভুর শোলোক-বলা মুখে। 'তোর সাগু তুই খা।'

শুধু সাগু ছুঁড়ে ঠাণ্ডা হবে তেমন মেজাজ নয় ভৈরবের। এদিক-ওদিক তাকাতে সামনে গুড়ের হাঁড়িটা নজরে পড়ে।

'গুড় দিয়ে খা!'

গুড়ের হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে খাবলা খাবলা গুড় সে শম্ভুর মুখে ছুঁড়ে মারে। পরে যা হবার তাই হয়, গরিব অসহায় চাষী তো। কিন্তু সে হিসাব তো আর মেজাজ বোঝে না।

এসব লোককে নিয়ে ওইখানে বিপদ। রাগ হলে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে, নিজের ভালমন্দে বিচার-বিবেচনা পর্যন্ত লোপ পায়, মরবে কি বাঁচবে খেয়াল থাকে না। সুতরাং তুচ্ছতায় যতই সে মশামাছির সামিল হোক, সহজে তাকে কেউ ঘাঁটাতে চায় না। তাই থেকে একটা মোটা সিদ্ধান্ত বোধ হয় করা চলে। যতই মনে হোক যে মেজাজটা তার একেবারেই অন্ধ ও বেহিসেবী, জগৎসংসার ভুলে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় যা খুশি কাণ্ড করে বসে, ঠিক অতটা হয়তো সত্য নয়। মানুষ যে তাকে ভয় করে, সহজে তার পেছনে লাগতে চায় না, এটা বোধ হয় সে বোঝে।

তারপর একদিন এল লক্ষ্মীপুরের ওই হাঙ্গামা। গাঁয়ের লোকেরা দল বেঁধে রাখালের চোরাই ধান-চাল চালান বন্ধ করতে যাওয়া নিয়ে যার সূত্রপাত। পরে অবশ্য ব্যাপার অনেক দূর গড়ায়। কারণ গরিবের যে কোন বেয়াদবিই ভীতিকর, সমূলে উৎপাটন না করলে চলে না। ধান-চাল উপে যেতে যেতে সে এলাকায় মানুষের প্রাণ যায়-যায় হলে মরিয়া হয়ে যখন তারা নিজেরাই প্রতিকার করবে স্থির করে, ভৈরবও সেখানে পরামর্শের গোড়ার দিকে উপস্থিত ছিল। ব্যবসায়ী-জমিদার রাখালের অপকর্মের বিবরণ শুনতে শুনতে সে গরম হয়ে উঠেছিল, জোর গলায় দাবি জানিয়েছিল যে, 'উহুঁ, শুধু ধান-চাল না, আগে ও লোকটাকে সবাই মিলে ফাঁসি দিতে হবে, তারপর ধানচাল ঠেকানো।' বুড়ো বনমালী তাকে ধমক দিয়েছিল, 'তুই থাম ভৈরব। এ ছেলেখেলা নয়।'

'তবে যা খুশি কর। মোকে ডেকোনি!'

বলে গটগট করে সে উঠে এসেছিল বৈঠক থেকে। তাতে বিশেষ কেউ অখুশী হয়নি। তাকে সঙ্গে রাখার ঝক্কি কম নয়। একা তার জন্যই হয়তো সম্পূর্ণ অকারণে দু-একটা খুন জখম হয়ে যাবে, সে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারবে না।

গ্রামের লোককে দাবাতে যে তাণ্ডব শুরু হয় তারপর তারা কেউ তা কল্পনাও করতে পারেনি। রাখালের গুণ্ডার দল জড়ো হয়ে পাড়ায় পাড়ায় হানা দেয়, প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও গ্রামের লোক শেষে প্রাণের দায়ে মরিয়া হয়ে দল বেঁধে তাদের মেরে হটিয়ে দেয়। পুলিসের স্থায়ী ছাউনি পড়ে লক্ষ্মীপুরে। কয়েকটা পাড়ায় গ্রামবাসীরা আত্মরক্ষার এমন শক্ত ব্যবস্থা করে যে রাখালের গুণ্ডারা দল বেঁধেও সেখানে ঢুকতে সাহস পায় না।

ভৈরবের ঘরটা ছিল এই এলাকার কিছু তফাতে। একদিন একদল লোক ঘরে ঢুকে খুঁটির সঙ্গে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধে। বাচ্চা ছেলেটা কালীর কোলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল, ছিনিয়ে নিয়ে ভৈরবের পিঠের সঙ্গে ছেলেটাকেও তারা দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধে। তারপর সেইখানে ভৈরবের চোখের সামনে কালীর উপর একে একে তারা সাতজন অত্যাচার করে। আলো জ্বালেনি। জ্যোৎস্না ছিল। গরিবের ছোট ঘর, খুঁটিটার তিন চার হাত তফাতেই ছেঁড়া কাঁথার বিছানা।

কাহিনীর এইখানে থেমে গিয়ে মনোরঞ্জন আচমকা প্রশ্ন করে 'কেন বল তো? পাশবিক অত্যাচারের মানে হয়, কিন্তু স্বামীর সামনে কেন? মাতাল মার্কিন সোলজারদেরও এই ঝোঁক দেখা যেত। কোনো কারণ ভেবে পাই না।'

'মানে? অত্যাচারের মানেই বিকার। অত্যাচারীর মনে দারুণ আতঙ্ক থাকে। নিজের বিশ্বাস, নিজের সংস্কার, নিজের নিয়মকানুন পর্যন্ত সে ভাঙছে—নিজের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সকলকে পায়ের নীচে পিষে রাখবার জন্য ওরা নিজেরাই নীতি-ধর্ম আইনকানুন আদর্শ খাড়া করে—নিজেরাই আবার তা ভাঙে। আত্মবিরোধ এড়িয়ে যাবার সাধ্য ওদের নেই, অন্যায় করতে ওরা বাধ্য। নেশাখোর যেমন নেশা চড়ায়, এরাও তেমনি অন্যায়কে আরও উগ্র আরও বীভৎস করে চলে। হিটলার অসংখ্য ভয়াবহ অন্যায় করেছে, যাতে তার এতটুকু স্বার্থসিদ্ধি হয়নি। গুণ্ডারা ওই একই জাত।'

মনোরঞ্জন একটু ভেবে বলে, 'তাই কি? কে জানে?'

তারা চলে যাবার পর কালী কিছুক্ষণ নিঃস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে। কাছাকাছি কোন চালায় আগুন ধরেছে, বাইরে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির রক্তিম দ্যুতিময় রূপ দেখা যায়। ভৈরব মৃদুকণ্ঠে বলে, 'বাঁধনটা খুলে দে বৌ।'

তার শান্ত গলার আওয়াজে কালী বোধ হয় আশ্চর্য হয়ে যায়। তবু সে ভয়ে ভয়ে বলে, 'মোকে কিছু করবে না তো?'

'না, তোর কি দোষ? শিগগির দড়ি খোল—ছেলেটা বুঝি শেষ হয়ে গেল।'

কালী তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালে। ছেলের দিকে এক নজর তাকিয়েই এতক্ষণ পরে সে প্রথম আর্তনাদ করে ওঠে। এ পর্যন্ত মাঝে মাঝে শুধু তার গোঙানি শোনা গিয়েছিল। বিক্রি করে কিছু বাড়তি রোজগারের জন্য ঘরে ভৈরব পাটের দড়ি পাকায়, বাঁধবার দড়ির তাদের অভাব হয়নি। দিশেহারা উন্মাদ তারা, ওইটুকু ছেলেকে পাটের সরু পাকানো দড়ি দিয়ে বাপের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধেছে গায়ের জোরে, গলাতেও প্যাঁচ পড়েছে। ইচ্ছা করে কিনা তারাই জানে। ছেলেটা খুব চেঁচাচ্ছিল, কান্না থামাতে হয়তো এই ভাবে গলায় দড়ি জড়িয়েছে। দড়ি খুলে নামাতে নামাতেই টের পাওয়া যায় ভৈরবের আশঙ্কাই সত্য, ছেলেটা শেষ হয়ে গেছে।

কালী হাউমাউ করে কেঁদে উঠতে খুঁটিতে বাঁধা ভৈরব সেই রকম শান্ত গলায় বলে, 'মোর বাঁধনটা খোল আগে।'

ভয়ে ভয়ে কালী তার বাঁধন খুলতে আরম্ভ করে। ভয়টা তার অকারণ নয়, এতদিন একসঙ্গে ঘর করেছে, মানুষটাকে সে সবার চেয়ে ভালোভাবেই জানে। কারণে

অকারণে কত ছ্যাঁচা খেয়েছে, গায়ের আজও তার অনেক চিহ্ন আঁকা আছে এখানে ওখানে। এ অবস্থায় আজ ভৈরবের মাথা ঠিক আছে এটা স্বপ্নেও সম্ভব বলে ভাবতে পারছিল না। তুচ্ছ কারণে মানুষটা ক্ষেপে যায়, মহামারী কান্ড বাধিয়ে দেয়, বাইরে রাগের কারণ ঘটলে ঘরে হাতের কাছে তাকে পেয়ে পিটিয়ে দেয়, আজ রাতের এত ভয়ানক কান্ড তার সইবে কি করে? বাঁধন খুলে দিলে দিশেহারা উন্মাদ ভৈরব যদি প্রথমে তাকেই খুন করে বসে!

দড়ি খুলে দিলে যে খুঁটিতে ওকে তারা বেঁধেছিল তাতেই ঠেস দিয়ে ভৈরব মেঝেতে বসে পড়ে। মনে হয়, তার সামনে তার বৌয়ের ওপর যে পাশবিক অত্যাচার হয়ে গেল, তারই গায়ে গায়ে লেগে থেকে কচি ছেলেটা যে ওদের দড়ির ফাঁসে দম আটকে মরে গেল, এসব কিছুই সে গায়ে মাখেনি। তার রাগও নেই, হা-হুতাশও নেই।

কালী নিজে টের পায় না সেও কত শান্ত ধীর হয়ে গেছে, ছেলের জন্য উন্মাদিনীর মতো সেও আছড়ে পিছড়ে কাঁদছে না। সাধারণভাবে অসুখে বিসুখে ছেলেটা মরলে এতক্ষণ তার গলা ফাটানো আর্তনাদ সারা গাঁকে জানান দিত তার শোকের খবর। সাতজন অত্যাচার করেছে। স্বামীর সামনে। রক্তাক্ত দেহে রক্তাক্ত মন কি সাধারণ শোকদুঃখের স্তরে থাকতে পারে?

'আবাব কে আসে?' ভৈরব অস্ফুট স্বরে বলে।

'শুধোও—সাড়া দাও! কাছে সরে এসে কালী বলে।

'কে?'

'আমি। বনমালী।'

বনমালী ঘরে এসে বলে, 'আর ক-জনা আসছে। বন্দুক হাতে পাহারা ছিল, মোরা এগোতে পারিনি ভাই। তোমার ঘরে অত্যাচার করবে তাও মোদের ভাবনার অগোচর ছিল। সেদিন চটাচটির পর তুমি তো তফাতে ছিলে বরাবর!

'গরিবের এই দশা।'

ভৈরবের নম্র শান্ত সুর বনমালীকেও আশ্চর্য করে দেয়। কোনদিন কোন অবস্থাতে কেউ কখনো তাকে এমন ধীরভাবে কথা বলতে শোনেনি। প্রদীপের আলোয় তার দিকে চেয়ে বনমালী ভাবেঃ পাগল হয়ে যায়নি তো মানুষটা?

উষ্ণ নিশ্বাস ফেলে বনমালী বলে, 'এর প্রতিশোধ পাবে একদিন।'

ভৈরব সায় দিয়ে তেমনি ধীরভাবে বলে, 'পাবে বৈকি, শিগগির পাবে। কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিতে হবে, সুদে আসলে।'

একে একে আরও কয়েকজন চেনা লোক আসে, ভৈরবের ধীর শান্ত ভাব তাদেরও অবাক করে দেয়। নগেনের বৌ আর নিতাইয়ের পিসী এসেছিল, এক কোণে তাদের কাছে বসে কালী বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুনে ভৈরব বলে, 'কাঁদিস না বৌ। আর কান্না কিসের? যদ্দিন বেঁচে রইব, তোতে মোতে শুধু দেখব ওদের কত সব্বোনাশ করতে পারি, কটাকে কাঁদাতে পারি।'

ছেলেকে পুড়িয়ে জিনিসপত্র পুঁটলি করে কালীর সঙ্গে ভৈরব পাড়ার ভিতরের

দিকে ব্রজেন দাসের বাড়ির একটা ঘরে আশ্রয় নেয়। একদিকে তাকে দেখে যেমন টের পাওয়া যায় না সে সেই বদরাগী পাগলাটে ভৈরব! অন্যদিকে তেমনি ভাবাও যায় না সেদিন রাত্রে তার জীবনে কী ভীষণ ঘটনা ঘটে গেছে। গ্রামরক্ষী দলে সে নাম দেয়, কাজ করে, মন দিয়ে আলাপ আলোচনা পরামর্শ শোনে। সারাদিন ঘুরে বেড়ায় আর মানুষকে সরলভাবে সংক্ষেপে নিজের কাহিনী বলে। দাওয়ায় বসে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে, হাটে বাজারে চাষাভুষো লোককে পরমাত্মীয়ের মতো ঘটনাটা শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'প্রতিকার করবে না? তুমি মোর ভাই?'

সাত দিন পরে সেই গুন্ডার দল যখন মাঝরাত্রে লোচন দাসের ঘরে হানা দিয়ে তাকে আর তার বাপকে বেঁধে বাড়ির বৌ আর মেয়েকে নিয়ে আরেকটা উৎসবের আয়োজন করে তখন তিনশো লোক নিয়ে ভৈরব বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে, যে কজন এসেছিল প্রায় সকলকেই বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়।

কী ভীষণ যে দেখায় তখন তার মুখের চেহারা। দেখে বনমালী এবং আরও অনেকে বুঝতে পারে ভৈরবের মেজাজ কোথায় চড়েছে। তাই, পরদিন আবার তাকে মৃদু ও শান্ত দেখে তারা কজন আশ্চর্য হয় না।

প্রাণাধিক

আজ জ্যোতির্ময়ের আসবার কথা। দিল্লী থেকে প্লেনে আসছে, লিখেছে অবনীদের বাড়িতে এসে উঠবে এবং দু-এক দিন থাকবে। অযাচিত সম্মানিত অতিথি। অভ্যর্থনা করে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য একজনের কি এরোড্রোমে যাওয়া উচিত নয়?

এখন সমস্যা হল, কে যাবে? অবনীর সে বন্ধু, সুতরাং সে গেলেই সবচেয়ে মানানসই হয়, কিন্তু এদিকে মুশকিল হয়েছে যে কেরানী-জীবনে অঘটন ঘটতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু আপিস গিয়ে কলম পিষে ছুটির পর নিজের ঘর-সংসার আত্মীয়-বন্ধুর প্রতি প্রাণপণে কর্তব্য করা নিয়ে হিমসিম খেয়ে তার দিন কাটে না। জীবনটাই যাতে টেঁকে সেজন্য কেরানীপনার রীতিনীতি বিধি ব্যবস্থা অর্থাৎ মাসান্তিক মজুরির কিছু উন্নতি সাধনের জন্য বেপরোয়া চেষ্টা শুরু করতে হয়েছে। অবনীদের আপিসে কাল ধর্মঘট—অবনী আবার এটা ঘটাবার ব্যাপারে ভালোরকম জড়িয়ে গেছে। কোন সম্মানিত বন্ধুকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে নষ্ট করার মতো সময় তার মোটেই নেই।

তার পিসতুতো ভাই সুব্রত যাবে ছাত্রদের জরুরী মিটিং-এ।

বাণীর সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের একদিন পরিচয় ছিল কিন্তু সে গেলে বাড়িতে এ বেলা রান্না করার লোক থাকবে না, পিসীমার অসুখ। বাণীর শ্বশুর অবনীর বাবা বুড়ো মানুষ। যত না বুড়ো হয়েছে ভদ্রলোক, তার চেয়ে বেশী অকাল-বার্ধক্য তাকে কাবু করেছে জেল খেটে খেটে দেশটা স্বাধীন করার পর কোথাও আর পাত্তা না পাওয়ার মনোবেদনার চাপে। বিরাট বিরাট সত্যযুগীয় ফাঁপা স্বপ্ন আর আদর্শ-গুলিতে সরোজের চিরদিন অন্ধ-বিশ্বাস, ভদ্রলোক কোনদিন ফাঁকিও চেনেনি, ফাঁকি দিয়ে নিজের জন্য বাগাতেও শেখেনি। আদর্শের ব্যবসাদারী হাটে তাই তার ত্যাগের মহিমা কানা কড়ি দামেও বিকালো না। বাষট্টি বছর বয়সে অম্বলের জ্বালার সঙ্গে প্রাণের জ্বালা মিশে বেচারীকে তাই অথর্ব করে ফেলেছে।

কিন্তু আদর্শ তো তার যাবার নয়। জীবনে কত উন্নতি করেছে জ্যোতির্ময়, কোথায় উঠে গেছে, তার মতো বড়মানুষকে উপযুক্ত সম্মান না দেখালে গুরুতর অপরাধ হবে। এও তার আদর্শের অন্তর্গত। সরোজের তাই টনক নড়ে।

'তোমরা বলছ কি? কেউ যাবে না? তা কখন হয়?'

'কাঁচ খোকা তো নয়,' অবনী বলে, 'বাড়ি চিনে আসতে পারবে। ট্যাক্সি চেপে আসবে, অসুবিধাটা কি?'

'কত বড় অভদ্রতা হয়!' একটা মান্যগণ্য পদস্থ লোক, তার একটা সম্মান নেই? তোমরা কেউ না যাও আমি যাব।'

তা সরোজের যদি জ্যোতির্ময়কে এগিয়ে আনতে যাবার আগ্রহ জেগে থাকে কারো কিছু বলবার নেই! নিজের অকারণ নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা ঘুচিয়ে যদি নড়েচড়ে বেড়াতে চায় সেটা বরং ভালো লক্ষণ।

শুধু বাণী বলে, 'আপনি একা যেতে পারবেন না বাবা। মন্টুকে সাথে নিয়ে যান।'

মণ্টুর বয়স এগার বছর। সে বাণীর ভাই।

রান্নার ফাঁকে ফাঁকে বাণী বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়, ঘামে-ভেজা গায়ে একটু হাওয়া লাগায়। খানিক দূরে রাস্তার ধারে ফাঁকা জমিটুকুতে বস্তির মজুরদের গান বাজনার ছোটখাটো একটা আসর বসেছে। কী উচ্চগ্রামে ওদের সুর বাঁধা, কী জমজমাট জীবন্ত স্থূল ওদের আওয়াজ। পানের দোকানটার শেডহীন বালব আর রাস্তার বাতি থেকে ওদের আসরে কিছু আলো পড়েছে, কিন্তু ওরা ধার করা আলোকে পর্যন্ত যেন অগ্রাহ্য করতে নিজেদের একহাত উঁচু একটা কারবাইডের আলো জ্বালিয়েছে, শিখাটা কাত হয়ে লড়াই করছে বাতাসের সঙ্গে। আগাগোড়া কি ভাবে বদলে গেছে জগৎ। জ্যোতির্ময় শহরে এসে যেচে তাদের বাড়ি উঠতে চাইবে এই কল্পনাতীত সম্ভবনায় আগে তারা কত উত্তেজনা বোধ করত, বিব্রত হয়ে উঠত। সন্দেহ নেই যে অনেক কিছু প্রত্যাশাও জাগত তাদের। আজ একমাত্র তার ওই বুড়ো পাগলাটে শ্বশুরটি ছাড়া জ্যোতির্ময়কে নিয়ে কারো বিশেষ মাথা ব্যথা নেই। আজ শুধু তারা ধরে নিয়েছে যে, এ একটা রহস্যময় ঘটনা, জ্যোতির্ময় এসে ব্যাখ্যা না করলে এ খাপছাড়া ব্যাপারের মানে বোঝা যাবে না। বালিগঞ্জে তাদের মস্ত বাড়ি, সেখানে তার ভাই সপরিবারে বসবাস করছে। শহরে বড় বড় হোটেলের অভাব নেই, বড়লোক বন্ধুরও অভাব নেই। তবু জ্যোতির্ময় প্লেন থেকে নেমে সোজা এসে উঠছে তার কেরানী বন্ধুর বাড়ি, অতিথি হয়ে সেই বাড়িতেই দু-একটা দিন কাটাবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছে।

শখ? খেয়াল? কে জানে কি আছে জ্যোতির্ময়ের মনে! এ কথা ভেবে নেওয়া বাণীর পক্ষে কঠিন নয় যে তাকে স্মরণ করে তার আকর্ষণে জ্যোতির্ময় আসছে, কিন্তু এ রোমাণ্টিক কল্পনায় তার সুখ নেই বলে কথাটা ভাবতেও তার ভালো লাগে না। তার জন্যই যদি জ্যোতির্ময়ের এ আগমন হয়, সে জানে তার মানে কি। একদিন চেনা ছিল, হয়তো মাঝে-মধ্যে কখনো মনেও হয়ে থাকতে পারে যে এ মেয়েটি দেখতে শুনতে মন্দ নয়, দূর থেকে সেই চেতনা মেয়েটিকে ভেবে হৃদয়-মনে ব্যাকুলতা জাগায়, জ্যোতির্ময় হঠাৎ তাকে দেখতে আসছে এ কথা কল্পনা করতেও বাণীর হাসি পায়। ঘটনাচক্রে যদি তারই জন্য জ্যোতির্ময় এসে থাকে, তার একমাত্র অর্থ হবে এই যে তার একটা কুৎসিত খেয়াল চেপেছে। মনে পড়েছে যে বাণীকে দু-

একবার লোভনীয় মনে হয়েছে অথচ পাবার চেষ্টা করা হয়নি, আজ সে গরিব কেরানীর বৌ, তাকে দু দিন একটু ঘেঁটে আসা যাক!

আগে থাকতে একটা লোককে মন্দ ভাবতে বাণীর ভালো লাগে না। কিন্তু জ্যোতির্ময়ের মতো উঁচু স্তরের লোককে মন্দ ছাড়া অন্য কিছু ভাবাও আজকাল কঠিন। ও জাতটাই বজ্জাত।

সরোজকে জ্যোতির্ময় একটু ঠাহর করে দেখে চিনতে পারে, বলে, 'ও আপনি? আপনার চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে। অবনী এলো না?'

'অবনী একটা জরুরী কাজে গেছে। তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা।' কিছু মনে করার ক্ষীণতম ইচ্ছাটুকুর অস্তিত্বও জ্যোতির্ময় অস্বীকার করে। তাকে বেশ উৎসাহী সানন্দ আত্মপ্রতিষ্ঠ মনে হয়, মণ্টুকে চিনতে না পারার ত্রুটির জন্য তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হেসে বলে, 'ভারি অন্যায় হল। তুমি তো শুধু ওনার ছেলে নও, তুমি যে আবার অবনীরও ইয়ে, না কি বল অ্যাঁ?'

গাড়িতে সে সরোজকে বলে, 'আমি একটা জরুরী কাজে এসেছি। একটা ভুল হয়ে গেল, অবনীকে লিখে দিতে মনে ছিল না, আমি এসেছি যেন চারিদিকে রটিয়ে না বেড়ায়।'

'না না, এখবর রটেনি। ওই যে তুমি লিখেছিলে কাজের চেয়ে দুটো দিন বন্ধুর বাড়ি শান্তিতে বিশ্রামের লোভটা তোমার বেশী, ওটা পড়েই অবনী কাউকে জানায়নি। জানলে দশটা লোক এসে তোমায় বিরক্ত করবে এ কি আমরা জানি না বাবা? তুমি এ গরিবের বাড়ি পা দেবে লোকের এটা ধারণায়ও আসবে না।'

একটা সিগারেট বার করে সরোজের প্রায় সাদাটে চুল ও শীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সেটা না ধরিয়েই জ্যোতির্ময় আবার পকেটে রেখে দেয়। তাতে আনন্দের সীমা থাকে না সরোজের।

জ্যোতির্ময় বলে, 'আপনাকে খুলেই বলি। আমি একটা এজেন্সি খুলব। নিজের নামে তো পারি না, চারিদিকে শত্রু, নানা লোকে নানা কথা বলবে। তাই ভাবলাম, বিশ্বাসযোগ্য কে আছে. কাকে ভার দেয়া যায়। তখন মনে হল, এত লোকের জন্য এত করেছি, অবনী আমার কতকালের বন্ধু, ওর জন্য কিছুই করা হয়নি। আপনি সারা জীবন কাজ করলেন, শেষ জীবনে আপনারও সুখ হল না। তাই অবনীকেই সব ভার দেব ঠিক করেছি। ওকে আর চাকরি করতে হবে না, আপিসে মাইনে যা পায় আমার কাছে তার বিশ গুণ কমিশন পাবে।'

'কিসের এজেন্সি বাবা?' সরোজের গলা কেঁপে যায়, চোখে জল এসে পড়ে।—এতদিনে—কি তবে তার সারা জন্মের আদর্শ-নিষ্ঠার প্রতিদান আসবে? এই কঠোর বাস্তববাদী জগতে অহিংসা দারিদ্র্য উপবাস-বরণের পুরস্কার মিলবে?

'বলব'খন বাড়ি গিয়ে। বিস্তারিত বলব।'

মনে মনে বিড়বিড় করে অভ্যস্ত কয়েকটা মন্ত্র আউড়ে অনির্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে সরোজ নিশ্বাস ফেলে। ভগবান তবে ছপ্পড় ফুঁড়েই দিলেন!

'ছেলে-মেয়ে ক-টি?'

'একটা মেয়ে আছে বছর তিনেকের। এলাহাবাদে দাদামশায়ের কাছে থাকে। কাজের চাপে, জানেন জ্যাঠামশায়, বছর খানেকের মধ্যে মেয়েটাকে চোখে দেখিনি।'

সরোজ মনে মনে বলে, ষাট! তিনিও কর্মী ছিলেন, এও কর্মী, এই বয়সে বেচারী কত সাফল্য লাভ করেছে, টাকা পয়সা মান সম্ভ্রম প্রভাব প্রতিপত্তি! কিন্তু এরা নীতি জানে না, ব্রত বোঝে না। একটা মোটে মেয়ে, কার জন্য তবে এই তপস্যা? এরা মনে রাখে না যে গান্ধীজীরও সংসার ছিল, পুত্র-সন্তান ছিল, তারপর যখন সময় এল তখন তিনি হলেন সন্ন্যাসী।

এরা যখন পৌঁছল, বাড়িতে বাণী তখনও একা, শুধু পিসীমা বিছানায় শুয়ে জ্বরে ধুঁকছে। সরোজ প্রায় চটে যায়, চেঁচিয়ে বলে, 'কী আশ্চর্য, এখনো কেউ বাড়ি ফেরেনি! এদের যদি কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে।'

জ্যোতির্ময় তাকে শান্ত করেঃ 'আহা আপনি ব্যস্ত হবেন না। কাজে গিয়ে আটকে গেছে, আসবে সময়মতো।'

কিন্তু অবনীর অনুপস্থিতিতে যে তাকে বিরক্ত করেছে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। পরক্ষণে সে প্রশ্ন করে, 'অবনী জরুরী কাজে গেছে বলছিলেন, কিসের কাজ?'

'ও তার আপিসের ব্যাপার।'

'আপিসের ব্যাপার?' বিরক্তি কেটে জ্যোতির্ময়ের মুখে স্মিত ভাব ফোটে। কেরানীর কাছে আপিস কত গুরুতর এটা তার অজানা নয়।

বাণীর দিকে সে আশ্চর্য হয়েই তাকায়, কি দেখবে ভেবেছিল আর কি দেখছে, যেন চোখ দিয়েই যাচাই করে নিতে চায়। পাঁচ-ছ বছর বিয়ে হয়েছে, কেরানীর মেয়ে কেরানীর বৌ! সে এখনো এমন আঁটো আছে, জীবন্ত আছে! বাণীকে গরিব বাঙালী গেরস্ত ঘরের বিবাহিতা মেয়ের চিরন্তন মাতৃরূপা রূপে না দেখে সে রীতিমতো বিব্রত বোধ করে।

'আপনাকে তো আগে তুমিই বলতাম, আপনার বোনের সঙ্গে দু-বছর এক সাথে পড়েছি। আশা কোথায় আছে?'

'আশা আশা? একটু বিলাতের দিকে বেড়াতে গেছে। মানে, দেশে কেমন ওর মন টিঁকল না, একটা সুযোগ জুটে গেল, ও একটু আমেরিকা বেড়িয়ে আসতে গেল।'

জ্যোতির্ময়ের অস্বস্তি বাণী টের পায়। কথাটা হালকা করে উড়িয়ে দিতে সে বলে, 'ওর বেড়ানোর ভাবনা কি? সাধ হলে বেরিয়ে পড়লেই হল। জামা-কাপড় ছাড়ুন, চান করবেন? বিশেষ চেষ্টায় দু বালতি জল রেখেছি।'

'বিশেষ চেষ্টা কেন?'

'জলের বড় অভাব। সব জিনিসেরি অভাব—কেরানীর বাড়ি তো!' কথাটা বাণী না বলতেও পারত। জ্যোতির্ময় এ সব হিসাব করেই এসেছে, বড় একটা মোটা লাভের গোপনীয় ব্যবস্থার জন্য একটা দুটো দিন এ সব কষ্ট অসুবিধা সইতে সে নারাজ নয়।

নাইতে অনেক সময় লাগিয়ে, সম্ভবত নিজের উচ্চতম জগতের অভ্যস্ত হিসাব-নিকাশ চালচলন কি ভাবে মানুষের জগতের উপযোগী করে ঢালাই করে নেবে,

কয়েক ঘণ্টার জন্য করে নেবে (আটচল্লিশ ঘণ্টা যদি এখানে থাকতে হয়, বাইরে নিজের জরুরী কাজের নামে দশ ঘণ্টা, ঘুমানোর নামে চোদ্দ ঘণ্টা, চিঠি লেখা কাগজ পড়া চিন্তা করার নামে দশ ঘণ্টা যাবে। তবু চোদ্দ ঘণ্টা থাকে ঘরোয়া সামাজিক জীবনের জন্য! অসুস্থতার ভান করে আরও ঘণ্টা দশেক কাটানো ছাড়া উপায় নেই। অন্যভাবে ছাঁটাই করে টোটালটা আরও কিছু কম করা যায় কি? বোধ হয় এরা ভড়কে যাবে। বন্ধুত্ব, প্রীতি; আদর্শ, নীতি, মানবতা ইত্যাদি ভান তো চাই, সরোজের ছেলেকে চাকরি ছাড়িয়ে চোরাকারবারে নামাতে হবে! তার জীবনে, তার পরিবারে এটা প্রায় বিপ্লবের সমান!) সেটা ঠিক করে সরল সহজ হাসিখুশি হয়ে জ্যোতির্ময় বারান্দায় জেঁকে বসে।

দূরে এক হাত কারবাইড লাইটের আলোয় মজুরদের গানের আসরের দিকে চেয়ে বলে, 'ও ব্যাটাদেরই আজকাল ফুর্তি! স্ট্রাইক করে করে মোটা মজুরি কামাচ্ছে, সস্তার ফুর্তি করছে। লোকে আমাদের প্রফিটটাই দ্যাখে। একখানা গান শুনতে আমাদের যে হাজার টাকা খরচ সেটা কেউ হিসাব করে না। হেসো না বাণী, ঠিক কথাই বলছি।'

'বলছেন না কি?'

'বলছি না? একটা ছোঁড়াকে বিনি পয়সায় মেয়ে সাজিয়ে ওরা নাচাচ্ছে, গান করাচ্ছে, চেয়ে দ্যাখো কী জমজমাট আসর! আমরা যে মেয়েটার গান শুনে একটু মাতব, সে মেয়েটার বাপকে একটা খাতিরী চাকরি দিতেই হবে। মেয়েটাকে শান্তি-নিকেতনে পড়িয়ে ঘুরিয়ে আনতে হবে। রেডিও সিনেমায় নাম করাতে হবে। গান তো আসলে অষ্টরম্ভা, কাজেই নাম টাম করিয়ে না শুনলে তো মাতলামি আসবে না। একটা রোমাঞ্চকর গান শুনতে আমাদের হাজার কেন, তার বেশী খরচা হয়!'

'না শুনলেই হয়।'

'হয় না। যার মেয়ে বা বৌ গান শোনাবে সেও সব জানে বোঝে কি না। সব কল টিপে হয়। কল টেপাটাই আসল।'

'এমন যখন কাহিল অবস্থা', বাণী হেসে বলে, 'ও কল আপনাদের বিগড়ে গেছে। আর কাজ দেবে না।'

সরোজ বাণীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে, 'শোন, তোমাকে একটা কথা বলি। একটু হিসেব করে কথাবার্তা বোলো। অবনীর একটা ব্যবস্থা করে দেবে বলেছে, যাতা বলে ওর সর্বনাশটা কোরো না।'

'আমি আপনার ছেলের সর্বনাশ করব? তাতে আমার লাভ কি বাবা?'

প্রাণপণ উদারতায় সরোজ ক্রোধ সম্বরণ করে। এরা কিছু জানে না বোঝে না মানে না। এদের আধ্যাত্মিক জীবনে এমন দৈন্য যে স্বার্থপরের মতো সর্বদা সব বিষয়ে স্বামীর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ভাবে। আমার কিছু হোক না হোক স্বামীর আমার ভালো হোক এ চিন্তাও এদের আসে না।

বাণী তার মুখের ভাব লক্ষ্য করে ভরসা দিয়ে বলে, 'ভাববেন না, বাড়িতে এসেছে মানুষটা, আমি প্রাণ দিয়ে আদর যত্ন করব।'

দুখানা ঘর আর ওই বারান্দাটুকু সম্বল। ছোট ঘরে বাণীরা যাবে, জ্যোতির্ময়ের কাছে চাদর চেয়ে নিয়ে বাণী সে ঘরে বিছানা করে দেয়, বলে, 'খাটে হাত-পা ছাড়িয়ে বসুন, যা চেয়ার বাড়িতে! কষ্ট পাবেন অনেক।'

'বেশ তো, তোমাদের সঙ্গে নয় কষ্টই পেলাম।'

পিঠ চাপড়ানো উদার আত্মীয়তা জাহিরের ভাব সুর ভাষা বাণী জানে। এ হল রক্ষাকর্তার পিতৃত্ববাদ। জ্যোতির্ময়ের অসুবিধাটাও বাণী টের পায়। তাদের দেখতে হচ্ছে অন্য দৃষ্টিতে, চোখ তার অভিনয়ের সংযম মানতে রাজী নয়। আগে খেয়াল ছিল না, জ্যোতির্ময়ের তাকানি দেখে বাণী টের পেয়েছে সে এখন একটা নতুন আকর্ষণ হয়েছে। বিয়ের আগে বাপের ঘাড়ে খেত-পরত, বাপ যতই গরিব হোক তখন আলস্য ছিল, শখ আর শৈথিল্য ছিল। নিজের সংসারে কর্মজীবনের দায়িত্বে সামঞ্জস্য আনার জন্য চলাফেরা খাওয়াপরার কঠোর সংযম আর খাটুনি তার দেহে কবছরে মজুর মেয়ের বিশেষ সৌন্দর্য এনে দিয়েছে—বেশী করে এনে দিয়েছে, কারণ যতই হোক, মজুর-মেয়ের মতো তার মন্দের হাড়ভাঙা খাটুনি নয়, যত ওঁচা হোক, খাওয়াও সে তুলনায় সে অনেক ভালো পায়।

'ছেলে-মেয়ে হয়নি?' জ্যোতির্ময় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে। তার আসল কৌতূহলটা কি বাণীর তা বুঝতে কষ্ট হয় না, কারণ চোখ দিয়ে তার সর্বাঙ্গে কৌতূহলটার জবাব সে খুঁজছিল।

বাণী ধীর কণ্ঠেই বলে, 'একটা মেয়ে হয়েছিল, দু-বছর বয়সে মারা গেছে। মারা যেত না, একটা চিকিৎসা ছিল। তাতে বহু টাকা লাগে, যোগাড় করা গেল না।'

জ্যোতির্ময়ের মাথা একটু নামে, দৃষ্টি মেঝেতে নেমে যায়।

'আমায় লিখলে না কেন?'

এ প্রশ্নের আর জবাব কি? বাণী চুপ করে থাকে।

'অবনীর যদি মাসে পাঁচ-ছ-শ টাকা রোজগার হয়, খুশী হবে?'

'হব না! কী বলেন!'

জ্যোতির্ময় চোখ তোলে, 'কালকেই সব ব্যবস্থা করে দেব। নাম থাকবে সরোজ-বাবুর, ওঁর নামের একটা বিশেষ ইয়ে আছে। দেখাশোনা সব অবনীই করবে। কালকেই ও রিজাইন দিয়ে দিক।'

'রিজাইন বোধ হয় দিতে হবে না, এমনিই তাড়িয়ে দেবে।'

'কেন?'

'স্ট্রাইক-ফাইক করছে।'

জ্যোতির্ময়ের চোখে সংশয় ঘনিয়ে আসে।—'ও বাবা, ও সবে যায় না কি?' একটু ভেবে বলে, 'যাক্ গে, ও পেটি চাকরিও আর করতে হবে না, স্ট্রাইকেরও দরকার হবে না।'

বাণী কিছু বলে না। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল স্বামী-শ্বশুরের সর্বনাশ করতে কিছুতেই মুখ খুলবে না। তরকারি নামাতে সে রান্না ঘরে যায়। পরনের শাড়িখানাই একটু ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করে নিয়ে একটা স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে

জ্যোতির্ময়কে বলে, 'আধ ঘণ্টা বাবার সঙ্গে কথা বলুন। পাড়ার একটি মেয়েকে পড়াই, একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েই চলে আসব।'

জ্যোতির্ময় আশ্চর্য হয়, ক্ষুন্নও হয়। কাল স্বামী চাকরি ছাড়বে, মাসে পাঁচ-ছশো টাকা রোজগার শুরু করবে, তার খাতিরেও সে এক বেলা মেয়ে-পড়ানো কামাই করতে সাহস পেল না।

অবনীর ফিরতে রাত প্রায় ন-টা বেজে যায়। বাণী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, 'কি হল?'

'ঠিক হল। সবাই একমত।'

জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সবে অবনী জামা কাপড় ছেড়েছে, সে ফিরেছে টের পেয়েই সরোজ তাকে ব্যগ্রভাবে আড়ালে ডেকে নিয়ে যায়। বাণী যখন মেয়ে পড়াতে গিয়েছিল সে সময় জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে তার এজেন্সি সম্পর্কে আরও আলাপ হয়েছে। সমস্ত ব্যাপার জেনে সরোজের যেমন হয়েছে ভয়, তেমনি বেড়েছে উত্তেজনা। নিজে আগে ছেলের সঙ্গে বোঝাপড়া না করে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে তাকে আলাপ-আলোচনা করতে দিতে সে রাজী নয়। এজেন্সির প্রস্তাবে সায় দিতে ছেলের নতুন বিবেকে বাধবে বলেই সরোজের ভয়, সোজাসুজি হয়তো সে জ্যোতির্ময়কে বলে বসবেঃ আমি তোমার ওই লোকঠকানো ব্যাপারে নেই। তাহলেই সর্বনাশ!

'জ্যোতির্ময় তোমায় বলেছে কিছু?' উত্তেজনায় হাত-পা কাঁপছে সরোজের, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

'কখন বলবে?'

'শোন তবে বলি—'

সরোজ জ্যোতির্ময়ের বেনামী এজেন্সির ব্যাপারটা ছেলেকে খুলে বলতে শুরু করে। অবনীর শ্রান্ত ক্লান্ত মুখ দেখে আলোচনাটা খাওয়ার পর আরম্ভ করার কথা বলতে গিয়ে বাণী ঠোঁট কামড়ে চুপ করে যায়—ক্ষিদের কষ্ট অবনীর সইবে, কিন্তু একটু শান্ত হতে না পারলে যে কোন মুহূর্তে বুড়ো মানুষটার হার্ট ফেল করা আশ্চর্য নয়। সেইখানে একটা মাদুর বিছিয়ে বাণী দু হাত ধরে সরোজকে বসিয়ে দেয়, বলে, 'বসে কথা বলুন বাবা, ব্যস্ত হবেন না।'

রাগে দুঃখে তার চোখে তখন প্রায় জল এসে গিয়েছে। ক্ষিদেয় মানুষ মরে যাক, জীবন অচল হয়ে আসুক, এমনি সব দুর্বলতা বাধা হয়ে মানুষকে ব্যস্ত হতে দেবে না, তাড়াতাড়ি কিছু করতে দেবে না। সরোজ এই বলে শেষ করে, 'সারা জীবন আমি নীতি আর আদর্শ বাঁচিয়ে এসেছি, এতে কোন দোষ দেখলে আমি নিজেই বারণ করতাম। মানুষের নীতিধর্ম অন্তরে, বাইরেটা দেখলেই শুধু চলে না। তুমি যেন জ্যোতির্ময়কে না বলে বোসো না।'

অবনী বাণীর দিকে তাকায়! বাণী যেন জানত সে এইভাবে তাকাবে, পাশের দিকে সরোজের চোখের আড়ালে সে দাঁড়িয়েছিল। নীরবে ঠোঁট কামড়ে বাণী চোখের ইশারায় সরোজকে দেখিয়ে দেয়। ইঙ্গিতটার মানে বোঝা সহজ। ধৈর্য হারালে চলবে না, ব্যস্ত হলে চলবে না, বুড়ো বাপটা যখন আছে তার অস্তিত্বটাও মানতে

হবে। অবনীর শান্ত চোখে বিপজ্জনক অসহিষ্ণু ক্রোধ ঝলসে উঠছিল, বাণীর ইঙ্গিত না পেলে সে হয়তো ভুলেই যেত আসল কারসাজি কার, অসহায় নিরুপায় বাপকে দাবড়ে দিত।

কী ভয়ংকর মুহূর্তটা যে কেটে যায় বোঝে শুধু বাণী আর অবনী। ঘৃণার মতো প্রচণ্ড মহৎ হৃদয়াবেগকে যুগে যুগে যারা অনেক কায়দায় বিপথে উল্টো দিকে চালিত করে ঘরে ঘরে ভুল বোঝা অশান্তি আর হতাশা সৃষ্টি করেছে তাদের কৌশল আরও একবার প্রায় সফল হয়ে গিয়েছিল!

জ্যোতির্ময় ঠকাবে মানুষকে, লোকচক্ষুর আড়ালে সে হাজার টাকা ফাঁকি দিয়ে বাগাবার ব্যবস্থায় কাজে লাগাবে সরল বোকা অসহায় সরোজ আর তার গরিব কেরানী ছেলে অবনীকে, আর একটু হলে আড়ালের মানুষ তাকে আড়ালেই রেখে ফাটাফাটি হয়ে যেত সরোজ আর অবনীর মধ্যে।

অবনী মৃদু শান্ত স্বরে বলে, 'আপনি যদি জোর করেন আপনি যা বলেন তাই হবে। আমি আপনার বিরুদ্ধে যাব না। কিন্তু আমি ভাবছি, আমার ভালোর জন্যই আপনি এটা বলছেন। সবার কাছে হীন হয়ে আমার সুখ-শান্তি যদি নষ্ট হয়, আপনি কি সুখী হতে পারবেন?'

'ওই তো, ওই তো দোষ তোমার!' ক্ষুব্ধ অভিযোগের সুরে সরোজ বলে। কিন্তু অভিমান সাধারণ হৃদয়াবেগ, মোটেই মারাত্মক নয়। সারা জীবনের ত্যাগ-স্বীকারের পুরস্কার যেচে ঘরে এসেছে অথচ ছেলে তা বাতিল করে দেবে, এই আতঙ্কে যে কাঁপুনি ধরেছিল সরোজের তা কেটে গেছে। ক্ষুব্ধ হোক আর অভিমান করুক, এখন সে শান্ত হয়েছে, আচমকা তার হার্টফেল করে মরার সম্ভাবনা নেই।

দু বার নাক ঝেড়ে, বাণীর কাছে এক গ্লাস জল চেয়ে নিয়ে কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে সরোজ বলে, 'তোমার ঠেকছে কিসে? এ তো চুরিচামারির ব্যাপার নয়, সাধারণ ব্যবসার কথা। কেউ না কেউ এজেন্সিটা পেত, এজেন্সি দেওয়াব ব্যাপারে জ্যোতির্ময়ের হাত ছিল, সে অন্যকে না দিয়ে তলে তলে নিজের জন্য ব্যবস্থা করেছে। এটা একটু অন্যায় বটে, দেশের লোককে জানানো হল এক রকম কাজে হল অন্য রকম। কিন্তু বিশেষ কি এসে গেছে? অন্য লোকেও এজেন্সিটা চালাত, জ্যোতির্ময় নিজের লোক দিয়ে সেটা চালাবে। এজেন্সি চালানোটাই আসল কথা। তাতেই দেশের মঙ্গল। এতে তোমার আপত্তি কি?'

অবনী বলে, 'এক কাজ করা যাক। জ্যোতি আপনার নামে এজেন্সি করতে চায়, তাই করুক। আপনি মাইনে দিয়ে লোক রাখুন, এজেন্সি চালান। আমি নাই বা রইলাম ওর মধ্যে।' আশেপাশের তিন চারটে বাড়িতে রেডিও বিনিয়ে বিনিয়ে গানের নামে কাঁদছে। তবে সুখের বিষয়, এ কাঁদুনি ঢোল করতাল ঘুঙুর আর সমবেত গলার আওয়াজে খানিকটা চাপা পড়ে গেছে।

সরোজ নিশ্বাস ফেলে বলে, 'ভেবে দেখি। তোমরা খাবে যাও। আমি আজ কিছু খাব না বৌমা।'

১৯

বাণী চট করে সামনে আসে।—'না খাওয়াই ভালো। পাতলা একটু বার্লি করে রেখেছি, চুমুক দিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়ুন।'

খাদ্য দেখে রীতিমতো ক্রোধের সঞ্চার হয় জ্যোতির্ময়ের, যদিও তার জন্যই বিশেষভাবে সরোজ একপোয়া মাছ আনিয়েছিল এবং মাছটা বেশির ভাগ তাকেই দেওয়া হয়েছে। তবে রাগ করে যেখানে লাভ নেই সেখানে জ্যোতির্ময় রাগ চাপতে পারে। তার শুধু লাভের হিসেব। বিনা লাভে রাগ দুঃখ খরচ করাও তার স্বভাব নয়।

'বাঃ! লাউ শাকটা তো খাসা হয়েছে!'

বাণী বলে, 'ওটা পুঁই-চচ্চড়ি। জানেন পুঁই শাক ছিল বলে বাঙালী বেঁচে আছে। ভাতের বদলে কচু আর মাছ-মাংসের বদলে পুঁই। কচু আর পুঁই না থাকলে—'

'কুচো চিংড়ি বাদ দিও না।'—অবনী বলে।

জ্যোতির্ময় খিলখিল করে হেসে ওঠে। কি করবে কি বলবে সে ভেবে পাচ্ছিল না।

চাদর গায়ে জড়িয়ে পিসীমা ধীরে ধীরে ঘরে এসে দরজার কাছে দেয়াল ঘেঁষে বসে। ধীরে ধীরে বলে, 'সলিল আসেনি, না?'

বাণী বলে, 'না পিসীমা, এখনো ফেরেনি।'

পিসীমা তেমনি মৃদু স্বরে বলে, 'বেরোবার আগে অনেকক্ষণ কপাল টিপে দিয়ে গেল। তখনি বুঝেছি মিটিং-এ গোলমাল হতে পারে, নইলে মার জন্য ছেলেব অত দরদ হয়! না-ও ফিরতে পারে ভেবে গেছে।'

'এখনো ফেরার সময় যায়নি।'

পিসীমা নীরবে মাথা হেলিয়ে সায় দেয়। এদিকে জ্যোতির্ময়ের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ দেখায়।

'সলিল কে? কিসের মিটিং?'

জবাব শুনে তার মুখ আরও পাংশু হয়ে যায়। কিছুক্ষণ ভাত গিলতে পারে না। বার বার চোখ তুলে সে বিধবা পিসীমার শীর্ণ কিন্তু শান্ত মুখখানার দিকে তাকায়।

তাদের খাওয়া শেষ হতে হতে সলিল বাড়ি আসে। বলে, 'বাঃ সবাই পেট-পূজায় লেগে গেছ।'

জ্যোতির্ময়ের মতো মহৎ ব্যক্তির উপস্থিতি তাকে মোটেই বিব্রত করেছে মনে হয় না। আধ-ময়লা পাঞ্জাবিটা গা থেকে খুলে হাত ধুয়ে একটা আসন টেনে বসে পড়ে বলে, 'চট করে থালা আনো বৌদি, আগে খাব তার পর অন্য কথা।'

ভাতের থালা সামনে পাওয়া মাত্র সে খেতে আরম্ভ করে, কোনোদিকে তাকায় না। জ্যোতির্ময় যেন আশ্চর্য হয়ে এই পুঁজি-করা প্রাণবন্ত প্রচণ্ড ক্ষুধার অভিব্যক্তি চেয়ে দ্যাখে। অবনীর খাওয়ার রকমে সে জোরালো ক্ষিদে দেখেছিল, তবে এতটা নয়। তার বোধ হয় বিশ্বাস হয় না যে, ভদ্রঘরেও এত ক্ষিদে পায় এবং সে ক্ষিদে চেপে রাখতে হয় রেশনের নির্দিষ্ট অন্নের জন্য।

অবনী বলে, 'মিটিং কেমন হল?'

'গ্র্যান্ড। পরশু জয়েন্ট প্রসেশন।'

কিছুক্ষণ সলিলের সঙ্গেই সকলে কথা কয়, জ্যোতির্ময়কে তারা যেন ভুলে গেছে। শরীরটা দুর্বল বোধ করে সরোজ শুয়ে পড়েছিল, এখানে উপস্থিত থাকলে তার হৃৎস্পন্দন বোধ হয় বন্ধ হয়ে যেত। জ্যোতির্ময়ের মুখে গভীর চিন্তার ছায়া নেমে এসেছে।

খেয়ে উঠে সিগারেট ধরিয়ে সে উসখুস করে। নাক ঝাড়ে, গলা খাঁকারি দেয়, নড়েচড়ে নানাভাবে বসে, হাতের তালু দিয়ে নিজের থুতনি ঘষে। 'টায়ারড্ লাগছে? তুমি বরং তবে শুয়ে পড়।' অবনী বলে।

'টায়ারড্ নয়। ভাবছি, তোমাদের বড়ই অসুবিধা করলাম। ঘরের এত টানাটানি জানলে আমি—'

'আমাদের কোনো অসুবিধে নেই, ভেবো না। অসুবিধে তোমারই।'

বাণী জলের কুঁজো আর গ্লাস এনেছিল, সে বলে, 'আমাদের অতিথি আসে না?'

তবু জ্যোতির্ময় উসখুস করে। এক গ্লাস জল খেয়ে নামিয়ে রাখা জ্বলন্ত সিগারেটটার কথা ভুলে নতুন আরেকটা সিগারেট ধরায়।

আচমকা সে বলে, 'একটা ভুল হয়ে গেছে, ইস্! আমায় তো ভাই যেতে হবে।'

'বেরোবে? তা বেশ তো। ফিরতে বেশী রাত হবে না কি?'

'জিনিসপত্র নিয়েই যাব। আমার কি আর বিশ্রাম আছে? তোমাদের চিঠি লেখবার পর এটা ঠিক হয়, খুব সিরিয়াস ব্যাপার। আমাকে হোটেলেই যেতে হবে, সকালে কজন বড় বড় লোক আসবে, জরুরী কনফারেন্স।'

অবনী বলে, 'ও!'

জ্যোতির্ময় হাসবার চেষ্টা করে, বলে, 'ভেবেছিলাম হোটেলেই উঠব, সেখান থেকে এসে তোদের সঙ্গে দেখা করে যাব। তোর বাবাকে দেখে সব ভুলে গেলাম। এত দিন পরে তোদের সঙ্গে দেখা, কী ভালোই যে লাগছে। হোটেলের কথাটা স্রেফ ভুলে গেছি!'

বাণী খেয়ে উঠে শোনে, সলিল ট্যাক্সি ডাকতে গেছে। জ্যোতির্ময় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। ট্যাক্সি এলে একটা প্রকাণ্ড সমস্যা দেখা দেয়। সরোজের বোধ হয় ঘুম এসেছে, তাকে না জানিয়েই কি জ্যোতির্ময় চলে যাবে?

'আমরা বুঝিয়ে বলব। এমনি ভালো ঘুম হয় না, ঘুম যখন এসেছে ওঁকে আর জাগিয়ে কাজ নেই।'

শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জ্যোতির্ময় ট্যাক্সিতে ওঠে। ট্যাক্সি চলে গেলে বাণীও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, 'বাঁচা গেল বাবা। নিজেই আমাদের সমস্যা মিটিয়ে দিল।'

অবনী বলে, 'তাই তো দেয়।'

রাত্রে শুতে যাবার আগে বাণী একবার সরোজের খবর নিতে যায়। শ্রান্ত অবনী আগে শুয়ে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, বাণীর হাতের নাড়ায় জেগে উঠে তার মুখ দেখেই সে খানিকটা বুঝতে পারে। নিঃশব্দে গিয়ে দুজনে সরোজের চৌকিতে বিছানো সামান্য সাধারণ বিছানার পাশে দাঁড়ায়, সামান্য ইঙ্গিতটুকু পাবে না জেনেও অবনী জীবনের সন্ধান করে। বাণীর দু চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে বুড়ো সরোজ চিরতরে ঘুমিয়ে গেছে।

সখী

সদরের কড়া নড়তে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বিভা বলে, 'দ্যাখ তো রিনা কে, কাদের চায়।'

উপরে নীচে পাঁচ ঘর ভাড়াটে। উপরে তিন, নীচে দুই। বাইরে লোক এলে দরজা খুলে খোঁজ নেবার দায়িত্ব স্বভাবতই নীচের তলার ভাড়াটে তাদের উপর পড়েছে, বিভা এবং কল্যাণীদের। সদর থেকে ভিজে স্যাঁতসেঁতে একরত্তি উঠোনটুকু পর্যন্ত সরু প্যাসেজের এপাশের ঘরটা তাদের, ওপাশেরটা কল্যাণীদের। ভিতরে আরও একখানা করে ছোট ঘর তারা পেয়েছে—কিন্তু রান্নাঘর মোটে একটি। কল্যাণীরা রান্নাঘরের ভেতরে রাঁধে, বিভা রাঁধে, বারান্দায়। তবে সুবিধা অসুবিধার হিসাব ধরলে লাভটা কাদের হয়েছে ঠিক করা অসম্ভব। রান্নাঘরখানা ঘুপচি, আলোবাতাস খেলে না, উনান ধরলে একেবারে হাড় কাঁপানো দিনগুলি ছাড়া শীতকালেও ভাপসা গরমে বেশ কষ্ট হয়। নিশ্বাস আটকে আসে, মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশের ফালিটুকুর দিকে মুখ তুলে হাঁপ ছাড়তে হয়। বারান্দায় আবার জায়গা এতটুকু, নড়াচড়া করতেও অসুবিধা হয়।

সাধারণত কল্যাণীরাই সদরের কড়া নাড়ায় বেশী সাড়া দেয়—তাড়াতাড়ি বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গে দেয়। বিভাদের বা উপর তলার ভাড়াটেদের কাছে লোকজন কদাচিৎ আসে, কল্যাণীরা নিজেরাও সংখ্যায় অনেক বেশী, দেখা করতে বেড়াতে বা কাজে বাইরের লোকও ওদের কাছেই বেশী আসে। অন্য ভাড়াটেদের তুলনায় বাইরের জগতের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ অনেক বেশী।

কল্যাণীরা সম্ভবত রান্নাঘরে খেতে বসেছে বা অন্য কাজে ব্যস্ত আছে, বিভার রান্না খাওয়ার পাট অনেক আগেই চুকে যায়। দু-এক মিনিট দেখে ওদের কাছেই লোক এসেছে ধরে নিয়েও শোয়া রিনাকে তুলে সে খবর নিতে পাঠিয়ে দেয়। এটুকু করতে হয় এক বাড়িতে থাকলে।

ক্ষীণ অস্পষ্ট আশা কি জাগে বিভার মনে যে আজ হয়তো তার কাছেই কেউ এসেছে? কেউ তো এক রকম আসেই না, যদিই বা কেউ আজ এসে থাকে!

একটু পরেই ফ্রক পরা তিন বছরের একটি মেয়ের হাত ধরে বিভার সমবয়সী একটি মেয়ে খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

'ভাবতে পেরেছিলি? কেমন চমকে দিয়েছি!'

তাকে দেখেই বিভা ধড়মড় করে উঠে বসে। উজ্জ্বল, ব্যাকুল ও উৎসুক কণ্ঠে সে বলে, 'রানী! ইস্, কী রোগা হয়ে গেছিস্? কী চেহারা হয়েছে তোর?'

রানী যেন বেশ একটু ভড়কে যায়, মুখের হাসি খানিকটা মিলিয়ে আসে, 'তা যদি বলিস, তুইও তো কম রোগা হসনি। কালো হয়ে গেছিস যে, তোর অমন রঙ ছিল?'

দুই সখী ব্যাকুল ও প্রায় খানিকটা ভীতভাবে পরস্পরের সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে দেখতে থাকে। দুজনেরই ভাঙাচোরা অতীতের প্রতিবিম্ব নিয়ে যেন দুটি আয়নার মতো তারা পরস্পরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন খারাপ হয়ে গেছে চেহারা, এত ময়লা হয়েছে রঙ, অমন ক্লিষ্ট হয়েছে চোখ? এতখানি উপে গেছে স্বাস্থ্যের জ্যোতি, রূপ-লাবণ্য? প্রতিদিন আয়নার সামনে তারা চুল বাঁধে, মুখে পাউডার সিঁথিতে সিঁদুর দেয়, নিজেকে রোগা মনে হয়, কখনো একটু আপসোস জাগে। কিন্তু আজ বন্ধুর চেহারা চেয়ে দেখার আগে পর্যন্ত তারা ধরতেও পারেনি কবছরে কী শোচনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে নিজের দেহেও, কী ভাবে শুকিয়ে সিঁটকে গেছে।

'আয় রানী বোস। ক-টি হল?'

বিভা রানীর মেয়ের হাত ধরে কোলে টেনে নেয়।

'কটি আবার? এই একটি। তোর?'

কতকাল কেটেছে, ক-বছর? এই তো সেদিন তাদের বিয়ে হল, যুদ্ধ বাধার পর একে একে দুজনেরই। বছর পাঁচেক কেটেছে তাদের শেষ দেখা হবার পর। পাঁচ বছরে একটি মেয়ে হয়ে রানীর সেই আঁটো ছিপছিপে গড়ন, যা দেখে তার প্রতিদিন হিংসা হত, সে গড়ন ভেঙে এমন চাঁচাছোলা প্যাঁকাটির মতো বেঢপ হয়ে গেছে? কণ্ঠার হাড় উঁকি মারছে, চিবুকের ডোল বুঝি আর খুঁজলেও মেলে না। অমন মিষ্টি কোমল ফর্সা রঙ জলে ধোয়া কাটা মাছের মতো কটকটে সাদা হয়ে গেছে। বিভা ভাবে আর উতলা হয়, তার চোখে জল আসে। বিভার দুটি ছেলেই ঘুমোচ্ছিল, ছোটটির দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে রানী মৃদুস্বরে বলে, 'ওর কত বয়স হল?'

'দু বছর।'

দুটি ছেলেই রোগা, ছোটটির পেট বড়, হাত পা কাঠির মতো সরু। ওদিকে দেখতে দেখতে রানী নিজের চেহারার কথা ভুলে গিয়েছিল। আচমকা সে বলে, কি আর করা যাবে, বেঁচেবর্তে যে আছি তাই ঢের। যা দিনকাল পড়েছে।'

'সত্যি! শেষ করে দেবে।'

বিভা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। সে ভুলে গিয়েছিল কী ভয়ংকর দুর্দিনের মধ্যে কী প্রাণান্তকর কষ্টে তারা বেঁচে আছে, ভুলে গিয়েছিল কী অবস্থায় কী খেয়ে কত দুশ্চিন্তা আর আতঙ্ক বুকে নিয়ে তারা দিন কাটায়। ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে আর অস্পষ্ট অনুভব করে মনের মধ্যে যে রহস্যময় ভীতিকর একটা চোরাবালির স্তর গড়ে উঠেছে, যার অতল বিষাদ আর হতাশায় মিছে মায়ার মতো দু দিনের অর্থহীন লীলাখেলার মতো জীবন যৌবন তলিয়ে যায়, সেটা আজ আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। এই তবে জীবনের রীতিনীতি মানুষের বাঁধাধরা অদৃষ্ট যে এত তাড়াতাড়ি তারুণ্য আনন্দ উৎসাহ সব শেষ হয়ে যায়? জীবনের এই চিরন্তন নিয়মেই সে আর

বিভা জীবনটা শুরু করতে না করতে মাত্র পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সে অমন হয়ে গেছে? রানী তাকে মনে পাড়িয়ে দিয়েছে, না, তা নয়! জীবন অত ফাঁকিবাজ নয়, অমন ভঙ্গুর নয় দেহ। শুধু খেতে পরতে না পেয়ে, চিন্তায় ভাবনায় জর্জরিত হয়ে, হাসিখুশি আমোদ-আহ্লাদের অভাবে তাদের এই দশা।

'একা এসেছিস রানী?'

'একা কেন? ঘোড়ায় চেপেই এসেছি, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে!'

'কী আশ্চর্য! তুই কি বল তো? এতক্ষণ বলতে নেই?'

অসহায়ভাবে বিভা পরনের কাপড়খানার দিকে তাকায়। রানী একখানা ভাল কাপড় পরে এসেছে, আগেকার দিনের সঞ্চিত তোরঙ্গে তোলা কাপড়ের একখানা, বিয়েবাড়ির মতো বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া কেউ যা পরে না, পরলে মানায়ও না। এ রহস্যের মানে বিভা জানে, তারও একই অবস্থা। আত্মীয় বন্ধুর বাড়ি যেতে, সিনেমা দেখতে, বেড়াতে বার হতে সাধারণ রকম ভালো কাপড় যা মানায় তার তোরঙ্গেও আগেকার পাঁচ সাতখানা ছিল, বাড়িতে পরে পরে সে ভাণ্ডার শেষ হয়েছে। এ দুঃশাসনের দেশে দ্রৌপদীদের কাপড় টানাটানির শেষ নেই।

বিয়ের সময়ের দামী শাড়ি আর ঘরে পরার শাড়ির মাঝামাঝি কিছু নেই, রাখা অসম্ভব। ঘরেও তো উলঙ্গ হয়ে থাকতে পারে না মেয়েমানুষ? ইতিমধ্যে মরিয়া হয়ে চোখ কান বুজে সাধারণ সামাজিকতা রাখার জন্য সাধারণ রকম ভালো দু একখানা কাপড় সে কিনেছে, প্রাণপণে চেষ্টা করেছে এই প্রয়োজনে ছাড়া ব্যবহার না করার কিন্তু সম্ভব হয়নি। চব্বিশ ঘণ্টা দেহ ঢাকতে হয়, বাসি কাপড় ছাড়তে হয়, স্নান করে ধুতে হয়, সাবান কেচে ধোপে দিয়ে ধোয়াতে হয়—নিত্যকার এই চলতি প্রয়োজনের দাবি সবচেয়ে কঠোর। তাই ভাবতে হয়েছে, এখনকার মতো পরে কটা দিন চালিয়ে দিই, উপায় কি, ধোপ দিয়ে এনে তুলে রাখব। তুলে রেখেছে কিন্তু বেশী দিন তুলে রাখা যায়নি। আলনার শাড়ি দুখানার একটি পরনের খানার মতোই ছেঁড়া, অন্যটি বড় বেশী ময়লা। বাক্স কি খোলা যায়? রানীর স্বামী সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, এখন কি অত সমারোহ করা চলে? হাত বাড়িয়ে সে ময়লা কাপড়খানাই টেনে নেয়।

কল্যাণী অমিয়কে জিজ্ঞাসা করছিল, 'কাকে চান?' কল্যাণী বিভার চেয়ে দশ বছরের বড় হবে, তার বেশী নয়। তার দুটি ছেলে মেয়ে, সংসারে এগারজন লোক। সেই চাপে তার লজ্জা সরম মুষড়ে গেছে। আঁচিয়ে উঠে সদরে মানুষ দেখে এক কাপড়ে সে অনায়াসে তার প্রয়োজন জানতে এসেছে, তার সংকোচ নেই দ্বিধা নেই অস্বস্তি নেই। দাসীর মতো দেখায় না রানীর মতো দেখায়, বাইরের অজানা লোকের চোখে কেমন লজ্জাকর ঠেকে এ চিন্তার অঙ্কুরও বুঝি আর গজায় না তার মনে, এমন শক্ত অনুর্বর হয়ে গেছে তার মধ্যবিত্তের অভিমান।

কিন্তু কী ভয়ানক কথা, নিজেও বিভা যে এগিয়ে এসেছে ব্লাউজ না গায়ে দিয়েই! এটা তারও খেয়াল হয়নি। তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায় বলে দশটা নাগাদ বাড়ির পুরুষরা আপিসে-কাজে বেরিয়ে গেলেই সে ব্লাউজ খুলে ফেলে, বিকালে পুরুষদের ফেরার

আগে একেবারে গা ধুয়ে আবার গায়ে দেয়। খালি গায়ে থাকাটা কি তারও অভ্যাস হয়ে গেল কল্যাণীর মতোই? দাসী চাকরানী মজুরনীর মতোই? কান দুটি গরম হয়ে ওঠে বিভার।

'আমাদের এখানে এসেছেন', সে কল্যাণীকে বলে, 'সেই যে রানীর কথা বলেছি আপনাকে, আমার ছেলেবেলার বন্ধু? তার স্বামী।' 'আপনার অসুখ নাকি?' কল্যাণী বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করে।

'অসুখে পড়েছিলাম, এখন সেরে উঠেছি।'

কল্যাণী বোধ হয় কথাটা বিশ্বাস করে না, অমিয়র চেহারায় সেরে ওঠার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া সত্যই কঠিন। কোন রোগ সেরে গেলে এরকম চেহারা হয় না মানুষের, রোগ বজায় থাকলেই হয়। কালিপড়া চোখে শুধু তার দৃষ্টিটা উজ্জ্বল ঝকঝকে।

'ওঃ, মনে পড়েছে' কল্যাণী আচমকা বলে, 'আপনারই গুলি লেগেছিল। কাগজে পড়ে বিভা বলেছিল আপনার কথা।'

এত বড় কথাটা ভুলে যাওয়ার জন্য কল্যাণী অপরাধীর মতো হাসে। 'অসুখও হয়েছিল।' অমিয় বলে।

দশ মিনিটের বেশী অমিয় বসে না। কাজে যাবার পথে সে রানীকে শুধু পৌঁছে দিতে এসেছে। বেচারীর গুলিও লেগেছে, সরকারী দপ্তরের চাকরিটিও গেছে। বন্ধুরা একটি কাগজে মোটামুটি একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। ঘটনাচক্রে কাগজটি আবার সরকার-বিরোধী, কাগজটাই কবে বন্ধ হয়ে যায় ঠিক নেই।

কিন্তু অমিয়কে বিশেষ শঙ্কিত মনে হল না। ববং কেমন একটা বেপরোয়া ভাব এসেছে।

'কি জানেন, সব উনিশ আর বিশ', সে বিভাকে বলে, 'ও ছাতার চাকরি থেকেই বা কি এমন স্বর্গলাভ হচ্ছিল? ঘরে বাইরে চাকরির মর্যাদা রাখতে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। নিজের মনটাও মানে না, যেমন হোক চাকরি তো করি, মাস গেলে মাইনে তো পাই যা হোক, একদম মিনিমাম ভদ্রলোকের স্ট্যাণ্ডার্ড তো অন্তত রাখতে হবে? সে এক ছুঁচো গেলার অবস্থা, পেটও ভরাতে পারি না, না খেয়ে মরতেও পারি না। এখন শালা বেশ আছি, হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার ব্যাস্‌!' অনায়াসে বিনা দ্বিধা সংকোচে সে বিভার সামনে শালা শব্দটা উচ্চারণ করে। সত্যই করে। কী ছোটলোক হয়ে গেছে শিক্ষিত মার্জিত ভদ্র সন্তান! পাশে কোথায় রেডিয়োতে মিষ্টি অলস সুরে গান বাজছে, উঠোনে এঁটো বাসনের ঝনঝনানি। কল্যাণীদের বাসনের সঙ্গে দোতালার এঁটো বাসনও উঠনে এসে জড়ো হচ্ছে। একসঙ্গে ছোট ছেলেমেয়ে কাঁদছে তিনটে অথবা চারটে, সংখ্যাটা ঠিক ধরা যায় না।

উঠে দাঁড়িয়ে অমিয় বলে, 'আপনার চিঠি পাবার পর থেকে বাড়ি বয়ে এসে ঝগড়া করার জন্য কোমর এঁটে বসেছিল, আমার অসুখের জন্য দেরি হয়ে গেল।'

'কিসের ঝগড়া?'

'বলেনি? চিঠিটা পড়ে কেবলি বলত, দেখলে? ছেলেবেলার বন্ধু, কত ভাব

ছিল, কাগজে গ্নলি লাগার খবর পড়ে একটা চিঠি লিখে দায় সেরেছে। কর্তাটিকে পাঠিয়েও তো খবর নিতে পারত?'

'ওঃ, এই ঝগড়া!'—বিভা সত্যই বিব্রত বোধ করে, 'যাব মনে করেছিলাম। ওঁকে তাগিদ দিয়েছি, এক মাসের ওপর যাব যাব করছেন—'

'কিন্তু যেতে পারেননি।' কোটরে বসা চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সোজা বিভার মুখের দিকে তাকিয়ে দশ মিনিটে গড়া আশ্চর্য অন্তরঙ্গতায় মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অমিয় সহজ সহানুভূতির সায় জানিয়ে বলে, 'আপিস, ছেলে পড়ানো, বাজার রেশন কয়লা ওষুধ ডাক্তার—কি করেই বা পারবেন?''

'এখনো ছুঁচো গেলার অবস্থা।'—বিভা প্রাণ খুলে হাসে।

অমিয় চলে গেলে বিভা সহজভাবে বলে, 'নে কাপড়টা ছেড়ে হাত পা এলিয়ে বোস, সং সেজে থাকতে হবে না।'

সত্য কথা বলতে কি, রানীকে এতক্ষণ সে প্রাণ খুলে গ্রহণ করতে পারেনি, ভিতরে একটা আবিষ্টভাব বজায় থেকে গিয়েছিল। খুশী হলেও সে আনন্দে খাদ ছিল। হোক সে ছেলেবেলার সখী, মাঝখানে অনেক ওলোটপালোট হয়ে গেছে চারিদিকে ও তার নিজের জীবনে। কে বলতে পারে তাকে কি রকম দেখবে কল্পনা করে এসেছে রানী, তার কাছে কি রকম ব্যবহার আগে থেকে মনে মনে চেয়ে এসেছে? হয়তো অনেক কিছু অন্য রকম দেখে তার ভালো লাগছে না—হয়তো সে ভুল বুঝছে তার কথা ও ব্যবহার, আরও হয়তো ভুল বুঝবে! এই একখানা আর পাশের আধখানা নিয়ে দেড়খানা ঘরে কত দিকে যে বিষিয়ে গেছে জীবনটা সে নিজেই কি খানিক খানিক জানে না? রানী এসে দাঁড়ানো মাত্র তাব ফ্যাকাশে ম্লান চেহারা দেখে উতলা হওয়ার সংগে প্রাণটা তার ধক্ করে উঠেছিল বিপদের আশঙ্কায়! তার সখী এসেছে, এককালে দিনে অন্তত এক বার যাকে কাছে না পেলে সে অস্থির হয়ে পড়ত, এতদিন পরে সেই সখী এসেছে তার ঘরের দরজায়—আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওকে তো সে অভ্যর্থনা করতে পারবে না, হেসে কেঁদে অনর্গল আবোল-তাবোল কথা যা মনে আসে বলে গিয়ে প্রমাণ দিতে পারবে না সে কৃতার্থ হয়েছে! সে সাধ্য তার নেই, হাজার চেষ্টা করেও বেশীক্ষণ সে আনন্দোচ্ছ্বাস বজায় রাখতে পারবে না, ঝিমিয়ে মিইয়ে তাকে যেতেই হবে। কী ভাববে তখন রানী? কি বিশ্রী অবস্থা সৃষ্টি হবে?

আরও ভেবেছিলঃ বিকাল পর্যন্ত যদি থাকে, চায়ের সংগে ওকে কী খেতে দেব? ওর মেয়ে যদি দুধ খায়, দুধ কোথায় পাব? শ্রান্তিতে যদি ওর হাই ওঠে, বিছানায় কি পেতে দিয়ে ওকে আমি শুতে দেব?

দশ মিনিটের মধ্যে অমিয় তাদের সখিত্বকে সহজ করে বাস্তবের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছে। বিভার আর কোন ভয় নেই, ভাবনা নেই, সংকোচ নেই। কারণ, কোন অভাব কোন অব্যবস্থার জন্য রানী তাকে দায়ী করবে না, তার মেয়ে দুধের খিদেয় কাঁদলে সে যদি শুকনো দুটি মুড়ি শুধু তাকে খেতে দেয় তাতেও

নয়! চাদরের বদলে ময়লা ন্যাকড়া পেতে দিলেও গা এলিয়ে রানী তাকে গাল দেবে না মনে মনে।

এটুকু অমিয় তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

ময়লা শাড়িখানা পরে রানীও যেন বাঁচে।

'একটা পান দে না বিভা?'

'কোথা পাব পান? ত্যাগ করেছি। মাসে তিন-চার টাকা খরচ—কী হয় পান খেয়ে? একটি লবঙ্গ মুখে দিলে মুখশুদ্ধি হয়। নে।' বিভার বাড়ানো হাতে প্ল্যাসটিক্‌সের চুড়ি নজর করে রানী হাসে। 'তুইও ধরেছিস? ভাগ্যে এ ফ্যাশনটা চালু হচ্ছে—সোনা না দেখে লোকে কিছু ভাবে না।'

'ফ্যাশন কি এমনি চালু হয়? যেমন অবস্থা, তেমন ফ্যাশন। সোনা নেই তোর?'

'টুকটাক আছে। তোর?'

'চারগাছা চুড়ি সরু হারটা আর কানপাশা। ওবছর টাইফয়েডের এক পালা গেল, তারপর আমার কপাল টানল হাসপাতালে। মরবে জেনেও কেন যে পেটে আসে বুঝি না ভাই। আমাকেও প্রায় মেরেছিল, কী যে কষ্ট পেলাম এবার। অথচ দ্যাখ এ দুটোর বেলা ভালো করে টেরও পাইনি। দিনকাল খারাপ পড়লে কি মানুষের বিয়োনের কষ্টও বাড়ে?'

'বাড়ে না? খেতে পাবে না, মনে শান্তি থাকবে না, গায়ে পুষ্টি হবে না, বিয়োলেই হল?'

দুই সখী অদ্ভুত এক জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে চোখে চোখে তাকায়, দুজনের মনে এক সঙ্গে একই অভিজ্ঞতা একই সমস্যা জেগেছে, আজ দুজনের নিরিবিলি দুপুরে কাছাকাছি আসার সুযোগে পরস্পরের কাছে প্রশ্নটা তাদের যাচাই করে নিতেই হবে। জানতে হবে, খাপছাড়া অদ্ভুত একটা ফাঁদে পড়ার যে রহস্যময় ব্যাপারটা নিয়ে যন্ত্রণার অন্ত নেই, সেটা শুধু একজনের বেলাই ঘটছে না দুজনেরই সমান অবস্থা। বুঝতে হবে কেন এমন হয়, এমন অঘটনের মানে কি?

রানী বলে, 'বল না? তুই আগে বল।'

আগেও ঠিক এমনি ভাবেই জীবনের গহন গভীর গোপন রহস্যের কথা উঠত, কেউ একজন মুখ খোলার আগে চোখ মুখের ভাবভঙ্গি দেখেই দুজনে টের পেত যে জগতের সমস্ত মানুষের কাছ থেকে আড়াল করা শুধু তাদের দুই সখীর প্রাণের কথা বলাবলি হবে!

বিভা বলে, 'কিছু বুঝতে পারি না ভাই। এরকম যাচ্ছেতাই শরীর, কী যে খারাপ লাগে বলার নয়, তবু আমার যেন বেশী করে ভূত চেপেছে। বিয়ের পর দু-এক বছর সবারই পাগলামি আসে; ও বাবা, এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে তখন রীতিমতো সংযমী ছিলাম বলা চলে। আগে ভাবতাম ও বেচারীর দোষ, ঝগড়া করে ওঘরের দুপাটির মাঝে বিছানা করে শোয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। তখন টের পেলাম, কি বিপদ, আমারও দেখি মরণ নেই! ঘুম আসবে কি ছাই, উঠে এসে যদি ডাকে

ভেবে কি ছটফটানি আমার। বিশ্বাস করবি? থাকতে না পেরে শেষে নিজেই এলাম!'

রানী একটু হাসে, 'উঠে এসে বললি তো একা শুতে ভয় করছে?'

'তোরও তবে ওই রকম?'—বিভা যেন স্বস্তি পায়।

'কি তবে? তোর এক রকম আমার অন্য রকম?'

দুই সখী আশ্চর্য হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

রানী বলে, 'তবে, আমার আজকাল কেটে গেছে, অন্য দিকে মন দিতে হয়। তোরও কেটে যাবে।'

একটু ভেবে রানী বলে, 'আমার মনে হয় এ একটা ব্যারাম। ভালো খেতে না পেলে ভাবনাচিন্তায় কাহিল হলে এরকম হয়। ছেলেপিলেকে দেখিস না পেটের ব্যারাম হলে বেশী খাই খাই করে, চুরি করে যা তা খায়?'

'চুরি করেও খাস না কি তুই?'

দুই সখী হেসে ওঠে।

সেই এক মুহূর্তের হাসির ক্ষীণ শব্দ সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে যায় শিশুর কান্না বাসন নাড়ার শব্দ মেশানো দুপুরের স্তব্ধতায়। শুধু শিশুর কান্না নয়, এ বাড়ির দোতালাতেই মেয়েলী গলায় একজন সুর করে কাঁদছে। উপর তলায় একজন ভাড়াটে রমেশ, তার বুড়ী মা। রমেশের ছোট ভাই অশেষ, সবে কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরির ধান্ধায় ঘুরতে শুরু করেছিল, কদিন আগে টি-বি রোগে সে মারা গেছে।

'এই সেদিন দেখেছি চলাফেরা করছে', বিভা হঠাৎ শিউরে উঠে বলে, 'দিনরাত ঘুরে বেড়াত। ওঁর সঙ্গে তর্ক করত আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি কি না। এই বিছানায় বসে একদিন রাত্রে কথা কইতে কইতে কাশতে শুরু করল, এক ঝলক রক্ত উঠে চাদরে পড়ল। কী রকম ভ্যাবাচেকা খেয়ে যে চেয়ে রইল ছেলেটা। আগে একটু-আধটু রক্ত পড়েছে গ্রাহ্যও করেনি, সেদিন প্রথম বেশী পড়ল। নিজের শরীরটাকে পর্যন্ত গ্রাহ্য করে না, কী যে হয়েছে আজকালকার ছেলেরা '

আনমনে কি যেন ভাবে, একটু ম্লান হেসে বলে, 'প্রথমে ঠিক হয়েছিল চাদরটা পুড়িয়ে ফেলব। কিন্তু তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা চাদর কিনতে হয়। শেষ পর্যন্ত তাই—'

এ কথাটাও বিভা শেষ পর্যন্ত বলে উঠতে পারে না, আবার আনমনা হয়ে যায়।

'কি ভাবি জানিস রানী? শুধু শাকপাতা আর পচা চালের দু-মুঠো ভাত খায়, না এক ফোঁটা দুধ না এক ফোঁটা মাছ। এই খেয়ে আপিস করা, রাত নটা পর্যন্ত ছেলে পড়ানো। একদিন যদি ওই রকম কথা কইতে কইতে কাশতে শুরু করে আর—'

এ কথারও শেষটা মুখে উচ্চারণ করা অসম্ভব।

রানী অসম্ভবকে সম্ভব করে যোগ দেয়,—'রক্তে বিছানা যদি লাল হয়ে যায়? আমিও আগে এরকম আবোলতাবোল কত কী ভাবতাম। রক্তে একদিন রাস্তাই লাল হয়ে গেল। আর ভাবি না। কী আছে অত ভয় পাবার, ভাবনা করার? সংসারে কুলিমজুরও তো বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে।'

ফেরিওলা

বর্ষাকালটা ফেরিওলাদের অভিশাপ।

পুলিস জ্বালায় বারোমাস। দুমাসে বর্ষা হয়রানির একশেষ করে। পথে ঘুরে ঘুরে যাদের জীবিকা কুড়িয়ে বেড়ানো তাদের প্রায় পথে বসিয়ে দেয়।

না ঘুরলে পয়সা নেই ফেরিওলার। তার মানেই কোনমতে পেট চালানোও বরাদ্দ নেই।

আকাশ পরিষ্কার দেখেই জীবন বেরিয়েছিল। ঘণ্টাখানেক ঘুরতে না ঘুরতে বৃষ্টি নেমে এসেছে।

পুরানো জীর্ণ বাড়িটার ঢাকা বারান্দায় আশ্রয় নিয়ে মনে মনে সে বর্ষাকে অভিশাপ দেয়।

কিন্তু দেহটা যেন সায় দিতে রাজী হয় না। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার সুযোগটাকে সাগ্রহে বরণ করতে চায়। দিন দিন যেন আরও বেশী বেশী দুর্বল মনে হচ্ছে শরীরটা।

বর্ষা বাদ সেধেছে রোজগারে, খাওয়া আরও কমে গেছে আপনা থেকে, সেই জন্য কি?

এক কাঁধের শাড়ি চাদর আর অন্য কাঁধের গামছাগুলির ওজন খুব বেশী নয়। ভারী হওয়ার মতো বেশী মাল সে কোথায় পাবে? এই সেদিন পর্যন্ত শুধু গামছাই ফেরি করত, কয়েক মাস যাবৎ কিছু শাড়ি আর বিছানার চাদর নিয়ে বেরোয়।

তবু এইটুকু ওজন কাঁধে নিয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুরেই যেন গায়ের জোর ফুরিয়ে আসে, হাঁটতে রীতিমতো কষ্ট হয়। 'শাড়ি চাদর গামছা চাই' বলে হাঁক দিতে যেন দমে কুলোয় না, বুকে লাগে, কাসি আসে।

'শাড়ি আছে?'

পাশের দরজার একটা পাট খুলে দাঁড়িয়েছে ছ-সাত বছরের হাফপ্যাণ্ট পরা একটি মেয়ে। কিন্তু জিজ্ঞাসাটা তার নয়। দরজার আড়াল থেকে মেয়েলী গলায় প্রশ্নটা এসেছে।

'শাড়ি আছে মা। নেবেন?'

'কৈ দেখি।'

একদিকে মিশ কালো অপর দিকে টুকটুকে লাল পাড়ওলা মিহি শাড়িটা জীবন ছোট মেয়েটির হাতে তুলে দেয়। তার সাধারণ মোটা তাঁতের শাড়ির মধ্যে এখানাই

সব চেয়ে সেরা এবং সব চেয়ে দামী কাপড়। আজ প্রায় দশ-বার দিন কাপড়টা নিয়ে ঘুরছে, বিক্রি হয়নি। দাম শুনে সবাই ফিরিয়ে দেয়। দরদস্তুর পর্যন্ত করে না।

এখানেও তাই ঘটে। দাম শোনার পর ফিরে আসে কাপড়টা।

'কম দামের নেই?'

তিন-চারখানা রঙীন তাঁতের শাড়ি মেয়েটির হাতে ভিতরে যায় আসে, আসল দরদস্তুর শুরু হল লাল পাড়, ফিকে সবুজ জমির শাড়িখানা নিয়ে। জিনিসটার গুণকীর্তন করতে করতে জীবন দশ টাকা থেকে নামে, অপর পক্ষ চার টাকা থেকে অল্পে অল্পে ওঠে। রফা হয় ছ টাকায়।

দর করতে পাকা হয়ে উঠেছে মেয়েরা। ফেরিওলাকে একেবারে অর্ধেকের চেয়ে কম দাম বলে বসতে পুরুষের সঙ্কোচ হয়, মেয়েদের একবার ভাবতেও হয় না।

একটি টাকা আর সিকি দুয়ানিতে মিলিয়ে মেয়েটি দুটি টাকা তুলে দেয় জীবনের হাতে।

'বাকিটা দুদিন পরে নিও।'

'ধারে তো দিতে পারব না মা। সামান্য কারবার, দাম ফেলে রাখলে পোষায় না মা।'

বাকিতে মাল দিতে হয় জীবনকে। দুপুর বেলা ঘরের মেয়েদের সঙ্গে বেচা-কেনা, মেয়েদের হাতে শুধু টাকা না থাকার জন্যই নয়, টাকা থাকলেও অনেক সময় কর্তাকে দিয়ে কেনাটা আগে মঞ্জুর করিয়ে নেবার জন্যও বাকিতে নেওয়া দরকার হয়। মঞ্জুর না হলে যাতে ফিরিয়ে দেওয়া চলে পরদিন।

অচেনা বাড়ি অচেনা মানুষ হলেও এটা মেনে নিতেই হয় ফেরিওলাকে। দুয়ারের কাছে বসে ঘরসংসার যেটুকু দেখা যায় দেখে আর সামনে এসে যে মানুষটা জিনিস পছন্দ করে কেনে তার বেশভূষা চালচলন থেকে ফেরিওলা আঁচ করে নিতে পারে ধারে মাল রেখে যাওয়া নিরাপদ কি না।

কিন্তু এভাবে ফেরিওলার সামনে বেরোতে লজ্জা করাটা রহস্যজনক অস্বাভাবিক ব্যাপার। ফেরিওলাকে মেয়েরা লজ্জাও করে না, ভয়ও করে না।

এ অবস্থায় টাকা বাকি রাখা যায় না। কালপরশু এসে হয়তো শুনবে, কই, এ-বাড়িতে কেউ তো কাপড় রাখেনি তোমার কাছে। কাকে তুমি কাপড় দিয়েছিলে, কে রেখেছে তোমার কাপড়?

ভেতর থেকে মেয়েলী গলায় আবার মিনতি মেশানো উপরোধ আসে, 'দুদিন বাদে এলেই ঠিক পেয়ে যাবে।'

'বাকি দিতে পারব না মা।'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটে। তারপর দরজার দুটি পাট খুলে এসে দাঁড়ায় শ্যামবর্ণা একটি বৌ। লাল পাড় ফিকে সবুজ জমির নতুন শাড়িটিই সে পরেছে।

করুণ কণ্ঠে বলে, 'মা বলে ডেকেছ, বাকি না রেখে গিয়ে পারবে না বাবা। গা থেকে খুলে নিতে হবে। তোমার সামনে আসতে পারিনি, তোমার কাপড়টি পরে তবে এলাম।'

এ জুলুমের প্রতিকার নেই। আধঘণ্টা পরে বৃষ্টি ধরলে জীবন বিরস মুখে পথে নেমে যায়। শহরতলীর শহরে আর গেঁয়ো পথে ধীরে ধীরে হাঁটে আর মাঝে মাঝে হাঁক দেয়। শহর আর গ্রাম শহরতলীতে একাকার হয়ে যায়নি এখনো, পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে এসেছে। এখানে ওখানে শুধু মিশে গেছে খানিকটা। শুধু একটা ইঁটের প্রাচীরের ব্যবধান হলেও পানাপুকুরটা খাপ খায়নি নতুন ঝকঝকে সিনেমা হলটার সঙ্গে।

কত রকমারি জিনিসের কত ফেরিওলা যে পথে নেমেছে এই শহরতলীর। কিন্তু জীবন জানে তার হাঁক শুনলে, ছিটকাপড় সায়া ব্লাউজওলার হাঁক শুনলে, সব চেয়ে বেশী উৎসুক মুখ উঁকি দেয় জানালা দিয়ে, তারাই আকর্ষণ করে সব চেয়ে বেশী লুব্ধ দৃষ্টি।

সন্ধ্যার আগে শ্রান্ত অবসন্ন দেহে জীবন শহরতলীর সীমান্তে তার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। এলুমিনিয়ামের বাসনের ঝাঁকা মাথায় একজন এগিয়ে আসছিল তারই মতো শ্রান্ত পায়ে; দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'শাড়ির কেমন দাম ভাই?'

'তের-চোদ্দ জোড়া হবে।'

'তের-চোদ্দ!'

'এগার টাকার নীচে নেই!'

সে নীরবে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়।

বীণা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, 'কি রকম হল?'

'সুবিধে নয়।'

প্রায় ছেঁড়া ন্যাকড়া হয়ে গেছে বীণার কাপড়টা। ঘরে সে এটাই পরে। চৈতন্যবাবুর বাড়ি খাটতে যাওয়ার জন্য একমাত্র সম্বল একখানি আস্ত কাপড় সে সযত্নে তুলে রাখে। আপিসে যাওয়ার জন্য ওদিকের ঘরের অঘোরের মতো একটি ধুতি, পাঞ্জাবি আর গেঞ্জির সেটটি প্রাণপণে বাঁচিয়ে চলার মতো। টেনেটুনে যতদিন চালানো যায়।

গামছা আর শাড়িচাদরের বোঝা নামিয়ে জীবন চৌকিতে সটান শুয়ে পড়লে, বীণা ভূমিকা শুরু করে দেয়, 'শুনলে তো তুমি রাগ করবে, কিন্তু কি করব বল উপায় ছিল না, এলুমিনিয়ামের একটা হাঁড়ি কিনেছি ফেরিওলার কাছে।'

একটু থেমে বলে, 'আগের হাঁড়িটা ফুটো হয়ে গেছে কদিন। তোমার রকমসকম দেখে আমি বাবু বলতে ভরসা পাইনি। ভাত তো রাঁধতে হবে, পিণ্ডি? মাটির হাঁড়িটাতে চাল রাখতাম, কদিন সেটাতে ফুটিয়েছি। আজ সকালে সেটাও ফেঁসে গেছে।'

জীবন কিছু বলে কিনা শোনার জন্য খানিকটা থেমে আবার বলে, 'একটু চালাকি করে বাকিতে রেখেছি। ওইটুকু হাঁড়ি, তার দাম সাতসিকে! দরদস্তুর করে পাঁচসিকেয় রাজী করালাম। তা পাঁচসিকে পয়সাই বা দিই কোত্থেকে? বললাম, ফুটোফাটা আছে কিনা দেখে কাল দাম দেব। কিছুতে বাকিতে দেবে না। কি করি?

উনুনটা ধরেনি তখনো ভাল করে। হাঁড়িটা চটপট মেজে জল আর চাল দিয়ে ধোঁয়ার মধ্যেই চাপিয়ে দিলাম। ভেতরে ডেকে এনে দেখালাম। বললাম, কি করি বল, উনুনে চাপিয়ে দিয়েছি, ধারে না দিলে উনুন থেকে নামিয়ে নিয়ে যেতে হয়। গজর গজর করতে করতে চলে গেল।'

নতুন হাঁড়িতে ভাত রান্না হয়েছে। তাতে কি একটু নতুনত্ব লাগবে? বোঁটকা গন্ধটা একটু কেটে যাবে, ঠান্ডা হয়ে আসতে আসতে কড়কড়ে হয়ে যাবে না?

অবসাদ কল্পনাতেও কেমন ছেলেমানুষী রঙ লাগিয়ে দেয়। বাচ্চা দুটোর সঙ্গে বসে ঢ্যাঁড়স চচ্চড়ি আর ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে জীবন ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে মুষলধারে বৃষ্টি।

শেষ রাত্রে নেমেছে। টুপটাপ জল পড়ে পড়ে ঘরের ভিতরটা অর্ধেক ভেসে গিয়েছে। ছাতটা একটু কাত হয়ে আছে একদিকে। কে জানে এভাবেই তৈরি হয়েছিল কিনা অথবা এটা প্রাচীনত্বের ফল। ধসে পড়ুক আর যাই হোক, ভাগ্যে ছাতটা একটু কাত করা। এপাশে জল চুঁইয়ে এলেও সরাসরি ঝরে না পড়ে ছাত বেয়ে খানিকটা গড়িয়ে গিয়ে ঝরে—তাই চৌকিটা রক্ষা পায়।

রক্ষা পায় ছেঁড়া তোশক বালিশ জামা কাপড়ের সঙ্গে নতুন শাড়ি চাদর গামছা—আর বাচ্চা দুটো।

জীবন ভেবেছিল খুব ভোরে বেরিয়ে পড়বে, মাল নিয়ে সরাসরি গিয়ে বৌটির স্বামীকে পাকড়াও করে কাপড়ের বাকি দামটা আদায় করে ছাড়বে।

কিন্তু সর্বদিক দিয়ে শত্রুতাই যদি না করবে তবে আর বর্ষাকাল কিসের!

কে জানে সারাদিনে আজ এ বৃষ্টি ধরবে কিনা?

বীণা গোমড়া মুখে বলে, 'এর মধ্যে কি করে কাজে যাই? কামাই করলে গিন্নী আবার ক্ষেপে যায়!'

বীণার গায়ের রঙ শ্যাম, হাজায় হাজায় হাত আর পায়ের আঙুলগুলি সাদা হয়ে গেছে। দেখলে মনে হয় হাতে পায়ে বুঝি মরণদশার পচন ধরেছে।

জীবন বলে, 'গিন্নী ক্ষেপে যান যাবেন, বর্ষা হলে মানুষ করবে কি?'

চৌকিতে গুছিয়ে রাখা নতুন শাড়িগুলির দিকে চেয়ে বীণা বলে, 'তুমি তো বলে খালাস, গিন্নী এদিকে এবার পুজোয় কাপড় না দেবার ফিকিরে আছে। পরশু একবেলা কামাই করলাম, তাতেই শাসিয়ে দিয়েছে—কামাই করলে পুজোর কাপড় পাবে না বাছা, বলে রাখলাম।'

'না দেয় না দেবে। আমরা ভিখিরি নই।'

'ভিখিরি কিসের? সব ঝি পায়। সারা বছর কাজ করলেই দুখানা কাপড় দিতে হবে।'

জীবন মৃদু হেসে বলে, 'এ তো আগের নিয়ম গো, এবার কজনে পায় দেখো। নিয়ম বলে কিছু আছে দেশে? নইলে লেখাপড়া শিখে গামছা ফিরি করি, তোমায় ঝিগিরি করতে হয়?'

বীণা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'জানো, মাগী টের পেয়েছে তুমি আমায় অন্য বাড়ি খাটতে দেবে না। নইলে এত তেজ দেখাতে সাহস পেত না। অন্য ঝিবা কথায় কথায় কাজ ছাড়ছে, আজ এ বাড়ি কাল ও বাড়ি করছে।'

মূক আবেদনের ভঙ্গিতে বীণা চেয়ে থাকে। কিন্তু জীবনের কাছ থেকে কোন সাড়া-শব্দ মেলে না। অন্য ঝিদের মতো এ বাড়ি ও বাড়ি কাজ করে বেড়াবার অনুমতি সে বীণাকে দিতে পারবে না। ঘরের কাছে হারাধনবাবুর বাড়ি, বুড়ো হারাধন ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ নেই। বৌকে এখানে কাজ করতে দিতে হয়েছে তাই যথেষ্ট। তাকে পুরোপুরি ঝি বানিয়ে আর কাজ নেই।

অঘোরের আট বছরের ছেলে ভোলা এসে বলে, 'বাবা একটা বড় গামছা চাইল। মাসকাবারে দাম দেবে।'

'ধারে দিতে পারব না।'

ভোলা ফিরে যায়। আবার এসে গামছার দামটা জিজ্ঞাসা করে যায়। তারপর কোমরে ছেঁড়া বিছানার চাদর জড়িয়ে অঘোর নিজেই আসে।

বলে, 'জানো হে জীবন, বন্ধুর দোকানে চিরকাল বাকিতে গামছা কিনেছি। আজ বিপাকে পড়ে তোমার কাছে নগদ দামে কিনতে হল। গামছা পর্যন্ত চুরি যায়, অ্যাঁ? তাও একমাসের ওপর ব্যবহার করেছি?'

'চুরি গেছে?'

'তবে কি? কাজে যাবার একটি কাপড় সম্বল, গামছা পরে নাইতে যাই। কে মেরে দিয়েছে কে জানে! আমার গামছা ব্যবহার করে তোরও যেন গেঁটে বাত হয় বাবা! ভাবলাম, দুত্তোরি, ন্যাংটো হয়েই নাইতে যাই! তা কেমন লজ্জা করতে লাগল!'

অঘোর ফোকলা মুখে হ্যা হ্যা হাসে।

'আপনার লুঙ্গিটা কি হল?'

'সেটাও চুরিই গেছে বলতে পার। ঘরের মানুষ চুরি করেছে এই যা তফাত। লুঙ্গিটা কি জান ভায়া, ইস্তিরির লজ্জা নিবারণ করছে। ভাল একটা শাড়ি তোলা ছিল, বড্ড পাতলা, সেইটে পরতে হল—তা, বলে কি না লজ্জা করে। তোমার লুঙ্গিটা দাও, সায়ার মতো পরব। এক মেয়ে পার করেছিস, আরেক মেয়ের বিয়ের বয়স হল, তোর লজ্জা কিসের? ওসব পাট চুকিয়ে দিলেই হয়! তা লজ্জাবতীরা মরলেও কি তা বুঝবে?'

অঘোর আবার শব্দ করে হাসে। জীবনের শাড়ি কটার দিকে চেয়ে থেকে বলে, 'বাকি দিলে একটা শাড়ি নিতাম। তা, বাকি তো তুমি দেবে না ভায়া!'

জীবন খানিক চুপ করে থেকে প্রশ্ন করে, 'আপিস থেকে ফিরে পরবেন কি?'

'গিন্নী যদি লুঙ্গিটা ফেরত দেন, সেটা পরব। নইলে তোমার এই গামছা। ততক্ষণে শুকিয়ে যাবে।'

অঘোর চলে গেলে বীণা শুধোয়, 'ঘরে বসে কত রোজগার হল?'

'রোজগার কোথা হল? এক বাড়িতে থাকি, পড়তা দামেই দিতে হল।'

'অ কপাল! আমি ভাবলাম ঘরে বসে বউনি হল। বিষ্টিটা আজ ধরলে হয়। আজ বেরোলে সব মাল বিকিয়ে যাবে।'

জলের ফোঁটা বাঁচিয়ে উনানটা পাতা হয়েছে। পুঁই শাক কুটতে বসে নিজের গাটা একেবারে বাঁচাতে পারেনি, টপ টপ করে বাঁ কাঁধে জল পড়ছে।

এবেলা শুধু পুঁই শাকের চচ্চড়ি। বাড়িতে ডাল নেই এক দানা। হাত একেবারে শূন্য নয় জীবনের। কদিনের মাল বেচার টাকা বাক্সে জমা আছে। টাকা আছে কিন্তু ডাল ও তরকারি এমনভাবে একটু বেশী কেনার উপায় নেই যাতে আকাশ ভেঙে বর্ষা নামলে একটা বেলা চলে যায়।

ওই টাকায় মাল কিনতে হবে।

টাকা আছে—খরচ করা যায় না। এ অবস্থায় এ-যে কি অসহ্য সংযম মানুষের, জীবন ছাড়া কে বুঝবে!

দুপুরে বৃষ্টি থামে। মেঘ সরে গিয়ে বেরিয়ে আসে নীল আকাশ। রোদ ওঠে কড়া।

জীবন বেরোবার জন্য তৈরি হয়। বীণা বলে, 'ভাতের হাঁড়ির দামটা রেখে যাও। আজ দাম না পেলে গাল দিয়ে যাবে।'

হাঁড়ির দামটা তার হাতে দেবার সময় জীবন ভাবে, সেও যদি বাকি টাকার জন্য গাল দিতে পারত ওই বৌটিকে!

কাঁধে পসরা চাপিয়ে সে বেরিয়ে যাবে, অঘোরকে জামা পরে ঘর থেকে বার হতে দেখে জিজ্ঞাসা করে, 'আপিস যাননি দাদা?'

'যা বিষ্টি, কি করে যাই বল?'

অঘোরের তবে ভাল আপিস, বৃষ্টির দোহাই মানে!

'কোন্ দিকে যাবেন?'

'আপিসেই যাচ্ছি।'

ফেরিওলাকে পাড়া বদলাতে হয় রোজ। একদিন যে পাড়াটা চষে, কদিন বাদ দিয়ে তবে আবার সে পাড়ায় আসতে হয়।

সকাল থেকে বৃষ্টির কৃপায় বিশ্রাম পেয়েছে, জীবন পা চালিয়ে দেয় দূরের সব চেয়ে ঘনবদ্ধ পাড়ার দিকে। ওখান থেকে বাজার খানিকটা কাছে হয়, কিন্তু সেজন্য কিছু আসে যায় না। মেয়েরা কাপড় গামছা কিনতে দোকানে যায় বটে আজকাল, এ এলাকার মেয়েরা কমই যায়।

বসতি খুব ঘন, গাদাগাদি করা মধ্যবিত্তের অনেকগুলি অন্তঃপুর।

হাঁক শুনে এক দোতলা বাড়ি থেকে জীবনকে ডেকে চার পাঁচটি মেয়ে বৌ কাপড় দেখছে, বাইরে আরেক জনের হাঁক শোনা যায়ঃ ছিট্ কাপড়—সায়া ব্লাউজ চাই। তাকেও ডেকে আনে মেয়েরা। কাঁধে ছিটের থান আর পিঠে সায়া ব্লাউজ ফ্রকের পুঁটলি নিয়ে আপিসের কেরানী অঘোরকে ফেরিওলাদের দুপুরবেলা আসরে নামতে দেখে জীবন হাঁ করে চেয়ে থাকে।

অঘোর হেসে বলে, 'অবাক হয়ে গেছ ভায়া? বলবখন সব বলবখন।'

দুজনেরি বিক্রি হয়। জীবনের লাল কালো পাড়ের শাড়িটা কিনে নেয় মাঝবয়সী একটি বৌ, ভালই লাভ থাকে জীবনের। অঘোর বেচে দুটি ব্লাউজ। তার রকমসকম দেখে বেশ বোঝা যায়, আজকেই সে হঠাৎ ফিরি করতে নামেনি। সেও পাকা ফেরিওলা।

একসাথে পথে নেমে অঘোর বলে, 'ক-মাস চাকরি গেছে। চাকরি জোটে না, কি করি, ভাবলাম তোমার রাস্তাই ধরি। বসে খেলে চলবে কেন?'

'তা গোপন করেছেন কেন? ফিরি করেন বলতে লজ্জা হয় নাকি দাদা?'

'লজ্জা না কচুপোড়া? যার পেট চলে না তার আবার লজ্জা! কি জান, মেয়েটার একটা সম্বন্ধ ঠিক হয়ে আছে। শ্রাবণের শেষ তারিখে বিয়ে। আপিসে কাজ করি জেনে মেয়েটাকে পছন্দ করেছে, জামা ফিরি করি শুনলে যদি পিছিয়ে যায়? এই ভয়ে ফাঁস করিনি কিছু। যাবার সময় বন্ধুর দোকানে মালপত্র রেখে যাব, ঘরে নিই না। তুমি যেন আবার পাঁচজনের কাছে ফাঁস করে দিও না ভায়া।'

'জেনেও কি তা করতে পারি দাদা?'

'ভদ্দরলোক সেজে থেকেই মেয়েটাকে পার করি, তারপর দেখা যাবে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সামনে গিয়ে ছিট কাপড় সায়া ব্লাউজ হাঁকব।'

দাঁড়িয়ে গল্প করার সময় নেই। দুদিকে পা চালায়।

আরেকটা দিন শেষ হয়ে আসে। বর্ষাকালের আধখানা বৃষ্টিহীন দিন।

ঘরের দিকে পা বাড়ায় জীবন। শ্রান্তিতে শরীর ভেঙে এলেও একটু ঘুর পথ ধরে খানিকটা বেশী হাঁটতে হলেও অবসন্ন শরীরে সেই বৌটির বাড়িতে একবার সে তাগিদ দিয়ে যাবে।

ওর স্বামী যদি কাজ থেকে ফেরে তবে তো কথাই নেই।

বারান্দার মাঝামাঝি বাড়ির প্রধান দরজাটা খোলাই ছিল। বারান্দায় বসে সিগারেট টানছিল খালি গায়ে পা-জামা পরা একটি যুবক।

পার্শের দিকের বন্ধ দরজাটা দেখিয়ে জীবন বলে, 'এ ঘরের বাবু আছেন?'

সে উদাসভাবে বলে, 'আছে বোধ হয়। ডেকে দ্যাখো।'

কড়া নাড়তে দরজা খুলে উঁকি দেয় সেই ছোট মেয়েটি।

'তোমার বাবা ঘরে আছেন খুকি?'

'বাবা তো বেরোয়নি। বাবার জ্বর।'

ভেতর থেকে পুরুষের গলা শোনা যায়, 'কেরে রাধি?'

'সেই কাপড়ওলাটা।'

গায়ে একটা জীর্ণ সতরঞ্চি জড়িয়ে ভেতরের মানুষটা জীবনের সামনে এসে দাঁড়ায়। এলুমিনিয়ামের বাসনের সেই ফিরিওলাকে রক্তবর্ণ চোখ নিয়ে সামনে দাঁড়াতে দেখে নিজের পাওনা টাকাটার বদলে প্রথমেই জীবনের মনে আসে এই কথা যে লোকটার খুব জ্বর, কয়েক দিনের মধ্যে বীণার কাছে হাঁড়ির দামটা সে চাইতে যেতে পারবে না।

সংঘাত

বিন্দের মা তার খড়ের ঘরের সামনের সরু বারান্দাটুকুর ঘেরা দিকে তাদের আশ্রয় দিয়েছিল।

ঘরে ঢুকবার দরজা বারান্দার মাঝামাঝি, তার এদিকের অংশটা ঘেরা, ওদিকটা ফাঁকা। চালাটা বারান্দার উপরে নেমে এসেছে, কোমর বাঁকিয়ে নীচু হয়ে বারান্দার উঠতে হয়।

তিন হাত চওড়া ও হাত পাঁচেক লম্বা হ'বে ঘেরা অংশটুকু বারান্দার—তার ভাড়া দু'টাকা। বাচ্চাটাকে ধরে তারা তিনটি মোটে প্রাণী, তাদের নড়তে চড়তে কষ্ট হয়।

বিন্দের মা তাদের আশ্রয় দিয়ে বলেছিল, এখন এমনি থাকো। কাজকম্ম জুটিয়ে নাও, তারপর দু'টাকা ভাড়া দিও। মাসে দু'টাকার বেশী চাইবো না আমি।

গাছতলা ছাড়া গতি ছিল না তখন তাদের। কত ভাল লেগেছিল বিন্দের মার কথাগুলি!

দু'বাড়িতে বিন্দের মা শৈলর কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। কত ভাল মানুষ মনে হয়েছে তাকে!

মাস কাবারে বেতন পেয়ে আজ এই আঁধার ঘুপ্‌চিটুকুর জন্যে দুটো টাকা দিতে কিন্তু গাটা চড়চড় করে শৈলর। ছেলে কোলে দু'বাড়িতে খেটে কত কষ্টে রোজগার করা কটা টাকা!

জীবনে নিজে খেটে প্রথম রোজগার।

মাখনের এখনো কাজ জোটেনি। এই সামান্য টাকা থেকে ঘর ভাড়া দিলে তারা খাবে কি?

শৈল বলে, মানুষটা একটা কাম জুটাইয়া নিক, তারপর থেইকা ভাড়া নিও। কয়টা টাকা পাইছি, ভাড়া দিলে থাকব কি?

বিন্দের মা গালে হাত দিয়ে বলে, কাজ না জুটিয়ে দিলে ও টাকাও পেতি? দুটো টাকা ভাড়া দেবে তার বায়না কত!

চাষীর মেয়ে শৈল, ফোঁস করে ওঠে, বায়না কিসের? ভাড়া দিমু না কইছি! দাও, টাকা মিটাইয়া দাও।

মাইনে এনে মাখনের হাতে তুলে দিতে হয়েছে শৈলকে। সে স্বামী, তারও মালিক, তার রোজগারেরও মালিক। টাকা হাতে নিয়ে গুণে দেখে চোখ পাকিয়ে মাখন বলেছিল, টাকা লুকাইছস্? বড় দালানে বারো টাকা না? বাইর কর তিন টাকা।

মরণ আমার! কবে কামে লাগছি খেয়াল আছে?

তা বটে। ও বাড়িতে পুরো মাসের মাইনে শৈলর পাওয়ার কথা নয়!

মাখন দুটো এক টাকার নোট ছুড়ে দেয় বিন্দের মার দিকে, নোট দুটো ফরফর করে উড়ে মাটিতে পড়ে।

কুড়িয়ে নিয়ে চোখ পাকিয়ে তাদের দিকে তাকায় বিন্দের মা। পেট ভরে খেতে জোটে না, দয়া করে থাকতে দিয়েছে, তেজ কত! তবু যদি মিনসের নিজের রোজগার হত, বৌয়ের ঝি-গিরির টাকায় ঘরে বসে না খেত।

চাল ঝাড়ার বাড়তি কাজ করে শৈল কিছু খুদ এনেছে। মাখন বলে, খুদ থুইয়া দে। এক সের চাল আর কিছু মাংস নিয়া আসি। কত কাল মাছ খাই না!

আলাপাথাড়ি খরচ কইরো না।

কাইল পরশু ওই ঘরের বেতন পাবি না?

সারাডা মাস চালান লাগবো না?

মাখন নির্বিচারে হেসে বলে, তুই ভাবছস কি? আমি কাম করুম না? খাইটা খামু, ডর কিসের!

শৈলর একখানা শাড়ি দুখন্ড করে সে লুঙ্গীর মতো পরে। কাঁধে ময়লা দুর্গন্ধ গামছা। শৈলর মোটে একখানি কাপড় সম্বল, সারাদিন পরে, লোকের বাড়ি কাজ করে, রাঁধে বাড়ে—সবই করে। রাত্রে শোবার আগে গা ধুয়ে ছেঁড়া ন্যাকড়া গায়ে জড়িয়ে কাপড়খানা কেচে মেলে দেয়।

মাটির একটা হাঁড়ি আর ছোট একটি কড়াই ছাড়া বাসনপত্র কিছুই নেই। একটা উনান পর্যন্ত নেই। কাজ সেরে এসে বিন্দের মা'র রান্না শেষ হলে তার উনানে ভাত বা খুদ সিদ্ধ করে নিতে হয়। কিছু কয়লা ধার হয়েছে।

আর কিছু হোক বা না হোক চলনসই একটা ঘর, দুটো বাসন, নিজেদের একটা উনান—পেটের চিন্তাই সবার উপরে উঠে আছে। পুজার সময় দু'বাড়ি থেকে সে দু'খানা শাড়ি পাবে—সে পর্যন্ত নয় এ ভাবেই চালিয়ে যাবে কোন মতে। কিন্তু কি দুরন্ত কি ভয়ানক এই পেটের ক্ষিদে!

বিন্দের মা এতকটি ভাত খায় ভাজা ব্যঞ্জন দিয়ে আর হাঁ করে শহরে নবাগতদের দুটি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এক কাঁড়ি ভাত কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে ফেলার কসরৎ চেয়ে দেখে!

রেশনের চাল আনে—দুদিনে তিনবার চার বার করে খেয়ে শেষ করে দেয়! আটা কোনখান দিয়ে কিভাবে শেষ হয়ে যায় টের পায় না। তারপর চলে এবেলা আধপেটা, ওবেলা সিকি-পেটা, সে বেলা উপোস—চাল ধার করার চেষ্টা এবং শৈলর বাড়তি কাজ করে আনা খুদটুকু চালটুকু দিয়ে কোন রকমে দিন কাটানো।

বিন্দের মা অন্যদের কাছে বলে, ছি ছি রাম রাম। মাগো মা, এমন পেটুক, এমন বেহিসেবী! আর কি নোংরা বাবা, মন্দমাগী কেউ কি ঘাট করে কাপড় ছাড়বে? ছাড়বে কি, থাকলে তো ছাড়বে। সম্বল তো ওই পরনের ন্যাকড়াটুকু।

হাড্ডিসার পেট মোটা পাঁচ বছরের বাচ্চাটা এখনো মাই খায়। ওকে ছাড়া এক দণ্ডে জগৎ অন্ধকার হয়ে আসে শৈলর, তবুও ওর জন্যই প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ওকে নিয়ে কাজে যেতে হয়, ঘর ধোয়া বাসন মাজা উঠান নিকানো সব কাজ করতে করতে সর্বদা ওকে সামলাতে হয়। খাওয়া দাওয়ার সময় দূরে দাঁড়িয়ে নজর দিলে, ঘরে গেলে, বাড়ির মানুষ বিরক্ত হয়, গজ গজ করে।

কড়া সুরে বলে, ওকে রেখে আসতে পার না? বড় নোংরা বাছা তোমার ছেলে। গায়ে প্যাঁচড়া, কানে ঘা,—ছেলেপিলের না ছোঁয়াচ লাগে।

মাখনের কাজ নেই কিন্তু বাচ্চাটাকে রাখতে সে রাজী নয়। বলে, তর পোলারে নিয়া থাকুম, কামের খোঁজে যামু না?

বাড়ি ফিরে শৈল দ্যাখে সে চিৎ হয়ে কাঁথায় শুয়ে আছে। শোনে বাড়ির বাইরেও সে যায়নি একবারও।

ঝগড়া করলে মাখন মুখ খিঁচিয়ে বলে, হ বুঝছি সব, তোর মতলব খারাপ। ক্যান পোলারে নিয়া কেউ কাম করে না? সুবিধা হয় না বুঝি পিরীত করনের?

পিরীতের একটা অশ্রাব্য বিশেষণের মুখে আগুন জেবলে দিয়ে বাচ্চাটাকে দড়াম করে ফেলে শৈল মুখ খোলে। বিন্দের মা কান পেতে শোনে। অনেক কটু কথা শৈল বলে কিন্তু মাখন যে বসে বসে তার রোজগার খাচ্ছে একবার একটু ইঙ্গিতেও উল্লেখ করে না!

মাখন বলে যে জানে জানে, সে সব জানে। বিন্দের মা-ই তাকে বলে দিয়েছে খোকাকে তার সঙ্গে দিয়ে কাজে পাঠাতে, একলা তাকে কাজে যেতে বারণ করেছে।

বিন্দের মা সামনে এসে বলে, ওকথা তোকে কখন বললাম রে মুখপোড়া? ভাল চাইলে উনি মন্দ বোঝেন! আমি বললাম মায়ের ছেলে মায়ের সাথে থাকবে, কাজে যাক বা সে চুলোয় যাক—মরদ মানুষের কি ছেলে আগলে ঘরে বসে থাকলে চলে? কাজ খুঁজতে মন নেই, মোর নামে উল্টো গাইছেন!

মাখন চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকে।

বিন্দের মা খনখনিয়ে বলে চোখ রাঙাচ্ছে! আরে আমার ব্যাটাছেলে! বৌয়ের রোজগার বসে খায়, লজ্জাও নেই।

শৈল যে খোঁচাটা কখনো দেয় না, মাখনকে সেই খোঁচা দিয়ে বিন্দের মা যেন স্বস্তি পায়।

মাখন ফিরে আসে—চাল নিয়ে, তরকারি নিয়ে, শিশি ভরা তেল নিয়ে—দেড়-পো গলদা চিংড়ি নিয়ে!

ক্ষণেকের জন্য লোভাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে শৈল চাঙ্গা হয়ে ওঠে, তারপর বিমর্ষ বিরস মুখে মাই ছাড়িয়ে ছেলেটাকে সরিয়ে দেয়।

কয় টাকার সওদা করছ?

তা দিয়া তর কাম কি?

বিন্দের মা একবার উঁকি দিতে এসে গালে হাত দিয়ে ফিরে যায়। তার রান্না

শেষ হলে তোলা উনানটি বারান্দায় এনে দুটি কয়লা দিয়ে গোমড়া মুখে শৈল নিজের রান্না শুরু করে—এতটুকু উৎসাহ আছে বলে মনে হয় না।

আমি যদি আজ ভাত খাইছি, তবে কি কইলাম!

মাখন সজোরে নিজের উরুতে চাপড় মারে!

শৈল মাছ ভাজতে ভাজতে মুখ ফিরিয়ে এক গাল হেসে বলে, না খাইলা, আমি একাই খাইয়া শেষ করুম—খোকা আর আমি। কতকাল পরে আইজ ইচা মাছ খামু!

সুতরাং রান্না শেষ হলে মাখন গোগ্রাসে এক থালা ভাত খায় ঝিঙা কুমড়ার তরকারি আর গলদা চিংড়ির ঝোল দিয়ে। মোড়ে বিন্দের মনোহারী মুদীখানা পান বিড়ি সিগারেট বেচার মিশ্রিত দোকান থেকে চোদ্দ আনা সের দরে কেনা দেড় সের চাল—চাল বেশ ভাল। শৈল অর্ধেক চালের ভাত রেঁধেছিল, তবু মাখন আর ছেলেকে খাইয়ে তার পেট মনের মতো ভরল না।

শৈল একরকম চাইতে না চাইতে দু'বাড়িতে ঠিকে ঝির কাজ পেয়ে গেছে। বাচ্চাটা না থাকলে এবং ইচ্ছা করলে আরও এক বাড়িতে কাজ সে জোটাতে পারে অল্প চেষ্টাতেই। অনেক ঝি তিন বাড়িতে ঠিকে কাজ করে।

দেখা যায়, মাখনের কাজ জোটানো অত সহজ নয়!

কোন কাজ জুটিয়ে নেবে তাই তার ঠিক নেই।

চাষা মানুষ, চাষ করা ছাড়া কোন কাজ জানে না।

চাষীর মেয়ে চাষীর বৌ বলেই শৈল ঘরকন্নার কাজে পাকা—বাসন মাজা, মশলা বাটা, নিকানো, পোছানো, উনান সাজানো, কয়লা ভাঙার মতো দৈনন্দিন সাধারণ সাংসারিক কাজে তো বটেই, ভদ্রঘরের অধিকাংশ মেয়ে বৌ যে কাজ একেবারেই জানে না অথচ আজ রেশনের ধুলো কাঁকর মেশানো চাল আর গমকে যে কাজ না জানলে খাওয়ার যোগ্য করা যায় না—যেমন, কুলো দিয়ে ঝেড়ে নেওয়া—সে কাজেও।

শৈল দু'বাড়িতে নিয়মিত বাসন মাজাটাজার কাজ করে—চার পাঁচ বাড়ির গিন্নিরা তাকে ডাকিয়ে তার সুবিধা আর অবসর অনুসারে তাকে দিয়ে কুলো চালিয়ে, কয়লার গুঁড়ো গোবর আর মাটি মেশানো গুল তৈরী করিয়ে, চাল ডাল বা নগদ পয়সা মজুরি দেন।

কেউ কেউ বলে, কাজটা করে দিয়ে এবেলা খাবি এখানে।

অর্থাৎ একবেলা খাওয়াটাই মজুরি।

বড় খিদে শৈলর। মাছ ডাল ভাজা তরকারি আশা ক'রে সে মহোৎসাহে কাজ করে দেয়। বাবুরা ভালমন্দ কত রকম খায় ঠিক ঠিকানা আছে কি!

খেতে বসে সে টের পায়, বাবুদেরও খাওয়াদাওয়ার বড় দুর্দশা!

যাই হোক, ভাল জিনিস না পাক, খানিকটা ডাল আর খানিকটা তরকারি দিয়ে সপুত্র পেট ভরানোর মতো ভাত তো সে পায়। খিদে কি অত বাছবিচার পছন্দ অপছন্দ জানে, না মানে। নুন কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পেট ভরা ভাত পেলে সে বর্তে যায়!

ঝনুকাই বাঁধায় মাখন।

তেড়ে বলে, এত দেরি ক্যান? কোন কাম কইরা আইলি তুই যে এত দেরি হইল?

কিবা কথা কও? ঘরের মাইনষেরে খাওয়াইয়া তবে আমারে দিছে না?

দুপুরে বিন্দের মা শৈলকে ডাকে। বলে, আয় হাড়হাবাতে বোকা মেয়ে, চুল বেঁধে দি। খেটে মরবি বলে চুলটাও বাঁধবি নে? কি কুক্ষণে যে তোকে দেখে মোর মায়া বসেছিল রে—

কামে যামু না?

যাবি, যাবি। সাত তাড়াতাড়ি কাজে যেতে অত তড়বড়াস নে। দেরি টেরী করে যাবি মাঝে মধ্যে। আরে মাগী, মন দিয়ে টাইম মতো যত খাটবি তত পেয়ে বসবে যে, এটা বুঝিসনে! না খাটিয়ে কেউ তোকে একটা বাড়তি পয়সা দেয়? বাসি ভাত নর্দমায় ফেলে দেবে, তবু তোকে দেবে না। দিয়েছে কেউ?

ক্যান দিব না? দয়া মায়া নাই মাইনষের? তিনতালা বাড়ির মাঝের তালার উনি—

ফর্সা মোটা সুন্দরী মাগীটা?

হ। উনি আমারে ডাইকা নিয়া আলাপ করেন, কোন কাম করান না। গা হাত পা টিপা দেই, ঘামাচি মারি, উঁচা পেটটারে দইলা মইলা দেই—

বিন্দের মা মুচকে মুচকে হাসে।

বলে, না লো ছুঁড়ী ফর্সা সুন্দরী বৌটা তাকে মোটেই খাটায় না। আধঘণ্টা একঘণ্টা তোকে দিয়ে শুধু গা টেপায় পা টেপায় ঘামাচি মারিয়ে নেয়। একটু আদর চেয়ে নেয় তোর কাছে। তারপর আদর করে গলার হারটি খুলে তোর গলায় পরিয়ে দেয়। দেয় তো?

তা না দিক, শৈলর ছেলেকে দু' একটা লজেন্স চকোলেট তো দেয়। শৈলকে দু'চার আনা পয়সা তো দেয়। ভরসা তো দেয় সে রাতদিন খাওয়া পরার চাকরি নিয়ে থাকতে চাইলেই শৈলকে সে রাখবে। কিন্তু উপায় কি, মাখনের জন্য তো সেটা হবার নয়।

মা গো মা! আর পারি নে তোর সাথে!—শৈলর জট বাঁধা রুক্ষ চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বিন্দের মা মেয়ে বৌ রোগে দুর্ভিক্ষে মারা যাওয়ার খবর পেয়ে উতলা হওয়ার মতো ব্যাকুলভাবে বলে, গাঁ থেকে তোরা এমন হাবাগোবা এসেছিস, মাইরি বিশ্বেস হয় না মেয়েলোক এমনি গরু-ছাগলের মতো বোকা হয়। তোর রোজগারে খাচ্ছে মানুষটা, উঠতে বসতে তোকেই লাথিগুঁতো মারছে, তবু তুই আটা-সেঁটার মতো লটকে রয়েছিস ওটার সাথে।

শৈল মাথা সরিয়ে নেয়। বলে, জট ছাড়াইয়া কাম নাই, বড় লাগে। চুল বাঁধুম অনে সুদিন আইলে।

আর এসেছে তোর সুদিন, যা বোকা তুই। সব হাতে দিস কেন, টাকা-পয়সা কিছু লুকিয়ে রাখতে পারিস না?

কই লুকামু? টের পাইলে মাইরা ফেলাইব!

তুই করবি রোজগার, তোকেই মেরে ফেলবে? থাকিস কেন অমন লোকের সঙ্গে?

রাম রাম অমন কথা কইও না, তেমন মানুষ না আমি।

মাখন বেশ খানিকটা বেহিসাবী, বেপরোয়া এবং রগচটা মানুষ। সেই সঙ্গে স্বার্থপর। এ সমস্তই সহ্য হ'ত শৈলর। যা হাতে পায় বেশী বেশী খেয়ে শেষ করে দিয়ে দুরবস্থার সীমা রাখে না বটে কিন্তু ভালমন্দ জিনিসও সে একা খায় না, বেশী বেশী খাদ্য শুধু নিজের পেটেই চালান দেয় না। তাদের সঙ্গেই যে ভাল খায়, কষ্টও ভোগ করে সমানভাবে।

কিন্তু দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছে তার সন্দেহ করা রোগটা। যুক্তি তর্ক কিছুই সে বোঝে না। যদুর মা এক বাড়িতে খাটে কাজে গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারে, তবু তার কথা তুলে কুটিল বাঁকা চোখে চেয়ে প্রায়ই সে জানতে চায় কি এমন কাজ শৈল করে, তার কেন ফিরতে দেরী হয়?

রেশন আনার পয়সা নেই। বিন্দের মার পরামর্শে মাখন নিজেই তাকে মাইনের দুটো টাকা আগাম চেয়ে আনতে বলে, শৈল টাকা এনে দিলে সে-ই বলে, চাওন মাত্র টাকা দেয়, বাবুর লগে খুব খাতির না?

কাজ খোঁজার নামে বেরিয়ে গিয়ে আচমকা মাখন ফিরে আসে।

তাড়াতাড়ি ফিরা আইলা?

আইলাম। ক্যান অসুবিধা হইছে নাকি তর? কেউ আসব নাকি?

একদিন একটু উৎসাহের সঙ্গে কাজের খোঁজে যায় তো তিনদিন ঘর ছেড়ে বেরোবার নাম করে না। শৈল জানতে পারে, সে কাজে গেলে মাখন বেরোয় এদিক ওদিক ঘোরা ফেরা করে, কাজ সেরে তার ঘরে ফেবার সময় ফিরে আসে।

শৈল অনুযোগ দিলে, কাজের খোঁজে না গিয়ে ঘরে বসে থাকার জন্য ঝগড়া করলে, মাখন রেগে আগুন হয়ে ওঠে! কেন, তাকে ঘর থেকে তাড়াবার এত আগ্রহ কেন? কাজে গিয়ে কার সাথে কি বজ্জাতি করে কে জানে, তাকে তাড়িয়ে ঘরেও বজ্জাতির সাধ?

তুই আরও টাকা পাস। কোথায় লুকাইয়া রাখছস ক' আমারে।

প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে যায়। মাখন ধাক্কা দিয়ে দিয়ে শৈলকে ফেলে দেয়। শৈল বসে বসে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদে:

বিন্দের মা কুটিল হিসেবী চোখে কলহ লক্ষ্য করে যায়।

বৌ আর বাচ্চা দু'জনের কান্না অসহ্য ঠেকায় বাচ্চাটার গালে একটা চড় বসিয়ে মাখন বেরিয়ে যায়। বিন্দের মা এসে কাছে বসে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বলে, কি পাষণ্ড বজ্জাত মানুষ মাগো! এমন করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে, এইটুকু বাচ্চার গালে অত জোরে চড় বসালে! তোকেও বলি বাছা, কেন এত সহ্য করিস? যত সইবি, তত বেড়ে যাবে। আমি হলে বাপু লাথি মেরে খেদিয়ে দিতাম। নিজে তুই রোজগার করিস তোর ভাবনা কি?

শৈল চোখ মুছতে মুছতে বলে, আমি যামু গিয়া।

বিন্দের মা খুসী হয়ে বলে, তাই যা। আমি তোকে ঘর ঠিক করে দেব।

শৈল কাজে যাবার আগেই মাখন ফিরে আসে। কিভাবে কোথা থেকে বিড়ি যোগাড় করে এনেছে সেই জানে, গোমড়া মুখে বসে জ্বলন্ত বিড়িটা টেনে শেষ করেই আরেকটা বিড়ি ধরায়!

শৈল কাজে গেলে বিন্দের মা মাখনের কাছে গভীর আফসোস জানিয়ে বলে, এ হ'ল কলিকাল কি করবে বল তুমি। ইদিকে তোমার কাজ নেই উদিকে ছুঁড়ি পেয়েছে পয়সা কামানোর সোয়াদ। শুধু বাসন মাজার পয়সায় কি মন উঠবে ওর? তোমার সাধ্যি আছে ওকে ঠেকিয়ে রাখবে! আজ বাদে কাল দেখবে কার সাথে ভেগেছে।

খুন কইরা ফেলুম।

বিন্দের মা মুখ বেঁকিয়ে ভেংচি দিয়ে বলে, খুন কইরা ফেলুম! আরে আমার মরদ রে! অতই সস্তা যদি হ'ত খুন করা, গণ্ডা মাগী খুন হয়ে যেত! বোকা হাবা কোথাকার। এটা বুঝি তোর সেই পাড়াগাঁ পেয়েছিস যে খুসী হলে খুন করবি? এ হ'ল বাবা খাস কোলকাতা শহর। কোথায় তলিয়ে যাবে মানুষের ভিড়ে এ জীবনে আর খোঁজ পাবি ভেবেছিস!

গুম খেয়ে রক্তবর্ণ চোখ মেলে মাখন বসে থাকে। নিজের অসহায় নিরুপায় অবস্থাটা সে মর্মে মর্মে অনুভব করছে টের পেতে বিন্দের মা'র বাকী থাকে না। সে গুজগাজ, ফিসফাস করে মাখনকে বোঝাতে থাকে সংসারের হালচাল, নিয়ম নীতি!

তার মতে, খুব সোজা নীতি। মাখনের মতো অবস্থায় যে পড়েছে তার কাছে অতি সুবোধ্য। পয়সা রোজগার করতে বেরিয়েছে যে মেয়েছেলে বাসন মাজা ছাড়াও অন্য উপায়ে বাড়তি রোগজার সে করবেই করবে। শ্রীভগবানেরও সাধ্য নেই তাকে ঠেকিয়ে রাখে। এভাবে চললে দু'দিন বাদে শৈল তাকে ছেড়ে যাবেই, তার অন্যথা নেই। তার চেয়ে শৈলও হাতে থাকে, তার বাড়তি রোজগারও হয়, সেটা ভোগও করতে পারে মাখন, এ ব্যবস্থা কি ভাল নয় সর্বদিক দিয়ে?

মাখন চুপচাপ শুনে যায়, কিছু বলে না। তার মুখ আর চোখের চাউনি দেখে বিন্দের মা-ই হঠাৎ এক সময় থেমে যায়। কে জানে কি রকম মতিগতি এসব গোঁয়ার রাগী মানুষের। রাগ সামলাতে না পেরে হাতের কাছে পেয়ে তাকেই হয়ত মেরে বসবে।

শৈল রেহাই পাওয়ার উপায় খোঁজে।

যেমন তেমন উপায় নয় সদুপায়। যাতে মাথা বিগড়ানো মানুষটার হাত থেকে সে রেহাই পাবে অথচ সন্দেহের জ্বালায় জ্বললেও মানুষটার মধ্যে সেটা আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবার কারণ ঘটবে না। কোন ভদ্র পরিবারে খাওয়া-পরা দিন রাত্রির কাজ পেলেই সবচেয়ে ভাল হয়।

শৈল এ রকম কাজ খোঁজে। কিন্তু কোলে তার ছেলে তাকে কেউ

ওভাবে রাখতে চায় না। তিনতলা বাড়ির ফর্সা মোটা গিন্নী বলে, ছেলে না থাকলে আমিই তো তোকে রাখতাম। ছেলের ঝন্‌ঝাট কে পোয়াবে বাবা।

আমারে রাখেন পোলারে দিদিমার কাছে থ্‌ইয়া আস্‌ম্‌।

বেশ, পয়লা থেকে কাজে লাগিস।

বাচ্চাটাকে ছেড়ে থাকতে মরে যাবে শৈল, কিন্তু উপায় কি। মাখনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ওর সঙ্গে আর বাস করা যায় না। শৈলর মা প্রথমেই এদিকেই ঝির কাজ আরম্ভ করেছিল, কলে কাজ পেয়ে উঠে গেছে। কলের কাজে উপায় বেশী। তার কাছে ছেলেকে রেখে এলে মাঝে মধ্যে শ্‌ধ্‌ গিয়ে দেখে আসা চলবে। কিন্তু উপায় কি! মাস কাবারের আর মাত্র ক'টা দিন বাকী।

সেদিন ঠিকে কাজ সেরে ঘরে ফিরে দ্যাখে, তাদের কাঁথাকানি হাঁড়ি কড়াই ওপাশের চালার ছোট একটি ঘরে সরানো হয়ে গেছে। এই নীচ্‌ চালার খ্‌দে খ্‌দে ঘরগ্‌লোও বিন্দের মা ভাড়া দেয়। এই ছোট ঘরখানাই খালি ছিল।

বিন্দের মা একগাল হেসে বলে, তোর কপাল ফিরেছে লো! আমার ছেলে তোর মিনসেকে একটা কাজ জ্‌টিয়ে দিয়েছে।

মাখন ঘরে ছিল না। সকাল বেলা বিন্দের সঙ্গে কারখানার কাজে ভর্তি হয়ে গেছে।

শৈলর ম্‌খে হাসি ফোটে না। কাজ পেয়েছে, নিজে খেটে রোজগার করবে কিন্তু মতিগতি কি বদলাবে মান্‌ষটার, মেজাজ নরম হবে? সারাদিন বাইরে থাকবে মাখন, সন্দেহের বিষে আরও সে জর্জরিত হবে। এ পোড়া শহরে এসে কপাল তার প্‌ড়েছে চিরদিনের জন্য।

বিন্দের মা বলে, স্‌দিন এসেছে, আয় তেল দিয়ে চ্‌ল বেঁধে দি।

চুল বাঁইধা কাম নাই। ঘরের ভাড়া নিবা কত?

যা দিবি তাই নেব। তোরা কি আমার পর?

কি করে হঠাৎ তারা এত বেশী আপন হয়ে গেল বিন্দের মার শৈল ব্‌ঝতে পারে না। ব্‌ঝেই বা কি হবে? আর মোটে ক'টাদিন সে এখানে থাকবে।

বিকেলে শ্রান্ত মাখন ফিরে আসে। লঙ্কা দিয়ে জল দেওয়া ভাত খায়। কথাবার্তা বিশেষ বলে না। শৈলও চ্‌প করে থাকে।

খানিক পরে মাখন ব্যঙ্গের স্‌রে জিজ্ঞাসা করে, মহারানী কিছ্‌ জিগান্‌না যে?

কি জিগাম্‌?

মাখন গ্‌ম হয়ে থাকে

বিন্দের মা মাখনকে আড়ালে ডেকে বলে, আমি তো বাপ্‌ পারলাম না। তুমি বলে দাও, চ্‌লে একট্‌ তেল দিক, সাবান টাবান মেখে একট্‌ সাফ-স্‌রৎ হোক?

বলব।

পরদিন খ্‌ব সকালে কাজে বেরোবার আগেই বিন্দের দোকান থেকে তেল আর সাবান এনে দিয়ে মাখন চোখ পাকিয়ে বলে, চ্‌লে তেল দিবি, সাবান মাইখা ছান করবি। ভূত সাইজা থাকলে ভাল হইব না কইলাম।

শৈল চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে।

ব্যাপারডা কি কও তো শুনি?

ব্যাপার অবার কি? ব্যাপার কিছু না।

কাজে লেগেই অদ্ভুতভাবে বদলে গিয়েছে মাখন। মেজাজ বদলায়নি, বরং আরও রুক্ষ হয়েছে, কথায় কথায় চটে উঠে গাল দেয়, মারতে আসে। যতক্ষণ ঘরে থাকে গুম খেয়ে থাকে, মাঝে মাঝে তীব্র বিদ্বেষের দৃষ্টিতে শৈলর দিকে তাকায়। কিন্তু সন্দেহ করে না, একেবারেই না। ছুটির দিন এক বাড়িতে গুল দিয়ে ফিরতে অনেক বেলা হল, মাখন একবার জিজ্ঞাসাও করল না তার দেরী কেন। এক অজানা আতঙ্কে শৈলর বুক কেঁপে ওঠে।

এ ঘরে উঠে আসার দিনচারেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর বিন্দের মা মাখনকে ডেকে বলে, এই কাপড়খানা পরিয়ে পাঠিয়ে দাও। দিনের বেলা দেখে গেছে, পছন্দ হয়েছে। এই নাও তোমার ভাগের টাকা।

মাখন এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, আইজ যাইবো না, হাঙ্গামা করব। আর কিছু না থাক, মাগীর তেজ আছে ষোলআনা। আর কয়দিন যাক, বুঝাইয়া রাজী করুম।

বিন্দের মা বলে, আ—মরণ! এর আবার বোঝানোর কি আছে? দুইটা গোলমাল করে দুঘা লাগিয়ে দিবি।

তুমি বুঝবা না। বড় তেজ মাগীর।

মাসের শেষ তারিখ। পরদিন শৈল নতুন কাজে লাগবে। ভোরে উঠেই ছেলেকে মার কাছে রেখে আসতে যাবে। ফর্সা মোটা গিন্নীকে বলা আছে প্রথম দিনটা কাজে লাগতে দেরী হবে। রাত্রে শৈল ভাবে, আজ রাত্রেই মাখনকে জানাবে, না একেবারে সকালে জানিয়ে বিদায় নেবে।

এখন জানালে যদি হাঙ্গামা করে?

মাখন জিজ্ঞাসা করে, এপাশ-ওপাশ করস যে? ঘুম আসে না?

না।

মাখন খানিক চুপ করে থাকে। তারপর শৈলকে কাছে টেনে বলে, শোন, কাইল আমরা অন্য ঘরে উইঠা যামু।

ক্যান?

এখানে থাকুম না। বিন্দের মা বড় পাজী বজ্জাত মানুষ।

যতই তার পক্ষ টানুক আর তাকে সুখী করার জন্য ব্যস্ত হয়ে নানা পরামর্শ দিক, শৈলর কি আর জানতে বাকী ছিল যে বিন্দের মা পাজী বজ্জাত মানুষ। তার সঙ্গে হঠাৎ মাখনের খাতির জমতে দেখে আর তাকে তেল সাবান মাখিয়ে ভাল কাপড় পরাবার ঝোঁক চাপাতে দেখে এটাও শৈল আঁচ করেছিল যে তাকে ফাঁসাবার একটা চক্রান্ত চলছে তলে তলে।

কিন্তু মাখনের দিকটা সে বুঝে উঠতে পারছিল না কোন মতেই। বিন্দের মা'র

খারাপ মতলব থাক, মাখন নিশ্চয় জেনে বুঝে তার মতলবে সায় দেয়নি, বিন্দের মা নিশ্চয় তাকে ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলেছে।

নইলে তাকে মিথ্যা সন্দেহ করেই যে মানুষটার এত জ্বালা সে কখনো জেনে শুনে বিন্দের মা'র বজ্জাতিতে সায় দিতে পারে?

মাখনের কথা শুনে' ভয় ভাবনার একটা পাহাড় যেন নেমে যায়, হাল্কা হয়ে যায় শৈলর দেহমন। সে ভাবে মাখন তবে ধরে ফেলেছে বিন্দের মা'র আসল মতলব!

আর মাখন ভাবে, ভাগ্যে শৈল টের পায়নি, মরিয়া হয়ে বিন্দের মা'র পরামর্শে কি কান্ড করতে যাচ্ছিল! ভাগ্যে বিগড়ানো মাথাটা তার ঠিক হতে আরম্ভ করেছিল একটা কাজ পেয়েই, দশজনের সঙ্গে খাটতে শুরু করেই!

শৈল বলে, কাল থেইক্যা আমি খাওয়া পরার কামে লাগুম—রাতদিন থাকুম।

ক্যান?

সন্দেহ করবা মারবা—তোমার লগে থাকুম না।

মাখন খানিক ভেবে চিন্তে বলে, হ, ঠিক কইছস। আমার মাথাটা বিগড়াইয়া গেছিল। ক্যান এমন হইল কিছুই বুঝলাম না। আর সন্দেহ করুম না।

করবা না?

না। তর গা ছুঁইয়া কইলাম।

সুতরাং শৈলর আর ফর্সা মোটা গিন্নীর বাড়ি কাজ নেওয়া হয় না। অন্য পাড়ায় একটা ঘর নিয়ে দু'বাড়িতে ঠিকে কাজ করে। সকালে রান্না হয় না, রাত্রে জল ঢালা ভাত খেয়ে মাখন কলে খাটতে যায়।

মাখনের বিগড়ানো মাথাটা কিসে সারল সে নিজেও বোঝে না, শৈলও বোঝে না। রাজী হয়ে গিয়েও মাখনের মাথাটা কেন বিগড়ে গেল এটা বোঝে না বিন্দে আর বিন্দের মা।

না বুঝলেও নেমকহারাম বজ্জাতটাকে কাজ জুটিয়ে দেওয়ার জন্য মায়ে পোয়ে তারা আপসোস করে।

মহাকর্কট বটিকা

ঘুষঘুষে জ্বর ছিল। খুক্‌ খুক্‌ কাসি। তার ওপর গলা দিয়ে উঠল দু'-ফোঁটা রক্ত। তাজা লাল রক্ত।

আরও কি লক্ষণ দরকার হয় ব্যাপার বুঝতে এর পরেও কি মানুষ খানিকটা 'হয়তো' মেশানো আশাও করতে পারে যে জ্বর কাসি আর রক্ত ওঠাটা সেরকম ভয়ানক কিছু নয়, নাও হতে পারে?

এতটুকু রক্ত। একটু আঙুল কাটলে এর চেয়ে কত বেশী রক্ত পড়ে! হারাণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মৃত্যুর এই সংক্ষিপ্ত লাল পরোয়ানার দিকে।

বলে, আর ভাবনা নেই। এবার সব ফিনিস!

ছাইবর্ণ হয়ে গেছে লতার মুখ। শুধু হাত পা নয়, ভেতরটাও তার থরথর করে কাঁপছে। সেই সঙ্গে দুলছে ঘরবাড়ি বা পৃথিবী। কিন্তু তবু আশা সে ছাড়বে না। মনে হচ্ছে দুঃখ-দুর্দশা ভরা সমস্ত অতীত জীবনটা যেন গভীর কালো হতাশার রূপ নিয়ে অন্ধকার করে দিয়েছে ভবিষ্যৎ তারও আর বাঁচার জন্য লড়াই করার মানে থাকল না।

—না না, হয় তো কিছুই নয়। ডাক্তার না দেখিয়ে কিছু বলা যায়? পরীক্ষা না করিয়ে?

—ডাক্তার অবশ্য দেখাবো। এক্স-রে ফটোও তোলা হবে। কিন্তু সেটা প্রমাণের জন্য নয়। কতদূর এগিয়েছে রোগটা, কি অবস্থা, বুঝবার জন্য।

মৃত্যু যেন এখনি ঘনিয়ে আসছে এমনি হতাশা হারাণের চোখে।

লতা একবার চোখ বোজে। জোর চাই, বুকে বল চাই। এভাবে কাঁপলে সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে এলে, চলবে কেন? সেও যদি হাল ছেড়ে দেয়, সর্বনাশ ঠেকাবার চেষ্টাও যে হবে না?

চোখ মেলে সে কথা বলে। নিজের কথাগুলি নিজের কানে তার লাগে অন্য কারও কথার মতো।

—যদিই বা হয়ে থাকে, চিকিৎসা করলে সেরে যাবে। আজকাল কত ভাল চিকিৎসা বেরিয়েছে, বেশীরভাগ সেরে যায়। নন্দবাবুর ছেলেটা সেরে ওঠেনি?

হারাণ আর কিছু বলে না।

এ রোগ সারিয়ে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আশা সে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু লতাকে কাবু করে লাভ নেই।

বাড়িওলা নন্দবাবুর ছেলে? মাছ, মাংস, দুধ, ঘি, সন্দেশ খেয়ে আর অজস্র বিশ্রামের সুযোগ ভোগ করেও তার এ রোগ হয়েছিল কেন কে জানে!—বোধ হয় নানা বিকৃত খেয়ালে শরীরটাকে কাবু করেছিল বলে। মৃত্যুর পরোয়ানা পাওয়া মাত্র ভড়কে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল। নন্দবাবুর অজস্র পয়সা খরচ করা ওষুধ পথ্য আলো বাতাস বিশ্রামের চিকিৎসায়।

ছ'মাসে সে শুধু সেরেই ওঠেনি, দিব্যি নাদুসনুদুস' চেহারা বাগিয়েছে। স্বাস্থ্য যেন পুষ্টি-রসে রসস্থ হয়ে উথলে পড়েছে তার সর্বাঙ্গে।

কিন্তু কম খেয়ে বেশী খেটে সে বাধিয়েছে রোগ--নিজে বাচার জন্য আর আপন-জনকে বাঁচানোর জন্য শরীরকে পুষ্টি না দিয়ে ক্ষয় একটানা ক্ষয় করে এসেছে শক্তি আর স্বাস্থ্য। কি দিয়ে এখন সে লড়বে এ রোগের সঙ্গে? সুস্থ দেহ নিয়ে যা ঠেকানো যায়নি, এসে চেপে ধরে কাবু করার পর অসুস্থ দেহ নিয়ে সেটাকে দূর করার বাড়তি ক্ষমতা সে কোথায় পাবে?

আর হয়না। এবার শুধু দিন গোণা।

শচীনের সব জানাশোনা আছে। তাকে বলতে সে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দেয়। সেই সঙ্গে তাদের সাবধান করে দেয় যে বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা যেন কিছু জানতে না পায়।

বুক পরীক্ষার ফল জানা যায়। চিকিৎসার বিস্তারিত বিধানও পাওয়া যায়।

ডাক্তারের কাছ থেকে লতা নিজে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয়। শুধু কি করতে হবে জেনে নেওয়া নয়, যতটা পারে বুঝেও নেয়, কিসে কি হয় আর কেন হয়, কোন ব্যবস্থার গুরুত্ব কতখানি।

না খাটলে যার পেট চলে না তার কি রাজসিক রোগ!

দামী ওষুধ চাই, দামী পথ্য চাই, সূর্যের আলো চাই, মুক্ত বায়ু চাই, আরামে বিশ্রাম চাই, আর চাই আনন্দ, আশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস!

ঘিঞ্জি পাড়ায় গলির মধ্যে পুরানো বাড়ির আধ-অন্ধকার সেঁতসেঁতে একখানা ঘর, দুবেলা নিজেদের এবং আরও অনেকের উনানের ধোঁয়া ঘর ছেড়ে যেন যেতে চায় না। এই ঘরে যাদের বাস, দুটি বাচ্চার জন্য যাদের শুধু একপোয়া দুধ বরাদ্দ, মাসের গোড়ার দিকে মোট দুটো চারটে দিন যারা মাছের স্বাদ পায়, অভাব ও দুর্ভাবনায় জর্জর হয়ে যাদের মাস কাবার হয়, তাদের আজ এত সব বাড়তি ব্যবস্থা দরকার।

একটা অদ্ভুত হাসি মুখে ফুটিয়ে হারাণ বলে, বাদ দাও। এত ব্যবস্থাও হয়েছে, আমার রোগও সেরেছে। অনর্থক কতগুলি টাকা নষ্ট হবে।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে ক্ষীণাঙ্গী লতা সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ধমক দিয়ে বলে, দ্যাখো তুমি রোগী মানুষ, তোমার অত বাহাদুরী কেন? তুমি চুপ করে থাকো। আমাকেও তুমি ভড়কে দিচ্ছ!

—তুমি আর কি করবে বল?

—চেষ্টা তো করবো?

—না। মিছে চেষ্টা করে লাভ নেই। যেটুকু সম্বল আছে তাতে এ রোগ সারে না। এ সেণ্টিমেণ্টের ব্যাপার নয় লতা, জেনেশুনে সম্বলটুকু খুইয়ে তুমি পথে বসতে পাবে না। সামান্য একটু চান্স থাকলেও বরং কথা ছিল।

লতা আবার ধমক দেয়, চুপ করবে তুমি? কে বললে তোমার চান্স নেই? রোগ বাধিয়ে এখন কর্তালি করতে এসো না। আমায় বুঝেশুনে ব্যবস্থা করতে দাও। মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমার সব করতে হবে, আমার মাথা গুলিয়ে দিও না।

মাথা উঁচু করে সে আবার বলে, তেমন মেয়ে পেয়েছ নাকি আমায়, চেষ্টা না করেই হাল ছেড়ে দেব?

মুখে যাই বলুক হারাণ, মৃতদেহে সে যেন একটু প্রাণ পায়।

লতা বলে, আপিস থেকে লোন টোন যে বাবদে যতটা পার ব্যবস্থা করবে। লম্বা ছুটির দরখাস্ত করবে।

—ছুটি? ছুটি নিলে মাইনে পাব না।

—জানি। সে ভাবনা তোমার নয়। আপিসেও খাটবে অসুখও সারবে, না?

আগে চাই টাকা, তারপর অন্য কথা। যেখানে যেভাবে যতটুকু পাওয়া সম্ভব, লতা টাকা কুড়োতে আরম্ভ করে। বাপ গরিব, টাকা দেবার সাধ্য নেই, লতা বাচ্চা দুটিকে মার কাছে রেখে আসে। ওদের খরচটা বাঁচবে, ওরাও ছোঁয়াচ থেকে বাঁচবে, সে নির্ঝঞ্ঝাটে লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে রোগটার বিরুদ্ধে।

গয়না থেকে শুরু করে যা কিছু বেচা সম্ভব সব সে বেচে দেয়। আত্মীয়-স্বজন যার কাছে যতটুকু সাহায্য বা ঋণ পাওয়া সম্ভব আদায় করার জন্য উঠে-পড়ে লেগে যায়।

কাঁদাকাটা করা থেকে হাতে পায়ে ধরা, একেবারে নাছোড়বান্দার মতো এঁটে থেকে জীবন অতিষ্ঠ করে তোলা ইত্যাদি যত রকম উপায় আছে আত্মীয় বন্ধুর কাছে সাহায্য আদায়ের তার কোনটাই সে বাদ দেয় না। মান-অপমানের বোধটা একেবারে ছাঁটাই করে সে যেন চারিদিকে আক্রমণ চালায়।

শচীন বলে দিয়েছিল অন্য ভাড়াটেরা যেন হারাণের অসুখ টের না পায়। কিন্তু সর্বস্ব পণ করে চিকিৎসা আরম্ভ করে দেবার পরেও কি আর এই মহারোগ গোপন করা যায়!

লতা টের পায়, বাড়ির অন্য বাসিন্দারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে! এক বাড়িতে থেকেও যতদূর সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে চলার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

পাশের ঘরে থাকে হেমেন। তার স্ত্রী রমার সঙ্গে এতদিন খুব ভাব ছিল লতার।

সেদিন তার ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই রমা মুখ কালো করে বলে, উনি বলছিলেন, তোমার কারো ঘরে না যাওয়াই উচিত।

—আমি খুব সাবধান থাকি। ওষুধ দিয়ে হাত ধোয়া, কাপড় ছাড়া......

—তবু বলা তো যায় না।

লতা নীরবে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, বেশ। এ জন্মে আর ঢুকবো না তোমার ঘরে।

অন্য ভাড়াটেরা গিয়ে চাপ দেয় বাড়িওলা নন্দকে। নন্দ এসে বলে, দেখুন, আপনাদের অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত। আপনারা না গেলে অন্য সবাই চলে যাবেন বলেছেন।

লতা বলে, আমরা চলে যেতেই চাচ্ছি। একটু আলো বাতাসওলা ঘর খুঁজছি—পেলেই উঠে যাবো। আপনারা দিন না খোঁজ করে? লতা ভয় পায় সত্যই কিন্তু বাইরে তেজ দেখিয়ে বলে, সে আপনি যা পারেন করবেন। ঘর না পেলে রোগা মানুষটাকে নিয়ে আমি রাস্তায় নামবো নাকি? নিয়মমতো ভাড়া গুণছি না?

নন্দ বলে, একি একটা কথা হলো? মনের মতো ঘর না পেলে আপনারা যাবেন না, এতগুলি লোকের অসুবিধা করবেন? দু'চারটা দিন দেখে আমি কিন্তু বাধ্য হয়ে—

বাধ্য হয়ে সে যে কি করবে না বললেও বোঝা যায়। অন্য সব ভাড়াটেরা তার পক্ষে, কাজেই তার জোর বেড়েছে।

শচীন একটা মীমাংসা করে দেয়। বলে, দেখুন, বাবাকে বলে ছাতে আমি একটা শেড্ তুলে দিচ্ছি। যতদিন ঘর না পান, ওইখানেই আপনারা থাকুন! তাছাড়া, অন্য বাড়িতে ঘর ভাড়া নিলেও এই ব্যাপার ঘটবে। একেবারে সেপারেট একখানা ঘর পাওয়া মুস্কিলের কথা।

লতা চোখ তুলে তাকায়। শচীন তার দিকেই চেয়ে আছে। চোখের লোভটুকু বোধহয় নিছক অভ্যাস। কারণ, তার সহানুভূতি যে খাঁটি তাতে সন্দেহ নেই।

সে বলে, তাই দিন। আমার আলো বাতাসের সমস্যাও মিটবে।

ভাড়াটেরা এ ব্যবস্থা মেনে নেয়। কারণ, শচীন বলেছে যে ছাতে জলের ব্যবস্থাও সে করে দেবে, লতাকে জলের জন্য নীচে এসে সকলকে ছোঁয়াছুঁয়ি করতে হবে না। সকলের কাছ থেকে প্রায় পৃথক হয়েই থাকবে লতারা।

লতার জলের সৌভাগ্যে কারো কারো মনে বেশ ঈর্ষাও জাগে।

কয়েকদিন পরে জিনিসপত্র নিয়ে হারাণ ও লতা খোলা ছাতে টিনের চালের অস্থায়ী ঘরখানায় উঠে যায়।

হেমেন শচীনকে জিজ্ঞাসা করে, সারবে?

শচীন বলে, সব নির্ভর করছে চিকিৎসা চালিয়ে যাবার ওপর। অনেকদিন টানতে হবে। বিষম খরচ।

হেমেন বলে, তা হচ্ছে। ভদ্রলোক সত্যি ভাগ্যবান—এমন চালাক-চতুর স্ত্রী পেয়েছিলেন। রমা বলে, আগে মোটেই এরকম ছিল না। হারাণবাবুর অসুখটা ধরা পড়বার পর কেমন অদ্ভুত রকম পাল্টে গেছে।

রীতিমত বিস্ময়ের সঙ্গেই সকলে এটা লক্ষ্য করছিল। সমস্ত দায়িত্ব লতা একা নিয়েছে, একা সব পালন করে চলেছে। বাইরে গিয়ে ওষুধ পথ্য কিনে আনা থেকে হারাণের সেবাশুশ্রূষা সব কিছু দায়িত্ব। চিকিৎসা আর আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা-

গুলি যে সত্যই কি রাজসিক ব্যাপার সেটা কারো অজানা নেই। মেয়েরা কৌতূহলের বশে একে একে সকলেই লতার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছে কি দিয়ে কি হয় এবং কিসে কি লাগে।

লতা কিছুই গোপন করেনি।

বরং যারা গোড়ায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বাড়ি থেকে তাদের তাড়াতে ব্যাকুল হয়েছিল, জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে তাদের যে সমবেদনা প্রকাশ পায় তাতে সে খুশিই হয়।

কিন্তু লোকের মনে প্রশ্ন জাগে, কতদিন এভাবে চালাবে লতা? কি করে চালাবে?

তার অবস্থা তো কারো অজানা নয়!

তাই মাস দুই পরে লতার মুখে দুশ্চিন্তার কালচে ছায়া পড়েছে দেখে রমা হেমেনকে বলে, আর বুঝি টানতে পারছে না বেচারা।

হেমেন বলে, কি করে টানবে? এতো জানা কথাই।

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে সেদিন প্রথম রমা ছাতে যায়—স্নান করার আগে যায়—নীচে নেমেই সাবান মেখে নেয়ে সব ছোঁয়াছুঁয়ি ধুয়ে ফেলবে।

রমা বলে, কি করে খরচ চালাচ্ছ?

লতা বলে, যা ছিল সব ফুরিয়ে এল। এবার কিছু করতে হবে।

—কি করবে?

—দেখা যাক। একটা উপায় করতেই হবে।

রমা দারুণ অস্বস্তির সঙ্গে ভাবে কে জানে কি উপায়ের কথা ভাবছে লতা নিরুপায় মেয়েমানুষ, ভেবে সে কি উপায় বার করবে!

কয়েকদিন পরে বাড়ির সকলে লক্ষ্য করে যে সকালে ঘরের রান্নাবান্না কাজ-কর্ম সেরে সাড়ে দশটা-এগারটার সময় লতা বেরিয়ে যায়।

ফিরে আসে সন্ধ্যার সময়।

কি ব্যাপার?

রমাই তাকে জিজ্ঞাসা করে সকলের আগে।

লতা বলে, একটা কাজ পেয়েছি।

—কি কাজ?

লতা একটু ইতস্ততঃ করে বলে, একজনের বাড়িতে নার্সিং-এর কাজ।

এরপর বেশী সে আর কিছু বলে না। দিন যায়। একটা লেডিজ ব্যাগ হাতে লতা রোজ নিয়ম মতো বেরিয়ে গিয়ে ফিরে আসে। হারাণের চিকিৎসা পুরোদমে চলে। ধীরে ধীরে তার শরীরে অস্বাস্থ্যের ক্লিষ্ট ছাপ কেটে গিয়ে স্বাস্থ্যের জ্যোতি ফিরে আসতে থাকে।

সকলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে: নার্সিং-এর কাজ? জীবনে প্রথম রুগ্ন

স্বামীর সেবা আরম্ভ করেই কি এমন ট্রেইন্‌ড নার্স হয়ে গেল যে তাকে এত টাকা মাইনে দিয়ে লোকে রেখেছে, হারাণের চিকিৎসার বিরাট খরচ যাতে চালানো যায়?

হেমেন রমাকে বলে, তুমিও যেমন, ওই কথা বিশ্বাস করলে। বয়স আছে, চেহারাটা মন্দ নয়—

তাই কি? স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে নিজেকে এইভাবে বলি দিতে হয়েছে লতাকে?

রমা একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

শচীনও ভাবছিল, ব্যাপারটা কি?

লতার মুখে যখন দুশ্চিন্তার কালো ছাপ পড়েছিল, একদিন কয়েকখানা নোট পকেটে নিয়ে শচীন বিকেলের দিকে তার কাছে গিয়েছিল। হারাণ তখন বেড়াতে গেছে।

বলেছিল, দেখুন, আমিও এ রোগে মরতে বসেছিলাম। আমার কাছে টাকা নিলে কোন দোষ নেই।

লতা বলেছিল, আপনি অনেক করেছেন। আমি চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। টাকার দরকার নেই।

তবু শচীন নড়ে না দেখে লতা বলেছিল, টাকা দিয়ে কেনার মানুষ আমি নই শচীনবাবু।

শচীনের রাগ হয়েছিল খুব। তারপর আর কোন খবর নেয়নি।

পথে মুখোমুখি হলেও যেচে কথা বলেনি।

কিন্তু সেদিন বিকেলের দিকে এমনভাবেই তাকে মুখোমুখি হতে হল লতার যে রাগ নিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সাধ্য তার হল না। জনাকীর্ণ রাজপথ। তারই ধারে ফুটপাথে কম্বল বিছিয়ে লতা বসে আছে। তার পিছনে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা মস্ত একটা বিজ্ঞাপন।

"যক্ষ্মা নিবারণী মহাকর্কট বটিকা।

এই বটিকায় আমার স্বামীর যক্ষ্মা সারিয়াছে।

সপ্তাহে একটি বটিকা সেবনে যক্ষ্মার ভয় থাকে না।

প্রতি বটিকা—এক আনা।

কত পয়সা কত দিকে যায়—সপ্তাহে এক আনা খরচে মহা রোগ ঠেকান।"

শচীন একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। লতা একটু হাসে।

তখন আপিস ছুটি হয়েছে। বিক্রীর সময়। খানিক তফাতে শচীন অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সন্ধ্যার খানিক আগে লতা উঠে বিজ্ঞাপনটি ভাঁজ করে, কম্বলটি তুলে গুটিয়ে নেয়, ব্যাগটি হাতে করে এগিয়ে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়ায়।

শচীন কাছে গিয়ে বলে, এতে সত্যি সত্যি চলছে আপনার?

লতা বলে, চলছে বইকি। হাতে কিছু পয়সাও জমেছে। আশ্চর্য হচ্ছেন কেন? যে দেশে কাসি হলে ফাঁসির আতঙ্ক জাগে, সে দেশে একআনা খরচ করে লোকে নিশ্চিন্ত হতে চাইবে না?

শচীন বুঝতে পারে, লতা ফাঁসি বলতে টি-বির কথাই বলছে।

এক বাড়িতে

বিলাসময়ের স্ত্রী সুরবালা শুনে বলে, না, আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে দেনা-পাওনার সম্পর্ক করতে নেই! বড় মুস্কিল হয়। বাইরের লোকের সঙ্গে সোজাসুজি কারবার, যা বলবার স্পষ্ট বলতে পারবে। আত্মীয় বন্ধুর কাছে চক্ষুলজ্জায় মুখ ফুটবে না। বন্ধুকে ভাড়াটে করে বাড়িতে এনে কাজ নেই।

ঃ বড় মুস্কিলে পড়েছে বেচারা—

ঃ পড়ুক। অমন কত লাখ লাখ লোক ঢের বেশী মুস্কিলে পড়েছে। বন্ধুকে অন্য বাড়ি খুঁজে দাও, নিজের বাড়িতে ও-ঝঞ্ঝাট ঢুকিয়ে কাজ নেই।

বিলাসময়ও যে কথাটা এদিক থেকে বিবেচনা করেনি তা নয়। সুধীর অনেক দিনের বন্ধু—গলায় গলায় ভাব। সেলামীর কোন প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু ওকে ঘর দু'খানা ভাড়া দিলে এক পয়সা আগাম নেওয়া যাবে না, সময়মতো ভাড়া না দিলে দাবড়ানি দেওয়া যাবে না, উঠতে বসতে সব বিষয়ে বন্ধুত্বের মর্যাদা রেখে চলতে হবে।

কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেই আবার মুস্কিল—রেহাই পাওয়া যায় কিসে? সুধীর এত করে বলছে, এখন তাকে না দিয়ে অন্য কাউকে ঘর দু'খানা কোন্ অজুহাতে দেওয়া চলবে?

সে তাই চিন্তিতভাবে বলে, ও কি সহজে ছাড়বে?

সুরবালা তাকে বুদ্ধি বাৎলিয়ে দেয়। বলে, এক কাজ কর। যা দিনকাল পড়েছে, বন্ধু বলেই তো টাকা পয়সার ব্যাপারে খাতির করা চলবে না? খুব চড়া ভাড়া চেয়ে বসো—সত্তর কি আশী টাকা। আর আগাম চাও পাঁচশো। বলবে যে একজন আগাম দিয়ে এই ভাড়ায় আসতে চায়। বন্ধু নিজেই ছাড়বে—ভাবতে হবে না!

এ মন্দ যুক্তি নয়। পাঁচশো টাকা আগাম দেবার মধ্যে যদিই বা হয় ধার করে গয়নাগাটি বন্ধক দিয়ে—মাসে দু'খানা ঘরের জন্য আশি টাকা ভাড়া দেবার ক্ষমতা সুধীরের নেই। চরম চাহিদার এই বাজারেও ঘর দু'খানার চল্লিশ টাকার বেশী ভাড়া হয় না—সাধ্য থাকলেও সুধীর ডবল ভাড়া দিতে রাজী হবে কেন?

ভাগ্যে এখনও ভাড়ার কথা কিছু হয়নি সুধীরের সঙ্গে। সে শুধু দাবী জানিয়ে রেখেছে যে, ঘর দু'খানা সে-ই ভাড়া নেবে। অন্য কাউকে যেন দেওয়া না হয়। কিভাবে বন্ধুর কাছে আগাম আর ভাড়ার কথাটা পাড়বে মনে মনে বিলাসময় তাই আওড়াতে থাকে।

পরদিনই সুধীর কথাটা পাকা করতে আসে। দু'তিন মাস তার মুখে দুশ্চিন্তার

বাড়তি একটা কালো ছাপ পড়েছিল আজ দেখেই বোঝা যায় মুখ থেকে সে মেঘটা কেটে গেছে।

দেখে, বিলাসময় বড়ই অস্বস্তি বোধ করে।

ঘর দু'খানা সে পাবেই এটা নিশ্চিত জেনে বন্ধু একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে! তা, তাদের বন্ধুত্বের হিসাব ধরলে সুধীরের নিশ্চিন্ত হওয়া আশ্চর্য নয়। আর নিশ্চিন্ত হয়ে তার মুখে যে অনেকদিন পরে হাসি ফুটবে সেটাও আশ্চর্য নয়। কি অবস্থায় যে তার দিন কাটছে বিলাসময় তা ভালভাবেই সব কিছু জানে।

কিভাবে এ অবস্থায় এসে পড়েছে সে ইতিহাসও তার অজানা নয়। জন্ম থেকে তার কলকাতায় বসবাস, পাকিস্তান হিন্দুস্থানের জন্ম সংক্রান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামার ধাক্কা লেগেছে তারও গায়ে। তার দাদা ভাল চাকরী করে, একখানা বাড়ি করেছে। অবশ্য স্ত্রীর নামে—নইলে সাহস করে ভাইকে একখানা ঘরে থাকতে দেবার মতো উদারতাটা দেখিয়ে ফেলার ভুলটা করত কি না সন্দেহ। হঠাৎ পাকিস্তান থেকে উৎখাত হয়ে এসেছে তার শ্বশুর বাড়ির সকলে আর ছেলেপুলে নিয়ে তার বড় মেয়ে ও জামাই।

বাড়ি থেকে সুধীরকে সে এক রকম তাড়িয়ে দিয়েছে। সুধীরের মেয়েটির সন্তান সম্ভাবনা সত্ত্বেও। হয়তো নিরুপায় হয়ে অগত্যাই ভাইকে এ-অবস্থায় এ-ভাবে তাড়িয়ে দিয়েছে,—নইলে শেষের দিকে ব্যবহার খারাপ হয়ে এলেও একখানা ঘরে ভাইকে সপরিবারে মাথা গুঁজে থাকতে দিতে আরও কিছুকাল হয়তো তার আপত্তি হতো না।

শ্যামবাজারে বোনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সুধীর—যে ক'টা দিন নিজের একটা আস্তানা খুঁজে নিতে না পারে। দু'খানা ঘরে বোনের মস্ত সংসার—তার মধ্যে আসন্নপ্রসবা মেয়েটিসমেত সুধীর মাথা গুঁজে আছে আজ প্রায় তিন মাস। তার ওপর স্ত্রীর ও তার অসুখ।

বোন, ভগ্নীপতি আর ভাগ্নে-ভাগ্নীর মুখ গোমড়া. ভাব করে কেন কেউ এক রকম তাদের সঙ্গে কথাই কয় না। শুধু গজর গজর করে।

সুধীর প্রথম কথাই বলে মারাত্মকঃ ঘর দু'টো যখন ভাড়াই দেবে—কাল-পরশু থেকে দিয়ে দাও। আজ মাসের তেইশে মিছে আর পয়লা পর্যন্ত ভোগাবে কেন! একেবারে পাগল হয়ে যেতে বসেছি।

বিলাসময় চেষ্টা করেও মুখের ভাব বা গলার স্বর স্বাভাবিক রাখতে পারে না। রীতিমতো গম্ভীর হয়ে বলে, তোমাকে একটা কথা বলি। তোমার আমার মধ্যে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কিছু নেই—আমাদের সে সম্পর্ক নয়।

সুধীর ভড়কে গিয়ে বলে, এ যে বিষম রকম ভূমিকা করে বসলে! ব্যাপার কি ভাই?

ব্যাপার কিছু নয়। তোমায় শুধু খোলাখুলি একটা কথা বলছি। ভাড়া-টারার ব্যাপারে আমি কিন্তু কোনও রকম কনসেশন দিতে পারব না। অন্যের কাছে যা পাব তোমাকেও তাই দিতে হবে।

সুধীর স্বস্তি পেয়ে বলে, তাই বল! এই কথা? অন্যে যা দেবে আমিও নিশ্চয় তাই দেব। আমি চেয়েছি কনসেশন? আমিও ভাবছিলাম তোমায় স্পষ্ট বলে দেব, এসব বিষয়ে যেন কোন সঙ্কোচ কোরো না। লেন-দেনের ব্যাপারে বন্ধুত্ব টানতে নেই—সাফ স্পষ্ট কথা। ঘর পাচ্ছি তাই ঢের, তোমার আর্থিক ক্ষতি করব কেন ভাই—।

বিলাসময় স্ত্রীকে স্মরণ করে আন্তরিক নিঃশ্বাস ফেলে বলে, দিনকাল বুঝতেই পারছো। তাছাড়া এ শুধু আমার নিজের ব্যাপার নয়—উনিও একজন কর্তা ব্যক্তি।

সুধীর হেসে বলে, আমাকে কর্তা চেনাচ্ছ নাকি? আমার বাড়িতে কর্তাব্যক্তি নেই?

সে তখনও ধারণা করতে পারেনি বিলাসময় দু'খানা ঘরের জন্য কি অসম্ভব দাবি করে বসবে। বন্ধুর প্রস্তাব শুনে হাসি মিলিয়ে তার মুখ খানিকটা হাঁ হয়ে যায়। বিস্ময় আর অবিশ্বাস তাকে বলায়ঃ ঠাট্টা করছ?

ঃ না ভাই, ঠাট্টা নয়। এর কমে পারব না। কালকেই একজন আমায় টাকাটা হাতে গুঁজে দিয়ে রসিদপত্র লিখে ফেলবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল।

ঃ পাঁচশো টাকা আগাম? আশী টাকা ভাড়া?

সুধীরের বিস্ময় আর অবিশ্বাস যেন কিছুতেই কাটতে চায় না।

বিলাসময় তার মুখের দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে চেয়ে বলে, তুমি হয়তো ভাবছ, আমিও দলে ভিড়েছি, চামার হয়ে পড়েছি। কিন্তু কি করি বল? অন্যের কাছে যা পাব, তোমার বেলা কমাতে পারব না। টাকার চিন্তায় পাগল হতে বসেছি। তোমার পোষাবে না জানি, আমি বরং কম ভাড়ায় ঘর খুঁজে দেব।

সুধীরের মুখে অদ্ভুত এক ধরনের হাসি ফোটে।

ঃ তিন মাসে খুঁজে দিতে পারলে না, আর কবে খুঁজে দেবে?

বিলাসময় কথা কয় না।

সুধীর একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মনের ভাবের প্রতিফলনে তার মুখে যেন ঘন কালো মেঘ আর চড়া রোদের খেলা চলতে থাকে। সকলের জীবনে চারিদিক থেকে কী ভয়ঙ্কর কী বীভৎস সব অন্যায় আর অনিয়মের আবির্ভাব ঘটেছে। দিন দিন যেন ভয়াবহ হয়ে ওঠার রেটটা চড়ছে জীবন যাপনের। যুদ্ধ থেমে গিয়ে ইংরেজ চলে গিয়ে কংগ্রেস রাজা হয়েছে বলে কি এত স্বপ্নাতীত অঘটন অনিয়মও সম্ভব হতে পারে?

সুধীর বলে, ঘর খুঁজে দেবে বলছ, কিন্তু এই যদি ঘর ভাড়ার বাজার দর হয়, কম ভাড়ায় ঘর তুমিই বা কোথায় খুঁজে পাবে?

ঃ দেখব চেষ্টা করে

ঃ দু'চার দশ বছর লেগে যাবে।

বিলাসময় আবার চুপ করে থাকে।

সুধীর বলে, থাক গে কি আর করা যাবে। এর মধ্যে খবর পেয়ে একজন

যখন পাঁচশো টাকা আগাম দিয়ে ওই ভাড়ার ঘর দুটো ভাড়া নিতে পীড়াপীড়ি করছে, ঘর ভাড়ার বাজার দরটা এই রকম দাঁড়িয়েছে নিশ্চয়।

বিলাসময় বেশ খানিকটা শংকিত হয়ে বন্ধুর কথা শোনে। সুধীর সত্যই তার অসম্ভব দাবি মেনে নেবে নাকি?

সুধীর আরও মিনিটখানেক ভেবে বলে, বেশ, আমি রাজী। তুমি যা চাইছ তাই দেব।

ঃ পারবে?

ঃ পারব--কষ্ট হবে। দিন কালটাই দুঃখ কষ্টের উপায় কি। আমি কিন্তু পরশুই আসব ভাই। এ কদিনের জন্য অর্ধেক মাসের ভাড়া দেব কিন্তু। পুরো মাসের দেব না আগেই বলে রাখছি।

সুরবালা আড়াল থেকে কান পেতে সব কথাই শুনছিল। খানিক পরে সে চা আর শিঙাড়া নিয়ে ঘরে ঢোকে।

ঃ এসে বাইরের ঘরেই বসে রইলেন? অন্ততঃ একটা খবর তো দিতে হয়!

ঃ খবর পেয়েছেন সে তো দেখতেই পাচ্ছি--খাবার এসে গেছে। দুদিন বাদে স্থায়ীভাবে ভেতরে ঢুকছি, সবাইকে নিয়ে। জ্বালাতনের একশেষ হবেন।

ঃ জ্বালাতন হতেই তো চাই!

বিলাসময়ের মুখের দিকে চেয়ে -সুরবালা যেন আড়াল থেকে কিছুই শোনেনি, কিছুই জানে না এই ভাবে বলে, কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল?

ঃ হ্যাঁ ও রাজী হয়েছে। পরশুদিন আসবে বলছে।

সুরবালা বলে, বেশ তো, ভালই। কাল সন্ধ্যায় তাহলে লেখা পড়াটা করে ফেলুন? না পরশু সকালে আসবেন?

সুধীর শিঙাড়া চিবোতে চিবোতে বলে, কাল সন্ধ্যাবেলাই আসব। পরশু আসব সবাইকে নিয়ে।

সুধীর আর বড় ছেলে বিষ্ণুর গায়ের জোরের উপর নির্ভর করে গাড়ি থেকে নেমে টলতে টলতে বাড়ির ভিতরে যাওয়ার সময় অলকাকে দেখেই টের পাওয়া যায় গত সন্ধ্যায় সুধীর কোথা থেকে কিভাবে সংগ্রহ করে এনে পাঁচশো টাকা আগাম দিয়ে ঘর ভাড়ার চুক্তিপত্রে সই করেছিল। অলকার গা খালি। সুরবালার ঠিকাঝির নাকে কানে আর হাতে যেটুকু সোনা আছে, অলকার গায়ে সেটুকুও নেই। সোনা-বাঁধানো একটি লোহা পর্যন্ত নয়! শুধু কপালে সিঁদুর আর হাতে শাঁখা।

পাঁচশো টাকা আগাম দিয়ে আশি টাকা মাসিক ভাড়ায় যে মানুষটা ঘর ভাড়া করে তার বৌ যখন স্বর্ণ চিহ্ন লেশহীনা হয়ে ভাড়া করা ঘরে ঢোকে তখন কি আর অনুমান করতে কষ্ট হয় যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে গয়না গাঁটি যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাই দিয়ে ঘর ভাড়া আগামের টাকাটা সংগ্রহ করা হয়েছে।

পুষ্প নিজেই গাড়ি থেকে নামে খুব সাবধানে। আজকেই কোন এক সময় তার প্রসব বেদনা শুরু হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সুরবালার মেয়ে বিনতা পুষ্পর সমবয়সী, বিয়ের আগে দু'জনের গলায় গলায় ভাব ছিল। বিয়ের পর দু'জনের দেখা হয়েছে কদাচিৎ—বছরে দু'একবার।

তবু কুমারী জীবনের সখিত্ব কি শেষ হয় বিয়ের পর কয়েক বছরের অদর্শনে? বিনতার ছেলেপিলে হয়নি এখনো, সে শুধু বেড়াতে এসেছে বাপের বাড়ি—উৎসুক আগ্রহে সে এগিয়ে যায়, পুষ্পকে বলে, বাঃ বেশ, বিয়ে তো সবারি হয়, এর মধ্যে এমন কাণ্ড করেছিস?

পুষ্প ভারি মুখে নিস্পৃহভাবে সংক্ষেপে বলে, কাণ্ড আবার কি? তুই নিশ্চয়ই ঠেকিয়েছিস?

হায়, সখিত্ব শেষ হয়ে গেছে তাদের। কোন স্বার্থের কোন টানাটানি থাকে না বলে যে ছেলেমানুষি সখিত্ব জমায়েত থাকে আজীবন—একযুগ পরে ঘটনাচক্রে কয়েক ঘণ্টার জন্যে দেখা হলে দুটি ধর্ষিতা নিপীড়িতা মনেও আবার ছেলেমানুষি রূপক রসের আমেজ লাগে—সেই সখিত্ব তাদের তেতো হয়ে গেছে।

কেন হয়েছে সে তো জানা কথাই।

প্রথম কাজ বিছানা পেতে অলকাকে শুইয়ে দেওয়া, তারপর ঘর সংসার গুছানো। সুরবালা অলকার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

রোজ রোজ জ্বর আসে নাকি?

রোজ।

অলকা খুক খুক করে কাসে। শঙ্কিত চিন্তিত দৃষ্টিতে সুরবালা চেয়ে থাকে। কে জানে এ কি রোগ বাড়িতে ঢোকানো হল? বেশী মেলামেশা ঘেঁষাঘেঁষি চলবে না।

ছেলে মেয়েদের সুরবালা সাবধান করে দেয়।

এক বাড়িতে সপরিবারে দু'টি বন্ধু—বাড়িওলা ও ভাড়াটে সম্পর্ক। ক'দিন আগেও রাস্তায় দেখা হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে কখন ঘণ্টা কাবার হয়ে গেছে টের পাওয়া যায়নি, আজ এত কাছাকাছি এসেও দু'চার মিনিটের বেশী আলাপ হয় না—তাও আবার ছাড়াছাড়া ভাসাভাসা আলাপ!

সময় আছে ঢের—হঠাৎ যেন বক্তব্য ফুরিয়ে গেছে উভয় পক্ষের! দূরে দূরে দুটি ভিন্ন বাড়িতে থাকার সময় যেমন নিজের নিজের ভাবনা নিয়ে তারা মশগুল থাকত, সেই দূরত্বই যেন এসেছে এক বাড়িতে পার্টিশনের দু'পাশের মধ্যে!

পার্টিশন শুধু ঘর দু'খানার জন্য। সদর দরজা এক, কল বাথরুম এক, বারান্দার একটু অংশ ঘিরে তৈরী নতুন রান্নাঘর ও সুরবালার রান্নাঘরে যাওয়া-আসা একই বারান্দা দিয়ে।

দূরত্বটা তাই স্পষ্ট অনুভব করা যায়—প্রত্যেকে অনুভব করে; কাছে আসার বাস্তবটা বাতিল করার কৃত্রিম বিশ্রী দূরত্ব।

মাসকাবারে সুধীর অর্ধেক মাসের ভাড়া দিতে গেলে বিলাসময় বলে, থাকগে, এ ক'টা দিনের ভাড়া দিতে হবে না। একেবারে সামনের মাস থেকে দিও।

তা কি হয়! কথা যা হয়েছে সেটা শুনতে হবে বৈকি?

মাসের মাঝামাঝি পুষ্প তিন দিন দারুণ কষ্ট পেয়ে একটি ছেলে বিয়োয়, বাচ্চাটা মারা যায় পরদিন। বাচ্চাটা মারা যাওয়ায় কেউ বিশেষ দুঃখিত হয়েছে মনে হয় না, বরং আরও একটা দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য একটু স্বস্তিই যেন সকলে বোধ করে—পুষ্প পর্যন্ত।

ছেলেপিলে হয়ে মারা গেলে শুধু চুকেবুকে যায় হাঙ্গামা, মায়ের পর্যন্ত আপসোস হয় না, অবস্থার ফের এমনও করে দিতে পারে এই সব স্নেহাতুরাদের? পেটের দায়ে ছেলেমেয়ে বেচে দেবার কাহিনী আজও এই দুর্ভিক্ষের দেশে শোনা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে বাপ-মার তো এই হিসাবটাও থাকে যে অন্যের হয়ে যাক, ছেলেমেয়ে তো উপোস দিয়ে মরার বদলে বাঁচবে।

কোন হাসপাতালে বেড খালি পাওয়া যায়নি। অন্য প্রসবাগারে দেওয়া যেত—কিন্তু বেডের ভাড়া আর আনুষঙ্গিক খরচ বড় বেশী। বাড়িতে ভাল ডাক্তার আনা যেত; কিন্তু ভাল ডাক্তারের ফী বড় চড়া।। সাধারণ যে ডাক্তার সুধীর এনেছিল সেও পুষ্পর কষ্টভোগ কমাতে পারত, বাচ্চাটাকে হয় তো বাঁচাতে পারত কিন্তু এখানেও সেই একই কিন্তু—সে জন্য যে-চিকিৎসা দরকার ছিল তার জন্য খরচ দরকার ছিল অত্যধিক।

জামাইকে টাকা পাঠাতে জরুরী তার করেছিল। ছাঁটাই-বেকার জামাই এসেছিল খালি হাতে—সব চুকেবুকে যাওয়ার পর জামাইকে তার ফিরে যাবার গাড়ি ভাড়া দিতে হয়েছে।

সকলেই প্রায় নির্বিকারভাবে হিসাব-কষা স্বস্তির সঙ্গে বাচ্চাটার মরণকে স্বীকার করেছে, সুধীর পারেনি। এই তার প্রথম নাতি বলে নয়, ওসব সখ আর সুখের হিসাব তার চুকে গেছে। সে ছাড়া বাড়ির কেউ জানে না যে চেষ্টা করলে—টাকা খরচ করলে—বাচ্চাটাকে বাঁচানো যেত। সেই শুধু জানে। সেই শুধু জানে যে, মেয়েটার তিনটি দিনরাত্রি ধরে অমন বীভৎস যন্ত্রণা ভোগও প্রয়োজন ছিল না।

মেয়েটার জন্যই এক রকম মরিয়া হয়ে দু'টি ঘরের জন্য সে পাঁচশো টাকা যোগাড় করেছে, দেড়শ' দুশো টাকার জন্যে সেই মেয়েটাকে ঠিকমতো প্রসব করানো গেল না।

সুধীরের বুকটা তাই জ্বলে যায়—আপসোসে ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায়!

তবু শান্ত নির্বিকারভাবেই সে মাসকাবারে দুশো টাকা বেতন থেকে আশি টাকা বিলাসময়ের হাতে গুণে দেয়, স্ট্যাম্প আঁটা রসিদ গ্রহণ করে।

তারপর একদিন হঠাৎ স্তম্ভিত বিস্ময়ের সঙ্গে বিলাসময় ও সুরবালা টের পায় সুধীর তাদের কিছু না জানিয়েই ঘর দু'খানার ন্যায্য ভাড়া ঠিক করে দেবার জন্যে রেণ্ট কণ্ট্রোলারের কাছে দরখাস্ত করেছে।

ভাড়া নির্দিষ্ট হয় চল্লিশ টাকা। যে আশি টাকা সুধীর দিয়েছে তার অর্ধেক টাকা পরবর্তী মাসের অগ্রিম ভাড়া হিসাবে ধরা হয়।

সব চুকেবুকে যাবার পর সদর দরজায় খিল লাগিয়ে ভেতরে এসে বিলাসময় আকাশে গলা তুলে চিৎকার করে বলে, এত বড় বজ্জাত তুমি! বন্ধু সেজে বন্ধুর সঙ্গে এই ব্যবহার! এই মতলব ঠিক করে তুমি ঘর ভাড়া নিয়েছিলে? বেরোও

তুমি আমার বাড়ি থেকে। তোমার আগাম টাকা, ভাড়ার টাকা পাইপয়সাটি পর্যন্ত ফিরিয়ে দিচ্ছি, বেরিয়ে গিয়ে রেহাই দাও আমায়!

সুরবালা তীক্ষ্ম কণ্ঠে চেঁচায়ঃ বন্ধুর বেশে এ কোন সর্বনেশে শনি ঘরে ঢুকেছে গো!

ঘর দু'খানা থেকে কোন জবাব আসে না। শুধু শোনা যায় সুধীর বিষ্ণুকে ধমকাচ্ছেঃ চুপ করে থাক। কথাটি বলবি না।

বিলাসময় ধৈর্য হারিয়ে গাল দিয়ে বলে, হারামজাদা, জুয়াচোর বজ্জাত! বেরো তুই আমার বাড়ি থেকে। তোদের আমি ঘাড়ে ধরে লাথি মেরে বাড়ি থেকে তাড়াব।

বিষ্ণু কলেজে পড়ে। তার অহংত তীব্র কণ্ঠ শোনা যায়ঃ চুপচাপ গালাগালি শুনবে বাবা?

জবাবে সুধীরের দৃঢ়কণ্ঠে শোনা যায়ঃ দিক না গালাগালি। ছোটলোক মানুষ আর কুকুর ঘেউ ঘেউ করে। আমাদের কি বয়ে গেল? পুলিস ডেকেও তো আমাদের তুলতে পারবে না। তুই চুপ করে বসে থাক্।

চুপচাপ গাল শুনব!

বিষ্ণুর কথা প্রায় আর্তনাদের মতো শোনায়।

বিলাসময় গর্জন করে বলে, এই শুয়োর বেরোলি ঘর থেকে?

তীরবেগে বিষ্ণু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বিলাসময়ের সামনে রুখে দাঁড়িয়ে বলে, শুয়োর বলছেন কাকে?

সুরবালা আঁতকে উঠে স্বামীর গায়ের গেঞ্জি টেনে ধরে বলে, থাক থাক, চুপ কর। পরে বিহিত হবে।

বিলাসময় বিষ্ণুর গালে একটা চাপড় বসিয়ে দেয়। বলে, শুয়োর বলছি তোর বজ্জাত জুয়াচোর বাপকে।

সেটা উভয় পক্ষের কমন বারান্দা। বারান্দার এ প্রান্তে সুধীরদের জন্য সংক্ষেপে ঘেরা রান্নাঘর–পুষ্প সেখানে চালকুমড়ার তরকারী রেঁধে কুচি করে কাটা চোকলা দিয়ে ছেঁচকি রাঁধতে রাঁধতে খন্তি হাতে বেরিয়ে এসে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিষ্ণু তার হাতের সেই সস্তা চিলতে খন্তিটা কেড়ে নিয়ে বিলাসময়ের ঘাড়ে খাঁড়ার মতো কোপ মারে। খন্তির ঘায়ে মানুষের গায়ের চামড়ার চলটা পর্যন্ত তোলা যায় না দেখে সে বোধহয় ক্ষেপে যায়।

বারান্দার এদিকে শেষ প্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে বিলাসময়ের কয়লা রাখা হয়। এক-একখানি আস্ত ইঁট দিয়ে ঘরোয়া কয়লা গুদামটির সীমা প্রাচীর করা হয়েছে। বিষ্ণু অবশ্য অনায়াসে ওই আলগা ইঁট তুলে নিয়ে বিলাসময়কে মারতে পাবত।

তার বদলে সে কয়লারই একটা সাত-আট সেরি চাপড়া তুলে নিয়ে বিলাসময়ের মাথায় প্রাণপণে ঠুকে দেয়। আগের দিন বিকালে বিলাসময়ের দু'মণ কয়লা এসেছিল। দু'মণ কয়লায় তার তের দিন চলে। বিলাসময় কাত হ'য়ে পড়ে যায়। মনে হয় সে যেন সুরবালার কোলেই ঢলে পড়েছে।

তার ফাটা মাথা দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসে।

উপদলীয়

একদিন সকাল বেলা প্রশান্ত নতুন একটি লেখা আরম্ভ করে একমনে লিখে যাচ্ছে, বাইরের এক ছোট শহর থেকে একজন তার সংগে দেখা করতে এল।

প্রশান্ত নামকরা লেখক এবং দরজায় খিল এ‘টে জগতকে বর্জন ও নিজেকে ঘরের কোণে নির্বাসিত করে সাহিত্য চর্চায় সে অবিশ্বাসী। লেখার সময় লোকজন প্রায়ই তার কাছে আসে।

সে তাতে খুশিই হয়।

লেখার ব্যাঘাত ঘটার বদলে তাতেই তার লেখা আরও জমে।

মানুষটিকে চেনা চেনা মনে হল। প্রশান্ত অনেক সভা-সমিতিতে যাতায়াত করে, নানা উপলক্ষে বহুলোকের সংগে তার সাময়িক পরিচয় ঘটে। একজনকে দেখে এরকম চেনা চেনা মনে হওয়া নতুন ব্যাপার কিছুই নয়।

আগন্তুক নিজের পরিচয় দিল। তার নাম সুবিনয়, বাস ঐ ছোট শহরে, ওখানে নতুন একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়া হয়েছে, সে তার সম্পাদক। সামনের শনিবার তাদের শহরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, সকলের ইচ্ছা এবং দাবি প্রশান্ত সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবে।

প্রশান্ত বলতে গেল, দেখুন—

আপনাকে যেতেই হবে। আমাদের ওখানে প্রতিক্রিয়া কি জোরালো আপনি ধারণা করতে পারবেন না। আপনি না গেলে আমরা দাঁড়াতে পারব না।

যেতে আমার অনিচ্ছা নেই। কিন্তু সময় করে উঠতে পারব না।

কিন্তু সুবিনয় নাছোড়বান্দা।

আপনাকে একটু সময় করে যেতেই হবে। আপনারা যদি শুধু কলকাতার বড় বড় মিটিং-এ যান, আমরা দাঁড়াই কোথায়? আমরা বহুদিন থেকে আপনাকে নেবার চেষ্টা করছি, দু'বার আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। এবার না বললে শুনব না।

দু'বার ফিরিয়ে দিয়েছি? এত জায়গা থেকে ডাক আসে—

একটু কষ্ট করে চলুন। ওখানকার সমস্ত লোক আপনাকে দেখার জন্য, আপনার কথা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে গেছে। আমরা এখনও ঘোষণা করিনি কিন্তু মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে যে আমরা আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

প্রশান্ত একটু চিন্তা করে বলে, আপনাদের যখন এত আগ্রহ, আপনাদের স্নেহের খাতিরে যেতেই হবে!

সভা-সমিতির সময় নিয়ে বাংলায় একটা অদ্ভুত, সর্বজনবিদিত প্রকাশ্য ফাঁকি গড়ে উঠছে—সর্বত্র। সভা যারা ডাকে তারা হিসাব করেই আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা হাতে রেখে সভার সময় ঘোষণা করে, সভায় যারা আসে তারাও সেই হিসাবেই আসে।

একটা নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে।

বিষ্ণুপদ নামে একটি যুবক প্রশান্তকে নিতে এসেছিল। পথে তাকে প্রশান্ত বলে, এটা হল একটা রোগের উপসর্গ। যাঁরা সভা ডাকেন আর যাঁরা সভায় আসেন তাঁদের মধ্যে একটা কৃত্রিম দূরত্বের লক্ষণ। এ দূরত্ব যদ্দিন না ঘুচছে, হাজার চেষ্টা করেও ফাঁকিটা দূর করা যাবে না।

বিষ্ণুপদ মৃদু হেসে সায় দেয়।

তোমাদের টাইম কটায়?

বিষ্ণুপদ পকেট থেকে একটা ছাপানো হ্যান্ডবিল তার হাতে দেয়। সবচেয়ে বড় হরফে তার নাম ছাপানো হয়েছে। সভার স্থান গোবিন্দ মেমোরিয়াল হল, সময় বৈকাল পাঁচটা।

বিষ্ণুপদ জানায় তারা শুধু ছাপা হ্যান্ডবিল বিলি করেনি, হাতে লিখে অনেক পোষ্টারও চারদিকে লাগিয়েছে।

সবচেয়ে বড় হরফে তার নাম ছাপানোর জন্য নয়,—নামের মোহ তার কেটে গেছে অনেকদিন আগেই—অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য এদের উৎসাহ ও প্রচেষ্টা প্রশান্তকে খুশি করে। সভায় বহুলোকের সমাবেশটাই তার কাম্য। এরকম অনুষ্ঠানের সার্থকতার দিক থেকে তো বটেই, সেটাই প্রথম তার প্রধান কথা, তার নিজের দিক থেকেও বটে।

তার অসম্ভব খাটুনি। অল্প লোকের ছোট সভায় বলতে দাঁড়িয়ে তার মনে হয়, এতখানি সময় লেখার পিছনে দিতে পারলে তার বক্তব্য আরও কত বেশী মানুষকে সে পড়াতে পারত।

চারটের পর ট্রেণ ছোট স্টেশনটিতে পৌঁছায়।

প্রশান্তকে অভ্যর্থনা করার জন্য কয়েকজন স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। খানিক কথাবার্তার পর তারা সাইকেল রিক্সায় গোবিন্দ মেমোরিয়াল হলের দিকে যাত্রা করে। যেতে যেতে প্রশান্ত লক্ষ্য করে, বেশ আঁটোসাঁটো ঘনবদ্ধ ছোটখাট শহরটি। আশে-পাশে কয়েকটা কারখানার চিমনি মাথা উঁচু করে আছে।

এখন সভায় গিয়ে বসে লাভ নেই। সাড়ে পাঁচটার আগে সভার কাজ আরম্ভ হবে না, ছ'টাও বেজে যেতে পারে। গোবিন্দ মেমোরিয়াল হলটি বেশ বড়। ফেস্টুন ও পোস্টার দিয়ে ভাল করে সাজানো হয়েছে। হলের পিছনের দিকে ছোট লাইব্রেরী ঘরটিতে বসে প্রশান্ত অপেক্ষা করতে করতে সভার উদ্যোক্তা দু'তিন জনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে।

আধঘণ্টা পরে মাইক ফিট করার আওয়াজ কানে আসায় একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে, মাইক এনেছেন?

মাইক ছাড়া কি মিটিং হয় আজকাল?

এরা তবে সভায় বহুলোক সমাগম আশা করছে। প্রশান্ত খুশী হয়। এই তো চাই। বৃহত্তম জনতার সঙ্গে আত্মীয়তাই তো প্রগতির আসল কথা।

জনসমাবেশের কলরবের সঙ্গে বহুদিন থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। পৌনে ছটা বাজে অথচ হলে যে বেশী লোক জমেছে লাইব্রেরী ঘরে বসে তা টের পাওয়া যায় না।

আরও কয়েক মিনিট পরে সভার কাজ আরম্ভ করার জন্য হলে এসে প্রশান্ত প্রায় স্তম্ভিত হয়ে যায়।

ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে হলে শ্রোতার সংখ্যা পঞ্চাশের বেশী হবে না। আরও বিশ-পঁচিশ জন এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে, সভার কাজ আরম্ভ হলে আসন গ্রহণ করবে।

সভার একজন উদ্যোক্তাকে সে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার? একেবারেই তো লোক হয়নি? সে জবাব দেয়, সংস্কৃতির ব্যাপারে একেবারে উদাসীন এখানকার লোক।

অথবা আপনাদের সংস্কৃতির ব্যাপারে উদাসীন?

আমরাই তো এখানে সংস্কৃতি করি!

জবাবটা মোটেই তার পছন্দ হয় না। স্থানীয় লোক সংস্কৃতির ব্যাপারে একান্ত উদাসীন হলে এবং শুধু এরাই সংস্কৃতি করলে--কাদের নিয়ে কাদের জন্য কি সংস্কৃতি এরা করে বোঝা বড়ই কঠিন।

সভাপতির আসনে বসে সে মুষ্টিমেয় শ্রোতাদের দিকে তাকায়। আশ্চর্য, দুর্বোধ্য লাগে ব্যাপারটা তার কাছে। এর চেয়ে কত ছোট জায়গায় সভায় গিয়েছে, হ্যাণ্ডবিল পোস্টার মাইকের সমারোহ ছাড়াই এর বিশগুণ লোক সভায় হাজির হয়েছে। সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন হোক--যদিও সেটা কি রকম উদাসীনতা সে কল্পনা করতে পারে না—তার নামের কোন আকর্ষণও কি এই শহরের লোকের কাছে নেই, এ তো বিনয় বা অহংকারের কথা নয়--নামকরা সাহিত্যিকের নামের আকর্ষণ একটা স্বাভাবিক বাস্তব সত্য। যে লোকটা বই লিখে এত নাম করেছে লোকে তাকে স্বভাবতই দেখতে চায়, তার কথা শুনতে চায়। অথচ এত পোস্টার হ্যাণ্ডবিল সত্ত্বেও এ সভায় যত লোক এসেছে তার অর্ধেকের বেশী উদ্যোক্তা এবং সংগঠনের সঙ্গে কোনও না কোনভাবে যুক্ত ধরে নিলে সাধারণ শ্রোতার সংখ্যা দাঁড়ায় নামমাত্র!

প্রশান্ত একটু ঝিমিয়ে যায়, অস্বস্তি বোধ করে। এমন একটা ধাঁধায় পড়ে গেলে নিরুৎসাহ না হয়ে অস্বস্তি বোধ না করে মানুষ পারবে কেন!

অনেকটা যন্ত্রের মতো সভার কাজ চালিয়ে যায়, দেরীতে সভা আরম্ভ করার অজুহাতে প্রোগ্রাম ছেঁটে ছোট করে দেয়, অল্প কথায় ভাষণ দিয়ে সাড়ে সাতটার মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলে।

আটটার গাড়িতে সে ফিরে যাবে।

সাইকেল রিকসায় স্টেশনের দিকে চলতে চলতে দূর থেকে তার কানে ভেসে

আসে লাউড স্পীকারের ক্ষীণ আওয়াজ। রিক্‌সা যত এগিয়ে যায় স্টেশনের দিকে লাউড স্পীকারের আওয়াজ তত স্পষ্ট হয়।

ওখানে কি হচ্ছে?

তাকে স্টেশনে পেঁৗছে দিতে যে ছেলেটি সঙ্গে যাচ্ছিল, সে বলে, একটা মিটিং হচ্ছে।

মিটিং? কিসের মিটিং?

দুর্ভিক্ষ, চোরাকারবার, ব্যক্তি স্বাধীনতা এই সব নিয়ে।

প্রশান্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস। না, বাস্তব হঠাৎ অবাস্তব হয়ে যায়নি, সত্য হঠাৎ ধাঁধায় পরিণত হয়নি। সব ঠিক আছে।

স্টেশনের কাছাকাছি এসে ভিড় ঠেলে রিক্‌সা এগোতে পারে না, তাদের নেমে যেতে হয়। স্টেশনের কাছে ফাঁকা মাঠে বিরাট এক জনসমাবেশ হয়েছে, রাস্তায় পর্যন্ত ভিড় উথলে এসেছে। স্টেশনে নামবার সময় মাঠটা ফাঁকা দেখে গিয়েছিল।

প্রশান্তও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে। বক্তৃতা শোনে।

আপনার গাড়ির কিন্তু দেরী নেই!

পরের গাড়িতে যাব।

এদিক ওদিক

দু'জনে প্রতিবেশী, সমবয়সী এবং বন্ধু। কিন্তু জীবনটা দু'জনের গতি নিয়েছে দু'দিকে। মাধব মেকানিকের কাজ শিখে ঢুকেছিল মোটর মেরামতের কারখানায়, সে সেইখানে সেই কাজেই লেগে আছে। শরৎ লেগেছিল অল্প বেতনের একটা কেরানীগিরি চাকরিতে, বিনা নোটিশে ছাঁটাই হয়ে সে দিয়েছে ছোটখাটো একটা মনোহারী দোকান।

মাধবের মোটর মেরামতি কারখানার কাছাকাছিই তার দোকান, তাদেরই বাড়ির দিকে যাবার গলির মোড়ে বড় রাস্তার উপর একটা মুদিখানার পাশে।

মুদিখানাটা বুড়ো নগেনের। দোকান খোলার সময় শরৎ ঘোষণা করেছিল আশপাশের কাউকে আর কোন সাধারণ বা সৌখীন জিনিস কিনতে শহরে ছুটতে হবে না, শহরতলীর তার এই দোকানে কলকাতার দামে সকলে সব জিনিস পাবে।

জোর গলায় বলেছিল সকলে পরখ করে দ্যাখো। মাল আনার খরচ হিসেবেও যদি দুটো পয়সা বেশী ধরেছি প্রমাণ করতে পারে কেউ, সকলের সামনে নিজের কান কেটে ফেলব।

মাধব বলেছিল, কেন? কিছু কিনতে শহরে যাওয়া-আসার খরচ নেই? তোমার দোকানে পেলে লোকে খুশি হয়ে দু' চার পয়সা বেশী দেবে না!

শরৎ হেসে বলেছিল, ও হিসাব ভুল। কত লোককে কত ধান্দায় শহরে যেতে হয় দেখিস না? কাজে যাবে দরকারী জিনিসটা কিনে আনবে নিজের আনবে অন্যের আনবে। জিনিস আনতে বেশী খরচ লাগবে কেন?

মাধব ভেবে চিন্তে বলেছিল তাহলে কলকাতার দরে দিলেও দামী মাল তোর দোকানে কেউ কিনবে না। শহরের বড় দোকান থেকে কিনবে।

দেখা যায় মাধবের কথাই ঠিক।

লোকে সাবান, চিরুনী, চা, খাতা, পেন্সিল এসব টুকিটাকি জিনিস কেনে তার দোকান থেকে কিন্তু বেশ দামী জিনিসের দরও জিজ্ঞাসা করে না,- দু' একজন ছাড়া। চেনা লোক যারা তাকে খুব উৎসাহ দিয়েছিল, তারাও ওসব জিনিস কলকাতা থেকে কিনে আনে।

দামী জিনিস দোকানে রাখা বন্ধ করতে হয়েছে শরৎকে।

শহরের দরে জিনিস বেচার নীতিও তাকে ছাড়তে হয়েছে।

নগেন বলেছিল, তবেই আপনি দোকান চালিয়েছেন দাদা! শুধু মাল আনার

খরচ নাকি? শহরের বড় দোকানে ধারে কারবার নেই, আপনাকে ধার দিতেই হবে। আদায় করা কি ঠেলা, টের পাবেন। কিছু টাকা আটকে থাকবেই সব সময় লগ্নী টাকার মতো। সুদ যদি না ধরেন তবে লাভ করবেন কি?

শরৎ জোরের সঙ্গে বলেছিল, আমি কাউকে ধার দেব না, ঘরের লোককেও নয়।

বুড়ো নগেন ফোকলা মুখে হেসেছিল।

ধারে মাল বেচতে হয়েছে শরৎকে, হিসাব করে দু'চার পয়সা দাম বেশীও ধরতে হয়েছে। ধারে মাল না দিলে অর্ধেকের বেশী খদ্দের তার দোকানে আসবে না, খানিক তফাতে রসিকের দোকানে যাবে। রসিক ধারে দেবে।

চাকুরে বাবু মাসের শেষের দিকে এসে চায়ের একটা প্যাকেট চায়, প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বলে, মাসকাবারে দামটা দেব।

চায়ের প্যাকেটটা তখন তাকে ধারে দিতেই হবে। কারণ, সত্যই তার হাত খালি, শাকপাতার দৈনিক বাজারটা ক'দিন কি দিয়ে চালাবে তাই তাকে ভাবতে হচ্ছে।

মেয়েরা ছেলেকে পাঠাচ্ছে দোকানে, ছেলে জিনিস নিয়ে বলছে, বাবা এসে দাম দেবে।

যারা চাকুরে নয়, এলোমেলোভাবে যাদের রোজগার, যাদের বেশ কিছুদিন পরে পরে থোক টাকা রোজগার, বরাবর নগদ কিনে এসে হঠাৎ কোন কারণে সাময়িকভাবে নগদ কিনতে পারছে না, তাদেরও ধার দিতে হয়।

বছরখানেক দোকান চালিয়ে কাবু হয়ে পড়েছে শরৎ। যা কিছু সম্বল ছিল সব সে ঢেলেছে এই দোকানে, এক বছর দোকান চালিয়ে লাভ হওয়ার বদলে গেছে লোকসান।

শুধু ওই ধার দেওয়ার জন্য।

কয়েকজনের কাছে বহুকাল অনেক বাকী পড়ে আছে, চেষ্টা করেও টাকা আদায় করতে পারেনি।

কানু আর নগেন দু'জনেই সাবধান করে দিয়েছিল, ধারে মাল দিতেই হবে কিন্তু লোক বুঝে দিও—সময়মতো হোক দেরীতে হোক, টাকাটা যেন আদায় হয়।

এক বছরে অভিজ্ঞতা জন্মেছে অনেক কিন্তু আজও সে বুঝতে পারে না ওই লোক বুঝে ধার দেওয়ায় নীতিটা কি!

কে জানে সুভদ্রা ভান্ডারের রসিক কোন্ মাপকাঠিতে লোক বুঝে ধার দিয়ে দোকান চালিয়ে লাভ করছে।

যাদব দোতলা বাড়ির মালিক, বেশ বড়লোকী চালে তার সংসার চলে, সে একদিন দোকানে পা দেওয়ায় কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল শরৎ।

যাদব প্রায় হুকুমের সুরে বলেছিল, একটা হিসেব খোল আমার নামে। বাড়িতে হাজার জিনিসের দরকার, খুচখাচ পয়সা দেবার ঝন্‌ঝাট পোষায় না আমার। আমি স্লিপ পাঠাবো, বিশ-ত্রিশ টাকা হলে হিসাব পাঠিয়ে দিও।

উল্লসিত হয়ে উঠেছিল শরৎ। এতবড় একজন খদ্দের পাওয়া সহজ ভাগ্যের কথা!

দশ-বার দিনেই ত্রিশ টাকার উপরে উঠে গিয়েছিল যাদবের কাছে পাওনা।

শরৎ সসঙ্কোচে নিজেই গিয়েছিল হিসাব নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে টাকা মিটিয়ে দিয়ে যাদব তার উল্লাস বাড়িয়ে দিয়েছিল শতগুণ।

মনোহারী দোকান হলেও শরৎ তেল মশলা ঘি ইত্যাদি কয়েকটা মুদিয়ালী জিনিসও দোকানে রাখে। যাদব সব রকম জিনিসের জন্যই তার দোকানে স্লিপ পাঠায়।

মাসে প্রায় শ'খানেক টাকার মাল কেনার খদ্দের!

মাসতিনেক ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকার হিসাব দাখিল করা মাত্র টাকা মিটিয়ে দিয়ে যাদব সেদিন বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, তুমি বড় জ্বালাচ্ছ আমাকে। মাসে দশবার হিসাব পাঠালে অসুবিধা হয় না আমার? একেবারে মাস কাবারে হিসাব দেবে।

আজ্ঞে ছোট দোকান, মাল আনাতে হয়—

তবে কাজ নেই, আমি অন্য কোথাও হিসাব খুলব।

বেশ, মাসে মাসেই হিসাব দেব আপনাকে।

মাসকাবারে একশ' তেইশ টাকা সাত আনা তিন পয়সার হিসাব নিয়ে হাজির হলে যাদব বলেছিল, আজ তো তোমায় টাকা দিতে পারছি না। সাত তারিখে পাবে।

জিনিসের প্রয়োজন যেন আচমকা বেড়ে যায় যাদবের সংসারে। সাত তারিখের মধ্যে দু'দফায় আড়াই সের করে পাঁচ সের তেলই নিয়ে যায় যাদবের চাকর।

দু'শো টাকার কাছে গিয়ে পেঁছায় তার কাছে শরতের দোকানের পাওনা।

সাত তারিখে গিয়ে শরৎ যাদবের দেখা পায় না। চাকর জানায় বাবু বড় ব্যস্ত, টাকা পাঠিয়ে দেবেন।

সে টাকা আজও আদায় হয়নি!

নিজের দোতলা বাড়ি, দামী আসবাবে সাজানো বৈঠকখানা, বাড়ির চাকর আছে, মেয়েরা সাজে-পোশাকে শহরতলীকে লজ্জা দিয়ে বেড়াতে যায়, সিনেমায় যায় লোক বুঝে ধার দেবার হিসাবটা এক্ষেত্রে সে কি হিসাবে খাটাত?

নগেন বলে, আমি কি ছাই জানি তোমার কাছে, ধারে মাল নিচ্ছে? ধারে কাউকে দেবে না বললে, আমি ভাবলাম নগদ নিচ্ছে বুঝি! মোর সাঁইত্রিশ টাকার পাওনা দেয়নি পাঁচ মাস।

শরৎ অবাক হয়ে বলে, মোটে সাঁইত্রিশ টাকা?

কাজে যাওয়ার পথে দু' পয়সার নস্য কিনতে মাধব দোকানে এসেছিল। সে বলে, তোমার দ্বারা দোকান চলবে না। ভদ্দরলোকের ছেলে, চাকরি-বাকরী করগে। এতটুকু দোকান তোমার, কি হিসেবে একজনকে তুমি দু'শো টাকার মাল ধারে দিলে? সে রাজা হোক, লাটসায়েব হোক—তোমার তো ছোট দোকান? ধারে এত টাকার মাল তুমি দেবে কেন?

নগেন বলে, ঠিক কথা, ন্যায্য কথা। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। ভাবলে যে মস্ত খদ্দের, মোটা লাভ হবে। তোমার মতো বোকাদের ঠকিয়েই ওর যত চাল, যত বড়লোকামি!

শরৎ ম্লান মুখে বলে, তোমার সাঁইত্রিশ টাকা আদায় হয়েছে দাদা?

অনেক কষ্টে হয়েছে। রাস্তায় পেয়ে একদিন রেগে-মেগে চেঁচিয়ে আচ্ছা করে গালাগালি দিলাম। জানি তো লোক দেখানো চালটাই আসল, চাল নষ্টের ভয়ে তটস্থ। ধমক দিয়ে বললে, চেঁচাচ্ছ কেন? আমি কি জানি তোমার দোকানে বাকি আছে? বাড়ি ফিরেই তোমার টাকা পাঠিয়ে দেব।

ফোকলা মুখে নগেন হাসে।

পাঁচ মাসে কতবার তাগিদ দিয়েছি, বাবু জানেন না দোকানে বাকি আছে। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা পাওনা পেয়ে গেলাম।

হাসি মুছে যায় নগেনের মুখের। বলে, তবে কিনা, মোকে জব্দ করতে চায়। অনেক বড় বড় ঝনঝাটে সময় পায় না, নইলে অ্যাদ্দিনে মোর ভারি অনিষ্ট করত।

শুধু এ রকম নয়। সুনীল চাকরি করছিল, মাসের কুড়ি বাইশ তারিখ থেকে সে ধারে মাল নিত। যা না নিলে নয় শুধু সেই রকম মাল। দোকানে বাকি যত কম হয় তারই জন্য যেন তাব প্রাণপণ চেষ্টা।

পরের মাসে দু' তিন তারিখে এসে বাকি পাওনা মিটিয়ে দিত। বলত, এ মাসে তোমার কাছে আর ধারে মাল কিনব না। তুমি বড় বেশী দাম ধরছ জিনিসের।

শরৎ বলত, ধারে দিতে হলে দাম দু' এক পয়সা বেশী ধরতে হয়, বোঝেন তো?

সাত-আট মাস অমনি নিয়মিতভাবে সুনীল তার দোকানে ধার করেছে, মাইনে পেয়েই মিটিয়ে দিয়েছে সব পাওনা। ছাটাই হবার পর সে কথাটা গোপন রেখে মাসকাবারে সে বলেছিল, এ মাসের মাইনে পেতে কয়েকদিন দেরি হবে।

অনায়াসেই সে আরও কয়েকদিন যাদবের কায়দায় বেশী বেশী মাল নিয়ে বাকি পাওনাটা বাড়িয়ে দিতে পারত কয়েকটা দিন চালিয়ে দেবার মতো যোগাড় করে রাখতে পারত তেল মশলা ইত্যাদি দরকারী জিনিস।

কিন্তু সে আর এক পয়সাও বাকি কেনেনি।

বাকি টাকাটাও শোধ দিতে আজ পর্যন্ত আসেনি। ছেলে-মেয়ে নিয়ে তার কি অবস্থা শরৎ জানে। তাগিদ দিতে প্রাণ চায় না। এ তো জানা কথাই যে তাগিদ দিয়ে লাভও কিছু নেই।

এমনি আরও কতজন।

কেউ হয়তো পনের-বিশ টাকা বাকি রেখেছে। কিন্তু মাসে পাঁচ টাকার মাল কিনছে। কোন মাসে পাঁচ টাকা ধার বেড়ে যায়, কোন মাসে দশ পাঁচ টাকা ধার কমে যায়।

বাকি না বাড়িয়ে নিয়মিত জিনিস কিনছে। এরা না কিনলে দোকান তার বন্ধ করতে হবে।

যাদব আর তারই মতো শাঁসালো পাঁচ-ছ'টি খদ্দের মোটা টাকা বাকি রেখে দোকানে কেনাকাটাই প্রায় বন্ধ করেছে। দোকান তার চালু রয়েছে এই পাঁচ-দশ-বিশ টাকা বাকিওয়ালাদের জন্য।

বাকি শোধ না করতে পারার লজ্জায় ওরা নগদ দিয়ে যা-কিছু কিনতে পারে,

তার দোকান থেকেই কেনে। টাকা প্রতি সে দু' পয়সা দাম বেশী ধরছে জেনেও কেনে।

রতন ধারে প্রায় পনের টাকার মতো। বয়স তার বিশ বছরের বেশী নয়, পাঁচ-জনের একটা অচল সংসার চালু রাখতে না পারলেও ধ্বংস হওয়া ঠেকিয়ে চলছে।

সে সরলভাবে বলে, আপনার ধারটা নিশ্চয় দেব শরৎদা, দু' এক মাসের মধ্যে দেব। বৌদি ছেঁড়া কাপড় পরে আছে আজ দেখেছি। কদ্দিন বাদে রায়বাবুদের ওই পুকুরের কোণায় পেয়ারা গাছে উঠেছি, বৌদি এসে বললে, আমায় দুটো পেয়ারা দেবে? দেখলাম শাড়িটা নশো জাগায় ছিঁড়ে গেছে নশো জাগায় সেলাই হয়েছে।

রতন দুটো সিগারেট কেনে। একটা সযত্নে পকেটে রেখে একটা ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করে, আমার টাকা ক'টা বাকি আছে বলেই কি বৌদিকে একটা শাড়ি দিতে পারছ না শরৎদা?

এভাবে যে কথা বলে ব্যবহার করে, পনেরটা টাকা বাকি আদায়ের জন্য তাকে কি গাল দেওয়া যায়?

যাদবদের মতো শাঁসালো লোকেদের কাছে সে যখন দেড়শ' দুশ টাকা বাকি আদায়ের জন্য সবিনয়ে সসংকোচে ভিখারির মতো দরজায় গিয়ে দাঁড়ায় দেখা হবে না শুনেও রাগ না করে ফিরে আসে?

দোকান বন্ধ করে সে যখন বাড়ি ফেরে, পাড়ার ঘরে ঘরে ঘুম তখন ঘনিয়ে এসেছে, তার তিনটি ছেলে-মেয়ে অচেতন হয়ে গেছে ঘুমে। শিবানীও হাই তুলছে ঘন ঘন।

শিবানীর পরনে সত্যই ছেঁড়া কাপড়, মাধব মিছে বলেনি।

মনোহারী মণিহারী দোকান করতে তার গয়নাগুলিও লেগেছে, তার শুধু ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে লজ্জা নিবারণের সমস্যা নয়।

শিবানী বলে, এখন খাবে?

শুকনো রুটি আর ছেঁচকি তো? খাব'খন। তুমি এতক্ষণ কি করছিলে?

শিবানী মুখ বাঁকায়।

কি আবার করব? ওরা খানিকক্ষণ পড়ল, তারপর খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কারো পেট ভরে না। খালি বলে, আরেকটা রুটি দাও, একটু চিনি দাও—কোত্থেকে দিই বলতো? রোজ আমার ওপর রাগ করে ঘুমোয়।

শরৎ কথা বলে না।

রমা এসেছিল, ওর সঙ্গে কড়ি খেললাম। ও বেচারারও সময় কাটে না। মাধববাবু কাজ থেকে এসে আবার বেরিয়ে যায়, মিটিং-ফিটিং করে ন'টা দশটায় ফেরে। কিন্তু তবু কি হাসি খুশি মেয়েটা, রোজ রোজ এসে প্রাণ জুড়িয়ে দিয়ে যায়। ও না এলে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যেতাম!

একেই বলে তিরস্কার। একেই বলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়া।

মাথা ঘোরে। শরীরে বিশ্রী অস্বস্তি আর অস্থিরতা। দোকানটার প্রথমদিকে মালপত্রে ভরাট একটি জমজমাট চেহারা ছিল, আজকাল কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। অনেক রকম জিনিস টাকার অভাবে দোকানে এনে রাখা যায় না। খদ্দের ফিরিয়ে দিতে হয়।

হঠাৎ একদিন বিকালের দিকে হ্যাট-কোট পরা যাদব দোকানে এসে তাকে আশ্চর্য এবং অভিভূত করে দেয়।

যাদব বলে, তুমি দুশো টাকার মতো পাবে, না? কাল সকালে গিয়ে টাকাটা নিয়ে এসো।

বুকটা ধড়াস ধড়াস করে। সেই যেন মস্ত একটা অপরাধ করেছে যাদবের কাছে, এতগুলি টাকার পাওনাদার হয়ে।

যাদব বলে, একটিন সিগারেট দাও তো। এক পাউন্ড চা দাও। ভেজিটেবল ঘিয়ের দশ পাউন্ড টিন নেই? আচ্ছা পাঁচ পাউন্ড টিন একটা দাও। আরও তিন-চারটে জিনিস যাদব নেয়। হাতের সুদৃশ্য চামড়ার কেসটির ভিতর থেকে একটা কাপড়ের থলি বার করে জিনিসগুলি তার মধ্যে ভরে নিয়ে চলে যায়।

বলে যায়, কাল যেও—দশটা নাগাদ।

শরৎ দাঁড়িয়ে থাকে পুতুলের মতো। অচেনা একজন খদ্দের এসে নতুন চকচকে একটা দোয়ানি বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দু' পয়সার নস্যি দিন তো।

শরতের যেন চমক ভাঙে।

নগদ দামে দু' পয়সার নস্যের খদ্দেরকে বিদায় করেই সে বন্ধ করে দোকান। এগিয়ে যায় হরেনের মোটর গাড়ির মস্ত হাসপাতালটার দিকে।

প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্য রমা না এলে শিবানী না-কি পাগল হয়ে যেত। মাধবের সঙ্গে খানিকক্ষণ দহরম-মহরম না চালালে সেও আজ পাগল হয়ে যাবে।

কারখানায় একটা শূন্যে তোলা গাড়ির তলায় আধ-শোয়ার মতো বাঁকা হয়ে বসে মাধব গাড়িটার হৃৎপিণ্ডে কি একটা অপারেশন চালাচ্ছিল।

নিশ্চয় কঠিন অপারেশন।

শরৎ ডাকতে মাধব বলে, দাঁড়া।

বলে' প্রায় বিশ মিনিট নিঃশব্দে একমনে ইঞ্জিনটার চিকিৎসা চালিয়ে যেন চটেমটেই উঠে আসে।

গজ গজ করতে করতে বলে, ব্যাটারা যত ধ্যাধ্যেরে পচা মড়া গাড়ি এনে দেবে—মাধব সারিয়ে দাও!

কেন, গাড়িটা তো নতুন মনে হচ্ছে।

গাড়ির বাইরেটা নতুন রং করা, ইঞ্জিনটা ঠাকুর্দার চেয়ে বুড়ো রদ্দি জিনিস।

হরেন মোটা চুরুট টানতে টানতে এসে বলে, কাল গাড়িটা ছাড়া যাবে তো মাধব? অন্যের বেলা যাই হোক, ধীরেনবাবুকে কিন্তু চটানো যাবে না।

মাধব বলে, কালকেই ছেড়ে দেবেন গাড়ি। বলবেন গাড়িটার যেন শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করেন।

হরেন চটে বলে, কি রকম?

মাধব বলে, মানুষ মরে গেলে ডাক্তার তাকে বাঁচাতে পারে? তার তখন শ্রাদ্ধ করতে হয়। এ গাড়িটা মরে ভূত হয়ে গেছে।

হরেন খানিকক্ষণ কটমট করে তার দিকে চেয়ে থেকে বলে, তুমি আমাকে ডোবালে মাধব! আমার অবস্থাটা বোঝ না কেন?

হরেনের সিগারেটের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন একটানে বিড়িটা পুড়িয়ে ফেলে মাধব বলে, বুঝতে দ্যান না, তাই বুঝি না। যাক গে বাবু কাল হপ্তা পাইনি আজ দিয়ে দিন।

শরৎ লক্ষ্য করে জন-ত্রিশেক মিস্ত্রী কারিগর খানিক তফাতে এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন সারা সপ্তাহ কাজ করেও হপ্তা পাবার জন্য তাদের এতটুকু ব্যগ্রতা বা উগ্রতা নেই।

হরেন একবার মাধবের দিকে একবার ওদের দিকে তাকায়।

আজ বোধহয় হবে না।

আজ চাই বাবু।

হরেন মিনিটখানেক চুপ করে থেকে কর্মচারীকে বলে, সুধীর—এদের হপ্তা দিয়ে দাও। সেই টাকাটা থেকেই দাও।

তেল-কালি মাখা হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি ছেড়ে ধুতি আর সার্ট পরে মাধব শরতের সঙ্গে রাস্তায় নামে।

বলে, দোকান ফেলে এ সময় এলি?

শরৎ বলে, দোকান আর চালাব না। যাদববাবু ফের আজকে প্রায় দশ টাকার মাল ধারে নিয়ে গেল।

নিয়ে গেল? না তুই দিয়ে দিলি?

শরৎ চুপ করে থাকে।

মাধব বলে, কাল দুশটায় যেতে বলেছে তো? কাল ছুটি আছে, আমি তোর সাথে যাব।

বেলা দশটায় যাওয়ার কথা ছিল, মাধব ন'টার আগেই শরৎকে ডেকে নিয়ে যাদবের বাড়ি যায়।

দরজা খুলে চাকর বলে, এখন বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।

অর্থাৎ যাদব দেখা করবে না। জানালা দিয়ে দেখা গিয়েছিল যাদব বাইরের ঘরেই বসে আছে।

মাধব কথা না বলে চাকরের পাশ কাটিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকে যায়, পিছনে যায় শরৎ।

যাদব কটমট করে তাকায়।

মাধব ধীরে সুস্থে একটা চেয়ার টেনে বসে বলে, ওর কাছে আমি তিনশ' টাকা

পাব যাদববাবু। আপনি আজ ওর দোকানের পাওনা মিটিয়ে দেবেন বলেছেন, তাই সাথে এলাম। বন্ধুকে টাকা ধার দেওয়া কি ঝকমারি কাজ বলুন দিকি? ঘরে আমার রেশন আনার পয়সা নেই।

যাদব একবার মাধবের দিকে, একবার শরতের দিকে তাকায়।

আজ হবে না। কাল দেব।

আজকেই চাই বাবু!

যাদব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে উঠে ভিতরে চলে যায়। ফিরে এসে পঞ্চাশটা টাকা শরৎকে দিয়ে বলে, আজ এর বেশী দিতে পারছি না। বাকিটা সামনের সপ্তাহে দেব।

শরৎ বলে, আবার সামনের সপ্তায়?

মাধব বলে, যাকগে। তাই দেবেন, দু'জনেই আসব।। বাকিটা সব একবারে না পারেন, এমনি পঞ্চাশ-ষাট করে মিটিয়ে দেবেন কয়েক দফায়।

বাইরে গিয়ে মাধব বলে, আর কার কার কাছে বাকি আছে, চ' ঘুরে আসি। হয়েছিস দোকানদার মানুষ, মেয়েমানুষের মতো করিস কেন বল দিকি?

কলহান্তরিত

একটা মেয়েলী কলহের পরিণামে এমন সংকট সৃষ্টি হতে পারে? তিনশ লোকের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা ভেস্তে যেতে বসে? এ যেন কল্পনা করা যায় না।

তিনশ মানুষ আজ কতকাল ভাগ হয়ে আছে তিন ভাগে, তিনটি ইউনিয়নে। এতকাল পরে যদিও বা দেখা দিয়েছে তিনটে ইউনিয়ন একটা হয়ে যাবার সম্ভাবনা, দু'জন স্ত্রীলোকের ঝগড়া আবার সব নষ্ট করে দিতে বসেছে।

গোকুলের সাথীরা হাসবে, না কাঁদবে ভেবে না পেয়ে শুধু বলে, কী আপসোস! কী আপসোস!

মালিকপক্ষ আর দীনেশেরা কয়েকজন হাঁফ ছেড়ে বলে, বাঁচা গেল। লাগ বাবা রাবণ বিভীষণ, আরও জোরসে লাগ!

গোকুলদের এবং দীনেশদের ইউনিয়ন দুটি বেসরকারী। এ দুটি ইউনিয়নের জন্যই অবশ্য সম্ভব হয়েছে এবং টি'কে আছে মালিক পক্ষের নিয়ন্ত্রিত আইনসম্মত তৃতীয় ইউনিয়নটি। সকলেই জানে যে বেসরকারী ইউনিয়ন দুটি কোন রকমে মিলে গেলেই ইউনিয়ন দাঁড়িয়ে যায় একটা—কর্তাদের গড়া লোক দেখানো ফাঁকির বদলে কর্মীদের নিজেদের আইনসম্মত ইউনিয়ন।

দীনেশ মিল চাইত কিন্তু মিলতে রাজী হত না। সে বলত, বেশ তো, তোমাদের ইউনিয়নটা ভেঙে দাও। আমাদের সংগে ভিড়ে পড়।

কিন্তু এ তো জানাই আছে যে এটা বাজে কথা। এভাবে ত্রিভুজ ভেঙে সরল রেখা করা গেলে অবশ্য গোকুলদের কোন আপত্তি ছিল না। দীনেশরা ইউনিয়ন চালাবে মানেই সেটা হবে কর্তাদেরই বশম্বদ ইউনিয়ন, এখনকার মতো সোজাসুজি আইনসম্মত ইউনিয়নটা দখল করে থাকার বদলে ওভাবে বশে রাখতে পেলে কর্তারা খুশীই হবে।

তবু, তাতেও আপত্তি ছিল না, কর্মীরা যদি একসাথে দাবি-দাওয়া নিয়ে লড়াই করার সুযোগ পেত। যতই পিছিয়ে থাক সে রকম অচেতন তো আর নয় মানুষ-গুলি আজ।

কিন্তু সে সুযোগ জুটবে না।

তেমন দেখলে দীনেশরা ফাটল ধরিয়ে দেবে, আরেকটা বেসরকারী ইউনিয়ন গড়ে আসল ইউনিয়ন ফিরিয়ে দেবে কর্তাদের দখলে।

সার হবে শুধু গোকুলদের ইউনিয়নটা ভেঙে দেওয়া। দীনেশ কাঁচা পাকা

চুলে হাত বুলোতে বুলোতে মুচকে হেসে হরেনকে বলত, গোকুল শালারা বোঝে ছাই। এ দেশটা কি সোভিয়েট হয়ে গেছে, খাওয়া-পরার ভাবনা নেই? এ দেশে যে করে খেতে হবে ব্যাটারা তাই ভুলে মেরে দিয়েছে। তুই নিজে যদি না-ই বাঁচলি তোর বাপের নাম কিসে থাকে রে বাবা!

হরেন যোয়ান মানুষ, একটু গম্ভীর আর বড়ই মেজাজী। সব কথায় সায় দিতে পারত না, মুচকি হাসিতেও নয়। গভীর আপসোসের সঙ্গে বলত, সত্যি, বড় অভাগা দেশটা।

তার মানে দীনেশ বুঝত অন্য রকম।

একটু গোঁয়ার একটু ভোঁতা কিন্তু সাদাসিধে সরল মানুষটা। ঘোরপ্যাচ সে তলিয়ে বুঝত না, মাথাও ঘামাত না। ইউনিয়নের প্রতি তার সহজ আনুগত্য ছিল মস্ত বড় অবলম্বন।

নিজের মতো করে বললেও সে প্রায় দীনেশের কথারই প্রতিধ্বনির মতো বলত, ইস্! আমাদের ইউনিয়ন ভেঙে দেব—অত খায় না! আরও জোরদার করব আমাদের ইউনিয়ন, পরেশবাবুদের হটিয়ে দিয়ে আমরা মেজরিটি হব।

দীনেশ বলত, তা না তো কি? তুমি আমি আছি কি করতে?

দীনেশ পাকা ঝানু লোক, কাজের লোক—কিন্তু শুধু তাই দিয়েই কি লাগাম ধরে রাখা যায় আজকালকার দিনে। হরেনকে সকলে বিশ্বাস করে ভালবাসে। সে নিজেও জানে না ইউনিয়নে তার কতখানি প্রভাব, তার কথাকে সকলে কতটা মূল্য দেয়।

দীনেশ ভাবে, ভাগ্যে জানে না!

ভাগ্যের কথা কিনা তাই ভয়ও বেশী। গোকুলের সঙ্গে হরেনকে অনেকক্ষণ কথা কইতে দেখে আতঙ্ক হয়!

ওর সাথে তোমার অত গুজগাজ কিসের?

একটা ঘর খালি আছে বলছিল। ঘর বদলাও ঘর বদলাও করে বৌটা পাগল করে দিলে দীনেশদা।

ঘর? আমি তোমায় ভাল ঘর খুঁজে দেব।

কিন্তু সে জন্য কে বসে থাকবে? ঘর একটা খালি হয়েছে, নগদ নগদ দখল করাই ভাল। তার তো আর নিজের জন্য গোকুলের সঙ্গকে ভয় করার কারণ নেই দীনেশের মতো যে ঘরের খবরটা গোকুল দিয়েছে বলে আর ও বাড়িতে গোকুলও আরেকটা ঘরে থাকে বলে সুযোগটা বাতিল করে দেবে।

রত্না কেবল বলে, তুমি তো বাইরে দিন কাটাও, দম আটকে আমি যে মরলাম?

শুধু ছোট নয়, সেঁতসেঁতে অন্ধকার ঘর, অন্য ঘরে আরসোলা তাড়ালে এই ঘরের কোণে এসে আশ্রয় নেয়। দু' বেলা পৃথিবীর সব উনুন আর চিমনির ধোঁয়া যেন এই ঘরে ঢুকতে ভালবাসে।

সস্তা ছিল। ভাল ঘরে টাকা বেশী লাগবে। কিন্তু উপায় কি? মাসে দু'চার দিন যে মাছ খেত সেটা নয় বাদ যাবে। আরও দু'চারটা প্রয়োজন নয় ছাঁটাই হবে জীবন থেকে।

এক বাড়িতে কাছাকাছি দু'খানা ঘরে গোকুল আর হরেনের ভাব হতে সময় লাগে। গোকুল তাকে কথা বলে বাগিয়ে নেবে এ ভয় কিছুমাত্র না থাকলেও গোকুল যে বিরোধী ইউনিয়নের লোক, এটা ভুলতে পারে না।

বাড়ির অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে সে আলাপ করে, দু' একটা গা-ছাড়া কথা বলে সে গোকুলকে এড়িয়ে যায়। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা গোকুলেরও কিছুমাত্র দেখা যায় না। হরেনকে সে খাতির করে খালি ঘরখানায় ঢোকায়নি। অন্যের কাছে খবর পেয়ে হরেন শুধু ঘরটা সম্পর্কে তার কাছে খবরাখবর জেনে নিয়েছিল।

দু'পক্ষে তাগিদ থাকে সে আলাদা কথা, কাছাকাছি এসে বাস করছে বলেই নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার সময়ই বা কই মানুষের, সে রকম মনের অবস্থাই বা কই! তাদের মতো মানুষের বইবার সাধ্য ছাড়িয়ে অনেক বেশী ভারি হয়ে উঠেছে জীবনযাত্রার বোঝা--খাদ্য বস্ত্র আনন্দ অবসর সব কিছু ছেঁটে প্রায় সাফ করে আনার পরেও! একদিকে এই অসম্ভব বাঁচার লড়াই, অন্যদিকে এমন করে বাঁচার অভিশাপ শেষ করার লড়াই। সময় কই মানুষের?

গোকুলের বৌ রানীর সঙ্গে রত্নার ভাব কিন্তু জমে ওঠে খুব তাড়াতাড়ি। আবার অল্পদিনেই তাতে ফাটল ধরে যায়।

রানীর চেহারা ভাল। গড়নটি তার সেই ধরনের যা চোখ টেনে এনে নিজেকে দেখায়। স্বাস্থ্য ভাল, পেট ভরে না, তাই ভাল তরকারীর বদলে বেশী করে সস্তা শাক পাতা আর রুটি খেয়ে রোগা হবার বদলে তার দেহে একটা বিপরীত প্রক্রিয়া ঘটেছে। ভিতরে দুর্বল বোধ করে অথচ দেহটি বেশ সবল এবং পুষ্ট--আসলে যেটা খাঁটি পুষ্টির ধাপ্পা মাত্র—একটু ফেঁপে ওঠা।

রত্না কাঠির মতো রোগা। রানীকে দেখেই মনে মনে সে মুখ বাঁকিয়েছিল।

হরেনকে বলেছিল, কি বেশ্যাটে বেশ্যাটে চেহারা, মাগো!

হরেন বলেছিল, সে কি? বেশ্যারা ওরকম ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে নাকি?

--খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাও দেখেছ?

রত্না একটু হিংসুটে আর স্বার্থপর। জীবনে সুখশান্তি স্বচ্ছলতা থাকলে হয়তো স্বভাবের এসব খুঁত চাপা পড়ে থাকত, দুঃখ-দুর্দশার চাপ মনটাকে আরও বাঁকিয়ে দিয়েছে। এ তো ত্যাগ নয়, ইঙ্গিত করলে লাখপতিরা ঝুলি ভরে দিতে ছুটে আসবে যে ত্যাগের মাহাত্ম্যে, এ স্রেফ কদর্য বাস্তব দারিদ্র। এ দারিদ্র হয় মানুষকে বীর লড়ায়ে করে তোলে নয় মনুষ্যত্ব নষ্ট করে দেয়। দারিদ্রই মানুষের সেরা শত্রু।

গরিবের খাঁটি বন্ধুও অনেক সময় ভুল করে দারিদ্রকে তুলে ধরে। শোষক ধনী অমানুষিক বলেই যেন শোষিত গরিবেরা মানুষ হয় শুধু গরিব বলেই!

কত দরদীই যে ভুলে যায়, লড়াই মনুষ্যত্ব দেয় গরিবকে, তার দারিদ্রটা নয়।

অভাব স্বভাবকে নষ্ট করবেই। মানুষের যে সৎগুণ নিছক কুসংস্কার আর ফাঁকি শুধু সেগুলির গোড়া খোঁড়ে না--সেটাতো মঙ্গলের কথাই—মনুষ্যত্বও কুরে কুরে খায়। এটা ঠেকানোও আরেকটা লড়াই গরিবের।

রত্না নিজেই ভাব করে। ভাব করতে হয়। শুধু যে একটা কলে জল নেওয়া বাসন মাজা থেকে সব কাজ সারতে হয় দু'জনকে এমন তো নয়, একই ঘুপচির মধ্যে দু'জনকে পাশাপাশি—প্রায় ঘেঁষাঘেঁষি করে– রাঁধতেও হয়।

দু'খানা ঘরের এটাই রান্নার ঠাঁই। এখানে না পোষায় নিজের ঘরের মধ্যে রান্না কর!

রত্না বলে, তোমার উনানে ভাতটা একটু চাপাই ভাই? তরকারী হবে না, কিছু ভেজে দি চটপট। কাজে যাবে কি খেয়ে?

রানী বলে, চাপাও।

সে বিরক্ত হয়। তার লোকটাও যে একই সময় একই জায়গাতে কাজে যাবে, এটা রত্নার খেয়াল নেই? শুধু নিজের সুবিধা খোঁজে! কিন্তু তাই বলে ঠিক শোধ নিতে নয়, প্রয়োজন বলেই রানী তাকে দু'ফালি বেগুন দিয়ে বলে, তোমার সাথে ভেজে দিও ভাই।

রত্না বিরক্ত হয়। দু' দণ্ড উনানটা চেয়েছে বলে যেন পেয়ে বসেছে! বেগুন ভাজতে তেল লাগে না?

দু'জনের ভাব একটু গড়ে উঠতে না উঠতে এমনি কত যে খুঁটিনাটি ঘা লাগতে শুরু হয়!

তা হোক, ছোট ছোট বিরোধ নিয়ে শুরু হোক, পরে একদিন ভেঙে পড়বে জানা থাক, তাদের ভাব করা থেকেই গোকুল আর হরেনের মধ্যে দূরত্ব ঘুচে যাবার সূচনা হয়।

যে যার স্বামীর কাছে গল্প করে অপর জনের দোষগুণ মতিগতি আর ঘর সংসারের কথা। শুনতে শুনতে দু'জনেই তারা অনুভব করে যে স্ত্রীরা তাদের খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছে, পরস্পরকে দু'জনকে তারা খুব বেশী পছন্দ করুক আর না করুক!

দেখা হলে ঘর সংসারের ব্যাপার নিয়ে কথা বলার তাগিদও অনুভব করে দু'জনে।

হরেন বলে, জল নিয়ে তো বিষম ব্যাপার হল! আপনার স্ত্রীরও নাকি মশাই নাইবার জল জোটেনি শুনলাম?

গোকুল বলে, আর বলেন কেন। কোন্‌টা জুটছে উচিত মতো? এতদিন খেঁচাখেঁচি করে পাঁচটা টাকা আদায় করতে পারলেন?

এটা সাম্প্রতিক ব্যাপার। ঘটনাটা হরেনকে পীড়ন করছিল। গোকুলেরা অনেক বেশী দাবি তোলে, দীনেশের চেষ্টায় দাবিটা শেষ পর্যন্ত সস্তায় রেশনের কাপড় অথবা পাঁচ টাকা মাগ্‌গী ভাতা বেশী দেবার দাবিতে দাঁড় করানো হয়।

বাইরে রেশনের কাপড় দেওয়া হচ্ছে এই যুক্তিতে যেন ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া হয় দাবিটা।

হরেন বলে, কি করে হবে? শুধু অমিল আর মিলে মিশে কি করা যায় সে বিষয়ে বড় বড় বুলি কপচানো।

গোকুল মন্তব্য করে, তোমরা মেয়ে মানুষেরও বাড়া বুঝলে? তোমাদের মতো দশা হলে সতীনেও ঝগড়া ভুলে যায়।

হরেন হেসে বলে, আমাদের কোন ঝগড়া নেই।

এমনিভাবে আরম্ভ হয় গোকুল আর হরেনের কথার আদান-প্রদান, ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট আর সুনির্দিষ্ট হয়ে আসে তাদের কথা। দু'দিন আগে যে বিষয়ে আলাপ শুরু হলে হয়তো দু'জনে ঝগড়া বেঁধে যেত, দু'দিন পরে সেই বিষয়েই তারা প্রাণ খুলে আলাপ করে।

আলাপ থেকে তর্কও বেধে যায়। বোঝাপড়ার যে সরু সুতো টানতে গেলেই ছিঁড়ে যেত, নতুন নতুন সুতো জড়িয়ে পাকিয়ে সেটা শক্ত হয় দিন দিন।

—ওই সে পাঁচ টাকা ফস্‌কে গেছে, তোমায় আমায় আদায় করতে পারব?

—শুধু ওটা? আরও আদায় করতে পারব।

হরেন ভাবনায় পড়ে যায়, দিন দিন সে যেন রীতিমতো ভাবুক হয়ে ওঠে। দেখে বড়ই ঘাবড়ে যায় রত্না। তার কাছে মানুষটা মুখ গোমড়া করে কি যেন ভেবেই চলে শুধু, ওদিকে রানীর সাথে দিব্যি হেসে কথা কয়!

গা জ্বালা করে রত্নার।

হরেনের মনস্থির করাটা যেন আচমকা ঘটে যায়। হঠাৎ একদিন যেন ঝোঁকের মাথায় সে ঠিক করে ফেলে যে দীনেশকে ছেড়ে গোকুলদের সঙ্গে ভিড়ে যাবে। সকলের জন্য একটা জোরালো ইউনিয়ন গড়ে তোলাই উচিত।

আসলে তার প্রকৃতিটাই এ রকম। একগুঁয়ে সোজা মানুষ, একটা কাজ উচিত ভাবলে তাই নিয়ে টালবাহানা করা একেবারেই তার ধাতে নেই।

দীনেশ প্রায় ক্ষেপে গিয়ে বলে, আগেই বলিনি তোকে ও শালাব সাথে অত মিশিস না, তোকে বিগড়ে দেবে, তোর সর্বনাশ করে ছাড়বে।

হরেন চোখ পাকিয়ে বলে, নেশা করেছ নাকি দীনেশদা? তুই তোকারি শুরু করে দিলে?

নিজের পায়ে কুড়ুল মারছ, তাই বলছি। ওদের সাথে ভিড়লে আখেরে মঙ্গল নেই জেনে রেখো। এসব বুদ্ধি ছাড়ো, আমি বরং চেষ্টা করে আরেকটা প্রমোশন বাগিয়ে দিচ্ছি।

তুমি বড় ইয়ে মানুষ দীনেশদা।

মৌচাকে ঢিল পড়ার মতো কর্মীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। উত্তেজিত জটলা আর পরামর্শের অন্ত থাকে না। বহুদিন ধরে মনেপ্রাণে সকলেই যা চেয়ে আসছে, এতদিন পরে এবার কি সম্ভব হবে সেটা?

নিরাশাবাদী বিপিন বলে, আরে ধেৎ! তেলে জলে কখনো মিশ খায়? সব ভেস্তে যাবে দেখিস্।

কিন্তু মুখে হতাশার কথা বললে কি হবে। বিপিনেরও উৎসাহ জেগেছে। সে যেচে গিয়ে হরেনকে বলে আসে, আমি তোমার সাথে আছি ভাই।

ইউনিয়নের সভায় সরাসরি তাদের ইউনিয়ন ভেঙে দিয়ে গোকুলদের ইউনিয়নে যোগ দেবার প্রস্তাবটা দীনেশ ঠেকাতে পারে কিন্তু হরেনের সংশোধিত প্রস্তাবটা ঠেকাবার ক্ষমতা তার হয় না।

সংশোধিত প্রস্তাবে বলা হয় যে, তাদের দু'টি বেসরকারী ইউনিয়ন একসাথে পাঁচশো কর্মীর সভা ডেকে নতুন ইউনিয়ন গড়বে যে ইউনিয়ন বর্তমান আইনসম্মত ইউনিয়নের স্থান দাবি করবে এবং দাবি নিয়ে লড়াই চালাবে।

এ প্রচেষ্টাকে নষ্ট করার অপচেষ্টা যথাসাধ্য চলতে থাকে। সে তো চলবেই। কিছু গড়তে গেলে লড়তে হবেই। ভেঙে দেবার এই প্রাণপণ চেষ্টার ফলে যদি শেষ পর্যন্ত ভেস্তেও যায় গড়ে তোলার চেষ্টা, সে হবে আলাদা কথা। লড়ায়ে হারজিত আছে।

কিন্তু বিপদ যে এল সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে! একটা মেয়েলী কোঁদল খাটুয়েদের নিজস্ব নতুন ইউনিয়ন গড়ার আশা নির্মূল করে দিল—দিল একেবারে শেষ মুহূর্তে।

সকালবেলাই রাঁধতে রাঁধতে প্রচণ্ড ঝগড়া বেঁধে গেল রম্ভা আর রানীর মধ্যে—অসাবধানে রানীর হাতের গরম হাতায় রম্ভার গায়ে ছেঁকা লেগে যাবার ফলে।

কুৎসিৎ গালাগালি করেই গায়ের জ্বালা মিটল না রম্ভার—তার তো শুধু গরম হাতা থেকে গায়ে একটু ছেঁকা লাগার জ্বালা নয়! পেটের ছেলের বোঝাটাও দিন দিন তার ক্ষীণ দুর্বল শরীরটার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

দিশেহারা হয়ে রানীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে আঁচড়ে তার গায়ে রক্ত বার করে দেয়। রানী ঠেলে না দিলে বোধহয় কামড়েও দিত।

রানীর ভিতরের দুর্বলতা আর অস্থিরতাবোধ বেড়ে চলেছিল প্রতিদিন। ঠেলাটা সেও একটু দিশেহারা হয়েই দিয়ে বসে।

উনানে ডালের কড়াই-এর উপর পড়ে যায় রম্ভা, গরম ফুটন্ত ডালে গায়ের অনেকটা জায়গা তার ঝলসে পুড়ে যায়।

তাদের চেঁচামেচি শুনে দু'চারজন ব্যাপার দেখতে এসেছিল, রম্ভার আর্তনাদ শুনে আরও কয়েকজন ছুটে আসে। ধরাধরি করে রম্ভাকে তারা তার ঘরে নিয়ে যায়।

রানী ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। কোনদিকে তাকাবার বা কি ঘটছে দাঁড়িয়ে দেখবার সাধ্য তার ছিল না। বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানির সঙ্গে মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে জগৎটা অন্ধকার হয়ে আসছিল।

ব্যাপারটা শুধু এ পর্যন্ত গড়ালে ভাবনা ছিল না। কিন্তু বাজার করে ফিরে রম্ভার অবস্থা দেখে আর তার মুখে ব্যাপার শুনেই মাথায় যেন আগুন ধরে যায় রগচটা হরেনের। গালাগাল দিতে আরম্ভ করে রানীকে।

রম্ভাকে দেখতে যাবে বলেই রানী প্রাণপণ চেষ্টায় কোন রকমে উঠে বসেছিল, কিন্তু উঠে দাঁড়াবার জোর পায়নি। হঠাৎ ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

গোকুল যখন ফিরে এল, ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করছে। বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা ডাক্তার এনেছিল।

ডাক্তার বিদায় নেওয়া পর্যন্ত গোকুল চুপ করে রইল। তারপর সোজা গিয়ে হরেনের গালে বসিয়ে দিল এক চড়।

—অসভ্য জানোয়ার! মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, তুই পুরুষ হয়ে মেয়েছেলেকে মারতে যাস্! তোকে আমি খুন করব।

ঘটনাটা মঙ্গলবারের। সভা ডাকা হয়েছিল শনিবার বিকালে।

কিন্তু আর কি লাভ আছে সভা ডেকে? সমস্ত সম্পর্ক চুকেবুকে গিয়েছে গোকুল আর হরেনের মধ্যে। আক্রোশে ফুঁসছে দু'জনে। দেখা হলে রাগে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বোঝা যায়, এ ভাঙন আর জোড়া লাগার নয়। হরেনের নাম করলে গোকুল বলে, ও বজ্জাতটার নাম কোরোনা আমার কাছে। জানোয়ারটাকে খুন করে আমার ফাঁসি যাওয়া উচিত ছিল।

গোকুলের নাম শুনলে হরেন কটমট করে তাকায়। দাঁতে দাঁত ঘষে একটা অকথ্য শব্দ উচ্চারণ করে।

শুধু বন্ধুত্ব ভেঙে গেলেও কথা ছিল। দু'জনে একেবারে শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের!

শনিবার বিকালে মিটিং বসে বটে কিন্তু কারো মধ্যে উৎসাহ জাগে না। দীনেশ শুধু মহোৎসাহে সিগারেট টানে আর তার নিজের লোকদের সঙ্গে ফিসফাস গুজগাজ পরামর্শ চালায়।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। মুখ তার হাঁ হয়ে যায় এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখে।

গোকুল আর হরেন কথা কইতে কইতে হলে ঢুকছে! বিবাদ কি ওদের মিটে গেল? দশ মিনিট আগেও যারা পরস্পরকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল?

এ কি ম্যাজিক?

মিটিং শেষ হলে উচ্ছ্বসিত আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে গোকুল আর হরেন বাইরে আসে। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দু'জনে দু'দিকে সরে যায়।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বিপিন হরেনকে বলে, গোকুলকে ডাকো, চা'টা খাওয়া যাক।

হরেন বলে, ও শালার নাম করো না আমার কাছে।

গোকুলও তার বন্ধুকে বলে ও বজ্জাতটার নাম কোরো না আমার কাছে। ওকে খুন করিনি—আমার এ আপসোস যাবার নয়।

চিকিৎসা

ফুটপাথের ধার ঘেঁষে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল। দেখেই টের পাওয়া যায় শহুরে মেয়ে। অর্থাৎ মফস্বল থেকে শহরে নতুন আমদানী নয়। রাজপথে চলার তার অভ্যাস নেই, খুব অন্যমনস্ক হয়ে থাকলেও অবচেতনা তাকে আপনা থেকে কতকগুলি সতর্কতা পালন করায় না, এটা বিশ্বাস করাও কঠিন।

অথচ বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে কোনদিকে না তাকিয়ে হঠাৎ রাস্তায় নেমে কয়েক পা এগিয়ে যায়।

স্কুল কলেজ আপিস যাবার সময় রাজপথে দ্রুতগামী গাড়ির যে দুমুখী স্রোত চলছিল একেবারে তারই একটা ধারার মধ্যে!

মস্ত সেলুন গাড়িটা তাকে চাপা দিয়ে আহত বা নিহত করলে কারো কিছু বলার থাকত না। এমনভাবে যে চলন্ত গাড়ির সামনে এসে পড়ে, প্রাণপণে ব্রেক কষেও বাঁচাবার সময় বা ফাঁক রাখে না, সোজাসুজি তাকে চাপা দেবার অধিকার নিশ্চয় সে গাড়ির চালকের আছে।

কিন্তু গাড়িও মানুষ চালায় কিনা এবং জগতে এত সমারোহের সঙ্গে ছোট ও বিরাট স্কেলে মানুষ মারা হয়ে থাকলেও মানুষকে বাঁচাতে চাওয়াটাই মানুষের ধাত কি না, দুর্ঘটনাটা তাই হয়ে যায় একটু অন্য রকম।

ভাবনা চিন্তার তো সময় ছিল না, সেলুন গাড়ির মোটাসোটা বেঁটে ড্রাইভারটি যা করে তার পিছনে নিজেকে বিপন্ন করেও মানুষকে বাঁচাবার প্রকৃতিগত ঝোঁকটাই ছিল বলতে হবে।

তাছাড়া আর কোন ব্যাখ্যাই হয় না তার কাজের। দাঁতে দাঁত চেপে ব্রেক কষার সঙ্গে সে ডাইনে হুইল ঘুরিয়ে দেয়। বাঁয়ে ফুটপাতে মানুষের ভিড়। একজনকে বাঁচাতে গিয়ে দশ জনকে মারা বা জখম করার মানে হয় না। মেয়েটি ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে। গাড়িটা ধাক্কা দেয় চলন্ত ট্রামটার গায়ে।

অদ্ভুত একটা আর্তনাদের মতো আওয়াজ ওঠে একসঙ্গে অনেকগুলি গাড়ির ব্রেক কষায়।

সেলুন গাড়িটার পিছনে আসছিল লম্বাটে পুরানো বড় একটা গাড়ি! ব্রেক কষেও সেটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেলুনটার উপরে।

পিছনের সিটের এদিকের কোণে যে প্রৌঢ় বয়সী ভদ্রলোকটি বসেছিল, চোট লেগে সে অজ্ঞান হয়ে পাশের সুন্দরী মেয়েটির কোলে ঢলে পড়ে—সিনেমার চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে আসল রসালো দৃশ্যটির মতই!

কী বিরাট ছন্দে কী গতিতে শহরের এই রাজপথে জীবনের স্রোত বয়ে চলেছিল, কী বিচিত্র অদ্ভুত ছিল হেঁটে চলা ট্রামে বাসে গাদাগাদি করা নানা আকারের নানা ধরনের ছোট বড় নতুন পুরানো মোটর গাড়িতে চাপা রিক্সা সাইকেলে বসা মানুষ-গুলির বিভেদ আর সামঞ্জস্য—ব্যাঘাত ঘটে থেমে যেতেই যেন সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ট্রাফিক বন্ধ।

পুলিস আসেনি, অ্যাম্বুলেন্স আসেনি কিন্তু লোকারণ্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। সে অরণ্য ভেদ করে সাইকেলটিরও এগিয়ে যাবার সাধ্য নেই।

বাসের ড্রাইভার কন্ডাক্টর নিত্যই দেখছে এ রকম দুর্ঘটনা। একটা ফাঁক পেলেই হুস করে বেরিয়ে যেত ঘটনাস্থল পিছনে ফেলে। তাদের টাইমের সার্ভিস। দেরি হলে জরিমানা—কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আপিস টাইমে আধঘণ্টা রোজগার বন্ধ থাকলে মালিক বড় চটে যায়। বলে, চোখ কান নেই? সেন্স নেই? অ্যাকসিডেণ্ট ঘটলে ট্রাফিক বন্ধ হলে আধঘণ্টা একঘণ্টা কাবার হয়ে যাবে খেয়াল নেই? হুস্ করে বেরিয়ে যেতে পারলে না? পাশের রাস্তায় ঢুকে একটু ঘুরে আসতে পারলে না? বাস কিনে হয়েছে ঝকমারি। তোমাদের পেটেই সব যায়।

বোঝাই বাস, মাল বোঝাই লরী, মাল বোঝাই নিতে যাবার খালি লরী, উগ্র অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। পারলে যেন জনতাকে পিষে বেরিয়ে চলে যাবে।

পুলিস না এলে তো আর সে সাহস সম্ভব নয়। শুধু ফোঁসে আর গর্জায়।

জনতা রাস্তা ছাড়ে না।

তারপর পুলিস আসে। অ্যাম্বুলেন্স আসে।

সামান্য ব্যাপার। শুধু একটু ঠোকাঠুকি হয়েছে চলতি কয়েকটা গাড়ির।

কেউ মরেনি।

দুর্ঘটনার কারণে সেই মেয়েটার বাঁ হাতটা শুধু গুড়ো হয়ে গেছে আর ভেঙেছে দুটো একটা পাঁজরার হাড়। সেলুন গাড়ির মোটাসোটা বেঁটে ড্রাইভারের ঘাড়টা শুধু একটু মচকে গেছে। বেশী রকম মুচড়ে গেছে বলেই জ্ঞান হারিয়েছে, নইলে আঘাত তার তেমন মারাত্মক কিছু লাগেনি। কোথাও কাটেনি, রক্তপাত ঘটেনি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কেন জ্ঞান হারিয়েছে বোঝাই যায় না। বোধহয় দেহযন্ত্রে কোন বিকৃতি আছে। হঠাৎ আঁতকে উঠলেই অজ্ঞান হয়ে যায়। নইলে এত সামান্য একটু ঝাঁকুনিতে কেউ এভাবে অচেতন হয় না।

ওই গাড়ির ড্রাইভারের চোট লেগেছে বরং অনেক বেশী। কপালের পাশের দিকটা অবশ্য দেখতে দেখতে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে ভদ্রলোকের। কিন্তু একফোঁটা রক্তপাত যার ঘটেনি তাকে আহত বলা যায় কোন যুক্তিতে!

কেউ মরেনি, রক্তপাত হয়নি, সুতরাং সামান্য দুর্ঘটনাই বলতে হবে।

মিনিট কুড়িও লাগে না রাজপথটির ধাতস্থ হতে।

তারপর ঠিক আগের মতোই অবিরামগতিতে মানুষ ও গাড়ির চলাচল দেখে মনে হয়, দুর্ঘটনার চিহ্ন কেন, স্মৃতি পর্যন্ত যেন উবে গিয়েছে।

সামনে খানিকটা ফাঁক পাওয়ায় পিছনের যে গাড়িটা ব্রেক কষে থামাবার সুযোগ পেয়েছিল, কারো এতটুকু চোট লাগেনি তার ড্রাইভার জীবন ফুটপাথে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বিড়ি টানে।

. একটার পর একটা।

ভূপেশ বলে, দাঁড়িয়ে রইলে যে জীবন? গাড়িতে স্টার্ট দাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

জীবন একটা ঢোঁক গেলে।

সন্ধ্যা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, তোমার মুখ এ-রকম শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

প্রাণপণ চেষ্টায় মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করতে করতে জীবন বলে, ও কিছু নয়। শরীরটা আজ ভাল নেই।

ধীরে ধীরে এগিয়ে সে গাড়িতে ওঠে। ভেতরে তার যে কি ব্যাপার চলেছে, মাথা ঘুরছে বুক ধড়ফড় করছে, সর্বাঙ্গ কাঁপছে এটা ওদের জানতে দেওয়া যায় না।

একটা দুর্ঘটনা ঘটবার এতক্ষণ পরেও যার ভেতরে এমন ব্যাপার চলে, তাকে গাড়ি চালাবার ভার দিয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে ওরা সাহস পাবে না, আজকেই মাইনে হাতে দিয়ে বলবে, ভালয় ভালয় বিদেয় হও!

এমনি ওরা তাকে পছন্দই করে ড্রাইভার হিসাবে, তার সাধারণ কথাবার্তা চালচলনও অপছন্দ নয়; কিন্তু সে জানে মাঝে মাঝে তার মুখ যে খুব শুকনো আর বিষণ্ণ দেখায়, অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, ডাকলে কখনো চমকে উঠে খানিকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—এসব লক্ষ্য করে ওদের মনে একটা খটকা লেগেছে :

একবার যদি টের পায় তার সত্যিকারের অবস্থা আর একদিনও ওরা তাকে রাখবে না।

ভূপেশ আর সন্ধ্যাকে আপিসে পেঁছে দিলে ভূপেশ বলে, আজ আর আমাদের গাড়ির দরকার নেই। বাড়িতে ওরা কোথায় যাবে বলছিল, গাড়ি নিয়ে যাও।

গাড়ি নিয়ে ফিরে গিয়ে জীবন অনেকক্ষণ শুয়ে থাকে। খেয়ে দেয়ে আবার বিছানা নেয়, কিছুক্ষণের জন্য একটু তন্দ্রাও আসে, তবু বাড়ির মেয়েদের সিনেমায় নেবার জন্য গাড়ি বার করার সময় তার বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে ; সর্বাঙ্গ কেমন অবশ হয়ে আসে। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে গ্যারেজে গিয়ে গাড়িতে উঠতে হয়।

সন্ধ্যায় বাড়িতে আসে অতিথি, হাসি গল্প গানে ড্রয়িং রুমটা যেন আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। বাইরে বাগানে দাঁড়িয়ে জীবন ভাবে, চোরাবাজারে টাকা করেও জীবনটা ওরা হাসি আনন্দে ভরে তুলতে পারে, কারও কিছু চুরি না করেও তার জীবনটা এমন দুঃখময় কেন?

শাড়ি গয়নায় চোখে ধাঁধা লাগিয়ে মেয়েরা বেরিয়ে আসে। ভূপেশের স্ত্রী প্রৌঢ়া সুপ্রিয়াও যেন নিজের মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেজেছে।

তার দিকে চেয়ে জীবন কিছুক্ষণের জন্য তার নিজের চিন্তা ভুলে যায়। ভাবে, ভূপেশ যে সন্ধ্যাকে শুধু তার বাড়ি থেকে তুলে নিজের আপিসে নিয়ে যায় না, সিনেমা হোটেলেও নিয়ে যায়, ফিরিঙ্গি পাড়ায় ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া করা সাজানো

ঘরেও নিয়ে যায়, এটা জানলেও কি তুমি এরকম সেজেগুজে হাসিমুখে সিনেমায় যেতে পারতে?

জীবনের মাথা ঘোরে।

বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে। হঠাৎ ধড়াস করে ওঠে হাত পা কাঁপে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। জল খেয়ে লাভ হয় না। জলে গলাও ভেজে না, তৃষ্ণাও মেটে না।

বেশী জল খাওয়ার দরুন শুধু আরেকটা অস্বস্তি বাড়ে।

খিদে পায় এলোমেলোভাবে। কখনো অসহ্য চনচনে খিদে পায়, কখনো ভোঁতা হয়ে যায়। ভাল হজম হয় না। আর হয় না ঘুম।

নিয়মিতভাবে নয় কিন্তু পালা করেই তার দুঃখের দিনগুলি আসে।

ক'দিন ভালই আছে, শরীরটা তাজা বোধ করছে, মনে অনুভব করছে ফুর্তির ভাব, জগৎটাকে মনে হচ্ছে খাসা জায়গা, জীবনটা মনে হচ্ছে আনন্দময়—স্বপ্নের মতোই যেন কেটে যায় এ অবস্থাটা, দুঃস্বপ্নের মতোই যেন শুরু হয় অস্বস্তি যাতনাবোধ অনিদ্রা আর আতঙ্কের দিনগুলি।

চেনা ডাক্তারকে দিয়ে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করানো হয়েছে দেহটা এবং রক্ত থুথু ইত্যাদি সব কিছু।

কোন খুঁত পাওয়া যায়নি।

—রোগটা বোধহয় আপনার মানসিক।

—মানসিক কি রোগ?

—সেটা স্পেশালিস্ট বলতে পারবেন। আমার মনে হয় আপনি খুব দুশ্চিন্তা করেন।

—শরীরটা বিগড়ে যায় কেন এছাড়া আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। কোন ঝন্‌ঝাট নেই।

—আপনি একবার কুমুদবাবুকে কনসাল্ট করুন।

কুমুদের ফি ভীষণ মোটা। তবে ডাক্তারী বিদ্যায় বা যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করায় তার ফাঁকি নেই।

প্রথম দিন প্রায় ঘণ্টাদেড়েক ধরে কুমুদ নানাভাবে এই কথাটাই তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল যে কারণ না জেনে রোগের চিকিৎসা করার সাধ্য ভগবানের থাকতে পারে কিন্তু রক্ত-মাংসের মানুষ ডাক্তারের নেই এবং কোন কথা গোপন করলে রোগের কারণ খুঁজে বার করবার সাধ্য ডাক্তারের হয় না।

কোন কথাই সে গোপন করেনি কুমুদের কাছে। বলেছে, আমার জীবনে কিছুই গোপন করার নেই। অল্প বয়সে দু'একটা ছেলেমানুষি হয়তো করেছি, তারপর ভুলটুলও হয়তো করেছি দু'একটা। কিন্তু সে সব এমন ব্যাপার নয় যে আপনাকে বলতে পারব না।

কুমুদ প্রশ্ন করেছে, সে জবাব দিয়ে গেছে। ছেলেবেলা থেকে তার নিজের জীবনের কথা, বাড়ির লোকের কথা, বন্ধু-বান্ধবের কথা সব বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন।

একদিনে হয়নি অনেকদিন যেতে হয়েছে কুমুদের কাছে।

এটা সম্ভব হয়েছে কুমুদের কাছে তাকে যে পাঠিয়েছে তারই মধ্যস্থতায়।

শঙ্কর ডাক্তার কুমুদের পরিচিত, তারই অনুরোধে কুমুদ তার পাওনাটা জীবনের কাছ থেকে মাসে মাসে কিছু কিছু করে নিতে রাজী হয়েছে।

শঙ্কর জোর দিয়ে কুমুদকে বলেছে, একবারে সব টাকা দিতে হলে সে চিকিৎসা চালাতে পারবে না। ওকে আমি অনেকদিন থেকে জানি, মানুষটা সত্যি অনেস্ট। আপনার পাওনা এক পয়সা মারা যাবে না।

প্রথমে একটু উদাসীনভাবে আরম্ভ করলেও কয়েকদিন জিজ্ঞাসাবাদের পর তার অসুখটার চিকিৎসা করতে কুমুদের যেন বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

প্রশ্নগুলি অবশ্যই চিকিৎসার পদ্ধতি অনুসারে সাজানো কিন্তু জীবনের কাছে ভারি এলোমেলো ঠেকে। কিন্তু ভাল করে তার রোগটা বুঝবার জন্য কুমুদের আগ্রহ সে টের পায়।

আশা জাগে জীবনের। কুমুদের মতো ডাক্তার এতখানি আগ্রহের সঙ্গে এত যত্ন নিয়ে যখন তার চিকিৎসা করছে, হয়তো সেরে যাবে তার দুর্বোধ্য অসুখ—ভিতরে আড়াল করা অসুখ।

দু'তিন রকম ওষুধের ব্যবস্থাও করেছে কুমুদ। একটু খিদে বেড়েছে, মোটামুটি ঘুমও হয়।

সেরকম কষ্টকর হয়ে ওঠে না মাথা ঘোরা বুক ধড়ফড় করা গলা শুকিয়ে যাওয়া।

এইখানেই কিন্তু থেমে গেছে উন্নতি। আগের মতো কষ্টকর না হলেও অসুখটা তার রয়ে গেছে।

কেমন বিচলিত মনে হয়েছে কুমুদকে।

একদিন সে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে বলে, তুমি নিশ্চয় আমার কাছে কোন গুরুতর কথা গোপন করছ।

—গুরুতর কথা ডাক্তারবাবু? কোন সামান্য তুচ্ছ কথাও গোপন করিনি।

কুমুদ মাথা নাড়ে।

—আমি স্পষ্ট ধরতে পেরেছি তোমার মধ্যে একটা কঠিন অশান্তি আছে, জোরালো সংঘাত চলছে। ব্যাপারটা না জানালে তো তোমায় সারাতে পারব না।

—সে তো এই অসুখটার জন্য। আগে অশান্তি ছিল, কোন কাজ ছিল না বলে, বড় দুরবস্থা হয়েছিল। ক'বছর ভাল মাইনের কাজ করছি, এক রকম চলে যায়। এখন এই রোগটা ছাড়া আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই।

কুমুদ বলে, না। অসুখের জন্য তোমার আসল অশান্তিটা নয়—ওই অশান্তিটার জন্যই তোমার অসুখ। এতে কোন ভুল নেই, এটা ধরতেও আমার অসুবিধা হয়নি।

এটার রকমটাও আমি ধরতে পেরেছি ঠিক। গোপনে মানুষ খুন করার মতো খুব বড় রকম একটা পাপ করলে যেমন প্রতিক্রিয়া হয়, সেই ধরনের ব্যাপার।

তোমার জীবনে নিশ্চয় একটা বড় রকম গোপন দিক আছে, নইলে এ রকম হতেই পারে না। আমাদের বিজ্ঞানের হিসাব ভুল হবার নয়। তোমার জীবনে গোপন দিক আছে এটা আমার আন্দাজ নয়। ডাক্তার যেমন স্পষ্ট লক্ষণ পেলে বলে দিতে পারে রোগীর শরীরে কি অসুখ, তেমনি স্পষ্ট লক্ষণ থেকে আমি তোমার ভেতরের ব্যাপারটা ধরেছি, এতে ভুল হওয়া অসম্ভব।

জীবন হাঁ করে চেয়ে থাকে। তার জীবনের একটা বড় গোপন দিক আছে, মানুষ খুন হবার মতো সাংঘাতিক দিক, অথচ সে নিজেই তার কোন খবর রাখে না!

কুমুদ বলেছে, এভাবে গোপন করলে তো চিকিৎসা সম্ভব নয়। গুরুতর ব্যাপার একটা আছে, ভেতর থেকে চাপ দিচ্ছে, তার লক্ষণগুলি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ব্যাপারটা কি না জানলে তো চিকিৎসা করতে পারব না, তোমার রোগও সারবে না!

জীবন ব্যাকুলভাবে বলে, বিশ্বাস করুন, আমি কোন কথা গোপন করিনি।

কুমুদ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর ধীরে বলে, যদি ক্রিমিনাল কিছু হয়, বিপদে পড়ার ভয়ে বলতে বাধছে, তাহলে তোমায় আবার বলছি যে তুমি মস্ত ভুল করছ। তোমাকে বিপদে ফেলা যায় এমন কিছুই আমি জানতে চাই না। কারও নামধাম, কোথায় কবে ব্যাপারটা ঘটেছিল, এসব আমার জানবার দরকার নেই। এসব পয়েন্ট তুমি গোপন রাখতে পার, বানিয়ে বলতে পার। আমি শুধু জানতে চাই ব্যাপারটা কি ধরনের আর কিভাবে তার জের চলছে।

একটু থেমে কুমুদ আবার বলে, যেমন ধরো তুমি একটা খুন করেছিলে। কবে কাকে কিভাবে খুন করেছিলে তোমায় বলতে হবে না। আমায় শুধু জানাবে কেন খুনটা করতে হয়েছিল, এখনো তার জেরটা চলছে কেন। তুমি সত্যি খুন করেছ বলছি না কিন্তু। আমি তোমায় শুধু এটুকু বোঝাতে চাইছি যে খুন করে থাকলেও আমায় যেটুকু জানালে আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে পারব না—আমায় সেইটুকু শুধু জানাও। যদি অন্যায় প্রেমের ব্যাপার হয়, আমাকে শুধু এইটুকু বলবে, আর কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবে যা থেকে আমার জানার সাধ্যও হবে না কার সঙ্গে তোমার অন্যায় প্রেম চলেছে।

জীবন ক্ষুব্ধস্বরে বলে, আপনি যেন ধরেই নিয়েছেন আমি মস্ত একটা পাপ করেছি, এখনও তার জের টানছি।

—আমাকে সেটা ধরে নিতেই হবে। নইলে চিকিৎসা শাস্ত্রটা মিথ্যা হয়ে যায়। আমার হিসাবে পাপ নয়, তোমার কাছে পাপ। এই বিকারটা তোমার মধ্যে আছে। তা না হলে এরকম অসুখ তোমার হতেই পারে না। ওটার চিকিৎসাই আমাকে করতে হবে।

জীবন হতাশ হয়ে বলে, আপনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না, কি বলব বলুন। ছোটখাট পাপকর্ম করেছি বা করছি বলে তো আমার জানা নেই!

কুমুদ গম্ভীর গলায় বলে, তাহলে আর টেনে কাজ নেই। তোমার কাছে আমার যা পাওনা আছে সেটা আর তোমাকে দিতে হবে না।

—তা কি হয় ডাক্তারবাবু! অ্যাদ্দিন চিকিৎসা করলেন, আপনার পাওনা টাকা আপনাকে দেব বৈকি!

এ জীবনে আর অসুখটা সারবার আশা সে রাখে না।

কুমুদের মতো ডাক্তার যদি রোগ ধরতে না পেরে এমন আবোল তাবোল কথা বলে, জীবনে বিশেষ কোন অন্যায় কোনদিন না করে থাকলেও গায়ের জোরে দাঁড় করায় যে কোন এক গুরুতর অন্যায় করার জন্যই তার এই রোগ, তাহলে আর সে কার কাছে যাবে, রোগ সারবার আশা করবে?

শঙ্কর ডাক্তার দেহটা সব রকম পরীক্ষা করেও কোন কারণ খুঁজে পায়নি। কুমুদ ডাক্তার তার মনকে পরীক্ষা করে বার করল এক কল্পিত কারণ। তার দেহ খুঁজে মন খুঁজে যদি সঠিক কারণটা না পাওয়া যায়, তবে আর আশা করা যায় কি করে?

এটা তাহলে কোন রোগ নয়। এরকম যে তার হয় এটাই তার ধাত।

এই অস্থিরতা, কণ্টবোধ অনিদ্রা অরুচি এ সমস্তের যে আক্রমণ হয় সেটা তার রক্ত-মাংসে জড়িয়ে আছে। চিকিৎসায় এর আর কোন প্রতিকার নেই।

বড় একটা দাঁও মেরে মোটা টাকা লাভ করে ভূপেশ একটা ঝকঝকে নতুন গাড়ি কেনে। কিন্তু এমন সুন্দর দামী নতুন গাড়ি চালাবার আরাম, অন্য অনেক ধ্যাড়ধ্যেড়ে গাড়ির ড্রাইভারদের ঈর্ষাতুর দৃষ্টি, দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি, কিছুই যেন খুশী করে না জীবনকে। কলকাতার রাস্তায় নতুন গাড়ি চালাতে তার যেন আরও বেশী ভয় করে, অস্বস্তি বোধ হয়।

সন্ধ্যা উচ্ছ্বসিত হয়ে গাড়ির এবং ভূপেশের রুচির প্রশংসা করে। এই গাড়ি চেপে আপিসে যাওয়া আসায় আনন্দে আরামে ও গর্বে যেন প্রকাশ্য পথেই নেতিয়ে পড়তে চায় ভূপেশের গায়ে।

বোধহয় এই জন্যই অথবা পুরানো হয়ে যাওয়ায় তাকে আর ভাল লাগছিল না বলে অথবা অন্য একজনকে পছন্দ হয়েছে বলে, কাজের চাপ আর সময়ের অভাবের অজুহাতে ভূপেশ সন্ধ্যাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আপিস যাওয়া আর তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

মালিনীকে আপিসে চাকরি না দিয়েই বিকালের দিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে সিনেমায় হোটেলে যায়।

সুপ্রিয়া আর তার ছেলে-মেয়েদের সাজসজ্জার চাকচিক্য, সিনেমা দেখা, বন্ধুদের বাড়িতে এনে হৈ-চৈ করা বেড়ে গেছে।

সকলেই ফুর্তিতে ডগমগ—অন্ততঃ বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হয়। মুখ শুধু শুকনো আর ক্লিষ্ট জীবনের।

বাড়ির সবাই নতুন গাড়ি চেপে মজা করতে যেতে চায়।

বড় ছেলে মোহিত আর মেজ মেয়ে নলিনী দু'জনেই সেদিন সকালে ভূপেশের কাছে প্রায় একসঙ্গে দরবার করতে যায় যে দুপুরবেলা দু'ঘণ্টার জন্য গাড়িটা চাই।

ভূপেশের বড় মেয়ে মোহিনী বিধবা।

ভূপেশের কাছে প্রথমে গিয়েছিল নলিনী। টের পেয়েই মোহিত তাড়াতাড়ি গিয়ে হাজির হয়।

বলে, আমার আজকে গাড়ি চাই-ই বাবা।

নলিনী হেসে বলে, আমি আগেই বাগিয়ে নিয়েছি।

দু'জনে বেধে যায় প্রচণ্ড কলহ। যেন আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি হয়ে যাবে!

ভূপেশ এক ধমকে তাদের ঠাণ্ডা করে দিয়ে বলে, আজ একজন কাল একজন নাও না? গাড়ি কিনে ঝকমারি হয়েছে। এমন কি জরুরী কাজ তোমাদের যে আজ গাড়ি না হলেই চলবে না! তুই তো বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে যাবি, মোহিত যখন বলেছে ওর জরুরী কাজ আছে, আজ ও-ই নিক। তুই কাল বেরোস।

ভূপেশ ধমক দিয়ে কথা কইলে ছেলে-মেয়েরা আর মুখ খুলতে সাহস পায় না। সেকালের রাজার হুকুমের মতোই তার কথা সকলে নীরবে মেনে নেয়।

তখন ধীরে ধীরে আসে মোহিনী। বিধবার সাদা বেশেও যে এমন চাকচিক্য আনা যায় তাকে না দেখলে ধারণা করা কঠিন।

সে ম্লান মুখে বলে, বাবা, আমি আজ নতুন গাড়িটা নিয়ে একটু বেরোব। আজ ওনার মৃত্যুদিন। ওঁর মা ভাই-বোনদের সঙ্গে দেখা করে আসব।

ভূপেশ বলে, ট্যাক্সিতে গেলে হয় না?

—না আমার গাড়িটা চাই।

তবে আর কথা কি।

ভূপেশ মোহিত আর নলিনীকে বলে, তোমরা কাল-পরশু গাড়ি পাবে। এরকম সিরিয়াস ব্যাপারে আমি তো মোহিনীকে না বলতে পারি না।

মোহিনী উদাসীনার মতো বলে, আমায় একশোটা টাকা দিও বাবা।

বাপের একশো টাকা নিয়ে বাপের নতুন গাড়িতে চড়ে মোহিনী বার হয়।

এ রাস্তাটা চওড়া এবং এটার নাম রোড, দেশের একজন নমস্য ব্যক্তির নামে। কিন্তু একটা দিক বন্ধ এ রাস্তাটার।

বড় রাস্তার মোড়ে পৌঁছবার আগেই জীবন জিজ্ঞাসা করে গাড়ি কোনদিকে যাবে।

মোহিনী মুচকে হেসে বলে, যেদিকে তোমার খুশি।

জীবন বলে, কোথায় যাবেন না বললে—

মোহিনী বলে, বললাম তো, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেইখানেই যাব। সোজা কথা বুঝতে শেখো। এখানে গাড়ি থামিয়ে রেখো না, পাড়ার লোক দেখছে।

পিছনের সিট থেকে সামনে ঝুঁকে একশো টাকার নোট সে জীবনের বুক পকেটে গুঁজে দেয়।

নিশ্চিন্ত মনে সিটে বসে বলে, রাত দশটা হোক এগারটা হোক, গাড়ি নিয়ে ফেরবার জন্য ভেবো না। আমি সামলে দেব, তোমার কোন দোষ হবে না। বলব যে একটু সভাটভা হয়েছিল, স্মৃতিপুজো হয়েছিল তাই ফিরতে পারিনি।

বুক পকেট থেকে নোটগুলি বার করে জীবন মোহিনীর কোলে ছুঁড়ে দেয়। বলে, আমার মাথা ঘুরছে, গা গুলোচ্ছে, চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। চালাতে পারব না। আজ গাড়ি চালাতে গেলেই এ্যাকসিডেণ্ট হয়ে যাবে।

গাড়ি ঘুরিয়ে আনার জন্য বড় রাস্তায় তাকে যেতে হয়। বড় রাস্তায় গাড়ির মুখ-ঘুরিয়ে সে মোহিনীকে নামিয়ে দিয়ে গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে!

গায়ের জ্বালায় বানিয়ে বানিয়ে মোহিনী কি বলে সেই জানে, খানিক পরেই ভূপেশ জীবনকে ডেকে পাঠায়। জীবন গিয়ে দ্যাখে রেগে একেবারে আগুন হয়ে আছে ভূপেশ।

সে গিয়ে দাঁড়াতেই যা-তা গালাগালি শুরু করে পায়ের চটি খুলে হাতে নেয়।

কিন্তু মুখ আর হাত থেমেও যায় আচমকা। সে বোধহয় কল্পনাও করেনি যে নিরীহ শান্ত প্রকৃতির জীবন এমনভাবে রুখে উঠতে পারে।

মাথা উঁচু করে জীবন বলে, আমারও মুখ আছে। পায়ে জুতো আছে, সেটা ভুলবেন না।

কি স্পর্ধা মানুষটার!

কিন্তু আর গালাগালি দিতে সাহস হয় না ভূপেশের। তার বড় ছেলে বলে, তোমায় আমরা পুলিসে দেব।

জীবন বলে, তা দিতে পারেন। একটা কিছু মিথ্যা দাঁড় করালেই হল, সেটা আপনাদের জানা আছে।

ভূপেশ বলে, তুমি এই দণ্ডে বেরিয়ে যাও।

—আমার মাইনে চুকিয়ে দিন।

মাইনে পাবে না।

জীবন ধীরে ধীরে বলে, দেখুন, একটা কথা ভুলবেন না। গাড়ির ড্রাইভার অনেক ভিতরের কথা জেনে যায়। আমি অনেক ব্যাপার জানি, ফাঁস করে দিলে বেশ মুস্কিলে পড়বেন।

মাইনে নিয়ে ছোট্ট সুটকেশ আর বিছানার বাণ্ডিল হাতে জীবন রাস্তায় বেরিয়ে যায়।

কোথায় যাবে ঠিক নেই, আরেকটা চাকরি জুটিয়ে নিতে কতকাল লাগবে জানা নেই, কিন্তু রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়ে জীবন মনে প্রাণে একটা অদ্ভুত রকম স্বস্তি অনুভব করে।

ভিতরে একটা বিশ্রী কষ্টকর চাপ যেন হঠাৎ কমে গেছে, একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে দেহমন!

এত স্পষ্ট হয় অস্বস্তি কেটে গিয়ে স্বস্তিবোধ করাটা, একটা দুঃসহ বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আনন্দ যে, জীবন সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়।

একটা সস্তা হোটেলে গিয়ে ওঠে। তক্তপোষে বিছানাটা পেতে ঠিকঠাক করে নিতে নিতে ওই আরামটাই যেন গাঢ় ঘুম হয়ে তার চোখে ঘনিয়ে আসে।

বিছানায় শোয়ামাত্র গভীর ঘুমে সে অচেতন হয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলা ঘুম ভাঙতে মনে হয় শুধু স্বস্তি নয়, একবেলা ঘুমিয়ে শরীর মন যেন আশ্চর্য রকম তাজা হয়ে উঠেছে।

পরদিন সে কুমুদের কাছে যায়।

বলে, ডাক্তারবাবু, আপনি ঠিক বলেছিলেন। আপনাদের কি ভুল হতে পারে! আমি সত্যি একটা মস্ত পাপ করেছিলাম কিন্তু নিজেকে অন্য রকম বুঝিয়েছিলাম বলে ধরতে পারিনি পাপ করেছি।

কুমুদ বলে এখন ধরতে পেরেছ?

জীবন সায় দেয়।

পেরেছি বৈকি। প্রায় চার বছর ধরে আমি একটা মহাপাপী বদলোকের কাছে চাকরি করছিলাম। প্রথমে তবু পদে ছিল, তারপর কত রকম অকাজ কুকাজ যে করেছে, কত লোকের ঘাড় যে ভেঙেছে! বাড়ির ছেলে-মেয়েগুলি পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে বজ্জাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি সব জেনেও নিজেকে কি বোঝাতাম জানেন আমি ড্রাইভার, আমি খেটে পয়সা রোজগার করছি, ও-লোকটা কি করছে না করছে আমার তা দেখবার দরকার কি! কাল একটা ব্যাপার ঘটায় আমাকে কাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কি উপকারটাই যে করেছে তাড়িয়ে দিয়ে। এখন বুঝতে পারছি ওদের অত বজ্জাতি আমার সইছিল না। গাড়িতে চেপে হাজার হাজার লোকের ঘাড় ভাঙার ব্যবস্থা করতে যাবে, গরিব নিরুপায় মেয়ের সর্বনাশ করতে যাবে—গাড়ি চালাব আমি কিন্তু ভাবব যে আমি তো কিছু করছি না—সে হয় না।

কুমুদ একটু হাসে।

জীবন বলে, আর চিকিৎসার দরকার হবে না। আমার রোগ আরাম হয়ে গেছে।

মীমাংসা

রাত ন'টার সময় গম্ভীর চিন্তিত মুখে পঙ্কজ বাড়ি ফেরে।

আজ আর কাগজের আফিসে বসে থাকতে ইচ্ছা হল না। এত আশা করে বেরিয়েছিল যে টাকার ব্যবস্থা বোধহয় হয়ে যাবে, সম্ভব হবে সঙ্কট কাটিয়ে উঠে কাগজটা চালু রাখা।

ভূদেবের মুখ দেখেই সে অনুমান করেছিল, আশা তার পূর্ণ হবে না। টাকার জন্য ভূদেবের যে চেষ্টা সফল হবে মনে হচ্ছিল, সেটা নিশ্চয় ভেস্তে গেছে!

ভূদেব অবশ্য প্রথমেই বলেছিল, এ পার্টি টাকা দিতে রাজি আছে। ভূদেবের মুখ আর বলার ভঙ্গি দেখে তবু পঙ্কজ আশা করতে ভরসা পায়নি।

ভূদেবের পরের কথায় জানা গেল যে, তার আশঙ্কাই সত্য। ঈশ্বরলাল টাকা দিতে রাজি আছে, কিন্তু কেবল তাদের সর্তে নয় আরও একটা সর্ত সে চাপাতে চায়। কাগজের পলিসি সে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করবে।

এই সর্তে আর টাকা নেওয়া যায় কি করে। আজ প্রায় তিন বছর যে নীতি অনুসরণ করে তারা দুই বন্ধু প্রাণপণ চেষ্টায় কাগজটা চালিয়ে এসেছে, সেই নীতিই যদি বদল করতে হয়, তার চেয়ে কাগজ বন্ধ করে দেওয়াই ভাল।

তার মুখ দেখে ছোট বোন কল্যাণী একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, টাকার ব্যবস্থা হল না দাদা?

—নাঃ। দেশের স্বার্থের বদলে ওদের স্বার্থ দেখবার পলিসি নিলে টাকা দেবে।

জামা-কাপড় ছেড়ে স্নান করে পঙ্কজ সবে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে, কল্যাণী বলে, বিভাদি একটা চিঠি দিয়ে গাড়ি পাঠিয়েছে দাদা।

পঙ্কজ খাম খুলে চিঠি পড়ে। দু'লাইন চিঠি—বিভার বড় বিপদ, পঙ্কজ যেন এখুনি একবার যায়।

—বিভাদি কি লিখেছে?

পঙ্কজ চিঠিখানা তার হাতে দেয়। চিঠি পড়ে কল্যাণী বলে, নিশ্চয় গুরুতর কিছু ঘটেছে। নইলে এমনভাবে ডেকে পাঠায়, খোঁড়া মেয়েটার কথা ভাবলে এমন কষ্ট হয়!

পঙ্কজ বাইরে গিয়ে বিভার বাবা নগেনের ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে?

বিপিন বলে, কিছু তো হয়নি। আমায় চিঠি দিয়ে আপনার কাছে আসতে বললেন। আমি কাগজের আপিস হয়ে আসছি। দিদিমণি আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

পঙ্কজ বলে, আজ আমি যেতে পারছি না। দিদিমণিকে গিয়ে বোল, কাল সময় করে যাব।

কল্যাণী যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

—একটা খোঁড়া মেয়ে এমন করে বিপদের কথা লিখে যেতে বলেছে, তুমি যাবে না দাদা?

—কাল গেলেও চলবে। তেমন জরুরী ব্যাপার হলে কি বিপদ সেটা খুলে লিখত।

—চিঠিতে লেখা যায় না, এমন হতে পারে তো! মেয়েদের কত কি হয়।

পঙ্কজ বোনের মুখের ভাব দেখে একটু হেসে বলে, মেয়েরা আবার সামান্য কারণে পাগলও হয়।

খেয়ে উঠে পঙ্কজ সিগারেট টানে, আর তাদের কাগজ বাঁচিয়ে রাখার উপায়ের কথা ভাবে। ভূদেবও টাকা দিয়েছে, খেটেছে কাগজটার পিছনে, কিন্তু তার মতো প্রাণপাত করেনি। কাগজটা তুলে দেবার কথা ভাবলে জীবনটা যেন শূন্য হয়ে যাবে মনে হয়।

কত মানুষের কত টাকা অকেজো হয়ে পড়ে আছে কিন্তু তার কাগজটা চালু রাখার জন্য কিছু টাকা লাগাতে সবাই নারাজ। বিভার বাবা নগেনেরও কত টাকা, খোঁড়া কুৎসিত একটা মেয়ে ছাড়া তার কেউ নেই, কিন্তু কাগজটার জন্য টাকা ধার চাইলে বা কাগজের অংশ কিনে নিতে বললে সে ঘাড় নাড়বে।

ঘুম আসবে না, তবু শুয়ে পড়ার কথা ভাবছে এমন সময় তাকে আশ্চর্য করে দিয়ে বিভা নিজেই এসে হাজির হয়। কষ্টে গাড়ি থেকে নেমে লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভেতরে আসে।

—আপনি তো গেলেন না, আমি নিজেই এলাম!

বয়স হবে তেইশ-চব্বিশ, দুটি পায়ের পাতাই তার দুমড়ানো। মুখখানা লাবণ্যে কমনীয় মনে হতে পারত, কিন্তু অতিরিক্ত লোমের জন্য সব লাবণ্য মাটি হয়ে গেছে।

পঙ্কজ বলে, এতই জরুরী ব্যাপার?

—বিপদে পড়েছি, জরুরী নয়?

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে বিভাদি?

বিভা বলে, তুই পরে শুনিস ভাই। পঙ্কজদার সঙ্গে আমি একটু পরামর্শ করে নিই।

কল্যাণী ভিতরে চলে গেলে বিভা কোন রকম ভূমিকা না করেই সোজাসুজি তার বিপদের কথা পাড়ে। বলে, বাবা আবার আমার বিয়ের ব্যবস্থা করছে। বাবার আপিসেই কাজ করে, আপনি বোধহয় চেনেন—নাম হল রমেশ সরকার।

পঙ্কজ বলে চিনি। ছেলেটির স্বভাব ভাল।

বিভা ফুঁসে উঠে, ছাই ভাল! টাকার লোভে বড়লোকের খোঁড়া কুৎসিত মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে, সে আবার ভাল! এদের চেয়ে হীন অমানুষ আর হয়?

রাগ সামলে বিভা কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে, আপনি আমায় বাঁচান পঙ্কজদা। কালকেই বোধ হয় আশীর্বাদ করতে আসবে।

—নগেনবাবুকে জোর করে বল না তোমার অনিচ্ছার কথা?

বিভা একটু হতাশার হাসি হাসে।

—বলতে বাকি রেখেছি নাকি? রেগে কেঁদে কতরকমভাবে কতবার বলেছি। বাবা আমার সব কথা শোনে, বিয়ের ব্যাপারে শুনবে না। আপনিই তো বল্লেন ছেলেটার স্বভাব ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, দেখতে শুনতে ভাল— এ সুযোগ বাবা কিছুতেই ছাড়বে না।

একটু থেকে বিভা মুখ বাঁকিয়ে বলে, বাবার কি হয়েছে আমি জানি। বাবার মনে ভয়ানক আতঙ্ক—বয়স হয়েছে, আমি পাছে কিছু করে বসি। বিয়ে হলে আমার সাধ-আহ্লাদও মিটবে, আবার কিছু যদি করেও বসি আসবে যাবে না।

বিভা তীব্র জ্বালাভরা হাসি হাসে।

—ভাল ছেলে কিনে আনবে তবু আমি বিয়ে করতে চাই না, এতে আরও বেশী ভয় হয়েছে বাবার। নিশ্চয় কিছু গোলমাল আছে ভেতরে। আমায় যে বিয়ে করবে, সে টাকার জন্যই করবে, এ রকম লোকের কথা ভাবলেও যে আমার ঘেন্না হয়, গা ঘিন ঘিন করে, বাবা এটা বুঝবে না।

পঙ্কজ বলে, কি করে বুঝবেন? উনি তো জানেন টাকার জন্যই মানুষ সব করে। তুমিও বুঝতে না, কেনা বর পেয়ে খুশীই হতে, কলেজে পড়ে পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশে তোমার মাথাটা বিগড়ে গেছে।

—শুধু সেজন্য নয়। আপনার কাছে পড়ার জন্যেও। আপনার কাছেই শিখেছি, খোঁড়া হলে কুৎসিত হলেই কারো জীবন ব্যর্থ হয় না, জীবনটা সার্থক করার, সুখী হবার অনেক উপায় আছে।

পঙ্কজ খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, শিখেছো অনেক কিছু, শুধু মনের জোরটা শিখতে পারনি। পারলে এরকম পাগলের মতো ছুটে আসতে হত না।

বিভা নীরবে চেয়ে থাকে।

পঙ্কজ বলে, এই বয়সে তোমার মতো মেয়ের বিয়ে জোর করে কোন বাবা দিতে পারে? এদিকে বিয়েটাকে বলছ ভয়ানক বিপদ, বিয়ে হলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে— অথচ সেটা ঠেকাবার জন্য একটু কাঁদা-কাটার বেশী কিছু করতে পার না। বিপদ কঠিন হলে কঠিন ব্যবস্থা করতে হবে না?

বিভা চেয়েই থাকে।

পঙ্কজ সিগারেট ধরায়। বিভা লক্ষ্য করছিল আজ সে ঘন ঘন সিগারেট ধরাচ্ছে।

—বাবাকে জানিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও যে বিয়ে তুমি কিছুতেই করবে না, মরে গেলেও নয়। সে জন্য যা করা দরকার করতে প্রস্তুত হও।

—কি করব?

পঙ্কজ এবার হাসে।

—এখনও জিজ্ঞেস করছ কি করবে? কত কি করার আছে। কিছুদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ি কিম্বা হোটেলে গিয়ে থাকবে। নগেনবাবু যতক্ষণ না কথা দেবেন যে, তোমার বিয়ের চেষ্টা করবেন না, বাড়ি ফিরতে রাজি হবে না।

ও!

—তুমি সত্যি বিয়ে করবে না, এটা টের পেলে কি আর নগেনবাবু চেষ্টা করবেন? কিন্তু তোমাকেই শক্ত হয়ে সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে তো ওঁকে।

বিভা বলে, বুঝেছি। ভাগ্যে আপনার কাছে এসেছিলাম!

ভিতরে গিয়ে বিভা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে। পঙ্কজের মার প্রশ্নের জবাবে জানায় সে খেয়ে এসেছে।

কল্যাণীর কাছে পঙ্কজের কাগজের সমস্যার কথা শুনে আপসোস করে বলে, ইস! বাবা যদি একটু কম কৃপণ হত! কাগজটাগজের ব্যাপার বোঝে না কিনা, এদিকে টাকা লাগাতে তাই ভয় পায়।

একটু আনমনা মনে হয় বিভাকে। মেয়েদের খাওয়া হয়ে যাবার পরেও সে উঠবার নাম করে না।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে কল্যাণীকে বলে, তুই কোন বিছানায় ঘুমাস ভাই?

কল্যাণী তার বিছানা দেখিয়ে দিলে, সে একেবারে শুয়ে পড়ে।

বলে, আমি আজ তোর কাছে ঘুমাবো। ড্রাইভারকে বলে আয় তো গাড়ি নিয়ে চলে যাক। বলিস কালকেও গাড়ি নিয়ে আসবার দরকার নেই।

কল্যাণী খুশী হয়ে বলে, তুমি থাকবে আমাদের বাড়ি? কি ভাগ্যি!

—কার ভাগ্যি সে তুই বুঝবি না!

ঘণ্টাখানেক পরে গাড়ি আবার ফিরে আসে, নগেনকে নিয়ে।

অন্য ঘরের আলো নিভে গিয়েছিল, আলো জ্বলছিল শুধু পঙ্কজের ঘরে। সে বাইরে গিয়ে দরজা খুলে নগেনকে ভিতরে আনতে আনতে অন্য ঘরের আলোও জ্বলে ওঠে।

নগেন রেগেছে টের পাওয়া যায়।

পঙ্কজকে সে বলে, কি বুদ্ধি মেয়েটার! কাল সকালে আশীর্বাদ করতে আসবে, আজ রাত্রে ও এখানে থেকে গেল। আবার বলে দিয়েছে, কালকেও গাড়ি আনবার দরকার নেই।

পঙ্কজ বলে, বিভা কল্যাণীর সঙ্গে শুয়েছে। আপনি ও ঘরেই চলুন।

কল্যাণী আর বিভা দু'জনেই উঠে বসেছিল।

নগেন ভূমিকা না করেই বলে, কাল সকালে আশীর্বাদ হ'বে, তুই এখানে থেকে গেলি কিরকম?

বিভা বলে, কাল আশীর্বাদ বলেই থেকে গেলাম।

নগেন প্রাণপণে নিজেকে সংযত রেখে বলে, পাগলামি কোরো না। আমার সঙ্গে ফিরে চলো। তোমার মা ওদিকে উতলা হয়ে আছেন।

বিভা বলে, আমি যাব না। তুমি বুঝতে পারছ না। আমি ছেলেমানুষ নই, ছেলেমানুষি করেও তোমায় বারণ করিনি। বলছি আমার বিয়েটিয়ে হতে পারে না, আমি মরে গেলেও হ'তে দেব না, তুমি কিছুতে শুনবে না আমার কথা। অগত্যা কি করি, বাড়িই ছাড়তে হল আমাকে।

নগেন বাক্যহারা হ'য়ে থাকে।

বিভা বলে, তুমি যদি রাগ করে আমায় ত্যাগ কর, করবে। আমি নিজের ব্যবস্থা করে নেব। আমি গায়ে বিষ্ঠা মাখতে পারব, কিন্তু তোমার কেনা মানুষকে বিয়ে করতে পারব না।

নগেন রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

বিভা বলে, হলে কি করব? আমার মাথা নিয়েই চলতে হবে তো আমাকে।

রাগারাগি করে নরম হয়ে বুঝিয়ে অনেকক্ষণ মেয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে নগেনকে অগত্যা ফিরেই যেতে হয়।

বিভার ঘুম আসে না। কল্যাণীরও নয়।

বিভা বলে, আমার নয় মাথা গরম হয়েছে, বুক ধড়ফড় করছে, ঘুম আসছে না, তোর কি হল?

কল্যাণী কাতরভাবে বলে, মাঝ রাতে দাদা ছাতে পায়চারি করছে। কি না করেছে দাদা কাগজটার জন্য। এমন একটা খাঁটী কাগজ, টাকার অভাবে তুলে দিতে হবে।

বিভা বলে, সত্যি। ভাবলেও কষ্ট হয়।

সকালে চা-খাবার সময় পঙ্কজের মুখে রাত-জাগার ছাপটা স্পষ্টই দেখা যায় কিন্তু দুশ্চিন্তার ছাপটা যেন কম মনে হয়।

চা খাওয়া হলে পঙ্কজ বলে, কল্যাণী, তুই একটু ও-ঘরে যা তো, বিভার সঙ্গে আমার একটু দরকারী কথা আছে।

কল্যাণী চলে গেলে পঙ্কজ বলে, আমিও এক বিপদে পড়েছি জান তো? কাগজটা নিয়ে।

বিভা বলে, শুনলাম। ঠিক এই সময়টা বাবার সঙ্গে ঝগড়া হ'য়ে গেল, নইলে অন্তত চেষ্টা করে দেখতাম!

পঙ্কজ শান্তভাবে বলে, তুমি আমার কাগজটাকে বাঁচাতে পারো।

বিভা আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে।

পঙ্কজ বলে, টাকার জন্যে তোমায় যদি বিয়ে করতে দাও।

বিভার মুখ হাঁ হয়ে যায়। সে কথা বলতে পারে না।

পঙ্কজ বলে, তোমার জন্য ঠিক প্রেম হয়তো আমার নেই, কোনদিন কোন মেয়ের

জন্য থাকবে বলেও মনে হয় না। তবে তোমাকে আমি স্নেহ করি। এই মমতা তুমি পাবে।

বিভা কাতরভাবে বলে, আপনি আমায় বিয়ে করবেন?

—দোষ কি? তোমার বাবা খুশী হবেন।

—কিন্তু আপনার যে খোঁড়া-কুচ্ছিত বৌ হবে।

পঙ্কজ বলে, তা হোক না। কাগজটা বাঁচাতে পারলে খোঁড়া বৌয়ে আমার আপত্তি নেই।

বিভা মাথা নত করে থাকে।

পঙ্কজ ধীরে ধীরে বলে, তবে একটা খুব গুরুতর কথা আছে। আমার ওপরে তোমার ঘেন্না জন্মাবে কিনা।

বিভা মাথা তুলে বলে, না। টাকার লোভ তো আপনার নয়, কাগজটার জন্য, আদর্শের জন্য। আমার বরং—

কথাটা তার গলায় আটকে যায়।

—তোমার বরং?

আমার বরং ভক্তিই বেড়ে যাবে।

বিভা একটু হাসে।

সুবালা

ভোরে অঘোরদের বাড়ি দুধ আনতে গিয়ে রোজই পঙ্কজ বৌটিকে দেখতে পায়। অঘোরদের বাড়তি ফেলনা ছোট চালা ঘরটা কিছুদিন হল ভাড়া নিয়েছে—দুমাসের ভাড়া আগাম দিয়ে। কোলে একটি বছরখানেকের ছেলে। সঙ্গে থাকে কেবল বুড়ি দিদিমা।

বুড়িকে প্রথমদিন দেখে পঙ্কজ শিউরে উঠেছিল। খড়িতোলা কালচে লোল চামড়ায় ঢাকা একটা যেন কঙ্কাল, বয়সের ভারে সে জীবন্ত কঙ্কালটা আবার বাঁকা হয়ে গেছে। মাথায় ধোঁয়াটে রঙের জট, ছানি পড়া চোখ। এই বয়সে এই দেহের ভার বয়ে সে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে নতুন আস্তানার খোঁজে! হয়তো এই যুবতী নাতনিটার জন্য অথবা যে কটা দিন বেঁচে থাকবে সেখানে তাকে দেখবার কেউ নেই বলে।

সুবালা সায় দিয়ে বলে, হ। আত্মীয়-কুটুম যাগো ভরসায় ছিলাম, তারা পলাইয়া আইলো, আমরাও লগে আইলাম। করুম কি।

নদীর দেশের মেয়ে, সুবালার গায়ের মেটে রঙটা যেন পলি পড়া নদীর বুকের ভিজা চরের মতো সরস আর মসৃণ। লাবণ্য যেন চোখ জুড়িয়ে দেয়। গরিবের মেয়ে গরিবের বৌয়ের দেহে এ লাবণ্য কোথা থেকে আসে, কিসে সম্ভব হয়, পঙ্কজ তা জানে। সেও ওই নদীর দেশেরই মানুষ।

সারা বছর ভাত হয়তো জুটত না পেট ভরে। কিন্তু পাড়-ঘেঁষা নদীর জলে খালে ডোবায় মেয়েরাও কুঁড়ো জালে ধরতে পারত কুচো মাছ, অনেক রকম জলচর জীবের ছানা আর কাউটা কাছিমের ডিম। বিষহীন মোটা মোটা জলের সাপ একটা দুটো। পেঁয়াজ আর খানিকটা লঙ্কাবাটা দিয়ে রাঁধলে মাছ মাংসের শোক ভোলা যেত। কলমী পলাশ কচু ইত্যাদি অনেক রকম শাকপাতা যতখুশি কুড়িয়ে আনলেই চলত। ঘরের চালায় ফলত লাউ কুমড়া। বিনা পয়সায় কিম্বা সামান্য দামে মিলত কয়েক রকম ফল।

দু'এক মুঠো চাল যোগাড় হলেই চালিয়ে নেওয়া যেত পুরানো আদিম উপায়ে শরীর পোষণ।

একখানা পুরানো শাড়ি আলগা করে গায়ে জড়ানো থাকে। ছেলেকে মাই দিয়ে দাওয়ায় শুইয়ে ঘর ঝাঁট দেয়, গামছা পরে বাসন নিয়ে ঘাটে যায়, গা ধুয়ে বালতি আর মেটে কলসীতে জল আনে দু'তিন দফায়।

একটু কম মনে হয় তার লজ্জাবোধ।

দু'তিন জন মানুষ দুধ নিতে এসে দাঁড়িয়েছে, দুধ দুইতে দুইতে অঘোর তার

দিকে তাকাচ্ছে, এটা যেন সে খেয়ালও করে না। খেয়াল করলেও বোধ হয় গ্রাহ্য করে না।

পঙ্কজ জানে, গ্রাম কেন, শহরতলীতেও যে সব এলাকায় মেয়েদের খোলা ডোবা পুকুরই একমাত্র অবলম্বন, শহরের মেয়েদের মতো শ্লীলতা বজায় রেখে চলা তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়; সেটা নিয়মও নয়। অবস্থার সঙ্গে মানিয়েই তো চালচলন হবে মানুষের। কিন্তু এই বয়সে এতটা শিথিলতাও আবার নিয়ম নয়। ডুমুরের মতো দু'তিনটি ছেলে-মেয়ে হলে, বয়স আর একটু বেশী হলে, আশে পাশে চালা ঘরগুলির পুরানো বাসিন্দা ও উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সুবালার চালচলনও চমৎকার মানিয়ে যেত।

ছেলে কোলে সুবালা দাওয়ায় বসলে তার পাকা গিন্নি পাকা মায়ের মতো বসার ভঙ্গি দেখে দেখে, মুখের উদাস নির্বিকার ভাব দেখে, পঙ্কজের অস্বস্তি কেটে যায়।

অঘোরের দুধ দোয়া আর ডুমুরের পোয়া পোয়া দুধ মেপে দেওয়া দেখতে দেখতে সে হয়তো জগৎ সংসার ভুলে গিয়ে ভাবছে, ছেলেটার জন্য এক ফোঁটা দুধ কিনতে পারলে ভাল হত।

দুধ দোয় অঘোর, দুধ মেপে দেয় তার বৌ ডুমুর।

অঘোরকে সে একেবারেই বিশ্বাস করে না। এক টাকা সের সামনে দোয়া দুধ, শ্যামবাবুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে সে মাপার কায়দায় তাকে একপো দেড়পো করে দুধ বেশী দিয়ে দিত। মাসে দশ বার টাকার দুধ বেশী দিয়ে খুশী থাকত চার পাঁচটা টাকা পেয়ে। যা পায় তাই তার লাভ!

কে জানে অন্য বাবুদের সঙ্গেও এ রকম বন্দোবস্ত ছিল কি না। টের পাবার পর ডুমুর আজকাল দুধ দোয়ার সময় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, নিজে দুধ মাপে। যে মন্দ মানুষ বৌয়ের ঘাড়ে খায় আর চোরাবাজারী একটা বজ্জাত লোকের ফুট্ ফরমাস খেটে হাত খরচার পয়সা কামায়, এমনি নেমকহারামই সে বোধহয় হয়।

ভদ্দরলোকদেরও বলিহারি যাই, ডুমুর বলে ঝংকার দিয়ে, সোয়ামীকে দিয়ে ইস্তিরির ঘরে চুরি করতে পিবিত্তিও হয়।

অঘোরের সামনেই সে বলে।

অঘোর কখনো মুখ বাঁকায়, কখনো মুচকে একটু হাসে।

তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ আর রাঁধাবাড়া সেরে মুখে দুটি গুঁজে ছেলে কোলে কোথায় যেন চলে যায় সুবালা সারাদিনের মতো। বুড়ি দিদিমা একলাই ঘরে পড়ে থাকে।

পঙ্কজ আজ তাড়াতাড়ি বার হয়েছিল, পথে একটা কাজ সেরে আপিস যাবে।

সুবালাও ছেলে কোলে বাসের জন্য কাছে এসে দাঁড়ায়।

কই যাইবা?

কামে যামু। কাম না করলে খামু কি?

সেই শাড়িখানাই তেমনি আলগা করে পরা, বোধহয় আর কাপড় নেই। পথে

বার হবার জন্য সিঁথিতে সে বেশী করে সিঁদুর দিয়েছে, কপালে স্পষ্ট করে বড় ফোঁটা এঁকেছে।

পঙ্কজ সহানুভূতির সঙ্গে সায় দিয়ে বলে, তাতো বটেই। তোমার সোয়ামী কই?

সুবালা মুখ বাঁকিয়ে বলে, কে জানে উপায়ের ধান্ধায় কোন্ চুলায় গেছে।

খানিক চুপ করে থেকে বাস আসছে দেখে পঙ্কজ হঠাৎ প্রশ্ন করে তুমি কি কাম কর?

সুবালা বলে, করি এটা ওটা যা পাই।

টের পাওয়া যায়, কি কাজ করে স্পষ্ট জানাতে সে নারাজ।

পুরো আপিস টাইমের মতো ভিড় না হলেও বাসে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। পঙ্কজকেও দাঁড়াতে হয়। সুবালা বসে লেডিজ সিটে।

বসে পঙ্কজকে চমৎকৃত করে দিয়ে বুকের কাপড় সরিয়ে ছেলের মুখে মাই গুঁজে দেয়। গাড়ি বোঝাই পুরুষের মধ্যে নয়, সে যেন বসে আছে নির্জন ঘরের কোণে, এমনি সহজ নির্বিকারভাবে মুখ তুলে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

পঙ্কজ বুঝতে পারে এটা তার পুরুষদের তুচ্ছ করা, অবজ্ঞা করা নয়। এতগুলি পুরুষের দৃষ্টিপাত তার কাছে অতি সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার, সূর্য যেমন বাসের জানালা দিয়ে তার গায়ে রোদ ফেলছে আলো ফেলছে, তেমনি সাধারণ ব্যাপার—এজন্য বিব্রত বা বিচলিত হবার কোনও কারণ তার নেই।

বুক ফুলে ওঠে পঙ্কজের। এ তো গেঁয়োমি, অসভ্যতা বা অশ্লীলতা নয়, এ যে বিদ্রোহ! তার দেশের এই কাঁচ মা-টি যেন ইংরেজী মার্কিনী নোংরামি ও অশ্লীলতা প্রচারের বিরুদ্ধে বাস্তব কার্যকরী প্রতিবাদ—বিদ্রোহের একটি জীবন্ত প্রতীক।

তোমরা সিনেমায় পারো, রংবেরং সখের পত্রিকায় পাবো, গোপন পুস্তিকা, গোপন ফটোতে পারো—দাম নিতে পারো, স্বার্থের খাতিরে পারো।

আমি মা এই চিন্তায় নিজের যৌবন ভুলে গিয়ে সন্তানকে গায়ের রক্ত জল করা মধু পান করানোর প্রয়োজন—পারো কি, এমন সহজ স্বাভাবিক জোরের সঙ্গে তেজের সঙ্গে?

সুবালা কি কাজ করে সেদিনই যে নিজের চোখে দেখে জেনে যাবে পঙ্কজ কল্পনাও করেনি।

নিজের কাজে সে নেমে যায় আগেই। কাজ সেরে আবার বাসে ওঠে যেতে যেতে বড় একটা চৌমাথার কাছে বাস দাঁড়ালে সে দেখতে পায় পাশের রাস্তায় চৌমাথার কিছু তফাতে ফুটপাথে বসে গামছা বিছিয়ে ছেলেকে সামনে ধরে সুবালা ভিক্ষা করছে।

পথে ঘাটে দেখা হলে বাড়িতে এলে আশে পাশের মেয়েরাও জানতে চায় সারাদিন সুবালা কোথায় থাকে, কি করে। কিভাবে সে দিন চালাচ্ছে জানবার জন্য উদ্বাস্তু অসহায়া মেয়েদের দেখা যায় আরও বেশী কৌতূহল।

রুগ্ন স্বামী আর তিনটি বাচ্চা নিয়ে বিব্রত ইছামতী প্রায় ধন্না দেয় তার কাছে।

বলে চাউল আইনা বেইচা পারি না আর টানতে। আনার খরচ, ঘুষ—মাঝে মাঝে চাউল কাইড়াও লয়। আমারে কইয়া দে—তুই যা করিস আমিও তাই করুম।

সুবালা বলে, তুমি পারবা না দিদি, তাছাড়া আমার কামে লাভও বেশী নাই।

ইছামতী বাঁকা চোখে তাকায়।—পারুম না ক্যান? লাভ হইব না ক্যান? বয়স নাই চেহারা নাই বইলা?

সুবালা দুঃখের হাসি হাসে।—দ্যাখো না সারাডা দিন বাইরে কাটাই? সোয়ামীরে ফেইলা পোলাপানগো ফেইলা তুমি পারবা? আমি ভিক্ষা করি, গতর খাটাই, যেমন সুবিধা। তুমি যা নিয়া আছ তাই নিয়া থাক।

ডুমুরও কৌতূহল প্রকাশ করে। বলে, সত্যি, কোথায় যাও, কি কর সারাডা দিন? আমায় বললে দোষ নেই। মেয়েছেলে বিপাকে পড়েছে, যে ভাবে পার রোজগার করবে—বাছবিচার থাকলে চলবে কেন? তুমি বদ কাজ কর জানলেও আমি তোমার নিন্দা করব না ভাই।

বলে, বে-রোজগেরে পুরুষগুলি পাজীর একশেষ। নইলে এমনভাবে তোমার দায় এড়িয়ে পালায়!

সুবালা বলে, সে ক্যান পালাইবো? পলাইয়া আইছি তো আমি! কাম নাই উপায় নাই, মাথা গেছে খারাপ হইয়া—যত চোট আমার উপরে। তুমি তো দিদি সুখেই আছ, সোয়ামী কত খাতির কইরা মন যোগাইয়া চলে।

ডুমুর বলে, খেতে পরতে দিচ্ছি, খাতির করবে না, মন যোগাবে না?

সুবালা মাথা নাড়ে। আমিও খাওয়াইতাম ভিক্ষা কইরা। জ্বালা য্যান বেশি হইত, পুরুষ হইয়া আমার রোজগার খাইব! আরও বেশী ঝাল ঝাড়ত আমার উপরে।

ডুমুর একটু আশ্চর্য হয়ে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বলে, অ! মানুষটা তবে অভিমানী? সেটা খারাপ নয়। অবস্থা পাল্টালেই এসব মানুষের মাথা আবার ঠিক হয়ে যায়।

মুখ বাঁকিয়ে বলে, পা-চাটা নরম চোর ছ্যাঁচোরের চেয়ে তো ভাল।

তারপর একদিন যথারীতি সকাল বেলা ছেলে নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সুবালা অসময়ে দুপুরবেলা ফিরে আসে। দেখা যায়, কোলে তার ছেলে নেই, মুখ থম্ থম্ করছে।

ডুমুর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি হল? ছেলে কই?

নিয়া গেছে।

নিয়া গেছে? কে নিয়ে গেল?

যার ছেলে সে-ই নিছে।

না, হরেন গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিয়ে যায়নি। সুবালা কি তা হলে ছেড়ে কথা কইত? এতদিন শহরের পথে পথে ঘুরছে সে কি আর জানে না মেয়েদের জোর

কিসে? চেঁচিয়ে লোক জড়ো করলে ছেলে কেড়ে নিয়ে পালাবার সাধ্য হত না হরেনের। হয়তো থানা পুলিস হত, সে তো পরের কথা।

বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ হঠাৎ কোথা থেকে হরেন এসে হাজির। শান্তভাবে নরমভাবে কথা বলছিল, ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করছিল। তারপর বলছিল যে এই দুপুর রোদে ছেলেটা ফুটপাতেই পড়ে রয়েছে, ওর গলা শুকিয়ে গেছে বোধ হয়। কাছের ওই খাবারের দোকান থেকে দুধ খাইয়ে আনবে।

ডুমুর বলে, বোকা মেয়ে সঙ্গে গেলে না?

সুবালা বলে, গেলাম না? গেলাম তো।

দুধ খাওয়াবে বলেই ছেলেকে নিয়ে হরেন চলতে আরম্ভ করেছিল; কাপড়টা গুটিয়ে পয়সাগুলি আঁচলে বেঁধে নিতে একটু পিছিয়ে পড়েছিল সুবালা। তার কি ধারণা ছিল হরেনের কি মতলব।

কোন গলিতে ঢুকে কোন দিক দিয়ে কোথায় যে চলে গেল হরেন। পাগলিনীর মতো চারিদিকে ছুটাছুটি করে লোককে জিজ্ঞাসা করে কোন আর হদিস পেল না সুবালা।

বুড়ী ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করে, পোলারে কই থুইয়া আইলি?

কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে কথা না কইলে সে বুঝতে পারে না। সুবালা ছেলের খবর জানাতেই সে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

সুবালা আবার তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে বলে, পোলা মরছে নাকি যে কাঁদ? বাপের লগে পোলা গেছে, কাঁদনের কি? অমঙ্গল ডাইকা আইনো না কইলাম!

দেখা যায়, সুবালা আজ কাঁধে ফেলে রাখার বদলে আঁচল গায়ে জড়িয়েছে। বোধহয় শূন্য বুক ঢাকবার জন্য।

কয়েকটা দিন আশায় আশায় সুবালা বার হয়, সেইখানে গিয়ে ফুটপাতে কাপড় বিছিয়ে বসে থাকে—যদি মানুষটা ফিরিয়ে এনে দেয় ছেলেকে।

এখনো মাই খায় ছেলে। আজ পর্যন্ত একদিন মাকে ছেড়ে থাকেনি। মার জন্য নিশ্চয় সে ককিয়ে ককিয়ে কাঁদবে! অতটুকু শিশুর কান্না, নিজের ছেলের কান্না কি সহ্য হবে হরেনের?

সহ্য হবে কি অতটুকু বাচ্চাকে সারাদিন সামলে চলার ঝনঝাট?

ডুমুর বলে, পাগল হয়েছ? তাই কখনো পারে? বড়জোর একদিন কি দুদিন। বাপ বাপ বলে তোমার কাছে ফিরিয়ে এনে দেবে।

সারাদিন রাস্তায় অসংখ্য মানুষ চলাচল করে হরেনের জন্য চোখ কান পেতে রাখে সুবালা। দু'এক পয়সা ভিক্ষে তাকে কে' দিচ্ছে না দিচ্ছে, গায়ে পড়ে ভাব করতে চেয়ে কে কি বলছে না বলছে, কোন দিকেই তার মন যায় না।

দিন দশেক পরে হতাশ হয়ে সে বেরোনো বন্ধ করে।

বলে, তবে আর ক্যান ভিক্ষা করুম? এবার থনে গতর খাটাই।

পঙ্কজের স্ত্রীর ছেলেপিলে হবে। আর দু'এক মাস পরে সে একটি রাঁধুনী

রাখার কথা ভাবছিল। সুবালা কাজ খুঁজছে শুনে সে তাকে অবিলম্বে বহাল করতে চায়।

সুবালা বলে, আপনারা বেরাম্ভন, নীচ জাতের রান্না খাইবেন?

পঙ্কজ বলে, রাখো তোমার জাত। কত সুখে আছি তার আবার জাত বিচার!

সুবালা দু'বেলা পঙ্কজের বাড়ি রেঁধে দিয়ে আসে, নিজে ওখানেই খায়। বুড়ী দিদিমার বয়সের কঠিন রোগ, বয়স ঠেকিয়ে ওর বেঁচে থাকার পথ্য তৈরী করে দেওয়ার কোন হাঙ্গামাই নেই। জল ছাড়া প্রায় কিছুই সহ্য হয় না বুড়ীর।

সুবালা ডুমুরকে বলে, আমি ঠিক শোধ নিমু। অন্যোরে দিয়া এই প্যাটে পোলা জন্মাইয়া কোলে করুম।

ডুমুর বলে একশো বার—করিস না কেন? কারো সঙ্গে থাক না—সতীশ, নকুল আরো কটা মানুষ তো ওৎ পেতে বসে আছে। একজনের সঙ্গে ভিড়ে যা, খেটে খেতে হবে না তোকে।

সুবালা বলে, থাকুম—বুড়ীটা মরুক? আরও কাহিল হইয়া পড়ছে, এই জল হাওয়া সয় না। আর কয়দিন? বুড়ী চোখ বুজলেই পুরুষ নিয়া থাকুম।

তারপর আবার একদিন আচমকা হরেন এসে হাজির হয় ডুমুরের বাড়িতে। ছেলেকে উঠানে নামিয়ে দিয়ে বলে, সুবালা নাই?

না।

গেছে কই?

তার গায়ের নতুন সার্ট, পরণের ফরসা ধুতি দেখে ডুমুর হেসে ফেলে। অজানা অচেনা মানুষটা সম্পর্কে তার ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যা হয়নি। অবস্থা একটু বদলাতেই, কোন রকমে দু'টো পয়সা উপায়ের ব্যবস্থা হতেই, মন মেজাজ বদলে গেছে মানুষটার। বৌয়ের আস্তানা খুঁজে বার করে নিজেই হাজির হয়েছে ছেলেকে কোলে নিয়ে!

তার হাসি দেখে ভড়কে গিয়ে হরেন শুধোয়, সুবালা থাকে না এখানে?

ডুমুর বলে, না। সুবালা ওদিকে সতীশ দাসের ঘরে থাকে।

হরেন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে ডুমুর জিজ্ঞাসা করে, আপনি কে হন সুবালার?

হরেন জবাব দেয় না।

তখন ডুমুর বলে, আপনাকে চিনেছি, তাই একটু তামাসা করলাম। সুবালা আছে।

দাওরায় পিঁড়ি পেতে দিয়ে বলে, বসুন, সুবালাকে ডেকে আনছি। সুবালা এক ভদ্দরলোকের বাড়ি রান্না করে।

বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই ডুমুর সুবালাকে ডাকতে যায়।

একলা ফিরে এসে বলে, সুবালা আসছে।

বেলা তখন প্রায় ন'টা। সুবালা আসে না কিন্তু ঘরে যেন বোনের জামাই এসেছে

এমনিভাবে হরেনকে ডুমুর সমাদর করে—অঘোরকে দিয়ে খাবার আনিয়ে চা আনিয়ে খাওয়ায়।

বলে, আপনাকে ঠেঙানো উচিত কিন্তু কি করি। মায়া পড়ে গেছে মেয়েটার ওপরে।

দু'ঘণ্টা পরে পঙ্কজের বাড়ি রান্না খাওয়ার পাট সাঙ্গ করে সুবালা ফিরে আসে।

অঘোর বেরিয়ে গিয়েছিল। ডুমুর বলে, আমিও একটু পাড়া বেড়িয়ে আসি। তোমাদের বোঝাপড়া হোক।

সেমিজের ওপর ডুমুর কোরা শাড়ি পরেছে। সিঁথিতে বা কপালে তার সিঁদুর নেই।

ছেলেকে কোলে নিয়ে সে চুপ-চাপ সামনে বসে থাকে।

হরেন কাতর ভাবে বলে, ওকে একটু মাই দাও।

ধীরে ধীরে সেমিজের বোতাম খুলে সুবালা ছেলের মুখে মাই তুলে দেয়। মাই টানবার চেষ্টা করতে করতে মুখ বাঁকিয়ে বাচ্চাটা একবার কেঁদে ওঠে, তারপর আবার মাই খাবার চেষ্টা করতে গিয়ে কচি দাঁতে প্রাণপণে কামড় বসিয়ে দেয়।

সুবালা বলে, উঃ!

আবার সে ধীরে ধীরে সেমিজের বোতাম এঁটে দেয়।

তার স্তনের দুধ শুকিয়ে গেছে।

হরেন নিজে থেকেই তার কৈফিয়ৎ দেয়, বলে, পোলারে নিয়া তুমি ভিখ্ মাগবা আমি সইতে পারি নাই।

সুবালা ধীরে ধীরে বলে, ভিখ না মাগলে পোলারে বা আমারে বাঁচা দেখতা না।

হরেন বলে, তা বুঝি না? তবু গাও য্যান জ্বইলা যাইত। কিন্তু পোলারে নিয়া গিয়া কি ফ্যাসাদে পড়লাম কি কমু তোমারে। রাঙামাসী মাই দিল কয়দিন—

অ! রাঙামাসী মাই দিছে!

কয়দিন মাই দিয়া কয় কি, আমি পারুম না। আমার মাইয়ারে মাইরা তোমার পোলারে দুধ দিতে পারুম না। আমারে মাছ ভাত খাওয়াও পেট ভইরা তবে পারুম। আমি মানুষ না, ছাল খাইয়া দুইটারে মাই দিমু? তারপর সেইখানে তোমারে খুঁজতে গেছিলাম।

গেছিলা?

হ। দিন পনর বাদে রাঙামাসী যখন বিগড়াইয়া গেল। তোমারে পাই না, কি বিপদ। মরিয়া হইয়া কিছু পয়সা রোজগারের ব্যবস্থা করলাম।

তার সার্ট আর ধুতির দিকে চেয়ে সুবালা জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যবস্থা করলা?

হরেন বলে, কইলকাতায় কত উপায় পয়সা রোজগারের। আমরা ক্যান যে বোকার মতো ভিক্ষা করছি আর খয়রাত চাইছি।

ওইটুকু চালার মধ্যেই দীর্ঘকাল পরে ছেলেকে পাশে নিয়ে তারা পাশাপাশি শোয়। বুড়ির ঘরের কোণে পড়ে থাকা না থাকা সমান কথা, চোখেও দ্যাখে না, কানেও শোনে না।

মাঝ রাত্রে পুলিস হানা দিয়ে হরেনকে ধরে নিয়ে যায়। শহরে অজস্র সম্পদ থাক, অন্যের টাকা ছিনিয়ে নিয়ে নতুন সার্ট আর ফর্সা ধুতি পরতে চাইলে চলবে কেন।

অনেক খোঁজাখুঁজি এবং হরেনকে মারপিট করেও টাকাগুলি কিন্তু পুলিস পায় না।

পুলিস হাতকড়া দিয়ে তাকে নিয়ে যায়। যাবার সময় মুখ ফিরিয়ে হরেন বলে, ভিখ মাইগো না। আমাগো অপরাধ নাই, ভিখ মাইগা অপরাধী সাইজো না। তার চেয়ে মরণ ভাল।

অসহযোগী

রমেনের বাবা হর্ষনাথ ধনেশগঞ্জের মস্ত আড়তদার।

বছরখানেক আগে রমেনকে সে তার পিসতুতো ভগ্নীপতি সূর্যপদর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল—ছেলেটাকে একটু শান্তশিষ্ট ভদ্র বানাবার আশায়। রমেন একেবারে মারাত্মক রকম দুরন্ত হয়ে উঠেছিল, কিছুতেই সে তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না। দু'তিনবার কোর্টে পর্যন্ত তাকে দৌড়তে হয়েছিল ছেলের জন্য। শেষে রমেন যখন একদিন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বসুর ছেলেকে মেরে রক্তারক্তি করে দিল, তখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারল যে এ ছেলেকে সামলে চলা তার সামর্থ নয়। এ ছেলে তার সর্বনাশ করবে। যুদ্ধের বাজারে কতভাবে কত কামাচ্ছে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে চটালে রক্ষা আছে!

দামী দামী ভেট নিয়ে তিনি সটান গিয়ে হাজির হল একেবারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে, মার-খাওয়া ছেলেটির জন্যই উপহার রইলো দু'শো টাকার। লুটিয়ে পড়ল মিসেস বসুর পায়ের তলে প্রার্থনা করল রমেনের নিস্তার। ছেলের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবে আগেই ভেবে ঠিক করে ফেলেছিল, তাই বিনা দ্বিধায় জানিয়ে দিল যে, ভয় পেয়ে রমেন কোথায় পালিয়ে গেছে, ফিরে এলে খুঁটিতে বেঁধে তাকে চাবকে লাল করে দেবে।

সেইদিনই রমেনকে নিয়ে সে কলকাতা রওয়ানা হয়ে গেল, ছেলেকে সূর্যপদর জিম্মা করে দেবার জন্য।

রমেনের মা একটু আপত্তি করেছিল!

'উনি স্বদেশী-টদেশী করেন শুনেছি, খোকাকে আবার না বিগড়ে দেন।'

হর্ষনাথ বলেছিল 'স্বদেশী না ছাই! জেলে যেত না স্বদেশী করলে? ওসব টাকা উপায়ের ফিকির। ছেলেদের নিয়ে দলটল সমিতি-টমিতি করে চাঁদা তুলবার জন্যে। মাস্টারিতে কি কারও পেট চলে?'

শহরতলিতে সূর্যপদর বাড়ি। এক রাত্রির বেশী হর্ষনাথ থাকতে পারেনি। তার কত কাজ ধনেশগঞ্জে। সূর্যপদকে সব জানিয়ে অনুরোধ করেছিল, 'ছেলেটাকে তোমার মানুষ করে দিতে হবে ভাই। শুধরে দিতে হবে।'

সূর্যপদ হেসে বলেছিলেন, 'দেব। ছেলেকে তোমার মানুষ করে দেব।'

একটা শর্ত করেছিল সূর্যপদ যে, এক বছরের মধ্যে রমেনকে ধনেশগঞ্জে নেওয়া চলবে না আর সোজাসুজি রমেনকে টাকা পাঠানো চলবে না। হর্ষনাথ রাজি হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

রমেনের খরচের জন্য পঞ্চাশ টাকা দিতে চাইলে সূর্যপদ মোটে পঁচিশ টাকা নিয়েছিল।

বলেছিল, 'আমি গরিব মাস্টার, তোমার ছেলের খরচ চালাবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু পঁচিশ টাকার বেশী খরচ ওর লাগবে না।'

পরের মাসে হর্ষনাথ পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছিল। কয়েকদিন পরে পঁচিশ টাকা ফেরত আসায় খুশি হয়ে রমেনের মাকে বলেছিল, 'না, লোকটা সত্যি ভালো। ছেলেটাকে শুধরে দিতে পারবে বলে মনে হয়।'

এক বছর পরে পুজোর ছুটিতে রমেন বাড়ি এল।

তার পরিবর্তন দেখে প্রথম ক'দিন হর্ষনাথ পরম খুশি। যেমন চেহারায় কথায় ব্যবহারেও তেমনি সে শান্তশিষ্ট-ভদ্র হয়ে এসেছে। উস্কোখুস্কো ঝাঁকড়া চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা কিন্তু তাও আঁচড়ানো, জামা-কাপড় সস্তা-দামের কিন্তু দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—মুখখানা হাসিখুশি,' কথা মিষ্টি, চাল চলন নম্র। গুন্ডার মতো চেহারা নিয়ে সারাদিন সে টো টো করে ঘুরে বেড়াত, খেলা আর মারামারি নিয়ে মেতে থাকত এমনি সে চঞ্চল ছিল এক বছর আগে, অকাজের পর অকাজ না করলে তার স্বস্তি ছিল না। একটা কথা কোনদিন সে কারো শুনত না। সে চাপল্য, শয়তানী আর অবাধ্যতা কোথায় উড়ে গেছে!

সারাদিন বাইরে ঘুরে বেড়ায়, এই যা একটু দোষ। কিন্তু কোন অপকর্মের খবর না পেয়ে এবং বাড়ি ফিরলে ছেলের দেহে বা কাপড় জামায় দুরন্তপনার চিহ্ন না দেখে হর্ষনাথ নিশ্চিন্ত হয়। ভাবে এত দিন পরে দেশে এসেছে, পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে হয়তো আড্ডা দিচ্ছে সাধ মিটিয়ে। ওতে আর কি আসে যায়?

দিন সাতেক পরেই কিন্তু তাঁর মনে খটকা লাগে।

আড়ত থেকে ভাত খেতে বাড়ি ফিরে দ্যাখে কি, শ'তিনেক দুর্ভিক্ষের কাঙালী মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো বাড়ির পাশে ফাঁকা বটগাছ তলায় পাত পেতে ভাত খাচ্ছে, পরিবেশন করছে রমেন আর তারই বয়সী পঁচিশ-ত্রিশটি ছেলে।

দেখে মুখ হাঁ হয়ে যায় হর্ষনাথের।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে ধপাস করে বসে পড়ে ছেলেকে সে ডেকে পাঠায়।

'এ সব কি হচ্ছে?'

রমেন তখন উৎসাহে ফুটছে।-'ওদের খাওয়াচ্ছি বাবা! কত হিসেব করে খাওয়াতে হচ্ছে জানো? কদ্দিন ধরে খায় না, বেশী খেলেই মরবে। তা কি বোঝে ব্যাটারা? সবাই চেঁচাচ্ছে—আরো দাও, আরো দাও! সামলানো দায়।'

'চাল ডাল সব পেলি কোথা?'

মা দিয়েছে।

রমেনের মা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আহা আব্দার ধরেছে, খাওয়াক না। সবাই আশীর্বাদ করছে। ভাল হবে।'

'ভাল হওয়াচ্ছি।'

বাড়ির ভাঁড়ারটাই প্রায় ছোটখাট একটি গুদাম ঘর। আগে হর্ষনাথ রমেনের মার

কাছ থেকে ভাঁড়ারের চাবি সংগ্রহ করলেন। তারপর বটতলার খাওয়া শেষ হলে সকলকে হাঁকিয়ে দিলেন।

আঁধার নেমে এল রমেনের মুখে। সে বলল, 'আমি ওদের সাতদিন রোজ খাওয়ার কথা বলেছি বাবা। তারপর ওরা গাঁয়ে ফিরে যাবে।'

'চুপ কর্, বেয়াদব কোথাকার! সাতদিন ধরে খাওয়াবে! আমাকে ফতুর করার মতলব'

দিন যায়। প্রতিদিন চারিদিকে অসহায় ক্ষুধিতের কান্না হু হু করে বেড়ে যেতে থাকে। রমেন আর হাসে না। খেতে বসে ভাত ছড়িয়ে উঠে যায়। দুধ পড়ে থাকে দুধের বাটিতে, সন্দেশ পিঁপড়েয় খায়।

হর্ষনাথ রাগ করে বলে, 'কি জ্বালা বাপু! কেন হয়েছে কি?

'সবাই না খেয়ে মরে যাবে, তুমি কিছু করবে না বাবা?'

'দিলাম যে কুড়িমণ চাল রিলিফে?'

'কুড়ি মণ! তোমার আড়তে হাজার হাজার মণ চাল রয়েছে। সবাই ছি ছি করছে বাবা। সবাই আমায় ঘেন্না করছে তোমার ছেলে বলে।'

'চুপ কর! বেয়াদব কোথাকার!'

দুদিন রমেনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। রমেনের মা কেঁদে-কেটে অস্থির হয়। মনে মনে যথেষ্ট শঙ্কিত হলেও হর্ষনাথ বাইরে মুখ গম্ভীর করে থাকে। রাগে ভয়ে দুশ্চিন্তায় তাঁর মেজাজটা যায় বিগড়ে। ভাবে, রমেন ফিরলে মেরে তাকে আস্ত রাখবে না। দুদিন পরে রমেন ফিরলে তার চোখের চাউনি দেখে দুটো ধমক দিতেও কিন্তু তাঁর সাহস হয় না। কেমন এক খাপছাড়া অদ্ভুত দৃষ্টিতে রমেন আজকাল তাঁর দিকে তাকাতে আরম্ভ করেছিল, দেখে তাঁর কেমন ভয় ভয় করে।

'কোথা গিয়েছিলি না বলে?'

'অনাথবাবুর সঙ্গে সাতগাঁয়ে।'

অনাথবাবুর সঙ্গে! তার পরম শত্রু অনাথবাবু, এই সেদিন যার জন্য প্রায় হাজার মণ চাল গুদামে তোলার বদলে বাঁধা দামে বিক্রি করে দিতে হয়েছে তাকে!

রমেন আবেদন আর আবদারের সুরে বলে, 'কি অবস্থা হয়েছে তুমি ভাবতে পারবে না বাবা। তুমি এক কাজ কর বাবা। যে দামে কিনেছিলে, এক টাকা লাভ রেখে চাল বেচে দাও। তোমার তো লোকসান হবে না, কত লোক বাঁচবে ভাব দিকি!'

'লোকসান হবে না, না? চল্লিশ টাকার জায়গায় চোদ্দ টাকায় বেচলে লোকসান হবে না, কি হিসেব তুই শিখেছিস্?' কথাটা হর্ষনাথ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

তখন রমেন বলে, 'তা হলে তোমার সব চাল আমি বিলিয়ে দেব, বাবা। আগে থেকে বলে রাখলাম। তোমায় আমি মানুষ খুন করতে দেব না।'

'ছোটমুখে বড় কথা বলিসনি, থাবড়া খাবি।'

'বলে রাখলাম। দেখো।'

ছেলেমানুষের হালকা কথা, কে তা মনে রাখে? আড়তে তার কত লোকজন,

গুদাম তালা বন্ধ, চাইলেই কি আর চাল বিলিয়ে দিতে পারবে রমেন—পঞ্চাশজন বন্ধু আর অনাথবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এলেও নয়।

সেজন্য হর্ষনাথের ভাবনা হল না। ছেলের পাগলামি দেখে মনটা শুধু খারাপ হয়ে গেল। কি কুক্ষণেই ছেলেকে মানুষ হতে পাঠিয়েছিল সূর্যপদর কাছে! এর চেয়ে ছেলেটা শয়তান-গুন্ডা থাকাও ভাল ছিল—বয়স বাড়লে আপনি শুধরে যেত।

দিন কতক পরে হর্ষনাথ ব্যবসার কাজে তিন দিনের জন্য বাইরে গেল। আড়তে বলে গেল, রমেন এসে গোলমাল করলে যেন ভালভাবে শাসন করে দেওয়া হয় আর অনাথ এসে হাঙ্গামা করলে যেন সোজা পুলিস ডেকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। একবার থানাটাও ঘুরে গেল, অনাথ কি ভাবে তার ছেলের মাথা বিগড়ে দেবার চেষ্টা করছে জানিয়ে দেবার জন্য।

পরদিন সকালে আড়তে ও আড়তের সামনে হৈ হৈ কান্ড শুরু হয়ে গেল। নিতাইচরণ আড়তের প্রধান কর্মচারী, বাবু নেই বলে আড়ত খুলতে লোক পাঠিয়ে নিজে একটু বেলা করে হেলতে দুলতে এসে দ্যাখে কি, প্রায় শ'পাঁচেক লোক জমা হয়েছে আড়তের সামনে। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে নিতাইচরণের চক্ষুস্থির! আড়তের যে কোণে হাজার টিন তেল ছিল পরশু পর্যন্ত. সেখানে মেঝেতে তেল আর ময়লার পুরু পাঁকের ওপরেই আড়তের সবাই বসে আছে। তফাতে হর্ষনাথের দুনলা বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রমেন। রমেনের সমবয়সী ছেলেতে আড়ত বোঝাই।

'আসুন নিতাই কাকা। গুদামের চাবিটা দিন তো।'

'চাবি? চাবি কোথা পাব? চাবি তোমার বাবার কাছে।'

'তা হলে ওখানে গিয়ে বসুন। দরজা ভাঙতে হবে।'

রমেনের এক বন্ধু তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তেল গাদায় ধপ্ করে বসিয়ে দেয়।

রমেন বলে, 'এই বন্দুক নিয়ে একজনের ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছিলাম মনে আছে তো? কেউ কোন ফন্দি-ফিকির-চালাকি করবার চেষ্টা করবেন না। সত্যি সত্যি গুলি করব কিন্তু।'

সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে রমেন ওদের পাহারা দেয় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। দেড়শো ছেলে গুদাম থেকে চাল বায় করে বিতরণ করে। কাছে ও দূরের অনেক-গুলি গাঁ থেকে হাজার হাজার লোক আসে চালের জন্য। রমেন গাঁয়ে গাঁয়ে ঢ্যাঁরা পিটিয়ে দিয়েছিল।

পুলিস দুচারজন আসে কিন্তু ঢুকবার চেষ্টা করে না বরং ভিড় আর হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণে কিছু কিছু সাহায্যই করে। ভোরে রমেন নিজে গিয়ে থানায় খবর দিয়ে এসেছিল, তার বাবা আজ চাল বিতরণ করবেন! এই মর্মে বড় বড় কয়েকটা ইস্তাহারও আড়তের বাহিরে টাঙিয়ে রেখেছিল।

সন্ধ্যার সময় চাল শেষ হল।

খবর পেয়ে পরদিনই হর্ষনাথ ফিরে এল। ছেলেকে সামনে রেখে গুম খেয়ে রইল। তার কান্না পাচ্ছিল!

নিরুদ্দেশ

মঞ্জু বাপের বাড়ি যায় না প্রায় তিন বছর। অপমানে অভিমানে যায় না। বছর তিনেক আগে তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে মাসখানেক বাপের বাড়ি থাকতে গিয়েছিল। তার বাবা যোগেশ তাদের জন্য কিছু খরচ চেয়েছিল জামাই বিনয়ের কাছে। বড়ই আহত আর অপমানিত বোধ করেছিল মঞ্জু।

দিনকাল বড়ই খারাপ কিন্তু অবস্থা তো নেহাত খারাপ নয় তার বাপের। যোগেশ নিজে মোটা বেতনে চাকরি করে, মঞ্জুর বড় ভাই অনিলও ভাল চাকরি পেয়েছে। আগের মতো না হলেও মোটামুটি সুখে স্বচ্ছন্দেই তাদের দিন কাটে। মেয়ে বছরে একটা কি দেড়টা মাস থাকতে এলে তার কাছে খরচ চাওয়া!

মুখে কিছুই বলেনি মঞ্জু। ঝগড়াঝাঁটি করেনি। করলে বোধহয় তার অপমান অভিমানের জেরটা তিন বছর গড়াত না।

বিনয়কে সে বলেছিল তুমি কাল পরশুই ফিরে যাও। গিয়ে একশ'টা টাকা বাবাকে পাঠিয়ে দিও। দিন দশেক পরে এসে আমাদের নিয়ে যাবে। লিখবে তোমার অসুবিধা হচ্ছে।

—মোটে দিন দশেক থাকবে? তাহলে টাকা পাঠাব কেন?

--ছি! এত ছোট করো'না মন। বাবাকে নয় একশটা টাকা এমনিই দিলে, অত হিসাব কেন? আর তো দিতে হবে না কোন দিন। এ জীবনে আমি আর বাপের বাড়ি আসব না।

মা-বোন, বাবা-দাদা অনেকবার যেতে লিখেছে, যোগেশ আর অনিল নিতেও এসেছে কয়েকবার—নানা অজুহাতে মঞ্জু যায়নি।

ছোট বোনের বিয়েতে পর্যন্ত যায়নি।

বিনয়ের হাতে এক জোড়া কানের দুল পাঠিয়ে দিয়েছে। বিনয়কে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, এক রাত্রির বেশী সে যেন তার বাপের বাড়িতে বাস না করে, শালীর বিয়ের ফুর্তিতে যেন মেতে না যায়!

বিনয় অবশ্য এক রাত্রিও থাকেনি। চাকরির অজুহাত জানিয়ে সন্ধ্যার পরেই বিদায় নিয়েছে শ্বশুরবাড়ি থেকে।

মাঝে মাঝে আজকাল মনটা কেমন করে ওঠে মঞ্জুর। কয়েকদিনের জন্য বাপের

বাড়ি ঘুরে আসবার সাধটা উত্তাল হয়ে ওঠে। মনে হয়, একটা ফাঁকা ছেলেমানুষি অভিমানের বশে বোকার মতো সে মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য মা-বাপ-ভাই-বোনের সাহচর্যের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে চলেছে—অতি তুচ্ছ অতি নগণ্য একটা মনগড়া কারণে। সে ঝগড়া করেনি। খোলাখুলিভাবে এতটুকু তিক্ততা সৃষ্টি করেনি—তিক্ততা যেটুকু সৃষ্টি হয়েছে সেটা বরং বার বার নেবার চেষ্টা করলেও সে নানা ছুতোয় বাপের বাড়ি যায়নি বলেই।

ও বাড়ির মানুষেরা হয়তো খানিকটা আঁচ করেছে তার মনের কথা, সেবার একমাস দেড়মাস থাকতে গিয়ে বিনয়ের কাছে খরচ চাওয়ার পর মোটে দিন দশেক ম্লান-গম্ভীর মুখে কাটিয়ে ফিরে যাওয়ার পর তিন বছর একদিনের জন্য বাপের বাড়ি পা না দেবার কারণ কতকটা নিশ্চয় আন্দাজ করেছে।

কিন্তু ওটাই যে তার আসল কারণ, তার মন যে বিগড়ে গেছে ওই একটি কারণে, সেটা থেকে গেছে তারই মনের গহনে—ওরা কল্পনাও করতে পারেনি।

বিয়ের পর ছ'সাত বছর যখন-খুশি বাপের বাড়ি গেছে, যতদিন খুশি থেকেছে, খরচ দেবার কথা কেউ বলেনি। এই আগুন লাগা চড়া বাজারে তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সে একমাসের বেশী আরাম করতে গিয়ে থাকলে তার বাবা যদি ভাসা ভাসা ভাবে তাদের জন্য কিছু খরচ চেয়েই থাকে তার স্বামীর কাছে, তাতে তো তার কোনই অপমান ছিল না!

সে আজ অনায়াসে কয়েকদিন বাপের বাড়ি ঘুরে আসতে পারে। সকলে খুশি হবে। কিন্তু কি করে যায় মঞ্জু?

সে রকম আগ্রহের সঙ্গে বাপ-ভাই তো তাকে যেতে বলে না।

ওদেরও তো মান অপমান অভিমান আছে, ধৈর্যের সীমা আছে। বছরের পর বছর ওরা কি তাকে তোষামোদ করে চলবে, দয়া করে বাপের বাড়ি আয়, কদিন থেকে যা? অথচ ওরা বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গে জোরের সঙ্গে নিতে না চাইলে এখন নিজের মান বজায় রেখে যাওয়াও সম্ভব নয় মঞ্জুর পক্ষে। নিজের অপমান অভিমানের কি ফাঁদেই আটক পড়ে গেছে মঞ্জু!

বিনয় বলে, কি হল তোমার? দিন দিন এ রকম মনমরা হয়ে মুষড়ে যাচ্ছ? কাহিল হচ্ছ?

মঞ্জু জোর করে হেসে বলে, দেখেছ নজর করে? ভালবাসা আছে মনে হচ্ছে যেন!

এত সহজে কথাটা এড়িয়ে যাবার সুযোগ বিনয় তাকে দেয় না। বলে, কাহিল নয় খানিকটা হলে, সেটা বুঝতে পারি। মাছ দুধ পাচ্ছ না, রেশনের চাল সইছে না। কিন্তু এত মনমরা হয়ে যাচ্ছ কেন? মেজাজ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কেন? অভাব বাড়ুক, সেজন্য রোগা হও আপত্তি নেই! কিন্তু গাছতলা সার করতে হলেও মন-মেজাজ বিগড়ে যাবার মানুষ তো তুমি নও।

মঞ্জু স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, ধীরে ধীরে ঠোঁট কামড়ায়। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

বিনয় বলে, অ! ব্যাপার গুরুতর, সেটা ধরেছি ঠিক। ব্যাপার কি তাও যেন বুঝতে পারছি মনে হচ্ছে!

মঞ্জু সেলাই করা রঙিন শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে মাথা নাড়ে, এটা বুঝতে পারবে না কিছুতেই।

বিনয় একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, যদি পেরে থাকি? বলব তোমার কি হয়েছে? বাপের বাড়ি যাবার জন্য মন কেমন করছে, খারাপ লাগছে।

মঞ্জু একেবারে থ বনে যায়।

—তুমি কি ম্যাজিক জানো?

—আজ্ঞে না। এটা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। ঝন্ঝাট ঝামেলা এসবেরও তো রীতিনীতি আছে—বেশী দিন চললে ওসব পুরানো হয়ে যায়। দুঃখ-কষ্ট তোমার গা সওয়া হয়ে গেছে—নতুন বড় রকম কোন মুসকিলে পড়নি। বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে একটা ছেলেমানুষি কান্ড করেছিলে, সেটার জের টানতে পারছ না। তা ছাড়া তোমার মুষড়ে পড়ার আর কোন কারণ থাকতে পারে না।

মঞ্জু খানিক চুপ করে থেকে বলে, আমার তো খারাপ লাগছে অনেক দিন থেকেই, অ্যাদ্দিন কিছু বলনি যে?

বিনয় বলে, আমি কি বেশীদিন টের পেয়েছি? কত ঝন্ঝাটে থাকি বুঝতে পার তো!

—বুঝতে পারি না? কি চেহারা হয়েছে তোমার চোখে দেখতে পাই না আমি?

বিনয় একটু হাসে।—দেখতে পাও বলেই তো পনের দিনের ছুটি নিয়েছি। তোমাদের নিয়ে পনের দিন শ্বশুরবাড়ির জামাই আদর ভোগ করে মোটা হয়ে ফিরে আসব।

অন্য অবস্থায় মঞ্জু নিশ্চয় রাগ করত।

তাকে কিছু না জানিয়ে বিনয় তাদের নিয়ে পনের দিন তার বাপের বাড়ি থেকে আসবার সব ঠিক করে ফেলেছে! সে কি এতই তুচ্ছ যে তার সঙ্গে একটু পরামর্শ করাও দরকার মনে করল না!

কিন্তু বিনয়ের ওই একটি কথা তাকে দমিয়ে দেয়। পনের দিন বিনয় তার বাপের বাড়িতে জামাই আদর ভোগ করবে, বিশ্রাম করবে!

শরীর সারানোর কথাটা তামাসা। পনের দিন জামাই আদর কেন? লাট সাহেবী-আদর ভোগ করলেও শরীরটা তার আগের মতো জোরালো হবে না, সেজন্য কয়েক মাসের তোড়জোড় চাই।

তবে বিশ্রাম পাবে। ছুটিটা এখানে কাটালে তার শুধু আপিসের কাজ থেকে বিশ্রাম, অন্য সমস্ত ঝন্ঝাট বজায় থাকবে। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে পনেরটা দিন হাত পা গুটিয়ে শুয়ে বসে কাটাতে পারবে।

মঞ্জু তাই শুধু বলে, এভাবে যেচে যাওয়া কি ঠিক হবে?

বিনয় বলে, কতবার এসে এসে সাধাসাধি করে গেছে ভুলো না। যেচে গেলেই বরং এখন উদারতা দেখানো হবে, তুমি নিজে থেকে ওদের দোষ ক্ষমা করেছ।

সত্যই খুশী হয় মঞ্জুর বাপের বাড়ির মানুষেরা। আদর-যত্নের একেবারে সমারোহ লাগিয়ে দেয়, তিন বছরের পাওনা যেন পুষিয়ে দিতে চায়।

মঞ্জু ভাবে, কি বোকার মতো রাগ করেছিলাম এদের ওপর!

হাসি আনন্দ গল্প-গুজবের মধ্যে দীর্ঘকালের ভুল বোঝাবুঝি যেন শূন্যে মিলিয়ে যায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। একদিনে মঞ্জু যেন সজীব হয়ে ওঠে।

বিনয় নিঃশ্বাস ফেলে গভীর। স্বস্তির নিঃশ্বাস। তাকেও যেন বেশ চাঙ্গা মনে হয়।

মঞ্জু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলে, তুমি সত্যি আমার যে কি উপকারটা করলে! তোমার জন্যই আসা হল, নইলে বাকী জীবনটা হয়তো মিথ্যা রাগ নিয়ে মিছি মিছি জ্বলে পুড়ে কাটত।

বিনয় পরম খুশির সঙ্গে বলে, আমিও বেঁচেছি তোমাদের মিটমাট হয়ে গেল।

মঞ্জু কি জানত তার হাসি আনন্দের জেরটা ঠিক দুটি দিনের বেশী চলবে না।

ঠিক দু'দিন তার পরম শান্তিতে কাটে। তৃতীয় দিন সকালে চা খাবার খেয়ে ফর্সা জামা-কাপড় পরে দু'খানা আধময়লা ধুতি আর একটা পাঞ্জাবি কাগজে পুটলি করে বিনয়কে বেরোতে দেখে মঞ্জু জিজ্ঞাসা করে, কোথা যাচ্ছ?

—জামা-কাপড়টা লণ্ড্রীতে দিয়ে আসি।

—তোমার যাবার কি দরকার?

—যাই, একটু হাঁটাও হবে।

সেই যে হেঁটে বেড়িয়ে আসার উদ্দেশ্যে বিনয় বার হয়, আর সে ফিরে আসে না। বেলা বাড়ার সঙ্গে শুরু হয় বাড়ির লোকের অস্বস্তি-বোধ, ক্রমে ক্রমে সেটা দাঁড়িয়ে যায় দুর্ভাবনায়।

দিন কাটে রাত আসে ভোর হয়, বিনয় ফেরে না। এভাবে কিছুক্ষণের জন্য একটা মানুষ বেরিয়ে গিয়ে বাড়ি না ফিরলে খোঁজ-খবর নেবার জন্য যা কিছু করা দরকার সবই করা হয়।

যোগেশ বলে, অ্যাক্সিডেণ্ট হয়নি, তাহলে জানা যেত।

এইটুকুই সকলের ভরসা। দুর্ঘটনা ঘটে থাকলে তার খবরটা অজানা থাকে না।

মঞ্জু একটা ঢোঁক গেলে। বলে, আমি ফিরে যাই বাবা। আমার এখানে আসা নিয়েই একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। ও বাড়িতে ফিরে গেছে মনে হয়।

অনিল বলে, দাঁড়া, আমি খবর নিয়ে আসছি।

—চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। ওরা থাক্।

অনিলের সঙ্গে মঞ্জু একা ও বাড়িতে যায়। দেখা যায় তাদের ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে দুটি।

অন্য ঘরের ভাড়াটেদের কাছে খবর পাওয়া যায়, বিনয় আগের দিন সকালে ঘণ্টা দু'য়েকের জন্য এসেছিল। বাড়িওয়ালার সঙ্গে বিনয়ের ভাড়া নিয়ে ঝগড়া হয়, বিনয় দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে যাবার পর বাড়িওয়ালা আরেকটা তালা এঁটে দিয়েছে।

বাড়ি ভাড়া নিয়ে ঝগড়া?

মঞ্জু যেন আকাশ থেকে পড়ে!

বাড়িওয়ালা রসিকের বাড়ি কাছেই, মঞ্জুও চেনে। অনিলকে নিয়ে সে ব্যাপার বুঝতে চায়।

অনিল জিজ্ঞাসা করে, আপনি এদের দরজায় তালা লাগিয়েছেন কেন?

রসিক বলে, ভাড়া না মিটিয়ে মালপত্র নিয়ে যাতে পালাতে না পারেন এই জন্যে।

—ক'মাসের ভাড়া বাকি?

—তিন মাস হয়ে গেছে।

মঞ্জু আর অনিল মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। অনিল রসিককে বলে, তালা খুলে দিন। আজকেই সব ভাড়া পাবেন।

ঘরে ঢুকে ধপাস করে খাটে বসে পড়ে মঞ্জু বলে, এ কি রকম ব্যাপার হল? তিন মাস ভাড়া বাকি পড়েছে আমি কিছু জানি না!

অনিল বলে, তুই বোস, আমি ব্যাংক থেকে ঘুরে আসি।

মঞ্জু একটু ভেবে বলে, এক কাজ করো, ব্যাঙ্ক হয়ে ওর আপিসটা ঘুরে এসো। আপিসে খবর নেওয়া উচিত।

রাস্তায় অনিল ট্যাক্সি নেয়। ব্যাংকে টাকা তুলে বিনয়ের আপিসে খবর নিয়ে বাড়ি ফিরতে তার দু'ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। খবর কি? না, পাঁচ মাস আগে আপিস থেকে বিনয় ছাঁটাই হয়েছিল।

মঞ্জু বিহ্বলের মতো বলে, পাঁচ মাস আগে! রোজ নিয়মমতো আপিস করেছে। পনের দিনের ছুটি নিয়েছে বলল।

– তাহলে কি অন্য আপিসে ঢুকেছে?

মঞ্জু ম্লান গম্ভীর মুখে বলে, আমায় না জানিয়ে? ছাঁটাই হবার কথাটা নয় চেপে গিয়েছিল, আরেকটা কাজ পেলে জানাত না? আমি এবার বুঝেছি ব্যাপার। আর উপায় ছিল না, আমার দায় তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে সরে গেছে।

অনিল একটু ভেবে বলে, লজ্জায় সরে গেছে সেটা বুঝতে পারি—কিন্তু এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে কেন? একটা চিঠি লিখে তোকে তো জানিয়ে যেতে পারত।

মঞ্জু বলে, তাও বুঝলে না? পাঁচ মাস টেনেছে, আমায় টের পেতে দেয়নি আশা করেছিল এ ক'দিনের মধ্যে যদি কিছু করতে পারে, সামলে নিতে পারে।

অনিল বলে, আহা, নিরুদ্দেশ হল বলেই আমরা জানতে পারলাম। ওখানে থেকে উপায়ের চেষ্টা করলে আমরা তো টেরও পেতাম না।

মঞ্জু বিষণ্ণ মুখে একটু হাসে।—সে রকম মানুষ কিনা, এ অবস্থায় শ্বশুর বাড়ির অন্ন ধ্বংস করবে। তাহলে আগেই গিয়ে সাহায্যের জন্য হাত পাততো।

পাষণ্ড

বাজার থেকে ফিরে জামাটা খুলে বিপিন খালি গায়ে বাইরের রোয়াকে গিয়ে বসে। বর্ষার গুমোট গরমে হেঁটে বাজার করে আনতে জামাটা ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে সেঁটে গিয়েছিল।

বাইরে এসে গায়ের ঘামটা শুকিয়ে নেবে।

হাত পাখাটা ছিল মেয়ের হাতে। ভিতরে বসলে মেয়ে হাওয়া করতে এগিয়ে আসবে। মেয়ের অযাচিত সেবায় বিপিন আজকাল বড়ই অস্বস্তি বোধ করে।

হতভাগী মেয়ে। আগের জন্মে বোধ হয় অনেক পাপ করেছিল, এ জন্মে তাই এক পাষণ্ডের হাতে পড়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গেল জীবনটা।

মাস শেষ হয়ে এসেছে। বাজার থেকে নামমাত্র মাছটুকু আনাও আজ ক'দিন বন্ধ রয়েছে। মাছ এত ভালবাসে রাধা, মাছ ছাড়া মুখে তার ভাত রোচে না। কোথায় রোজগেরে স্বামীর ঘরে দুবেলা মাছ ভাত খাব, সর্বস্ব খুইয়ে গরিব বাপের ঘাড়ে এসে চেপে শাকপাতা ডাঁটা চিবিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

রাধা আজ প্রায় এক বছরের বেশী বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু মেয়েটার দুর্ভাগ্য আর পাষণ্ড জামাইটার চিন্তা আজও অভ্যস্ত হয়নি বিপিনের। প্রাণের জ্বালা আরও বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন।

মানুষ এমনভাবে বখে যেতে পারে, এত নীচে নামতে পারে অধঃপতনের পথ ধরে? চাকুরে ছেলে ভাল ছেলে বলে কত আশা করে যথাসর্বস্ব খরচ করে মেয়েটাকে ওর হাতে তুলে দিয়েছিল। বিয়ের পরেও তিন-চার বছর টের পাওয়া যায়নি টাকা-পয়সা স্বভাব-চরিত্র কি রেটে সে উৎসন্ন দিতে বসেছে, বিসর্জন দিচ্ছে মনুষ্যত্ব। টের পাবার পর মোটে দুবছর লেগেছে চরম অবস্থায় পেঁছিতে।

স্বাস্থ্য গেছে, চাকরি গেছে, একে একে রাধার গয়না গেছে,—সব চেয়ে দামী যে আত্মীয় বন্ধু দশ জনের বিশ্বাস, তাও গেছে।

সবাই হাল ছেড়েছে, তারা ছাড়তে পারেনি। সকলকে ঠকানো থেকে চুরি-চামারি পর্যন্ত শুরু করেছে জেনেও আশা ছাড়া যায়নি।

হয়তো এ ঝোঁক কেটে যাবে। হয়তো চৈতন্য হবে।

কিন্তু কপালটাই মন্দ যে-মেয়ের, তার স্বামীর বেলা কি আর সে অঘটন ঘটে? যে মানুষ ছিল সে অমানুষ হলেও আবার মানুষ হয়?

রাধার সব যাওয়ার পর তাকে আর ছেলেমেয়ে দুটিকে সমীর আবর্জনার মতো ফেলে গেছে এখানে। তবু তাদের রেহাই দেয়নি।

সে ধূর্ত। সে টের পেয়েছে তাদের এই নিরুপায় আশা—হয়তো সে শুধরে যাবে। এখন তো সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এ পথে কত সুখ। বাড়িতে গেলে আত্মীয় বন্ধু কুকুরের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। বদ উপায়ে কোন রকমে দুটো পয়সা হাতে এলে বদ খেয়ালে দুদিনে তা উড়ে যায়, আবার সম্বল করতে হয় রাস্তা। এবার হয়তো নিজেকে সে সংশোধন করবে।.

যতদিন এই আশাটুকু বজায় রাখা গেছে, মাঝে মাঝে এসে নানা ছুতায় দশ-পনেরোটা টাকা বাগিয়ে নিয়ে গেছে সমীর।

তার এই অমানুষিক নির্লজ্জতাই অবশেষে একেবারে শেষ করে দিয়েছে তাদের শেষ আশাটুকু।

পরের বার সমীর এলে বাইরের দরজা থেকেই তাকে বিদায় করে দিতে হয়েছে।

রাধা নিজেই বলেছেঃ না বাবা, আর প্রশ্রয় দিও না। এখন থেকে মনে কর আমি বিধবা হয়েছি।

আবার আজ সমীরকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে ঘামে ভেজা শরীরটা বিপিনের ঠাণ্ডা অবসন্ন হয়ে আসে।

আরও কদর্য কুৎসিত হয়ে গেছে সমীরের চেহারা। কোটরে বসা চোখে একটা ঝিমানো ভাব, মুখে ঘর্মাক্ত ক্লেদের মতো শ্রান্তি মাখানো।

বিপিন প্রায় কাতর অনুনয়ের সুরে বলে, আবার কি চাও বাবা? মাসের শেষে আমার হাতে একটি পয়সাও নেই—

আগে কোন বার করেনি, আজ সমীর তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

বলে, আজ্ঞে টাকা চাই না। আপনার মেয়ের সঙ্গে একবার দেখা করব। ক'টা দরকারী কথা আছে।

বিপিন ভাবে, কে জানে এ আবার কি নতুন চাল? আবার কি চালাকি খাটাতে এসেছে জামাই?

মুখে বলে, একটু দাঁড়াও, জিজ্ঞেস করে আসি।

জিজ্ঞাসা তাকে করতে হয় না। রাধা সমীরকে জানালা দিয়ে আসতে দেখেছিল, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তার কথাও সব শুনেছে। কবে কখন আবার তার স্বামী তার বাবাকে ঠকাতে আসবে বলে সে কি সারাদিন জানালায় চোখ কান পেতে রাখে?

রাধা বলে, বাবা, বলে দাও, দেখা করে কাজ নেই, আমি দেখা করব না।

কি বলতে চায় একবার শুনলে হত না?

না। কোন লাভ নেই। নতুন কি মতলব করেছে, বানিয়ে বানিয়ে কত রকম কি বলবে, মাথাটা ঘুরে যাবে আবার। আগের বার বলেছিল, আমার লুকানো কিছু নেই? এবার সেটা বাগাতে এসেছে। মিথ্যে অশান্তি করে লাভ নেই বাবা।

চলে যেতে বলব?

তাই বল। নিজেকে বিধবা ভেবেছি, তাই আমার ভাল।

বিপিন অপরাধীর মতো বলে, রাধা তো তোমার সাথে দেখা করবে না, বাবা।

দেখা করবে না?

মাথা নত করে সমীর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। বিপিন টের পায় এ পাশের ও পাশের আর সামনের বাড়ির জানালা দিয়ে অনেকগুলি কৌতূহলী মুখ উঁকি দিচ্ছে।

তার জামাই-এর বিষয় জানতে কারো বাকী নেই। মেয়ে তার এখানে বাড়িতেই আছে, তবু মেয়ের জামাই এসে কিভাবে দরজা থেকে ফিরে যায় দেখবার জন্য তাদের ঔৎসুক্যের সীমা নাই।

এ দৃশ্য সিনেমায় সস্তা গল্পের চেয়ে রসালো।

বিপিনও মাথা হেট করে।

মুখ তুলে সমীর বলে, আমি শুধু পাঁচ মিনিট কথা বলেই চলে যাব।

বিপিনকে জবাব দিতে হয় না।

জানালা দিয়ে অদৃশ্য রাধার স্পষ্ট জবাব আসে, আমি বিধবা হয়েছি। ভুতের সঙ্গে আমি এক মিনিটও কথা বলতে চাই না।

সমীর চোখ তুলে জানালার দিকে চায় কিন্তু রাধাকে দেখতে পায় না।

মাথায় ঝাঁকি দিতে গিয়ে সে যেন নিজের শীর্ণ দেহটাকেও ঝাঁকানি দেয়। ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের কোঁচা তুলে মুখে চাপা দিয়ে কয়েকবার কাসে। তারপর আবার বিপিনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে নীরবে ধীরে ধীরে চলে যায়।

তখনও বিপিনের গায়ের ঘাম শুকোয়নি।

দিন দশেক পরে বিকালের ডাকে একখানা পোস্টকার্ড আসে সমীরের। পেন্সিলের অস্পষ্ট লেখা কিন্তু পড়া যায়।

সে শিয়ালদহ স্টেশনে পড়ে আছে। তার সমস্ত অপরাধ যেন সকলে ক্ষমা করে। সম্ভব হলে ছেলেমেয়ে দুটিকে শেষবারের মতো দেখতে চায়।

এই পরিণতিই ঘটে সমীরদের। সে জাত-বজ্জাত নয়; বেপরোয়া ঔদাসীন্যের সঙ্গে যারা পাপের পথে হাঁটতে শুরু করে মোটর হাকায়, তাদের ধাতুতে সে গড়া নয়। পাপ তার পেশা নয় নেশা। স্বাভাবিক সুস্থ জীবন আয়ত্তে থাকলেও অসুস্থ জীবনের অস্বাভাবিক তীব্রতা উন্মাদনা বিষাক্ত ভয়ানক নেশার মতোই তার মতো মানুষটাকে ধ্বংস করে দেয়।

রাধার মা কেঁদে ফেলে।

রাধার হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল। কিন্তু মুখে সে বলেঃ আঃ, থামো না। এ আরেকটা মিথ্যে চালও তো হতে পারে? ও মানুষটার কোন কথায় বিশ্বাস আছে?

মার কান্না থেমে যায়। সেটা অসম্ভব নয়, ছল চাতুরী মিথ্যা আর প্রতারণার মতলব ভাঁজতে সে যে কত বড় ওস্তাদ তার পরিচয় সমীর ভালভাবেই দিয়েছে বটে।

তবু মেয়ের দিকে চেয়ে মা অবাক হয়ে থাকে। তার সেই মেয়ে রাধা, কারো একটি আঙুল কেটেছে দেখলে যার কান্না আসত, এই চিঠি পেয়েও আজ সে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মতো।

বিপিন আপিস থেকে ফিরে আসে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। চিঠি দেখে তার শুকনো মুখে বিহ্বলতা নেমে আসে।

একবার তো যেতে হয় তা হলে?

তুমি অস্থির হ'য়ো না বাবা। কতবার তোমায় ঠকিয়েছে মনে নেই?

তাই বলে তো মরতে দেওয়া যায় না?

তাই কি যায়? আমরা যাবো চল, কিন্তু তোমায় শক্ত হয়ে থাকতে হবে। আগে বুঝবে সত্যি লিখেছে কি না. তারপর যা হোক ব্যবস্থা করবে। ব্যাকুল হয়ে ওর কোন ফাঁদে আমরা আর পা দেব না।

বিপিনও অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সত্যই পাষণ্ড সমীর, নইলে এমনভাবে কেউ মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করে যে রাস্তার ধাবে মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকার সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখলেও নিজের স্ত্রীর সন্দেহ থেকে যায়—এ তার প্রতারণার আরেকটা কৌশল হওয়া অসম্ভব নয়!

কিন্তু যাই ভাবুক আর যাই বলুক, ভিতরটা যে রাধার কাঁপছে সেটা টের পাওয়া যায়। ঢোক গিলতে গিয়ে দু'একবারের চেষ্টায় গিলতে পারে না। ছোট ছোট নিঃশ্বাস ফেলে, আতঙ্কের চাপে তার শ্বাসযন্ত্র খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে এসেছে।

অসহায় নিরুপায় উদ্বাস্তু মানুষে ভরা শিয়ালদহ স্টেশন। শিশু থেকে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ, ছোট বড় পরিবার, একলা মানুষ। এদের মধ্যে খুঁজে নিতে হবে সমীরকে।

চারিদিকে তাকায় আর রাধা ভাবে সমীরকে নয় নিজের দোষে এখানে এসে শেষ-শয্যা পাততে হয়েছে, এরা কার কাছে কি দোষ করেছিল? কি পাপে এদের এই পরিণাম, এই শাস্তি?

এক প্রান্তে সমীরকে পাওয়া যায়। একটা কাপড়ের পুঁটলী মাথায় দিয়ে সে সতরঞ্চিতে শুয়ে ছিল। তাকে দেখেই তার অবস্থা সম্পর্কে সমস্ত সন্দেহের মীমাংসা হয়ে যায়।

বিপিন নাম ধরে ডাকতে সে অতি কষ্টে চোখ মেলে তাকায়। খানিকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে বিহ্বলের মতো চেয়ে থাকে। গায়ে হাত দিয়ে দেখা যায়, জ্বর নেই।

আমাদের চিনতে পারছ না?

একটু মাথা নেড়ে সমীর সায় দেয়।

অগত্যা বাড়িতেই তাকে আনতে হয়। জামা কাপড় ছাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতে হয়, তারই ছেলেমেয়ের দুধটুকু গরম করে খাইয়ে দিতে হয়, ডেকে আনতে হয় ডাক্তারকে।

ডাক্তার পরীক্ষা করে জানায়, আর কিছু হয়নি, একটু দুর্বল।

একটু? রাধা ঠোঁট কামড়ায়।

রাত বাড়ে। চারিদিক নিঝুম হয়ে আসে।

সমীরকে খাটে শুইয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে রাধা মেঝেতে নিজের শোয়ার ব্যবস্থা করেছে। অনেক দিনের খাট। যখন সে নিজের মেয়েটার মতো ছোট ছিল, মার সঙ্গে এই খাটে শুয়ে ঘুমোত।

রাধার ঘুম আসে না। আকাশ পাতাল ভাবে। কতকাল পরে স্বামীকে ঘরে পেয়েছে, খাটে শুয়ে ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে এপাশ ওপাশ করছে। কিন্তু রাধার মনে আশা নেই, আনন্দ নেই, স্বস্তি নেই। অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তা আর অতীতের স্মৃতি যন্ত্রণার মতোই চাপ দিচ্ছে মাথার মধ্যে।

স্টেশনে পড়ে থাকলে হয়তো মরে যেত। এবারের মতো সমীর মরবে না। কিন্তু কি লাভ হবে তাতে? এমনিভাবে কে কতবার ঠেকিয়ে রাখবে তার অপমৃত্যু? আপনজনের আশ্রয়ে আপনজনের সেবাযত্নে মৃত্যু ঠেকিয়ে সুস্থ হয়ে উঠে সে তো আপন হবে না। অশান্তিতে আবার সে অসহ্য করে তুলবে জীবন। আবার তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে বাড়ি থেকে।

কিছুদিন পরে এই আগামী ঘটনার কথা কল্পনা করে রাধা শিউরে ওঠে।

কেন তাদের খবর দিতে যায় সমীর, শেষ দেখা দেখতে চায় ছেলেমেয়েকে? কেন সে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উদ্বাস্তুদের মধ্যে নীরবে মরে গিয়ে তাদের রেহাই দেয় না?

ঘরের আলোটা জ্বলে উঠায় রাধা চমকে ওঠে। খাট থেকে নেমে সমীর নিজে আলো জেলেছে!

ধড়মড় করে উঠে বসে রাধা। পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে। সন্ধ্যাবেলা যাকে ধরাধরি করে গাড়ি থেকে নামিয়ে খাটে শোয়াতে হয়েছিল, নিজে নিজে সে উঠে দাঁড়িয়েছে সাধারণ সুস্থ মানুষের মতো।

নিজে নিজে সে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খাচ্ছে!

নতুন এক আতঙ্কে বুক কেঁপে যায় রাধার। কে জানে কি মতলব নিয়ে এই কৌশলে সমীর বাড়িতে ঢুকেছে, রাত দুপুরে এখন মতলব হাসিল করবে।

জল খেয়ে সমীর একটু তফাতে বিছানায় বসে। ছেলেমেয়ের গায়ে একবার হাত বুলোয়।

বলেঃ ভেবেছিলাম দু'তিন দিন সময় নিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হব। কিন্তু আর ছলনা ভাল লাগছে না। তোমার সঙ্গে কথা না কয়ে চুপচাপ পড়ে থাকতে পারলাম না।

আবার তুমি আমাদের ঠকালে?

ঠকিয়েছি, কিন্তু এবার আমার মতলব ভাল।

রাধা চুপ করে থাকে।

বিশ্বাস হয় না? না হওয়াই উচিত। কিন্তু কাল তোমার বিশ্বাস হবে। সকালে আমি নিজেই চলে যাব। টাকাও চাইব না, কিছু চুরিও করব না।

এ রকম করার মানে কি?

মানে? মানেও তুমি বিশ্বাস করবে না আজ। আমি জীবনের মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করছি। তোমাদের কাছ থেকে একটু মনের বল জোগাড় করতে এসেছি। মনটা বড় দুর্বল হয়ে গেছে রাধা।

কে জানে এ আবার কোন নাটকের ভূমিকা? রাধা চুপ করে থাকে।

সমীর বলে, অনেকবার পাঁক থেকে উঠবার চেষ্টা করেছি, পারিনি। কিসে কাবু হতাম জানো? হতাশায়। নিজকে যে শুধরে নেব সে তো অল্পে হবে না, দু'দিনে হবে না। যা ভেঙেছি আবার তা গড়তে হলে অনেকদিন ধরে অনেক কষ্ট করতে হবে। এটা ভাবলেই মাথা ঘুরে যেত। ভাবতাম আমার পক্ষে আর তা সম্ভব নয়। উদ্বাস্তুরা আমার হতাশা ভেঙে দিয়েছে।

উদ্বাস্তুরা?

সমীর সায় দেয়।

অনেকদিন থেকে পথে পথে ঘুরছি তো। সারাদিন পয়সা উপায়ের ফন্দি-ফিকির নিয়ে ঘুরি, রাত্রে স্টেশনে ওদের মধ্যে শুয়ে থাকি। দেখলাম কি জান? যথাসর্বস্ব গেছে, ছেলেমেয়ে নিয়ে কি করবে জানা নেই, কিন্তু কি মনের জোর! হাল ছেড়ে ভেসে যাবে না কিছুতেই, একদিন আবার সব ঠিক হবে। যতদিন কষ্ট করতে হয় করবে। কেউ সাহায্য করে ভাল, না করলে নিজেরাই চেষ্টা করবে উঠতে। ওদের সঙ্গে মিশতে মিশতে আমারও মনের মোড় ঘুরে গেছে রাধা। ওরা পারলে আমি কেন পারব না? ওরা হাল ছাড়েনি, আমি কেন ছাড়ব?

মিথ্যাকে সত্যের মতো বলার অভিনয়ে সমীর অনেকবার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। বারবার ঠকেও আবার বিশ্বাস করতে হয়েছে সে কথা। কিন্তু আজ যেন তার কথায় একটা সহজ সরলতার নতুন সুর শোনা যায়।

বহুকাল পরে আবার স্বামীর সঙ্গে মাঝ রাত্রে এক ঘরে বসে কথা বলতে বলতে নতুন আশার ক্ষীণ গুঞ্জনের সুর ওঠে রাধার মনে। কিন্তু—

এ সব কথা চিঠিতে লিখলেই পারতে খোলাখুলি? এ রকম ছলনা করা উচিত হয়নি।

তোমরা কি বিশ্বাস করতে?

প্রথম প্রথম নাই বা করতাম? সত্যি তুমি যদি আবার ভাল হও আমরা কি অবিশ্বাস করব? তোমার সুমতি হোক এটাই তো আমরা মানত করছি দিনরাত।

রাধা চোখ নামায়, আপসোসের সঙ্গে বলে, তোমার মন বাঁকা রয়ে গেছে, তুমি ভাল হবে কি করে?

দমে যাবার বদলে সমীর উৎসাহিত হয়ে বলে, কি আশ্চর্য তুমিও এটা ভেবেছ? খাটে শুয়ে শুয়ে ঠিক এই কথাটা ভাবছিলাম। তোমাদের একটু দেখব। মনের জোর পাব, সেজন্য তোমাদের যে ধাপ্পা দিচ্ছি এটা খেয়ালও হয়নি আগে। কেমন একটা উত্তেজিত অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম, এখানে আসার পর ধীরে ধীরে সেটা কেটে গেল। তখন বুঝতে পারলাম, এটা আমার করা উচিত হয়নি। তাইতো উঠে পড়লাম, তোমার সঙ্গে ছলনার জের টানব না।

ছেলের গায়ে হাত রেখে সে আবার বলে, আমি যা চেয়েছিলাম পেয়ে গেছি রাধা।

পরদিন সকালে সমীরকে চা আর খাবার দিয়ে রাধা বলে, তুমি তবে এখানেই থাকো, কাজের চেষ্টা কর।

সমীর বলে, না। তোমাদের আদরে মন নরম হয়ে যাবে। আমি ভাবছি, কোন উদ্বাস্তু কলোনিতে গিয়ে হোগলার কুঁড়ে তুলে থাকব। মাঝে মাঝে এসে তোমাদের দেখে যাব।

রক্ত নোনতা

সন্ধ্যা তখন সাতটা।

মোড়ের দিকে টিয়ার গ্যাসের বোমা ফাটতে শুরু করা মাত্র আওয়াজ শুনে ডাক্তার দাশ তাড়াতাড়ি ভিতর থেকে ডিস্‌পেন্‌সারির দরজা বন্ধ করে।

কম্পাউন্ডার নবীনের সঙ্গে নিজেও হাত লাগায় দরজা বন্ধ করতে।

আপসোসের কাঁপা সুরে বলে, 'এবেলা না খুললেই হত। তুমি বললে ভয় নেই, কিছু হবে না—নইলে আমি কিছুতেই খুলতাম না।'

নবীন প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, 'কিছু হবে না এ কথা তো আমি বলিনি। আমি শুধু বলেছিলাম—ভয় নেই। খোলা রাখলেই হত—মোড়ে হাঙ্গামা হচ্ছে, এখানে ভয় কি?'

জোয়ান নবীনের মুখের দিকে চেয়ে ঢোঁক গিলে ডাক্তার দাশ বলে, 'যাক্‌ গে, রোগীপত্র তো আজ আর আসবে না, কি হবে খোলা রেখে?'

'তা বলছি না। বন্ধ করেছেন বেশ করেছেন।'

নবীনকে বেশ খুশী মনে হয়। টিয়ার গ্যাস বন্দুকের টোটা ফাটার শব্দে এমন মহামারী কাণ্ড ঘটায় তার যে ছুটি মিলেছে তাতেই সে খুশী। ডাক্তার দাশ ভাবে, কে জানে বাবা এরা কোন্‌ ধাতে তৈরি, কি আছে এদের রক্তে!

নবীন বলে, 'আমি তবে যাই ডাক্তারবাবু?'

এত কাছে চলেছে কে জানে কেমন ভীষণ কাণ্ড, ছুটি পেয়েই বন্ধ ডিস্‌পেন্‌সারির নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য ছোঁড়া ব্যাকুল! ভারি মজার ব্যাপার ঘটবে, দেরি হলে ফসকে যাবে।

ডাক্তারি পরীক্ষাতে কি ধরা পড়বে এমন অদ্ভুত কি মিশেছে ওদের রক্তে?

'বাড়িতে একটা খবর দিয়ে যাবে নবীন? আমার ফিরতে দেরি হলে কিংবা না ফিরলে যেন চিন্তা করে না। বলবে, এখানেই আছি, হিসাব দেখছি।'

ফিরতে দেরি হলে কিংবা একেবারে না ফিরলে! নবীনের তাজ্জব লেগে যায়। ডাক্তার মানুষ, কত লোকের গায়ে ছুরি কাঁচি করাত চালিয়েছে, কত রক্তপাত দেখেছে, কত মানুষকে মরতে দেখেছে, ভুল চিকিৎসায় দু-চারজনকে হয়তো মেরেও ফেলেছে —তার এমন আতঙ্ক! হাঙ্গামা না থামলে এখান থেকে বেরোবে না, দরকার হলে সারারাত এখানে কাটাবে!

পাড়াতে কাছেই ডাঃ দাশের বাড়ি, গলির ভিতরে। নবীন চলে যাওয়ার পর বন্ধ

ঘর ডিস্‌পেন্‌সারির মধ্যে বসে হিসাবের মোটা খাতাটা খুলে বসে ভাবে, কতক্ষণ আর হাঙ্গামা চলবে? হাঙ্গামা থেমেছে টের পাওয়ার পরই বাড়ি যাবে।

এত কাছে বাড়ি, বেরিয়ে টুক করে অবশ্য চলে যাওয়া যায় বাড়িতে। কি দরকার রিক্সা নিয়ে?

আধঘণ্টাও কাটে কিনা সন্দেহ। ডিস্‌পেন্‌সারির লাভ লোকসানের হিসাবে মশগুল ডাক্তার দাশ বন্ধ দরজায় হাত থাবড়ানির শব্দে চমকে উঠে।

খানিকটা আশ্বস্ত হয় নবীনের গলার আওয়াজে, 'ডাক্তারবাবু দরজাটা খুলুন তো।'

তবু হাত পা একটু কাঁপে ডাক্তার দাশের। হাঙ্গামা এদিকে এগিয়ে এসেছে? নবীন ভয় পেয়ে পালিয়ে এসে থাকলে অবস্থা সাংঘাতিক দাঁড়িয়েছে বলতে হবে।

ছ'জনে' ধরাধরি করে বয়ে এনেছে রক্তাক্ত দেহটা।

বালক জোয়ান ছ'জন—সবাই তারা পাড়ার, সবাই তারা চেনা।

তারাও অল্পবিস্তর আহত। তিন চার জনের দেহের এখান-ওখান থেকে অল্প অল্প রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

নবীনের গায়ের শার্টটা যাবার সময় ছিল ধবধবে সাদা, বাঁ দিকের ঘাড় আর হাতার কাছে রাঙা হয়ে চুপচুপ করছে। নিজের রক্তে, অথবা যাকে বয়ে এনেছে তার রক্তে কে জানে!

চৌদ্দ বছরের যাকে বয়ে এনেছে পাড়ার ক'জন চেনা বালক আর জোয়ান, তাকে ডাক্তার দাশ সবচেয়ে ভাল করে চেনে।

সঙ্গে এসেছে বুড়ো শিবশঙ্কর, সে বলে, 'তুমি নিজেই ডাক্তার, তাই ভাবলাম তোমার ছেলেটাকে অন্যদের সঙ্গে হাসপাতালে পাঠিয়ে কাজ নেই। বড় বেশী ঘা খেয়েছে, হাসপাতালে যেতে যেতে বাবুদের নজর পড়লে কি জানি কি হয়!'

বেঞ্চে শুইয়ে দিয়েছিল। ছেলের মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে কব্জিটা কয়েক মুহূর্তের জন্য হাতের মুঠোয় নিয়ে ডাক্তার দাশ বলে, 'বেশ বুদ্ধি আপনার! ছেলেটাকে উস্কে দিয়ে ঘায়েল করে, মরার দায়টা ঘাড়ে চাপাচ্ছেন আমার!'

শিবশঙ্কর বললে, 'ছি, দিশেহারা হয়ো না বাবা। ছেলে কি তোমার কারো পরামর্শে ঘায়েল হতে গিয়েছিল? ডাক্তার মানুষ বিচলিত হয়ো না। বাঁচাবার চেষ্টা তো কর ছেলেটাকে; তারপর না বাঁচলে আর করা কি!'

ডাক্তার দাশ বলে, 'এসো দিকি তোমাদের কার কি হয়েছে একে একে দেখি! নিজে নিজে শার্টটা খুলতে পারবে না নবীন?'

নবীন মাথা নাড়ে।

'নাঃ, হাতটা নাড়তে পারছি না।'

শিবশঙ্কর ব্যাকুলভাবে বলে, 'নিজের ছেলেটার দিকে আগে তাকাও বাবা। এই কি রাগ করার সময়? সবাই মেতেছে—তোমার ছেলের দোষটা কি বল! দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম তো সব—বাপের বয়সে এমন কাণ্ড দেখিনি।'

ডাক্তার দাশ শিবশঙ্করের কথা কানেও তোলে না; মুখ ফিরিয়ে একবার তাকিয়েও দ্যাখে না।

তুলো ব্যাণ্ডেজ ওষুধপত্র ইত্যাদি চটপট গুছিয়ে নিয়ে সব চেয়ে ছোট গণেশকে প্রথমে ধরে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়।

শিবশঙ্কর প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'ছেলেটার দিকে তাকাবে না! দেরি হলে ও মরে যাবে!'

'মরে যাবে? ও তো আগেই মরে গেছে।'

সকলে হতভম্ব হয়ে যায়।

শিবশঙ্কর বিহ্বলের মতো বলে, 'আগেই মরে গেছে? জ্যান্ত ছেলেটাকে নিয়ে ছুটে এলাম, আগেই মরে গেছে কি রকম!'

'আনতে আনতে মারা গেছে। পরীক্ষা করলাম দেখলেন না?' শিবশঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে কেন তবে?'

ডাক্তার দাশ একমনে দ্রুতগতিতে গণেশের ক্ষতটা বাঁধতে বাঁধতে বলে, 'মরার পরেও কিছুক্ষণ রক্ত চুঁইয়ে পড়ে।'

কালোবাজারের প্রেমের দর

ধনঞ্জয় ও লীলার মধ্যে গভীর ভালবাসা।

কোন নাটকীয় রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্যে তাদের ভালবাসা জন্মেনি, 'প্রেমে পড়ার বয়স হবার পর ঘটনাচক্রে হঠাৎ দেখা এবং পরিচয় হয়েও নয়। অল্প বয়স থেকে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও স্নেহ মমতার সম্পর্ক বড়ো হয়ে ক্রমে ক্রমে যে ভালবাসায় পরিণত হয়, তাদের প্রেমটা সেই জাতের।

লীলা যখন স্কুল পার হয়ে কলেজে ঢুকেছে এবং ধনঞ্জয় ব্যবসায়ে নেমেছে তখনও তারা ভালবাসা টের পায়নি। মাঝখানে ধনঞ্জয় ব্যবসা উপলক্ষে বছর তিনেক বাইরে ছিল—সেই সময় দু'জনের মনেই খটকা লাগে যে ব্যাপারটা তবে কি এই? ধনঞ্জয় ফিরে আসা মাত্র সব জল্পনা কল্পনার অবসান হয়ে যায়—প্রথম দর্শনের দিনেই!

তা, হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। বিশেষত এরকম পাকাপোক্ত বনিয়াদের উপর অনেককাল ধরে যে ভালবাসা গড়ে ওঠা সেটা বিরাট দালানের মতোই—গাঁথুনি শেষ হবার আগে কে সেটাকে ইমারত বলে মনে করে?

তারপর বছরখানেক ধরে তাদের ভালবাসা জমাট বেঁধেছে। এখন বিয়ের মধ্যে যথারীতি সমাপ্তি ঘটলেই হয়।

একটু বাধা আছে। তেমন মারাত্মক কিছু নয়। ব্যবসা ধনঞ্জয় মন্দ করছে না। কিন্তু এখনও ততটা ভাল করতে পারেনি লীলার বাবা পশুপতির যেটুকু দাবি। এমন একটা কিছু এখনও ধনঞ্জয় করতে পারেনি যাতে ব্যবসায়ী জাতের বড় বা মাঝারি রাঘব বোয়ালদের সঙ্গে তুলনায় যতই ছোট হোক অন্তত বড় ব্যবসায়ীর জাতে উঠতে পেরেছে বলে তাকে গণ্য করা যায়।

কথাটা স্পষ্ট করার জন্য ধনঞ্জয় বলেছে, 'যেমন ধরুন লাখ টাকা? কিন্তু সেটা কি ভাবে দেখতে চান? কারবারে খাটছে অথবা ব্যাঙ্কে জমা হয়েছে?'

পশুপতি বলেছে, 'না না, এমন কথা আমি বলছি না যে আগে তোমাকে লাখপতি হতে হবে! লাখ টাকার কারবারী কি দেউলে হয় না? সে হল আলাদা কথা। ব্যবসার আসল ঘাঁটিতে তুমি মাথা গলিয়েছো—এটুকু হলেই যথেষ্ট। তারপর তোমার লাক্ আর আমার মেয়ের লাক্! তুমি এখনও যাকে বলে ব্যবসায়ে এপ্রেন্টিস্!'

লীলার ইচ্ছা হলে অবশ্য এ বাধাটুকু কোথায় ভেসে যেত। কিন্তু লীলাও এ বিষয় বাপের মতের সমর্থক।

সে বলে, 'যাই বল তাই বল ; এদিকে ঢিল দিলে চলবে না। তোমার চাড় নষ্ট হয়ে যাবে—আমাকে নিয়ে মেতে থাকবে দিনরাত। তোমার ফিউচার নষ্ট করতে রাজী হব অত সস্তা পাওনি আমাকে!'

ধনঞ্জয়ের ভবিষ্যৎ অবশ্য লীলারও ভবিষ্যৎ। কিন্তু ভালবাসার মানেও তো তাই। কাজেই, এটা লীলার স্বার্থপরতা মনে করা ছেলেমানুষি ছাড়া কিছু নয়। ধনঞ্জয় তা মনেও করে না।

খুব বেশী দুর্ভাবনার কারণও তার নেই। অপূর্ব যে কালো বাজার সৃষ্টি হয়েছে, অপূর্ব যে স্বাধীনতা পাওয়া গেছে ব্যবসা করে মুনাফা লুটবার, তাতে একবার একটা লাগসই সুযোগ পাকড়াতে পারলে আর দেখতে হবে না, রাতারাতি ব্যবসা জগতে নিজেকে এমন স্তরে তুলে নিতে পারবে যে লীলা বা তার বাবার কিছু বলার থাকবে না।

লীলা মাঝে মাঝে বলে, 'কি করছ তুমি? অ্যাদ্দিনেও কিছু করতে পারলে না, টুকটাক্ চালিয়ে যাচ্ছ! এদিকে কত বাজে লোক উতরে গেল। লোকেশবাবুর হতভাগা ছেলেটা পর্যন্ত একটা পারমিট বাগিয়ে কি রেটে কামাচ্ছে!'

ধনঞ্জয় বলে, 'তোমরা শুধু ব্ল্যাক মার্কেটটা দেখছ আর এটা বাগিয়ে ওটা বাগিয়ে কত সহজে কে বড়লোক হচ্ছে সেটা দেখছ। ওই বাগানোর জন্য যে কি ভয়ানক কম্পিটিশন, কত কাঠখড় পোড়াতে হয়—সেটা তো দেখছ না!'

লীলা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে হেসে বলে, 'তুমি পারবে। বাবা বলেন, মালটা তুমি খাঁটি।'

ধনঞ্জয় হেসে বলে, 'আর তুমি কি বলো? ভেজাল?'

'ভেজাল! আমার কাছে ভেজাল চলে? খাঁটি না হলে তোমায় আমি হাত ধরতে দিলাম?'

ইতোমধ্যে ধনঞ্জয়ের আশা-লোলুপতার বৃন্তে ফুল ধরবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। একদিকে যেমন বেড়ে যায় তার কর্মব্যস্ততা আর কমে যায় লীলার সঙ্গে দেখা করা গল্প করার সময়, অন্যদিকে তেমনি তার কথাবার্তা চাল চলনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নতুন ধরনের একটা উৎসাহ ও উত্তেজনা।

'কি হয়েছে তোমার?'

লীলার প্রশ্নের জবাবে ধনঞ্জয় তাকে শুধু একটু আদর করে।

'ব্যাপারটা কি?'

'বলব পরে।'

লীলা হেসে বলে, 'বলতে হবে না, আমি বুঝেছি।'

'বুঝেছ?'

'বুঝব না? বিয়ের তারিখ ঘনিয়ে না এলে পুরুষ মানুষের এ রকম ফূর্তি হয়!'

কয়েকদিন পরে তারা দু'জনে এক ভাটিয়া কোটিপতির বাড়িতে এক উৎসবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরেছে। ধনঞ্জয় বলে, 'একটা মোটা কণ্ট্রাক্ট বোধ হয় পাব।'

লীলা গিয়েছিল পশুপতির সঙ্গে, ধনঞ্জয় গিয়েছিল একা। প্রীতি অনুষ্ঠানে ধনঞ্জয় অযাচিত উপেক্ষিত হয়ে ছিল আগাগোড়া—যেটুকু খাতির পেয়েছিল সবটুকুই লীলার জন্য। কিন্তু আজ ধনঞ্জয়ের কোন ক্ষোভ আছে মনে হয় না।

লীলা খুশী হয়ে বলে, 'খুলে বলো।'

ধনঞ্জয় খুলেই বলে। হাজার আশী টাকার ব্যাপার। পরে কৌশলে আরও কিছু বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

মিঃ নিরঞ্জন দাস দেবার মালিক, তাকে অনেক চেষ্টায় বাগানো গেছে।

'বাবা কম হাঙ্গামা করতে হয়েছে আমাকে! লোকটা নিজে এতটুকু রিস্ক নেবে না, সব নিয়মদুরস্ত হওয়া চাই! কোন দিকে ফাঁক থাকলে চলবে না। অথচ এদিকে চাহিদাটি ঠিক আছে। দশ বছরের পুরানো ফার্ম ছাড়া কণ্ট্রাক্ট দেওয়া চলবে না। এরকম একটা ফার্ম কোথায় লালবাতি জ্বালতে বসেছে খুঁজে খুঁজে গা বাঁচিয়ে কিনে নেওয়া কি সোজা কাজ!'

'কিনেছ?'

'হ্যাঁ। তবে মোটা রকম ঢালতে হয়েছে। তিনটে দিন মোটে সময়, করি কি। গরজ বুঝে গেল। যাক্‌গে, সব তুলে নেব। হাজার গুণ তুলে নেব!'

লীলা একটু ভেবে বলে, 'সব একেবারে ঠিকঠাক তো?'

ধনঞ্জয় বলে, 'তা একরকম ঠিকঠাক বৈকি!'

'একরকম!'

লীলা ধনঞ্জয়ের একটা কান আদর করে মলে দেয়, বলে, 'বাবা যে বলেন তুমি এপ্রেণ্টিস, সেটা মিছে নয়। এত টাকা ঢেলে এতদূর এগিয়ে এখনো বলছ একরকম ঠিক! মোটা নিরঞ্জনকে বাঁধোনি বুঝি যাতে কোন রকম গোলমাল করতে না পারে? কি বুদ্ধি। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি এই বাজারে ব্যবসা করবে!'

ধনঞ্জয় রীতিমতো ভড়কে যেতে লীলা সাহস দিয়ে বলে, 'মোটা নিরঞ্জন তো? গোলমাল করবে না মনে হয়। আমি বরং একটু চাপ দেব। লোকটা খুব শিভালরাস।'

'চাপ দেবে মানে?'

লীলা সশব্দে হেসে ওঠে, 'অমনি ঈর্ষা জাগল? এই মোটা নিরঞ্জনকেও তুমি ঈর্ষা করতে পার আমার বিষয়ে! ধন্য তুমি! মেয়েরা কি করে গা বাঁচিয়ে চাপ দেয় জানো না?'

গা বাঁচিয়ে চাপ দিতে গেলেও কাছে যেতে হয়, মিশতে হয়, হাসি আর মিষ্টি কথায় মন ভুলাতে হয়। তার ফলেই সৃষ্টি হল সমস্যা।

প্রেমের সমস্যা।

এতদিন পর্যন্ত তাদের ধারণা ছিল যে জগতে অন্য সমস্ত কিছুর দরদাম আছে, একটা ফুটো পয়সায় হোক বা লক্ষ টাকায় হোক সব কিছুর দাম ঠিক করা যায়—প্রেম অমূল্য। কারণ প্রেম তো কোন বস্তু নয়—মাল নয় যে দাম দিয়ে কেনা যাবে।

নিরঞ্জন স্বয়ং ক্রেতা হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের ধারণা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

নিরঞ্জন লীলাকে বিয়ে করতে চায়। কোনরকম শস্তা বা কুৎসিত মতলব তার নেই, সে শুদ্ধ পবিত্র শাস্ত্রীয় অথবা ততোধিক শুদ্ধ আইনসঙ্গতভাবে লীলাকে গরিয়সী মহীয়সী স্ত্রী হিসেবে পেতে চায়। এর মধ্যে কালোবাজারী কোন চাল নেই।

সে নিজে কিছু বলেনি। খ্যাতনামা একজনকে ঘটক হিসেবে পাঠিয়েছে পশুপতির কাছে। লীলার কাছে প্রেম নিবেদন করাও সে দরকার মনে করেনি। কারণ সে ভাল করেই জানে যে সোজাসুজি লীলার কাছে কথা পাড়লে লীলা সোজাসুজি জবাব দেবে না।

ধনঞ্জয় গিয়েছিল তার ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করার প্রত্যাশায়, নিরঞ্জন তাকে একটু অকারণ লজ্জা মেশানো হাসি দিয়ে খাপছাড়া অভ্যর্থনা জানিয়ে সরলভাবে বলে, 'শুনলে তুমি ঠাট্টা করবে, কিন্তু বিয়ে টিয়ে করে সংসারী হচ্ছি ভাই! তুমি চেনো, পশুপতিবাবুর মেয়ে। সামনের মাসেই একটা শুভদিন দেখে যাতে হয় তার প্রস্তাব পাঠিয়েছি।' নিরঞ্জন তাকে একটা সিগারেট দেয়। হাসিমুখেই আবার বলে, 'পশুপতি-বাবু অনেকদিন ঘোরাফেরা করছেন—এ পর্যন্ত কিছু করা হয়নি। এবার কিছু করে দিতে হবে। তোমাকে কথা দিয়ে ফেলেছি—অন্য কেউ হলে এই কণ্ট্রাক্টই পশুপতিবাবুকে দিয়ে দিতাম। কিন্তু তোমার কথা আলাদা—তোমাকে তো আর না বলতে পারি না এখন!'

কথাটা সহজেই বুঝতে পারে ধনঞ্জয়। অতি সরল স্পষ্ট মানে নিরঞ্জনের কথার। লীলাকে তার চাই, ধনঞ্জয় যদি ব্যাঘাত ঘটায় তবে বর্তমানের আশী হাজার এবং অদূর ভবিষ্যতে যা লক্ষাধিক টাকার কণ্ট্রাক্ট দাঁড়াবে সেটা ফসকে যাবে ধনঞ্জয়ের হাত থেকে। শুধু তাই নয়, পশুপতিরও ভবিষ্যতে কোনদিন কিছু বাগাবার আশা ভরসা থাকবে না নিরঞ্জনের মারফতে!

তারপরে কাজের কথায় আসে নিরঞ্জন। বলে, 'খুব সাবধানে হিসেব করে সব করবে! কোন দিকে যেন কোন ফাঁক না থাকে। এদিককার সব আমি সামলে নেব।'

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতোই ঠেকে ব্যাপারটা তাদের কাছে। পরস্পরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা করতে পর্যন্ত দুজনেই তারা ভয় পায়। নিজের নিজের ঘরে একা বসে তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করে যে কিসে কি হল এবং এখন কি করার আছে!

নিরঞ্জনের প্রস্তাব নিয়ে যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি ঘটকালি করতে গিয়েছিল তাকে পশুপতি জানায় যে মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দুতিন দিনের মধ্যেই নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করবে।

নিরঞ্জনের আপিস থেকে ধনঞ্জয় সোজা বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। পশুপতি ধনঞ্জয়কে টেলিফোনে ডেকে পাঠায়।

ধনঞ্জয় বলে, 'আমি সব শুনেছি। কাল সকালে আপনার ওখানে যাব।'

'লীলাকে ডেকে দেব?'

'থাক।'

ধনঞ্জয় ও লীলা দুজনেই সারারাত জেগে কাটায়—মাইলখানেক তফাতে শহরের

দুটি বাড়ির দুখানা ঘরে, যে ব্যবধান তারা যে কেউ একজন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কয়েক মিনিটে ঘুচিয়ে দিতে পারে! সকালে ধনঞ্জয় আসে পশুপতির বাড়ি।

পশুপতি বলে, 'লীলার সঙ্গেই কথা বলো। তোমরা ছেলেমানুষ নও, তোমরা যা ঠিক করবে আমি তাই মেনে নেব।'

লীলার চোখ লাল। বোঝা যায় রাত্রে বেশ খানিকটা কেঁদেছে। ধনঞ্জয়ের শুকনো বিবর্ণ মুখ এক নজর দেখেই আবার সে কেঁদে ফেলে। চোখ মুছতে মুছতে বলে, 'বোসো।'

ধনঞ্জয় বসে, ধীরে ধীরে বলে, 'কিছু ঠিক করেছ?'

লীলা বলে, 'তুমি?'

তারপর দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

প্রথমে লীলার কাছেই অসহ্য হয়ে উঠে এই নীরবতা। বলে, 'নিরঞ্জন ছাড়বে না, সব ভেঙে দেবে।' ধনঞ্জয় বলে, 'সে তো স্পষ্ট বলেই দিয়েছে।'

'আবার কবে তুমি এ রকম চান্স পাবে। কে জানে' একেবারে পাবে কিনা তারও কিছু ঠিক নেই।'

ধনঞ্জয় নীরবে সায় দেয়।

লীলা বলে, 'তাছাড়া এদিক ওদিক টাকাও ঢালতে হয়েছে অনেক। সব নষ্ট হবে।'

ধনঞ্জয় বলে, 'তা হবে। এমনিতেও তোমাকে পাবার আশা একরকম ঘুচে যাবে।'

লীলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, 'তুমি যা ভেবেছ, আমিও তাই ভাবছি। কাল আমরা বিয়ে করতে চাইলে এ জগতে কারো সাধ্য আছে ঠেকায়? কিন্তু আমরা ছেলেমানুষ নই। বিয়ে নয় হল, তারপর? তোমার আমার দুজনেরি জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। কোন লাভ নেই।'

ধনঞ্জয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'সত্যি লাভ নেই'।

ঢেউ

বৈশাখ মাস।

ভোর রাত্রে মতিলাল নরক হয়ে পুকুরঘাটে আসে, ধাঙগড়রা ধর্মঘট করেছে সাতদিন। দুর্গন্ধের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ ও স্থায়ী পরিচয়, গরিব বস্তিবাসী মজুর বৈ তো নয়। দুর্গন্ধ কখন অসহ্য হয় সে জানে—পচা বাসি মড়ার উৎকট গন্ধের স্তরে যখন ওঠে। দুর্ভিক্ষের সময় এ গন্ধের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, স্টেশনে যাবার সময় রাস্তায়। গাছতলায় দুটো মানুষ পড়ে পড়ে পচছিল। তারপর এই গন্ধই সে পেয়েছে শহরের পথে মিছিলের উপর গুলি চলায় যারা মরেছিল তাদের দেহ আনতে মর্গের দরজায় গিয়ে ধন্না দিতে।

এক দমক ঝড়ের সঙ্গে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে রাত্রিটা চমৎকার ঠাণ্ডা হয়েছিল, ভিজে ভোরটি মিষ্টি হয়ে আছে। রাতের চাঁদের জ্যোৎস্নাকে এখনো দিনের আলো স্পষ্ট ছাপিয়ে ওঠেনি। আকাশে প্রায় গোটা চাঁদটা ভাঙা ভাঙা মেঘে তর তর করে সাঁতরে চলেছে। দাঁতন ঘষতে ঘষতে মুখ তুলে একনজর চাঁদটা দেখে মতিলাল থুতু ফেলে বলে, 'শালা!'

না, চাঁদটার ওপর মতিলালের কোন রাগ নেই। ওসব হতাশার ধার সে ধারে না। এ হল তার আপসোস। আপসোস এই যে, দিনটা মোটেই সুবিধামতো যাবে না জানা কথা, কারখানার দরজায় ভজিলালদের দলের সঙ্গে সংঘাত বাধবে, পুলিস হাঙগামা তো আছেই—সেদিনটা আরম্ভ হল এমন সুন্দরভাবে! অবিরাম লড়াই ছাড়া যারা গতি রাখেনি, রাগটা তাদের উপর—চাঁদের উপরে নয়! চাঁদতো খাসা জিনিস। চাঁদনী রাতে মজুরের কি আর রস জাগে না একেবারেই! পেট আর খাটুনি বাদ সাধে, হাই উঠে যায়, সকালে উঠে কারখানায় ছুটে হাড়ভাঙা খাটুনির ভাবনা থাকে। দশবিশ জনা এক সাথে ঢোলক পিটিয়ে ফূর্তি করে তবু রাত ভোর করে দেয় মাঝে মাঝে। চাঁদ কারো প্রাণের দুয়ারে ধন্না দেয় না, মালিক বাবুরা চাঁদিনী রাতে চুটিয়ে মজা লোটে আর দালাল দিয়ে চাঁদ-মার্কা ঘুমপাড়ানি স্বপন ছড়ায় চাঁদের বাবা ভগবানের দোহাই দিয়ে—বাঁচার মজা বরবাদ করে দুনিয়ায় মানুষ ঠাণ্ডা রাখবে বলে।

সব জেনে গেছে মতিলাল। চাঁদের কোন দোষ নেই বাবা! কেমন সরস আলো দেয় আঁধার রাতে ডিবরি পিদিমে যখন তেল একেবারে ফাঁক। চিরদিনের সুস্থ

...ন্দর চাঁদ, ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যায়, বেড়ে বেড়ে আবার আস্ত হয়। চাঁদ মোটে বরবাদ নয়, চাঁদিনী রাতের সব মজা সব ফূর্তিও আদায় করতে হবে, শুধুই বাঁচার মতো ভাত কাপড় নয়!

যারা সব গাপ করে রেখেছে তাদের কথা ভেবে এই কাক ডাকা আবছা ভোরে আবার মুখ তুলে রুপোলি চাঁদের সাদাটে মেঘে পাড়ি জমানো আরেক নজর চেয়ে দেখে থুতু ফেলে মতিলাল বলে, 'শালা বজ্জাত!'

চারিদিকে কাছে ও দূরে কারখানার চিমনিগুলি ওই আকাশেই মাথা তুলে আগামী দিনের উঁচানো আঙুলের সংকেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এখানে দাঁড়িয়ে কটা চিমনি তার চোখে পড়ে কিন্তু মানস চোখে কাছের এই তাল ও নারকেল গাছের গাদাগাদির চেয়ে চিমনির সমাবেশ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে।

ছোট ময়লা পুকুর, আবাঁধা ঘাটে নেমে মতিলাল মুখ হাত ধোয়। একটি যুবতী মেয়ে জলে নেমেছিল, মতিলালও তার দিকে তাকায় না, মেয়েটিও নিজের মনে নেয়ে যায়। বাবুরা বেসামাল মেয়েলোকের দিকে আড়চোখে কেন তাকায়, কি সুখ পায়, মতিলাল ধারণা করতে পারে না। ওতে কি মজা আছে মরদের?

পুকুরটার তিনদিকে গাদাগাদি করা ঘর, একদিকে সাহাদের বাগানবাড়ির ভাঙা দেয়াল। কলের জল নামমাত্র, পুকুরটার পচা জলেই বস্তির কাজ চালাতে হয়, স্নান থেকে রান্না। ঘাড় ধরে, সব বয়সের সব মেয়ে পুরুষকে প্রতিদিন দুবেলা পাশাপাশি ঘাটে নামানো, বস্তির মানুষেরা নিজেদের ভদ্রতা নিজেরাই গড়ে নিয়েছে, ভদ্র জগতে যা কল্পনাতীত।

তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে মতিলাল বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। ঘরে শুধু বুড়ী মা, কাল রাতে তার হু হু করে এসেছে জ্বর। কারখানায় গেটে আজ কি ঘটবে কে জানে, ঘরে শেষ পর্যন্ত ফিরবে কিনা ঠিক নেই। বুড়ীর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

সামনে দিয়ে একটা বাস চলে যায়। রাস্তাটা সবে জাগছে। রাস্তার ধার ঘেঁষে ছোট ছোট খাটিয়া পেতে এখনো কয়েকজন ঘুমিয়ে আছে, জগজীবনের মুদিখানা 'কাম' তরিতরকারির দোকানটা কারবার আরম্ভ করেছে সবার আগে, তেল-নুন-ভিণ্ডি-বেগুন কিনে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে রান্নাখাওয়া সেরে অনেকে কাজে ছুটবে। কালো কুকুরটা ছাইগাদায় কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে।

আরেকটা প্রায় নূতন বাস বেরিয়ে যায়। এখন একরকম খালি, ফিরবে বোঝাই নিয়ে। তারপর পুরানো ধ্যাড়ধেড়ে বাসটা নিজের সর্বাঙ্গের ঝাঁকুনিতে রাস্তা কাঁপিয়ে এগিয়ে আসে। রোজেনালির গাড়ি।

গাড়ি থামিয়ে মতিলাল চেনা ড্রাইভারকে দুকথায় দরকারটা বুঝিয়ে দেয়। বাসটা যে শহরের অন্য প্রান্তে যাচ্ছে সেখানে একটা কারখানায় কাজ করে মতিলালের ভাই বংশীলাল। বাসটার এমুখো যাত্রা যেখানে শেষ, তার গায়েই নয়ানের পান-বিড়ির দোকান। নয়ানকে জানালেই সে বংশীলালকে খবর দেবার ব্যবস্থা করবে।

একটি জেনানা প্যাসেঞ্জার তুলতে যেটুকু সময় লাগে তার বেশী দাঁড়াতে হয় না বাসটাকে।

মতিলাল বলে, 'ঠিক আছে?'

গাড়ির গতি নিতে নিতে ড্রাইভার খালেক বলে, 'ঠিক আছে।'

রামপিয়ারীকে আসতে দেখে মতিলাল দাঁড়িয়ে থাকে। এত দূর থেকে ভোরের আলোতেও দেখে টের পেয়ে যায়—রামপিয়ারীর চলন তার এত বেশী চেনা। ভজিলালের মেয়ে রামপিয়ারী।

আগে তাদের কাছাকাছি ঘর ছিল। দুজনে তারা মহড়া নিয়ে এ এলাকার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ঠেকিয়েছিল, মজুরদের ভাগ হতে দেয়নি। সে অভিজ্ঞতা থেকে দুজনে তারা টের পায়, মজুরদের যাতে স্বার্থ নেই বরং ক্ষতি আছে সে সব বাজে ফ্যাকড়া নিয়ে মাথা ঘামাবার ঝোঁক মজুরদের নেই। পাঁচটা বদলোকের চেষ্টায় যদি বা একটু বিগড়ে যেতে চায় কেউ, একজন সোজাসুজি খোলাখুলি একটু সমঝিয়ে দিলেই, ও সব ফালতু ঝোঁক সাফ হয়ে যায়। কি চটপট সবাই বুঝে নেয় আসল প্যাঁচটা কি! নিজেরা মজুর হয়েও নিজেদের বোধশক্তির এ খবর তারা জানত না, বড় বড় কথা কি করে সকলকে বোঝাবে ভেবে রীতিমতো ভাবনা হয়েছিল।

বোঝানো যে কত সহজ, কাজে তারা দেখে সেটা অবাক হয়ে খুশী হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছে। কি প্রচণ্ড উন্মত্ত হানাহানি শহর জুড়ে, দেশ জুড়ে—মজুর ভাইদের শুধু একটু বুঝিয়েই ধাতস্থ রাখা যায়। গর্বে বুক ফুলে উঠেছে তাদের। সেই থেকে তাদের দোস্তি হয়েছিল। একজন বুড়ো হতে চলেছে, একজনের জোয়ান বয়স, এতেও ঠেকেনি। ভজিলালের নতুন ইউনিয়নে যাওয়া নিয়ে ঝগড়া হয়ে যায়।

মতিলাল বলেছিল, 'দয়ালবাবুদের পাল্লায় পড়ছ, দালাল বনতে যাচ্ছ! হুঁশিয়ার!'

ভজিলাল বলেছিল, 'চুপ থাক্। যাতে বিশ্বাস করি, তাতে যাব একশোবার।'

দিন দিন বিতৃষ্ণা বেড়েছে। ভজিলাল তফাতে উঠে গেছে, খুব বেশী দূরে নয় কিন্তু এ কদিন মতিলাল তার দুয়ারে বসে কলকে টানতে যায়নি, দেখতে যায়নি রামপিয়ারী বেঁচে আছে না মরে গেছে। দুর্দিন যত বেশী ঘোরালো হয়েছে, ধনিক-মালিক যত বেশী মরিয়া হয়ে মারতে চেয়েছে মজুরকে, লড়াই যত চড়েছে চড় চড় করে, তত ঘৃণা বেড়েছে মতিলালের। রাস্তায় দোকানে রামপিয়ারীকে দেখলে পর্যন্ত টিটকারী দিতে সাধ গিয়েছে তার!

রামপিয়ারীর সামনে দিয়ে জগজীবনের দোকানে চলে যাবে ভেবেছিল মতিলাল. কিন্তু সামনে এসে সে মুখোমুখি দাঁড়ায়।

বলে, 'বাবা ডাকছে তোমাকে।'

'কেন?'

'বার্তাচিত করবে।'

'আমি যাব না। দালালের সাথে বার্তাচিত করি না। দালালকে মেরে ঘায়েল করি।'

রামপিয়ারী ফুঁসে ওঠে, 'বাবাকে দালাল বলবে না, খবর্দার! ঝাঁটা মেরে মুখ ভেঙে দেব।'

'বাসরে!'

মতিলাল মুচকে মুচকে হাসে। নিছক তামাসার হাসি অবশ্য নয়! রামপিয়ারী তেমনি ঝাঁঝালো সুরে বলে, 'হাসি নয়, তোমার সাথে বুঝাপড়া আছে আমার। তুমি মস্ত আদমি হয়েছ, মজুরদের লড়ায়ে নামাচ্ছ, মোর বাপটা দালাল বনল কিসে? তুমি মজুরের ভাল চাও মোর বাপ চায় না?'

'তাই মজুরের রুজির লড়াই ভাঙতে জোট পাকায়, আঁ?'

'রুজির লড়াই?' রামপিয়ারী স্থির চোখে চেয়ে ধীর গলায় কথা বলে, 'বাবা বলে এটা তোমাদের ভুল রাস্তা, এতে সব নষ্ট হয়ে যাবে। তোমরা মজুরকে উল্টা রাস্তা বাতলিয়েছো। এ দেশে ওসব চলবে না।' মতিলাল মুখ খুলতে যাচ্ছিল, রামপিয়ারী দুহাত উঁচু করে তাকে চুপ করিয়ে দেয়। মতিলাল লক্ষ্য করে রামপিয়ারীর কব্জিতে ভারী মোটা রুপার বালা জোড়া নাই।

রামপিয়ারী বলে, 'তোমার যা বিশ্বাস তুমি তা করছ, তুমি হলে মস্ত আদমি, খাঁটি মজুর। বাবার যা বিশ্বাস বাবা তা করছে, বাবা হল দালাল। না কি? খাঁটি আদমি যা ভাবে তা করে, দুসরা লোকের কথায় নাচে না, বাবা যদি ভুল বুঝেছে জান, দুরোজ যেচে এসে মিঠে কথায় সমঝে দিলে না কেন?'

চিন্তাজগতে একটা সত্য ঝলক্ মারে। মতিলাল ভড়কে যায় না। কিন্তু চুপ মেরে থাকে। এ তো বড় ভয়ানক কথা হল! দুঘণ্টা পরে আজ কারখানায় ধর্মঘট শুরু হবে, কারখানায় ঢোকা নিয়ে একদল মজুরের সঙ্গে সশস্ত্র পুলিস প্রহরী ঘেরা আরেক দল মজুরের লাগবে মারামারি, লাঠি খেয়ে গুলি খেয়ে মরবে মজুর, জেলে যাবে মজুর নেতা—এই এক্‌টাই মন জুড়ে আছে। এখন কিনা খেয়াল হল কারখানায় যারা ঢুকতে চাইবে তারাও মজুর! অন্যাদিন একটু কষ্ট করে যেচে গিয়ে গাযে পড়ে বুঝিয়ে দিলে তারাও বুঝত!

রামপিয়ারী বলে, 'সুবোধবাবু বলত, গোষ্ঠবাবুও বলে, মজুর শুধু ষোল আনা খাঁটি, মানুষ আঠারো আনা! আরে বাবা, ষোল আনা খাঁটি মানুষের মন যদি বলে ডাইনে চল, বাঁয়ে সে চলবে কার খাতিরে? মানুষটাকে সম্‌ঝে দেও! সম্‌ঝে দিলে যদি ফের কংগ্রেসী সোস্যালিস্ট বাবুদের ধাপ্পায় ভোলে, তখন তাকে দালাল বলবে।'

'আজও সম্‌ঝে দিতে হয়?'

'হয় না? সবাই সবারটা সম্‌ঝে দিচ্ছে, তুমি তোমারটা সম্‌ঝে দিবে না গাঁট মেরে রইলে। তোমার সমঝাওতা কোথা থেকে আসবে? চলে এসো, মুখ খোলো। ভুবন, রামভজন, জগু রহমানেরা এসে গেছে, গোষ্ঠবাবুরাও এসে দুটো কথা বলতে কি ফোস্কা পড়বে গায়ে?'

বিনা বাক্যব্যয়ে এগোতে আরম্ভ করে মতিলাল, অন্য কথা পাড়ে। বলে, 'তোমার হল কি?'

রামপিয়ারী সোজাসুজি বলে, 'গয়না বেচতে হল, কলে খাটতে হল। বাপ তো

মোর সত্যিকারের দালাল নয়, না খেটে মোটা টাকা কামাবে।' রামপিয়ারী কলে খাটছে। এবার মতিলাল মোটামুটি বুঝতে পারে রামপিয়ারীকে—প্রায় নতুন রামপিয়ারীকে। সে শুধু মজুরের মেয়ে ছিল, এখন নিজে মজুরনী হয়েছে।

ভজিলালের ঘরের ঠিক সামনে একটা উঁচু চালা। সদর রাস্তাটাই যেন পিচ বাদ দিয়ে ইঁটপাটকেল সুরকির রূপ ধরে সোজাসুজি চালাটায় প্রবেশ করেছে। শহরের রাজপথচারী একটি বাস এখানে রাত্রে কয়েকঘণ্টা বিশ্রাম করেন। স্বাধীনতা লাভের পর ঘোষেদের বাসুদেব দিল্লী ঘুরে এসে কি এক কৌশলে বাসটির লাইসেন্স বাগিয়েছে, দেনা শোধ করে রেডিও কিনে আবার তার ময়রার দোকান উঠছে।

বাস আগেই বেরিয়ে গেছে। চালার নীচে প্রায় ষোল সতের জন মানুষ জটলা করছে।

মতিলালকে ভজিলাল এগিয়ে নেয় না, অভ্যর্থনা জানায় না, বসতে পর্যন্ত বলে না। মতিলাল নিজেই জায়গা খুঁজে বসে পড়তে না পড়তে ভজিলাল বলে, 'ব্যাপারটা হল কি যে ধর্মঘট করলে বাঁচার রাস্তা পাব না, মিছেই ঘুরপাক খেয়ে মরব, আসল ব্যাপারটা কি হচ্ছে তা মালুম হচ্ছে না। গোষ্ঠবাবুরা এসে যাবে আধঘণ্টার মধ্যে, তার আগে ব্যাপারটা মোরা সমঝে নিতে চাই।'

এতকাল বেশ চলে যাচ্ছিল, আজ আধঘণ্টার মধ্যে সব বুঝে না নিলে চলবে না। এরকম অবস্থাও কখনো দাঁড়ায়নি। গোষ্ঠবাবুরা এসে এখান থেকে তাদের সকলকে বাগিয়ে নিয়ে পুলিস পাহারায় সঁপে দেবে, বাগানো বন্দুক সাথে নিয়ে তারা খাটতে যাবে কারখানায়। শুধু এটুকু হলে কথা ছিল না। মতিলালদের হাসি টিটকারি শুনতে শুনতেও যদি কারখানায় ঢুকে কাজে লাগা যেত তা হলেও ঝনঝাট ছিল না। কিন্তু প্রায় সবাই জানে তা হবে না। সে দিনকাল আর নেই। উঁচানো রাইফেল দেখেই মতিলালেরা ভালমানুষের মতো পথ ছেড়ে দিয়ে শুধু হাসি টিটকারি নিয়েই খুশী থাকবে না, রক্তপাত ঘটবেই।

কুঞ্জ বলে 'মোরা তাই বলাবলি করছিলাম কি যে, আসল কথাটা কি তোমাদের? মোট কথাটা কি? এ রাস্তায় লাভটা কি হবে শেষতক্?'

কুঞ্জ সজোরে মাটিতে একটা থাবড়া মারে। শুকনো গামছা দিয়ে ভজিলাল নিজের মুখটা মুছে নেয়। হোসেন একটা বিড়ি এগিয়ে দেয় মতিলালকে।

এতক্ষণে রক্ত এদিকে চনমনে হয়ে উঠেছে মতিলালের। সে টের পেয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা। গোষ্ঠবাবুরা ভাঁওতা দিয়েছে একধার থেকে, ঈশ্বর আল্লা থেকে দোহাই দিয়েছে সব কিছুর। কিন্তু এদের পিছিয়ে পড়া মনে ঢেউ লেগেছে লড়ায়ের! চোখ কান বুজে তো থাকে না, যে ব্যাপার ঘটছে চারদিকে রাস্তায়, কারখানায়, ক্ষেতে, মাঠে, জেলখানায়, খবর তো তার চাপা থাকেনি। ভজিলালের মতো একরোখা গান্ধী-ভক্তের প্রাণেও স্বস্তি নেই।

বড় আপসোস হয় মতিলালের। অনেক আগেই তার আসা উচিত ছিল, সঙ্গে আনা উচিত ছিল আসল কথা—মোট কথা যারা জলের মতো বোঝে, ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারে। আধঘণ্টার মধ্যে সে কি পারবে সারা দুনিয়ায় যে আসল

ব্যাপারটা ঘটছে, মালিক-রাজ হটিয়ে দিয়ে মজুর-রাজ উঠছে তার মোট কথাটা বুঝিয়ে দিতে, যে, কিসে এটা হচ্ছে, কেন হচ্ছে? দেখাই যাক্!

মতিলাল বলে, 'আসল কথা মজুর-রাজ। দুনিয়ার মজুর-রাজ চাই।' রামভজন সিং বলে, 'এদেশটাতে রাম-রাজ্য হলে দোষটা কি?'

মতিলাল জবাব দেয়, 'রামরাজ্য চুকেবুকে গেছে। রামরাজ্যে কি মজুর ছিল ভাই? মজুর তখন তক্ জন্মেনি মোটে। আজ দুনিয়ায় মজুর গাদা, আজ কি ফের রামরাজ্য হয়? আজ চাই মজুর-রাজ।'

ভজিলাল বলে, 'মজুরি বাড়াতে ধর্মঘট করলে মজুর-রাজ আসে?'

'না। মজুরির জন্য লড়াই থেকে মজুর-রাজ্যের জন্য লড়াই। কি রকম মজুর-রাজ? সোভিয়েতে যেমন আছে।...'

মতিলাল বলে যায়, সাদা মাটা ছাঁকা কথায়। রামপিয়ারী তাকে এক ছিলিম তামাক এনে দেয়। ভজিলালের কড়া তামাক টানতে মতিলাল বড় ভালবাসে।

কারখানার গেট আগলে বাইরে বসে থাকে মতিলালেরা। ভজিলালেরা তার কাছ থেকে কি বুঝেছে, কতটুকু বুঝেছে, আর কি করবে ঠিক করেছে মতিলাল জানে না। গোষ্ঠবাবুরা এসে হাজির হবার আগেই চালার নীচের বৈঠক থেকে মতিলালকে ভজিলাল ভাগিয়ে দিয়েছিল। তারা নিজেরা একটু পরামর্শ করবে।

খানিক তফাতে ছোটখাট একটা ভিড় জমেছে। এপাশে পুলিস বোঝাই লরি। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব।

মজুররাই নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, হাসি তামাসা চালাচ্ছে।

দূর থেকে মজুর শোভাযাত্রার ধ্বনি ভেসে আসে। সবাই উৎকর্ণ হয়ে শোনে। প্রায় দেড়শজনের একটি শোভাযাত্রা ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে আসে, সকলের সামনে ভজিলাল স্বয়ং। কারখানার সামনে এসে মতিলালদের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে শোভাযাত্রা মাটি নেয়, ভজিলাল উবু হয়ে বসে মতিলালের পাশে।

কথায় কথায় ভজিলাল বলে, 'রামপিয়ারী তোমায় ডেকে এনেছিল।'

'বটে নাকি? বলল যে তুমি ডেকেছ?'

'মোরা জটলা পাকাচ্ছি, রামপিয়ারী তোমার কথা পাড়ল। বলল যে, ডেকে এনে সামনাসামনি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলে গোল মিটে যায়! ভজুকে পাঠাতাম ডাকতে, নিজে গেল জোর করে।'

মতিলাল ভাবে, রামপিয়ারী বুঝতে পেরেছিল, শুধু ডাকলেই সে যাবে না।

বিচার

প্রকৃতপক্ষে এখনো ভোর হয়েছে বলা যায় না। কৃষ্ণপক্ষের গোড়ার দিকের প্রায় আস্ত চাঁদটার আলো ফ্যাকাশে হয়ে এলেও ভোরের আলোর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়নি। এক সূর্যের আলো, চাঁদের গা থেকে ঠিকরে আসা আর সিধে আসা, তফাত তো শুধু এইটুকু, তবু কত তফাত!

ইতোমধ্যেই রাস্তায় জলের কলে লোক জমতে শুরু করেছে। কলে জল আসতে আসতে ছোটখাট ভিড় গড়ে উঠবে। বস্তির মেয়ে-পুরুষরাই সংখ্যায় বেশী, বস্তির গা ঘেঁষে যে নতুন কলোনি গড়ে উঠেছে সেখান থেকেও দু-চার জন জল নিতে আসে। কলোনি থেকে রাস্তার কলে নিরুপায় হয়ে ধর্ণা দিতে আসে শুধু লুঙ্গি পরা গেঞ্জি গায়ে বা গামছা জড়ানো বেপরোয়া জোয়ান পুরুষ আর কোরা অবস্থা থেকে একবারও ধোপ না দিয়ে মাঝে মাঝে সাবান-কাঁচা করার ফলে পাকা একটা ময়লা রঙের মোটা ছেঁড়া থানপরা মাঝবয়সী বিধবা—যাদের স্তিমিত বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখ দেখে মজুর মেয়ে-পুরুষ গোড়ার দিকে অদ্ভুত এক ধরনের মায়া বোধ করত।

আজকাল আর করে না। ওরা ভীষণ ঝগড়াটে! লাইনে জায়গা দখল নিয়ে, বালতি কলসী ভরে এখানে জল নেওয়া সম্পর্কে সকলের স্থির করা নিয়ম ভেঙে চট করে একটু চানও করে নিতে চেয়ে গলা ছেড়ে কোন্দল করে।

শহরতলীর এই বস্তিবাসী মজুর-মজুরনীর চোখের সামনে কয়েক মাসের মধ্যে ভোজবাজির মতো প্রায় একই ধাঁচের ছোট ছোট দালানের কলোনিটা গড়ে উঠেছে, অদৃশ্য হয়ে গেছে গোটাকতক কুঁড়ে, তিনটে ডোবা পুকুর, বাঁশ ঝাড় এবং ছোট একটা মহিষের খাটাল। লোকে বলে রসিকবাবুর কলোনি, কিন্তু আসলে রসিক ছিল জমিটার বেনামদার মালিক। সবাই জানে মাড়োয়ারী ভগবানদাসের টাকায় অবস্থা আঁচ জমিটা কিনে নিয়ে ডোবা ভরিয়ে বাঁশঝাড়, কচুবন, কুঁড়ে খাটাল উচ্ছেদ করে সস্তা ওঁচা ইঁট সুরকি সিমেন্ট ইত্যাদি নিয়ে নীচু ভিতে দালানগুলি তুলেছে—পূর্ববঙ্গের একশ্রেণীর গৃহত্যাগী ও গৃহের জন্য উন্মাদ মানুষের ঘাড় ভেঙে মোটা মুনাফা লুটেছে। এরা ধনী নয়, অবস্থাপন্ন জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, চাকুরে—দশ-বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা বাড়ির মালিক হয়ে গ্যাঁট হয়ে বসাটাই ছিল এদের প্রথম স্বপ্ন, প্রথম প্রয়োজন। অধিকাংশ বাড়ির আবার বাড়ির একাংশে ভাড়াটে বসিয়েছে, অন্তত একখানা ঘরে, কিছু আয়ের জন্য। ভাড়াটেরা অল্প সঞ্চয় নিয়ে আগত রিফুইজি অথবা এই বাংলার সাধারণ চাকুরে।

এই কলোনির বিপরীত দিকে রাস্তার ওপারে একটুকরো পোড়ো জমিতে আর একটা কলোনি গড়ে উঠেছে—পুতুলের খেলাঘরের মতো কয়েকটা হোগলার চালা উঠেছে, প্রায় মানুষের মাথা সমান উঁচু, লম্বা হয়ে শোয়া যায় প্রায় এরকম লম্বা, তিন-চার জন পাশাপাশি শোয়া চলে প্রায় এতখানি চওড়া। এটা হল তাদের কলোনি, ইংরেজের ভাগাভাগি নীতির চরম পরিণতির রক্তাক্ত বন্যায় কুটার মতো দলে দলে যারা ভেসে এসে চারিদিকে সর্বত্র আটকে গেছে—বস্তিতে, রোয়াকে, রাস্তায় গাছতলায়।

ভোরের আলো যত প্রকট হতে থাকে, জলের উমেদারদের লাইন বড় হয়ে চলে। খানিক তফাতে রাস্তার ওপারে হাইড্রান্টের চুয়ানো ময়লা জল লোটায় ভরে স্নান চলছে। বস্তির কাছে ছোট পুকুরটার জল সবুজ হয়ে গেঁজিয়ে উঠেছে, তার চেয়ে এই কাদাগোলা নদীর জল অনেক শুদ্ধ ও পরিষ্কার।

রাত্রে একদমক ঝড়ের সঙ্গে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, ভোরটা ঠান্ডা ও মিষ্টি হয়ে আছে—খালি গাগুলিতে। আকাশে সাদাটে ভাঙা মেঘ দ্রুত উত্তরে পাড়ি দিচ্ছে, চাঁদটা ছুটেছে বিপরীত দিকে। চারিদিকে কাছে ও দূরে এলোমেলোভাবে ওই আকাশের দিকে উঁচিয়ে আছে কারখানার চিমনি। ওগুলির তুলনায় রাস্তায় জলের কলের নলটা কত সরু! ওই চিমনির কোনো কোনোটা হাজার মানুষকে খাটিয়ে রক্ত-মাংস আনন্দ অবসর শুষতে ধোঁয়া ছাড়ে কিন্তু সারা এলাকায় যতগুলি চিমনি রাস্তায় বস্তিতে ততগুলি জলের কলও বুঝি নেই। উপোসী মানুষের জলের তেষ্টাটাও মেটে না, মুখ দিয়ে জল গিলে খাবার তেষ্টাটুকু ছাড়া সর্বাঙ্গের যে শত-রকম তেষ্টা আছে, কাপড় গামছা বাসনপত্র ধুয়ে মেজে সাফ করার যে দরকারী সাধ আছে।

দাঁতন ঘষতে ঘষতে মতিলাল বস্তি থেকে বেরিয়ে এসে জলের লাইন আর হাইড্রান্টের চুঁয়ানো জলে স্নানের চেষ্টা দেখে থুতু ফেলে আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে।—উঁচানো চিমনিগুলোকেই যেন ভাঙা শব্দের একটা অশ্রাব্য গাল দেয়। মানুষটা সে ঢ্যাঙা, চওড়া বুকে পাঁজরাগুলি ঠেলে উঠেছে, মুখ ভরা খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি কিন্তু মাথায় মস্ত একটি টাক। টাকের বাড় ঠেকাতেই যেন কদমছাঁটা কাঁচা-পাকা চুলের বাঁধ দিয়েছে টাকটা ঘিরে।

মতিলালের হাতে ছিল ঘরে লোহার শিক বাঁকিয়ে তৈরি করা নকল চাবি, খানিক ধস্তাধস্তি করে সে হাইড্রান্টের মুখটা খুলে দেয়। হাতের তালু দিয়ে হাইড্রান্টের মুখ চেপে সরু ধারায় জল তুলে ধীরে ধীরে লোটা করে রামসুখ স্নান করছিল। পা দিয়ে চেপে মতিলাল তোড়ে জলের তিন হাত উঁচু বাঁকা ফোয়ারা তুলে দেয়, রামসুখ এবার উঠে দাঁড়িয়ে মনের সুখে স্নান করে, গা ঘষে ময়লা গামছা দিয়ে।

স্নানার্থী একজন বলে, 'আরে রাম রাম, রামসুখ!'

তেওয়ারী ব্রাহ্মণ রামসুখ নীচু জাতের একজনের পা-ধোয়া জলে স্নান করছে, মন্ত্র পড়তে পড়তে স্নান করছে—বেচারা শিউশরণের কাঁচা শহুরে প্রাণটাকে এটা নাড়া দিয়েছে ভীষণভাবে। মানুষটা মেটে রঙের, মাঝবয়সী, কপালে গতকালের

চল্‌টা ওঠা চন্দন-তিলকের চিহ্ন, কব্জিতে গোটা তিনেক মাদুলি, নেড়া মাথায় টিকি থেকে ফুলটা খসে পড়ে গেছে কিন্তু গিঁটটা টিঁকে আছে। পরনের নতুন আধখানা হেঁটো কাপড়খানা কয়লার গুঁড়োয় কুচকুচে কালো; মতিলালও এভাবেই কাপড় পরে। একখানা কাপড় কিনে চালায়—কাপড়ের যা দাম!

মাত্র ক-মাস আগে দেশ থেকে চাষবাস ছেড়ে কলকাতায় এসেছে শিউশরণ, সেও ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ হৃদয়টি তার এই ক-মাস কতবার কতভাবে যে বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম করেছে, শহরে জীবনে অনিয়ম আর অত্যাচার দেখে! অসংখ্য অন্যায় আর অবিচারের চেয়েও এটা এখনো তার কাছে বড় হয়ে আছে। তার হৃদয় কিন্তু বিদীর্ণ হয়নি। কারণ তার হৃদয়টাই ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখার চেয়ে প্রাণটা বজায় রাখা পছন্দ করেছে অনেক বেশী।

অভয়পদ দাসের স্থানীয় ছোট কয়লার গুদামে সে কুলি খাটে, মুফতে! লরি ভরে চালান এলে কয়লা নামায়, খদ্দের এলে কয়লা মেপে দেয়—পাঁচ সের থেকে এক মণ পর্যন্ত একবারের মাপ। এজন্য মজুরি পায় না, পায় দু-বেলা আধ পো হিসাবে আটা, ছটাক খানেক তরকারি আর দুটি করে কাঁচা লঙ্কা। তার রেশন কার্ডের চিনি আর চাল অভয়পদর বাড়িতে যায়। সকালে বিকালে ফাউ পায় শিউশরণ দু পয়সার ছাতু বা ছোলা। ভোর থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত কয়লার গুদামে তার এলোমেলো ছাড়াছাড়া ডিউটি।

বাড়তি খেটে তার রোজগার। যারা মোটে পাঁচ-দশ সের কয়লা কেনে তারা থলি বস্তা সাথে এনে নিজেরাই বয়ে নিয়ে যায়। আধ মণ এক মণ কয়লার বস্তা খদ্দেরের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে শিউশরণ মজুরি পায় দু-আনা। বাঁধা রেট—খদ্দেরের বাড়ি এক মিনিট বা দশ মিনিট দূরে হোক। এই কুলিখাটার অধিকারের মূল্য হিসাবে কয়লা গুদামের খাটুনিটা তাকে এমনি খেটে দিতে হয়।

রামসুখ তার তিরস্কার শুনেও শোনে না বলে শিউশরণ ভীষণ রেগে আবার বলে, 'রাম রাম রামসুখ! ধিক!'

তার ধিক্কার শুনতে শুনতে রামসুখ নির্বিচারে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে সরে দাঁড়িয়ে গা মুছতে থাকে। এমন সে স্বার্থপর নয় যে তোড়ে জল পেয়েছে বলেই অন্য সকলের স্নান ঠেকিয়ে নিজে সাধ মিটিয়ে স্নান করে যাবে, যদিও সে জানে আরও দু-তিন মিনিট জলের ফোয়ারাটা সে দখল করে থাকলেও কেউ কিছু বলত না বা ভাবত না।

রামসুখের বদলে মতিলাল এবার ধমকের সুরে শিউশরণকে বলে, 'পাগলা হো গিয়া? গঙ্গাজল আছে না?'

রামসুখ মতিলালের দিকে আড়চোখে চেয়ে মুচকে হাসে। মতিলাল না হেসেই চোখের ইঙ্গিতে সায় দেয়। তারা দুজন কারখানার ঘাগী মজুর, দুজনেই বুঝে নিয়েছে বেচারা শিউশরণের মুশকিল।

'ও, হাঁ, ঠিক বাত।'

শিউশরণ যেন মুক্তি পায়, ইংরেজ রাজের জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার চেয়ে

বড় মুক্তি। এতই সে স্বস্তি আর আশ্বাস বোধ করে যে অল্প বয়সী মুসলমান ছোকরাটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মতিলালের পা-ধোয়া কাদাগোলা গঙ্গাজলের ফোয়ারায় স্নান করতে লেগে যায়। মনে হয় মতিলালের পায়ের চাপে হাইড্রান্ট থেকে বাঁকা হয়ে যে জলের ফোয়ারাটা উঠেছে সেটা তার মনে পড়িয়ে দিচ্ছে কোমরে গলায় সাপ জড়ানো, কোলে মোমের রক্তহীন পুতুলের মস্ত আকাট ফরসা ছোটখাটো একটি মেয়ে বসানো শিবের বটতলার সস্তা ছবির জটা থেকে উৎসারিত জলের ফোয়ারাকে!

কিন্তু নাওয়া তার এত সহজে হয় না। রামসুখ ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দেয়. গর্জন করে বলে, 'লাটসাহেবী জজ-ম্যাজিস্টারি চলবে না হেথা, খপর্দার! একজন যে নাইছে তাকে নাইতে দিয়ে তবে তুমি আসবে।'

ক্রুদ্ধ শিউশরণ রুখে উঠে বলে, 'আমি পয়লা এসেছি।'

'না, তুমি পয়লা আসোনি। তোমার আগে সালেক এসেছে।'

'হাঁ? তুমি বললেই হয়ে গেল? একে জিজ্ঞেস কর।'

পীতম্বর খাবারেব দোকানে কাজ করে, এক পাশে বসেই সে কড়াই মাজছিল। সাক্ষী মানায় শিউশরণকে সমর্থন করে সে বলে যে হ্যাঁ, সালেকের আগেই শিউশরণ এসেছিল বটে।

'ঝগড়া করছ কেন? একে একে নেয়ে নাও না!'

কিন্তু তা কি হয়? তোড়ে জল উঠছে, ঝগড়ার মীমাংসা হতে হতে সালেকের স্নান হয়ে যাবে কিন্তু সে হল ভিন্ন কথা। আপসে একজন কেন দশজন তার আগে নেয়ে নিক, শিউশরণ কিছু বলবে না। অন্যায় সহ্য করবে কেন? অবিচার মানবে কেন? যতই সামান্য হোক সে অন্যায়, অবিচার।

রামসুখ বলে 'আরে বাবা, তোমাদের দুজনারই আগে সালেক এসেছিল। কল-খোলার চাবিটা তো চাই! না, চাই না? চাবি আনতে সালেককে মতিলালের ঘরে ভেজেছিলাম। ভেবেছিলাম কি, মতিলাল আজ ভোরে নাইতে আসবে না।'

মতিলাল বলে, 'হ্যাঁ, চাবি চাইতে গিয়েছিল। এক সাথে আসছিলাম, দাঁতন খুঁজতে পিছিয়ে গেল।'

তাহলে অবশ্য কোনো কথা নেই। তাকে ডিঙিয়ে নাইতে শুরু করেছিল ভেবেই সে সালেককে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল, সালেক যদি সত্যিই আগে এসে থাকে তবে কাজটা তার অন্যায় হয়েছে বৈকি, তাকে ধাক্কা দিয়ে রামসুখ দোষ করেনি। মেঘ সরে গিয়ে যেভাবে সূর্য বেরিয়ে আসে তেমনিভাবে, পলকে পলকে শিউশরণের মুখের ক্রুদ্ধভাব কেটে যেতে থাকে।

রামসুখ মতিলালকে জিজ্ঞাসা করে, 'ভোরে নাইলে কেন আজ?'

মতিলাল আশ্চর্য হয়ে বলে, 'খাটতে যাব না?'

'খাটতে যাবে? আজ?'

আজ বিশ বছর ধরে মতিলাল কারখানায় খাটতে যাচ্ছে, আজ কারখানায় ছুটি বা ধর্মঘট বা শহরে হরতাল এসব কিছুই নেই, তবু মতিলাল আজ কাজ করতে যাবে শুনে রামসুখ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তার মুখ দেখে মতিলালেরও ভাবনা

লেগে যায় যে তার অজান্তেই হয়ত বা মস্ত ব্যাপার কিছু ঘটে গেছে যেজন্য আজ কাজে যাওয়াটা খুবই খাপছাড়া হবে।

'কি ব্যাপার রামসুখ? কি বলছ? আজ কাজে যাবে না কেন?'

'কোর্টে যাবে না? কাজে যাবে তো কোর্টে যাবে কি করে?'

এবার মতিলালের মুখের ভাব কঠিন হয়ে যায়।

'কোর্টে যাব? কোর্টে যাবার দরকার কি?'

'তোমার ছেলেকে হাজির করবে না আজ?'

মতিলাল মাটিতে থুতু ফেলে দারুণ অবজ্ঞার সুরে বলে, 'হাঁ কত হাজির করছে!'

দাঁতনটা দাঁতে চিরে মতিলাল জিভ চাঁছে, মুখ ধোয়। রাস্তা দিয়ে একটা ফাঁকা লরি জোরে বেরিয়ে যায়! রামসুখ দ্বিধাভরে খানিকটা যেন জিজ্ঞাসার সুরেই বলে, 'তবু একটা হুকুম যখন হয়েছে--'

'হুকুম হয়েছে, তোমার শখ থাকে তুমি যাও! মিছিমিছি একটা দিনের মজুরি যাবে, বাসভাড়া যাবে, তত গরজ আমার নেই।'

মতিলালের দ্বিধা নেই, সংশয় নেই, বিচারক হুকুম দিলেও তার আটক ছেলে ও সাথীদের বিচারালয়ে হাজির করা হবে, সে বিশ্বাস করে না। বিনা বিচারে আটক বাতিল হবে না, এটা জানাই গেল। কিন্তু বন্দীদের বিচারালয়ে হাজির করা হবে, এতেও মতিলালের এমন সুনিশ্চিত অবিশ্বাস যে একদিনের মজুরি ও বাসের পয়সা খরচ করে গিয়ে যাচাই করে আসতেও সে রাজী নয়।

জলের কলের লাইন থেকে একজন চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে, 'মতিলাল! কোর্টে যাবে তো?'

মতিলাল চেঁচিয়ে জবাব দেয়, 'না!'

তার জবাব শুনে কয়েকজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক লাইন ছেড়ে এদিকে এগিয়ে আসে। নিজেদের মধ্যে তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে বোঝা যায় মতিলালের জবাব তাদেরও রামসুখের মতোই বিচলিত করে দিয়েছে।

কাছে এসে দু-তিন জন একসঙ্গে প্রশ্ন করেঃ 'যাবে না কি রকম? তারিখ পাল্টেছে? বিচার বাতিল হয়ে গেছে?'

আর একজন প্রশ্ন করে, 'তোমার ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছে?'

এই প্রশ্ন শুনে মতিলাল জ্বালা ও ব্যঙ্গভরা এক অদ্ভুত সশব্দ হাসি হাসে—'ছেড়ে দিয়েছে বৈকি, ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করাতে হাওয়াই জাহাজে মার্কিন মুলুকে পাঠিয়েছে।'

হঠাৎ হাসি থামিয়ে ভুরু কুঁচকে প্রশ্নকারীকে বলে, 'আমার ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছে, তবে আর ভাবনা কি, আর কে শালা কোর্টে যায়,—তাই কোর্টে যাব না ভাবছ বুঝি?'

প্রশ্নকারী লজ্জা পায়, 'না না, তা ভাবিনি, তা ভাবব কেন? কথাটা মনে হল তাই—'

আর একজন বলে, 'যাক্ যাক্ যেতে দাও। ব্যাপারটা কি মতিলাল? যাবে না কেন? আমি তো ভেবেছিলাম যাব, দেখে আসব কি হয়।'

মতিলাল বলে, 'ব্যাপার কি আবার, ব্যাপার কিছু নেই। কিছুই হবে না জানি তো ফের গিয়ে কি করব? শুধু আইনের মারপ্যাঁচ নিয়ে কচকচ হবে খানিক, কানাকড়ি মানেও ঢুকবে না মাথায়। কাজ কি বাবা ঝকমারিতে!'

'কি করে জানলে তোমার ছেলেদের আনবে না?'

'কি করে আনবে? সাহস পাবে কোথা? কি তাদের দরকারটা আনবার? কোর্টে যদি আনবে, বিচার যদি করবে, বিনা বিচারের কানুন করেছে কি শখের জন্য, ধুয়ে জল খাবে বলে?'

সবাই নির্বাক হয়ে শোনে, শুনেও নির্বাক হয়ে থাকে। তোড়ে জল বেরিয়ে নালা বেয়ে গড়িয়ে যায়, স্নানটা সেরে নিতে শিউশরণের খেয়াল থাকে না।

প্রায় ষাট বছর বয়সের বুড়ো পটল প্রথম কথা বলে। বিড়িটাতে বাঁধা সুতোটার কাছ পর্যন্ত শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে, দুবার কেশে, ধীর স্বরে সে বলে, 'আমি বলি কি, আইন মতে সমন-টমন বেরিয়েছে, ওদেরই জজ-আদালত, ওদেরই নিয়ম-কানুন, তাই হয়তো বা—'

মতিলাল হেসে বলে, 'কোথায় আছ দাদা? ভাবচো বুঝি ইংরেজ আমল শেষ হয়ে গেছে, সত্য-যুগ এসে গেছে? যার সৈন্য যার পুলিস, তার আইন, তার বিচার। নিজের আইনের ফাঁদে পড়লে, জজ আদালতের রায় মুশকিল করলে, কাল ফের একটা নতুন আইন করে জজ আদালত তুলে দিতেই বা কতক্ষণ?'

কড়াই মাজা বন্ধ রেখে পীতাম্বর শুনছিল, সে বলে, 'যা বলেছ মাইরি। লোকে বলে ভদ্দরলোকের এক কথা! এ কেমন এক কথা রে বাবু ভদ্দরলোকের! এদিকে বিচারও রইবে, বিচার ছাড়া আটকের আইনও রইবে! রাখবি তো একটা রাখ, খুশী হয় বিচার-টিচার সব তুলে দে। বিচার রইলে বিনা-বিচার রয় কোন বিচারে আঁ?'

মতিলাল বলে, 'ইংরেজ-মার্কিনের লেজ ধরে স্বাধীন হলে সবই হয়, এ বাবা মার্কিনী বিচার।—এ শিউশরণ, তোমার তো ভাই টাইমের কাজ নয়, আমি আগে নেয়ে নি?'

'হাঁ, হাঁ।'

মতিলাল নাইতে শুরু করে। জলের কলের লাইন থেকে যারা এসেছিল তারা ফিরে যায়।

স্নান শেষ হতে হতে মতিলাল টের পায়, জলের কলের লাইনে একটা গোল বেধেছে। চেঁচামেচি তার কানে আসে। লক্ষ্মী আর কজনের সঙ্গে লাইন ছেড়ে তার সঙ্গে কথা কইতে এসেছিল, লক্ষ্মীর পরিচিত তীক্ষ্ম ও চড়া গলার আওয়াজ গোলমাল ছাপিয়ে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে কাছে গিয়ে দেখে, লাইন ছেড়ে যারা তার সঙ্গে কথা কইতে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গেই লাইনের অন্য কয়েকজনের ঝগড়া বেধেছে।

লাইনের যেখান থেকে তারা মোটে দু-মিনিটের জন্য সরে গিয়েছিল ফিরে এসে

তারা আবার সেইখানে দাঁড়াতে চায় কিন্তু কয়েকজন তাদের এ-দাবি মানতে রাজী নয়। তারা বলছে, এদের দাঁড়াতে হবে সকলের পিছনে।

কারণ, তা-ই নিয়ম, জলার্থীদের রাস্তায় দাঁড়ানো পার্লামেণ্টের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আইন।

অনেকটা মতিলালের চেষ্টাতেই আইনটা পাশ হয়েছিল। শুধু লাইনে দাঁড়ানোর আইন নয় অন্যান্য কয়েকটা ধারাও পাশ হয়েছে। একজন ক-বালতি জল পাবে, কখন খাবার জল নেওয়া ছাড়া মুখ হাত ধোয়া পর্যন্ত চলবে না, কখন চলবে, এসব বিষয়েও নিয়ম ঠিক করা হয়েছে, সকলে স্বীকার করেছে নিয়ম মেনে চলবে। নানা অবস্থার বয়সের লোক এসে কলে ভিড় করত, বস্তি থেকে আরম্ভ করে অধিকাংশ দোকান-পাট ঘরবাড়ির আনাচ-কানাচ রিফিউজিতে ভরে যাবার পর ভিড় অসম্ভব রকম বেড়ে যায়, বিশেষ করে এই ভোরের দিকে। প্রতিদিন হাতাহাতির উপক্রম হত, ছোটখাট মারামারি বেধেও যেত প্রায়ই। ভোরে বেশী মজুর হাজির থাকায় মারামারিটা গড়াত না, অল্পেই থেমে যেত। মতিলাল এতদিন সকলের জন্য একরকম নিয়ম চালু করার কথা বলে। কলোনির ফকিরবাবু খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বালতি-কলসি রেখে, এমনকি আগের রাত্রে ভাঙা মাটির কলসি বসিয়ে লাইনে জায়গা দখল করে রাখা নিয়েই ঝগড়া হত সবচেয়ে বেশী। তাই নিয়ম হয়, লাইনে যে হাজির থাকবে তারই জল নেবার অধিকার, বালতি-কলসির নয়। লাইন ছেড়ে চলে গেলে ফিরে এসে সকলের পিছনে দাঁড়াতে হবে।

এই নিয়মের ব্যাখ্যা আর প্রয়োগ নিয়েই আজ গোল বেধেছে।

আর একটা নিয়ম হয়েছিল, ভোরে একজন এক বালতি বা এক কলসির বেশী জল পাবে না, সাতটার পর দু-বালতি বা দু-কলসি। ফকিরবাবু নিয়ম করার সময় খুব লাফিয়ে ছিল, পরদিন সে পাঁচটি বাচ্চা, দুটি বড় কলসি আর চারটি বড় বালতি নিয়ে হাজির—বোধ হয় প্রতিবেশীর কাছে ধার করে; বাচ্চাগুলি তার নিজের।

ঝগড়া আরম্ভ করেছিল লক্ষ্মী, সকলে তার পক্ষ নিয়েছিল। কিন্তু ফকিরবাবু কিছুতে মানবে না সে নিয়ম ভেঙেছে। নিয়ম হল একজনের এক বালতি—সে তো বেশী চাইছে না। বাচ্চারা কি মানুষ নয়!

অন্য কয়েকজনও ছেলে-মেয়ে সাথে এনেছিল কিন্তু ফকিরবাবুর মতো অতটা চালাক হতে কেউ পেরে ওঠেনি। এই গণ্ডগোলের পর নতুন নিয়ম হয় প্রত্যেকের জন্য এক বালতি জল বরাদ্দ বটে কিন্তু সে এমন বালতি হবে যা জল ভরে নিজে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। ফকিরবাবু হম্বিতম্বি করেছিল অনেক, কিন্তু সকলে মিলে যে নিয়ম করেছে তা না মেনে উপায় কি। তাছাড়া কলোনির দু-তিনজন ভদ্রলোকও তার বিপক্ষে দাঁড়ায়। স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করে যে এসব ফকিরবাবুর অন্যায়।

আজও ফকিরবাবুই চেঁচাচ্ছে বেশী।

'যা নিয়ম আছে তা মানতে হবে। তোমরা কোন লাটসায়েব যে খুশীমতো নিয়ম ভাঙবে? চলবে না ওসব, পিছনে দাঁড়াতে হবে তোমাদের, সবার পিছনে।

লক্ষ্মী আকাশ-চেরা গলা শেষ পর্দায় তুলে বলে, 'আরে মরণ মোর! নিয়ম

ভাঙলাম কিসে? দু-পা গিয়ে দু-দণ্ড একটা লোকের সাথে কথা কয়েছি, তাতে লাইন ছেড়ে যাওয়া হল কোনখানটায়? একটা লোকের জোয়ান ছেলেটা কতকাল বিনা বিচারে আটক রয়েছে আজ নাকি তার বিচার হবে সবার সাথে, বাপটাকে দেখে দুটো কথা শুধিয়ে না এসে থাকতে পারে মানুষ? তাতেই লাইন ছাড়া হল! এ কোন দেশী বিচার গো মা! তুমি যে নর্দমায় জল করতে যাও, সেটা লাইন ছাড়া হয় না কেন? পিছনে দাঁড়াও না কেন জল করে এসে?'

মতিলাল কাছে এলে লক্ষ্মী বলে, 'ও মতিলাল, একটা বিচার কর।'

ফকিরবাবু বলে, 'মতিলাল আবার কি বিচার করবে! বিচারের কি আছে? লাইন ছেড়ে গেলে পিছনে দাঁড়াতে হবে, সোজা কথা!'

কিন্তু মতিলালকে এত সহজে বাতিল করা সম্ভব নয়। বেশীর ভাগ যারা চুপ করে ঝগড়া শুনছিল, বুঝে উঠতে পারছিল না কোন পক্ষের যুক্তি সার্থক, তারা বলে, 'না না, মতিলাল কি বলে শোনা যাক।'

দেখা যায়, ফকিরবাবুকে সমর্থন করেছে তাদের মধ্যেও কয়েকজন মতিলালের কথা শুনতে ইচ্ছুক।

মতিলাল গামছা দিয়ে মুখ মুছে ফকিরবাবুর দিকে চেয়ে বলে, 'মোরা হেথা বেশীর ভাগ গরিব মানুষ বাবু, খেটে খাই।'

মতিলাল একটু থামে। সকলে চুপ করে শোনে। কলে জল এসেছে, তলে বসানো বালতিতে জল পড়ার শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়।

মতিলাল বলে, 'মোরা এ'টো কথা বলি না বাবু, বমি করে খাই না।'

সে আবার একটু থামে। বোঝা যায় ফকিরবাবু বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করছে। মতিলাল তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে আনে।

বলে, 'মোরা দশজনে মিলে নিয়ম করেছি, নিয়মটা মোদের মানতে হবে। কেউ তো খুশী মতো নিয়ম মোদের ঘাড়ে চাপায়নি, মোদের কি বলার আছে কানে না তুলেই। তোমাদের কিন্তু লক্ষ্মী পিছনে দাঁড়ানো উচিত। মোদের নিয়ম মোরাই যদি না মানি তো মানবে কে?'

লক্ষ্মী নরম সুরে প্রতিবাদ জানায়, 'বিনা বিচারে আটকের বিচারটা কি ব্যাপার একটুখানি জানতে গেলাম—'

মতিলাল মাথা নেড়ে বলে, 'তা বললে চলবে কেন! লাইন ছেড়ে না গেলেই হত, আমি এখান দিয়ে যাবার সময় শুধোতে পারতে, ঘরে গিয়ে জানতে পারতে। জরুরী বলে যদি লাইন ছেড়ে না গিয়ে পারনি, তার দামটুকু দিতে হবে না?'

বুড়ো পটল বলে, 'ঠিক কথা!'

বলে সে বালতি হাতে লম্বা লাইনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য পা বাড়িয়েছে, জোয়ান বয়সী খলিল তার হাত ধরে লাইনে নিজের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয়।

বলে 'আমার তাড়া নেই, পিছনে যাচ্ছি। বুড়ো মানুষ, তোমার কষ্ট হবে।'

খলিলের জল পাবার পালা আসতে বাকি ছিল মোটে চারজন। বিনা দ্বিধায় সে সতের জনের পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়।

লাইনের মাঝামাঝি জায়গা থেকে সুখী ডেকে বলে, 'অ লক্ষ্মীদিদি তুমি বরং মোর যায়গায় এসে দাঁড়াও। মেয়েটার জ্বর কমেনি, না?'

যারা মতিলালের সঙ্গে কথা কইতে লাইন ছেড়ে ছিল তাদের উদ্দেশ করে লাইনের সামনের দিকের আর একজন বলে, 'তোমাদের কারো যদি তাড়া থাকে ভাই—'

একটি বখাটে ছেলের কাহিনী

অশ্লীল গল্প পড়া, অশ্লীল কথাবার্তা গাল-গল্পের আড্ডায় জমে যাওয়া, ছাপা লেখা আর ছবির যে আধুনিক অশ্লীলতা প্রচার-বন্যা চালানো হয়েছে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা দাঁড়িয়েছে সমরেশের বাতিক।

খেলাধুলো নয়, নোংরা না হলে সিনেমা দেখা নয়, যৌনবিজ্ঞান ছাড়া কোন রকম সত্যিকারের কাজের কথার আউট-বুক পড়া নয়—শুধু পরীক্ষা পাশ করা আর অশ্লীলতার মানসিক চর্চায় মেতে থাকা।

অবাধ্য একগুঁয়ে গোঁয়ার ছেলে, কবে কোন গুণ্ডামি বা বজ্জাতির দায়ে জেলে যাবে এই হল বাড়ির লোকের ভয়। কিন্তু যতই আড্ডা দিয়ে আর মারামারি করে বেড়াক, আসলে তার ছিল নিছক মানসিক অশ্লীলতার ঝোঁক। তার ছেলেবেলার বন্ধু কুমার বললে, 'দোষ কিন্তু আপনাদের। ছেলেবেলা থেকে দেখে শুনে আসছি তো সব। এদিকে আদরের শেষ নেই, ওদিকে ভীষণ রকম কড়াকড়ি—এটা কোরো না, ওটা কোরো না, এর সঙ্গে মিশো না, ওর সঙ্গে মিশো না।'

সমরেশের মা সাবিত্রী বলে, 'ওনার সে বাতিক ছিল কিন্তু তখন তো বিগড়ে যায়নি। উনি মারা যাবার পর কি রকম হয়ে গেল। তেমন দোষ না করলে পরমেশ ওকে ধমকও দেয় না।'

'সমরও সুযোগ পেয়ে বখাটেপনার সাধ মেটাচ্ছে।' সমরেশের বোন সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করে, কড়া শাসনে রাখলে এ রকম হত না বলছ?'

কুমার হেসে বললে, 'এত বড় ছেলেকে কত আর কড়া শাসনে রাখা যেত? বিকার আগেই জন্মে গিয়েছিল—বেশী শাসন করতে গেলে আরও বিগড়ে যেত। বখে গেলেও মানুষ আছে, শাসনে হয়তো খাঁটি গুণ্ডা বনে যেত।'

কুমার মাথা নাড়ে 'ঠিকমতো সায়েণ্টিফিক চিকিৎসা হলে সারানো যায়, গায়ের জোরে কিছু হয় না।'

সুমিত্রা আবদারের সুরে বললে, 'তুমি তো সাইকলজির ছাত্র, বুঝিয়ে ব্যারামটা সারিয়ে দিতে পার না। কি নোংরা সব বই যে পড়ে! বলতে গেলে রেগে যায়—ওসব বিজ্ঞানের বই আমরা কি বুঝব।'

কুমার হেসে বললে, 'ছেলেবেলার বন্ধু, আমার কথা কি শোনে? হেসে উড়িয়ে দেয়, নয় ঝগড়া হয়ে যায়। আজকাল এমনিতেই আমায় নীতিবাগীশ সুবোধ ছেলে বলে টিটকারী দেয়।

ছেলেবেলার বন্ধুর বোন প্রায় সমবয়সী সুমিত্রা সকাল বেলা এসে বলে যায়, 'এ বেলা তুমি আমাদের ওখানে খাবে।'

আকস্মিক কিছু নয়। বাড়িতে ভালমন্দ বিশেষ কিছু রান্না হলেও কুমারের মা তাকে ডেকে পাঠায়—বিশেষ ব্যাপারে বিশেষ রান্না বান্না হলে তো কথাই নেই।

ছুটির দিন। শ্যামসুন্দরের বৈঠকখানায় বেলা দশটা নাগাদ যথারীতি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্যা নিয়ে তর্ক ও আলোচনার আড্ডা শুরু হয় কিন্তু যেন জমে না। বাপ মরবার পর শ্যামসুন্দর বছর খানেক বাড়িঘর টাকাকড়ি কারবার ইত্যাদি সব কিছুর মালিক হয়েছে। নতুন বৌ তৈরি করে দেয় আর বিধবা মা ঘন ঘন চা আর দু-এক রকম ভাজাভুজি সরবরাহ করে যায়, আড্ডা তবু যেন জমে না।

সব দায় ঘাড়ে চেপে থাকে, সব কিছুর মালিকও তো শ্যামসুন্দর হয়েছে, সে তো এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবু কেমন ঝিমিয়ে গেছে।

অনেক বেলায় বিরক্ত কুমার সুমিত্রার নিমন্ত্রণ রাখতে যায়।

বাড়ি একেবারে শূন্য বলে কুমারকে বিব্রত হতে দেখে সুমিত্রা খিলখিল করে হেসে ওঠে।

'আজ বেবীর বিয়ে, সকালবেলাই সবাই চলে যাবে, খেয়াল ছিল না? পরশু এসে নিজেই তো শুনে গেলে।'

'খেয়াল ছিল বৈকি। আমাকেও তো যেতে বলেছে। তবু দেখতে এলাম ব্যাপার কি। এসে দরজায় তালা বন্ধ দেখে জব্দ হয়ে যাব, তুমি এরকম সস্তা তামাসা করতে শিখেছ কিনা।'

'দেখেছই তো তামাসা নয়। বাড়িতে কেউ জানে না তোমায় খেতে বলেছি। মতলব হল—রেঁধে বেড়ে তোমায় খাওয়াবো, দাদা কি বই পড়ে, কি ছবি দ্যাখে, কি কবিতা লেখে, সে সব তোমায় দেখাব—এই বিকারের মানেটা তোমার কাছ থেকে বুঝে নেব।'

'তবেই দফা সেরেছে। আমার যে জরুরী কাজ আছে।'

'কাজের ছুতোয় আমার সাধ না মিটিয়ে যদি চলে যাও—জীবনে তোমার সঙ্গে কথা কইব না।'

কুমার একটু ভেবে বলে, 'সমব কোথায়?' সুমিত্রা বলে, 'কোথায় আবার—বিয়ে বাড়িতে। কাল ওখানে গেছে। হৈ চৈ পেলে আর কথা আছে?'

সুমিত্রা যত্ন করে তাকে খাওয়ায়। কুমার আনমনে খায়, উসখুস করে। একটু বিরক্ত বিষণ্ণ মুখেই সুমিত্রা তার অস্বস্তি লক্ষ্য করে।

দু রকম মাছ রেঁধেছিল। কুমার একটা বাটিতে হাত দিতেই বাটিটা চেপে ধরে। রেগে বলে, দু'বার বললাম এটা পেঁয়াজ দিয়ে রাঁধা—এ মাছটা পরে খাবে, নইলে ঝোলের মাছের স্বাদ পাবে না। এত কষ্ট করে রেঁধেছি, এভাবে খেলে বিশ্রী লাগে মানুষের। একটা কথা ভুলে যেও না—তোমার বন্ধুর মতো আমিও বখাটে হয়ে যাইনি। আমার কাণ্ডজ্ঞান আছে। আমি ওর বিকারটা বুঝতে চাই, ওকে

শোধরাতে চাই—খালি বাড়িতে তোমায় ডাকার সময় আর কিছুই আমি ভাবিনি। কাজেই, নিশ্চিন্ত মনে ভাল করে খাও।'

'লোকে কি বলবে?'

'যা খুশী বলুক।'

এবার কুমার একটু হেসে বলে, 'মেয়ের পক্ষে এটাও কিন্তু বখাটেপনার লক্ষণ—লোকে কি বলবে গ্রাহ্য না করা।'

পরমেশ হঠাৎ একদিন মারা যায়। সংসারের দায় টানতে তার শরীর ভেঙে পড়েছিল।

বাপের আয় ছিল ভাল, সংসারে ছিল সচ্ছলতা। অল্প আয়েই সে সংসারকে টেনে চলা কি ব্যাপার, তারও একটা উদাহরণ রেখে গেল।

সবাই ভেবেছিল, এবার সে সামলে যাবে—সংসারের দায় ঘাড়ে চেপেছে. আর সে ছ্যাবলামি করে বেড়াবে না।

দেখা গেল, অতি তাড়াতাড়ি সমরেশ বদলে গেল কিন্তু রয়ে গেল বখাটেই।

জনৈক আত্মীয়ের অনুগ্রহে একটা চাকরি জুটল, পরমেশের বেতনের অর্ধেকের চেয়ে কম বেতনে। শুধু চাকরিটাই সে করে যেতে লাগল পড়া চালিয়ে পরীক্ষা পাশ করে যাওয়ার মতো যথানিয়মে—বাকি সময় কাটাতে লাগল আড্ডা মেরে।

সকালে বাজারটা এনে দিয়েই আড্ডা মারতে যায়। সময় মতো এসে নেয়ে খেয়ে যায় আপিসে। বাড়ি ফেরে রাত বারটায়।

কোথায় যায়, কি করে, কে জানে।

কুমারের যে কী বিষম দায়।

একদিন সুমিত্রা এসে কুমারকে বলে, 'সম্পর্ক চুকিয়ে দিলে নাকি! একবার উঁকি মারতেও যাও না!'

কুমার বলে, 'সময় পাই না, করব কি?'

'বাপের টাকার কাঁড়িটা আরও বাড়াতে খুব ব্যস্ত, না?'

বাপের টাকার কাঁড়ি! সমরেশ সব জানে কিন্তু তার বোন বিশ্বাস করে না তাদের বড়লোকত্ব তার বাপের আমলেই ফুরিয়ে গিয়েছিল।

সুমিত্রা বলে, 'যাই হোক, মা তোমায় একবার যেতে বলেছে। সময় নেই বললে চলবে না—জরুরী ব্যাপার।'

'কি ব্যাপার?'

'গিয়েই শুনো।'

সুমিত্রার মুখ ম্লান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ নিজের মনে টেবিলের কাঠটা খোঁটে।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, 'একটা টেবল ক্লথও জোটে না? কী সুন্দর ছিল তোমার সেই টেব্‌ল ক্লথটা।'

কুমার নীরবে একটু হাসে।

পাঁচ-ছ বছর আগে প্রণতি বানিয়ে দিয়েছিল সেই টেবিলের ঢাকনিটা।

দু-একদিনের মধ্যে বোনেরা মিলে ওর চেয়েও সুন্দর টেবিল ঢাকনা তাকে বানিয়ে দিতে পারে—দয়া করে সে যদি শুধু দামী কাপড় আর রঙীন সুতো এনে দেয়।

সুমিত্রা হঠাৎ মুখ তুলে বলে, 'বলতে ভুলে গেছি। মা বলেছে, দাদা যখন বাড়ি থাকবে না তখন যেও। দাদার বিষয়ে কথা কিনা। দুপুরের দিকেই যেও আজকালের মধ্যে একদিন!'

কুমার হেসে বলে, 'সমরকে নিয়ে এমন জরুরী ব্যাপার? মাসীমা নিশ্চয় ওর বিয়ে দিতে পাগল হয়েছে, ও নিশ্চয় বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না, মাসীমা নিশ্চয় ওকে বুঝিয়ে রাজী করানোর কথা বলতে আমায় ডেকেছে।'

সুমিত্রা নীরবে ম্লান মুখে মাথা নাড়ে।

'তবে কি? একটু আভাস দিয়ে গেলে হত না? ভাবনাচিন্তা করে যাবার সময় পেতাম।'

'আমি কিছু বলতে পারব না। গিয়ে সব শুনো। কাল যাবে, না—পরশু দুপুরে খেতে যাবে বলো! কিছু রেঁধে রাখতে হবে তো!'

'কাল পরশু কেন, আজকেই যাব। যেতে যেতে দেড়টা-দুটো বেজে যাবে কিন্তু।'

'বাজুক।'

সাবিত্রী মা তাকে ভাত দেয় না, ভেজিটেবল ঘিয়ের লুচি আর দোকান থেকে কিনে আনা রান্না করা মাংস খাওয়ায়—ঘরে রান্না ডাল তরকারি ভাজাও দেয়।

খেতে বসে কুমার বলে, 'খেতে খেতেই বলুন মাসীমা, আমার একদম সময় নেই!'

সাবিত্রী চিরদিনের মতোই আদরের সুরে বলে, 'ব্যাটা-ছেলের সময় না থাকাই সুখের কথা বাবা। রাশি রাশি কাজ করবে, রাশি রাশি পয়সা কামাবে, দিনরাত ব্যস্ত হয়ে থাকবে। তবে শরীর দিয়ে তো কাজ, শরীর ঠিক থাকলে কাজও ঠিকমতো করা যায়। শরীর বিগড়ে গেলে এক ঘণ্টার কাজ দশ ঘণ্টা খেটেও করা যায় না।'

কুমার ভাবে, সেরেছে! এমন লম্বা বক্তৃতা দিয়ে শুরু।

নিরামিষ ঘিয়ে টাট্‌কা ভাজা ফুলকো দুটি লুচি তার পাতে দিয়ে সাবিত্রী কিন্তু আসল প্রসঙ্গে আসে, 'তুমি ছেলেবেলার বন্ধু, ভাইয়ের বাড়া। সমরের কি অসুখ হয়েছে লুকোচুরি না করে আমায় বলতেই হবে বাবা। ওর জ্ঞানবুদ্ধি কম, ঝোঁকের মাথায় চলে—ওর ওপরে ছেড়ে দিলে চলবে না। আমায় কিছু বলে না, রেগে উড়িয়ে দেয়! কি বিশ্রী মেজাজ যে হয়েছে! জানলে বুঝলে ব্যবস্থা হয়তো একটা করতে পারব। গোপন করতে পারবে না, তোমায় বলতেই হবে অসুখটা কি?'

'সমরের অসুখ? আমি তো কিছুই জানি না—'

সাবিত্রী যেন আকাশ থেকে নেমে বলে, 'ওর যে কঠিন অসুখ তুমি তা জান না বলতে চাও?'

'ওর কঠিন অসুখ হয়েছে জেনেও আমি কি চুপ করে থাকতাম মাসীমা!'

দু-জনে চুপ করে থাকে।

ফেলে ছড়িয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে কুমার।

মরিয়া হয়ে সাবিত্রী বলে, 'ওর অসুখটা তুমি সহজে জেনে আমাদেব জানাতে পার।'

কুমার ক্লিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'সংসার খরচের টাকা পয়সা দেয় না নিয়মমতো?'

'ও-ই তো টানছে। বখামি করে টানছে। বখামির পয়সার জন্য কত কি যে বেচে দিয়েছে বলা যায় না। সেদিন মরল ভাইটা, তার শখের দামী ঘড়িটা পর্যন্ত বেচে দিয়েছে। সুমিত্রা বলে, যাকগে, দুবছর খাওয়া তো ঠিকমতো চালিয়ে আসছে আমাদের। ওর শরীরটা ভেঙে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

কুমার বলে, 'অনেকদিন দেখা হয়নি। দু-একদিনের মধ্যে দেখা করব। অসুখ হয়েছে কিনা জানি না—জানতে পারলে নিশ্চয় জানিয়ে যাব।'

খেয়ে উঠে মিনিট দশেক বিশ্রাম করেই কুমার বিদায় নেয়।

মোড়ে দেখা হয়ে যায় সমরেশের পূর্বতন বখাটে ক্লাস-ফ্রেন্ড মনোজের সঙ্গে।

কুমার নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'ভাল আছেন? ছুটির দিনে অসময়ে কোথায় চলেছেন?'

মনোজ দাঁত বার করে হাসে। বলে, 'আড্ডা দিতে।'

কুমার বিরক্তি গোপন করে বলে, 'এখনও বয়স হল না?'

'সকলের এক সঙ্গে বয়স হয়ে গেলে চলবে কেন!'

মনোজ আর দাঁড়াল না।

কুমার এগোতে লাগল। সমরেশের ব্যাপারটা সম্পর্কে গভীরভাবে ভাববার চেষ্টা করবে কুমার। অন্তত চেষ্টা করল গভীরভাবে ভাবতে। হঠাৎ মনে হল সমরেশ সুমিত্রার দাদা ; এবং সুমিত্রাও দস্তুরমতো সমরেশের জন্য চিন্তিত। সুমিত্রা এবং কুমারের ভাবনার কায়দাটা একই রকমের। কুমারের আবার ভাবতে ভালো লাগল এই একটি বিষয় নিয়ে সুমিত্রা মাঝে মাঝে নির্জন দুপুরবেলা তাকে নিমন্ত্রণ করবে। এই মুহূর্তে কুমার সমরেশের জন্য ভীষণ রকমের বিরক্তি বোধ করল। এমন বখাটেপনা তার সাজে না। কুমারের সচ্চরিত্রতাও কি তাকে আকর্ষণ করে না। আরো একটু ভালোভাবে রোজগার করে আরো দশজন প্রাণীর মতো সভ্য ভদ্র ও সামাজিক হতে পারত না কি? কই, একবারও যদি মুখ ফুটে কুমারকে জানাত, তারই কারখানায় সুপারভাইজারের চাকরি যোগাড় করে দিত। নিশ্চিত।

কুমার সমরেশের বখাটেপনার আর একটি দিক এতদিন পরে আবিষ্কার করল। বড়লোক বন্ধুর বন্ধুত্বকে উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে না সে। ওই একটি লোক তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। অথচ ওর মারফতে ওদের বাড়ির সঙ্গে আলাপ। ওর মা-বোনের সামনে দাঁড়ালে কেমন নিজেকে অভিভাবুক-অভিভাবক মনে হয়।

কিন্তু সমরেশের ব্যবহারে স্পষ্ট নির্লিপ্ত ভাব আছে। বড় বেশী নিরুত্তাপ।

সে যেন বাড়ির হয়েও বাড়ির আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠেনি। ওর জোর বাইরে, বখাটেপনার, একগ‍্ুঁয়েমির।

তারপর একদিন এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে গেল।

কুমারের কারখানায় কয়েকটি ছোটখাটো দাবি নিয়ে মাত্র কয়েকদিনের নোটিশে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে দিল।

মালিকের আহ্বানে ওদের সংঘের নেতা সাক্ষাৎ করল চেম্বারে। তাকে দেখেই চমকে উঠল কুমার।

'তুই।'

'হ্যাঁ আমি।'

'বোস, বোস তোর সংগে অনেক কথা আছে।'

'ঠিক আছে।'

সমরেশ বসল।

'সিগারেট?'

'না থাক।'

কুমার বলে, 'মাসীমা বলছিলেন তোর নাকি শক্ত অসুখ!'

সমরেশ হাসল।

কুমার বলে, 'বখামি করার কি বয়স আছে এখনো? হৈ হৈ আড্ডা। বাড়ির প্রতি কি তোর কর্তব্য নেই? শোন্, তোর জন্য একটা চাকরি ঠিক করেছি আমারই কারখানায়। আপাতত আড়াইশ মাইনে—'

সমরেশ আবার হাসল, বলে, 'আমি যে জন্য এসেছিলাম—'

কুমার বলে, 'জানি জানি। বখাটেপনার চূড়ান্ত করেছ। এবার একটু সভ্যভব্য হও।'

সমরেশ বলে, 'আমার অসুখ আর যাবে না।'

'অসুখকে প্রশ্রয় দিতে নেই। নতুন কি কবিতা লিখলি বল।'

'কবিতা লিখিনি।'

'জানিস আমার কি মনে হয়? যৌনসমস্যা আজকের যুগের এক মর্মান্তিক সমস্যা। এ নিয়ে তুই গবেষণা করছিস। এই লাইনের ভবিষ্যৎ আছে।'

সমরেশ উঠে দাঁড়াল। বলে, 'চলি। বাইরে ওরা দাঁড়িয়ে আছে।'

'তার মানে।'

'মানে একটাই।'

কুমার মূক।

সমরেশ বলে, 'ভেবে দেখলাম যৌন অত্যাচারের হাত থেকে মানুষের উদ্ধার পেতে হলে প্রথম প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। মানুষ তার শ্রম খাটিয়ে ভালো ভাবে বাঁচতে শিখলে অনেক গ্লানির পাঁক থেকে সে নিজেকে তুলে ধরতে পারবে। তাই—'

সমরেশ আর দাঁড়াল না। বাইরে ওরা অপেক্ষা করছে। কুমার যদি তার সংগে মুখোমুখি হতে চায় তাহলে তাকে বাইরেই আসতে হবে।

উপায়

কলকাতা শহরের একেবারে চোখের সামনে তখনও উপায়হীন নিরাশ্রয় মানুষগুলি এই স্টেশনের আশ্রয়টুকুতে গরু-ছাগলের মতো গাদাগাদি করে দিনরাত্রি কাটাচ্ছিল অল্প কিছুদিন আগেও।

একখানা চাটাই যতটা যায়গা জুড়তে পারে ঠিক ততটাই ছিল মল্লিকাদের ঠাঁই। মল্লিকা, তার স্বামী ভূষণ, আড়াই বছরের ছেলে খোকন ও বিধবা ননদ আশা। টিনের তোরঙ্গ, কাঁথা-বালিশের পুঁটলি আর ঘটিবাটি কটার স্থানও তারই মধ্যে।

আরও একটি সকাল হয়েছে। সূর্যের বোধ হয় উপায় নেই উদয় হয়ে রাত ভোর না করে—নইলে কেন যে এই কুৎসিৎ নিষ্ঠুর পৃথিবীতে রাত পোহায়। আজ তাদের মুখে দেবারও কিছুই নেই। ভোর থেকে ছেলেটা কান্না শুরু করেছে। বেলা বাড়তে বাড়তে এখন গেছে ঝিমিয়ে। থেকে থেকে উঁ উঁ করে কান্নার সুর টানে, আবার থেমে যায়।

রামলোচনকে সঙ্গে নিয়ে মানব-কল্যাণ ও জনসেবা-মহাসমিতির প্রমথকে তাদের চাটাই-রাজ্যের কাছে এসে দাঁড়াতে দেখে মল্লিকা চোখ তুলে তাকায়। আশা মাথায় কাপড় তুলে কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দেয়। এখন ভূষণের জ্বর কম। ভাঁজ করা একখানা কাপড় গায়ে জড়িয়ে বসে বসে সে যেমন ঝিমোচ্ছিল তেমনি ঝিমোতে থাকে। প্রমথের আবির্ভাবকে সে যেন গ্রাহ্যও করে না।

অমন কত মানুষ এসেছে—গিয়েছে। সংঘ থেকে, সমিতি থেকে, সভা থেকে, খবরের কাগজের আপিস থেকে। এতটুকু এদিক-ওদিক হয়নি তার অবস্থার। সরকারের ভরসা আর বিশেষ রাখে না, এদের ভরসা খানিক ছিল। কিন্তু স্টেশনের এই নরক গুলজার করেই তাদের দিন কাটছে। শোনা যাচ্ছে, শীগগির নাকি স্টেশনের এই আশ্রয় থেকেও তাদের ভাগিয়ে দেওয়া হবে।

'জ্বর কেমন?'

প্রমথের প্রশ্নের জবাব মল্লিকাই দেয়ঃ 'অখন কমছে। আবার আইবো কাঁপাইয়া।'

বেশভূষা ও কথাবার্তা চালচলনে প্রমথ সম্ভ্রান্ত ঘরের প্রৌঢ়বয়সী সংসারী পিতার মতো। সেইজন্যই এটা আরও বেশী রকম খাপছাড়া ও ক্ষোভজনক মনে হয় যে, এই নিয়ে মানুষটা চারবার খবরাখবর জানতে এবং সহানুভূতি জানাতে এল অথচ কোনদিক দিয়ে এতটুকু উপকার তাদের হল না। আজ তারা একেবারে উপোস দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছেছে!

মল্লিকা আজ কথা বাড়ায় না, সোজাসুজি বলে, 'কই, আমাগো লেইগা কিছু তো করলেন না? আপনাগো ভরসায় আছি।'

প্রমথ বলে, 'আমরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। কজনের জন্য ব্যবস্থা করব? আপনারা নিজেরা যদি একটু গা-ঝাড়া না দিয়ে উঠেন, সচেষ্ট না হন—'

মল্লিকা বলে, 'গা-ঝাড়া দিমু? চেষ্টা করুম? ফল যদি ভাল হয় অখন খাড়াইয়া উলঙ্গ হইয়া গা-ঝাড়া দিতেছি। নাইচা-কুঁইদা হাত-পা ছুইড়া চেষ্টা করতেছি। আর কি করনের আছে কন?'

কথায় যত ঝাঁঝ থাক খোঁচা থাক, দিশেহারা আর্তনাদের আওয়াজ নেই, মুখে নেই ক্রোধ আর ক্ষোভের বিকৃতি। নিরুপায় মানুষের এই ভাবটা প্রমথর কাছে বড় ভয়ংকর ঠেকে। এতো আর কিছু নয়, দরদভরা ভাল কথার জবাবে অবজ্ঞার সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া যে উপদেশ ঝেড়ো না, কি উপায় আছে কি করার আছে বল, উপদেশ ঝেড়ো না!

বাস্তব বুদ্ধি টনটনে প্রমথের—এত বেশী টনটনে যে মাঝে মাঝে বুদ্ধি কষতে কষতে অকারণে অর্থহীনভাবে বুকের শিরা মাথার শিরা তার আতংকে টনটন করে।

একটু বিনয় দিয়ে মল্লিকাকে ঠান্ডা ও গরম করতে চেয়ে সে বলে, 'কি আর বলব!' আপনারা বন্যার মতো আসছেন, সরকার বাহাদুর সামলাতে পারছেন না, আমরা কজনের জন্য ব্যবস্থা করব বলুন? বন্যা ভূমিকম্পের মতো এও হল ভগবানের মার। ভগবানের অবশ্য আমাদের মতো দীনহীন ব্যক্তিকে দিয়ে যতটুকু প্রতিকার করাতে চান করিয়ে নেন। নইলে আপনাদের মতো মেয়েরা এত কষ্ট পাচ্ছেন এটা আমায় এত ব্যাকুল করবে কেন, ঘর থেকে টেনে বার করবে কেন!'

'মুখপোড়া ভগবানের কথা কওনের কাম কি?'

প্রমথ সামলে নেয়।

ফাঁকা কথা ছেড়ে চট করে সে কাজের কথায় আসে। বলে, 'দেখুন, অবস্থার ওপরে তো আমাদের কোন হাত নেই। আপনি যদি করতে চান, আপনাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারি। রোজগার ভালই হবে।'

মল্লিকা বলে, 'ওনারে একটা কাজ দেন না? ম্যালেরিয়া জ্বর, কাইল ছাইড়া যাইবো। পরশু বিশ্রাম কইরা পরের দিন কাজে লাগবেন।'

ভূষণ এবার রক্তবর্ণ চোখ তুলে তাকায়।

প্রমথ জিভের আওয়াজে আপসোস জানিয়ে বলে, 'ব্যাটাছেলের কাজ? বেটা-ছেলেরা কাজ থেকে ছাঁটাই হচ্ছে। মেয়েদের কিছু কিছু কাজ জুটিয়ে দেওয়া যায়।'

'আমার এই ননদরেও কাজ দিবেন? দুইজনে খাইটা রোজগার করুম।'

দুটি শিকার পাবার আশায় প্রমথ খুশী হয়ে বলে, 'তা দিতে পারি।'

মল্লিকা চোখ নামিয়ে কঙ্কালসার ছেলেটার দিকে তাকায়। খসা ঘোমটা মাথায় তুলে ভূষণের দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বলে, 'তুমি কি কও? আর তো কোন উপায় দেখি না।'

ভূষণ কিছুই বলে না। হাতের আঙুলগুলি সে শুধু ঘন ঘন মুঠো করে আর খোলে।

মল্লিকা বলে, 'ভগবান! কপালে এও লিখছিলা?'

অভ্যাসবশে ভগবানকে ডাকে কিন্তু নালিশের মতো শোনায় না তার কথা। এভাবে শেষবারের মতো ডেকে সে যেন চিরতরে বাতিল করে দিতে চায় ভগবানকে।

'বেশ, কাম করুম। যে কাম জুটাইয়া দিবেন তাই করুম। উলঙ্গ হইয়া নাচার কাম দ্যান, উলঙ্গ হইয়া নাচুম। কিন্তু মাথা গুইজা থাকনের লেইগা একখান ঘর দিবেন তো আগে? একখান ঘিরা ঘর আর এট্টু দুধ না পাইলে পোলাটা মইরা যাইব গা।'

প্রমথ মনে মনে হিসাব কষে, বলে, 'ঘর পাবে, দুধও পাবে। মাইনের কিছু টাকা আগাম নাও, তাই থেকে ঘরের ভাড়া, দুধের দাম দেবে। একটা রসিদ দিয়ে কয়েকটা টাকা বরং এখুনি নিয়ে নাও। ও-বেলা সকলকে ঘরে নিয়ে যাব।'

হাসিখুশি মুখে প্রমথ একটা সিগারেট ধরায়, মুখে পান নেই এটা তার বিষম রকম বিশ্রী লাগে। তবু ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'রামলোচন, পোয়াটেক দুধ কিনে এনে দাও। তুমি এইখানেই থাক, এদের দেখাশোনা করতে। কত বজ্জাত হারামজাদা যে এদের ঘাড় ভাঙার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে তার কি ঠিক ঠিকানা আছে কিছু। একটু সামলে-সুমলে রেখ।'

মল্লিকা হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে প্রমথের চকচকে পালিশ করা জুতোপরা পা দুটি চেপে ধরে চাপা আর্তনাদের সুরে বলে, 'আপনে মানুষ না, দেবতা?'

প্রমথ বিদায় হবার পর কুড়ি বাইশ বছরের একটি ছেলে এবং প্রায় তার সমবয়সী একটি মেয়ে তাদের কাছে এগিয়ে আসে। কোন কলেজের ছাত্র এবং ছাত্রীই হবে সম্ভবত।

'আপনাদের কাজ দেবে বলেছে?'

'হু।'

'লোকটা ভীষণ বদমাস। কি কাজ দেবে জানেন?'

ছেলেটি এবং মেয়েটি দু'জনে প্রায় দশ মিনিট ধরে প্রমথ মল্লিকাকে কিভাবে কিরকম কাজ দেবে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে।

তাদের কথার মধ্যে রামলোচন একপোয়া গরম দুধ মল্লিকাকে এনে দেয়। ফুঁয়ে ফুঁয়ে দুধ জুড়িয়ে পাতা কাঁথার তল থেকে একটা ঝিনুক বার করে সন্তর্পণে ছেলেটাকে কোলে তুলে মল্লিকা তাকে দুধ খাওয়াতে থাকে। বলে, 'এমন পাজি নাকি লোকটা? আপনারা দেখি সব জানেন, পুলিসে ধরাইয়া দেন না ক্যান?'

ছেলেটি বলে, 'পুলিস ওকে ধরবে না।' মেয়েটি উৎসাহের সঙ্গে বলে, 'আপনি যদি নালিশ করেন তা হলে অন্তত'—বড় দুঃখে মল্লিকার মুখে হাসি ফোটে। 'নালিশ? নালিশ করুম? বইন তুমি সংসার চিনলা না। কি নিয়া নালিশ করুম? আমারে কাম দিবার চায়, আমার ভাল করবার চায়? অখন তো নালিশের কিছু নাই। নালিশের কারণ যখন তখন আমার নালিশ কি, কিসের কি!'

ছেলেটাকে কোল থেকে নামিয়ে ঠেলে একটু তফাতে সরিয়ে দেয়। ছেলেটার উপরেই যেন তার রাগ আর বিতৃষ্ণা। তার চোখ দুটি চকচক করে।

'বজ্জাতি বুঝি না? কেডা সাধু কেডা শয়তান ঠাহর পাই না? সাধু সাইজা আইছে, চোখের নজর ঢাকব কিসে? আমরা ঠেকছি দায়ে—আমাগো দায়টাই আসল। না তো লাথি মাইরা এইসব মানুষের মুখ ভাইঙা দিতে আমরাই পারি। করুম কি, উপায় নাই।'

ছেলে আর মেয়েটি চুপ করে থাকে।

রামলোচন তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাদের লক্ষ্য করছিল—কখন সরে গিয়ে সে একজন পুলিস অফিসারকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

'কি মতলব?'

ছেলেটি বলে, 'আমরা ছাত্র ভলন্টিয়ার।'

খানিক জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের দু'জনের নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে মল্লিকাদের সতর্ক করে দিয়ে অফিসারটি চলে যায়, বলে, 'আজে-বাজে লোকের কথায় ভুলবেন না। সাবধান থাকবেন।'

'কোনখানে সাবধান থাকুম, কি খাইয়া সাবধান থাকুম?'

কিন্তু মল্লিকার প্রশ্ন তার কানে যায় না।

ছেলে আর মেয়েটি চলে গেছে। দেখা যায়, খানিক দূরে রামলোচন বসে আছে। বোধ হয় তাদের পাহারা দিতে, আর কেউ না বাগিয়ে নেয়!

মল্লিকা আশাকে বলে, 'ঠাকুরঝি, তোমার নি শুধু পরকাল। তুমিই কামে যাও —আমাগো বাঁচাও।'

আশা শিউরে উঠে বলে, 'আমি পারুম না—মইরা গেলেও পারুম না।'

মল্লিকা আঁচল দিয়ে চোখ মোছে, শান্ত সুরে বলে, 'মরণের কথা না—আমি নি মরণরে ডরাই? মইরা যদি পোলাটারে বাঁচান যাইত, অখনি মরতাম।'

ভূষণের বাঁচা মরার কথা সে বলে না। সে একরকম স্পষ্টই বলে দেয় যে স্বামীকে বাঁচাবার জন্য সে মরতেও রাজী নয়, প্রমথের ফাঁদে ধরা দিতেও রাজী নয়। ছেলের জন্যে দুয়েই সে রাজী। তবে প্রথমটা হবে নিষ্ফল, সে মরলে ছেলেটার বাঁচার উপায় হবে না, তাই দ্বিতীয়টা বেছে নিয়েছে।

সে আবার মিনতি করে বলে, 'বুইঝ্যা দ্যাখো ঠাকুরঝি। আমাগো তিনটা প্রাণীরে বাঁচাইবা—তোমার কোন কলঙ্ক নাই, পাপ নাই। সুদিন আইলে তোমারে ঘিন্না করুম না—পূজা করুম।'

'আমারে কইও না। আমি পারুম না।'

ভূষণ এতক্ষণ মুখ খোলেনি। এবার সে হঠাৎ ঝেঁঝে বলে, 'কারও অমন কামে গিয়া কাম নাই!'

বলে আবার সে ঝিমিয়ে যায়। তার মাথায় মধ্যে জীবন আর জগৎটা কেমন

খাপছাড়া উদ্ভট হয়ে গেছে—দূরে সরে গেছে। মল্লিকা, আশা, খোকন, নিরাশ্রয় মানুষের ভিড়; দুর্গন্ধ সব কেমন ওলটপালট হয়ে গেছে, অকারণ হয়ে গেছে।

মল্লিকার প্রথম শর্ত ছিল মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই সকলের জন্য। দুপুরে প্রমথের গাড়ি এসে তাদের শহরের একপ্রান্তে ছোট একটি দোতলা বাড়িতে নিয়ে যায়। বোঝা যায়, বাড়িটা ভদ্র পাড়াতেই। নীচের তলায় একখানা ঘর তারা পায়। সদরে যে দারোয়ান বসেছিল সে তালা খুলে দেয় ঘরের।

এ বাড়িতে আগে এক মুসলমান ভাড়াটে ছিল। প্রমথের উদ্যোগে পাড়ায় যখন হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় তখন তারা পালিয়ে যায়। এ কাহিনী মল্লিকাকে শোনায় রামলোচন। প্রমথকে বাড়াবার জন্য তো বটেই, মল্লিকাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতা জাগাবার উদ্দেশ্যেও। তাদের হয়ে প্রমথ খানিকটা প্রতিশোধ নিয়েছে!

বাড়ির আরও চারটি ঘরে আরও চারটি পরিবারকে প্রমথ আশ্রয় দিয়েছে। চারটি পরিবারের মেয়ে-পুরুষ নিস্পৃহ ভোঁতা দৃষ্টিতে মল্লিকাদের আবির্ভাব লক্ষ্য করে।

কারো যেন কিছু বলার নেই, জানার নেই, শোনার নেই।

মল্লিকাদের নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভারও নামে। মল্লিকারা ঢোকে তাদের ঘরে, ড্রাইভার ঢোকে পাশের ঘরে।

মল্লিকা মেয়েলি গলা শোনে: 'এত দেরি কইরা আলেন! আমি অখন গিয়া কখন ফিরুম?'

ড্রাইভারের গলা শোনা যায়: 'কি করব বলুন, আমি তো গাড়ির মালিক নই!'

'ভাড়াটা তো ঠিক মতো নিব আপনার গাড়ির মালিক!

'সেটা তো আর আপনি দেবেন না!

ড্রাইভার গাড়িতে ফিরে যায়। খানিক পরে একটি বৌ, মল্লিকার চেয়ে সে কয়েক বছরের বয়সে বড় হবে, ভাল একখানা শাড়ি পরে ধীরে ধীরে গিয়ে গাড়িতে ওঠে—একা। তার বিষণ্নতায় কঠিন মুখখানা মল্লিকা নজর করে চেয়ে দ্যাখে।

মল্লিকা জানে, বৌটি কোথায় যাচ্ছে। স্টেশনের গাদাগাদি ভিড়ে যে দিনরাত্রিগুলি কেটেছে তার মধ্যেই এসব জানা হয়ে গেছে তার। তাদের বাঁচাবার অসীম আগ্রহ সম্বল করে সেই ছেলে আর মেয়েটিও বিশেষভাবে প্রমথের অনেক রকম ব্যবস্থার কথা খুলে বলেছিল। একেবারে আত্মসমর্পণ করতে পারেনি এমন দু-একটি মেয়ে বৌকে সে নিজেই এমনিভাবে একা চলে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরে আসতে দেখেছে—দু'পাঁচটা টাকা নিয়ে।

খারাপ পাড়ায় ঘণ্টা হিসাবে চড়া ভাড়ায় প্রমথই হয়তো বাসর ঘর ঠিক করে রেখেছে। বৌটির আজ যে নতুন বর হবে সে ঘরের ভাড়া দেবে, গাড়ির ভাড়া দেবে—সব যাবে প্রমথের পকেটে। বৌটির দেহেরও যে ভাড়া দেবে নতুন বরটি—তা থেকেও কমিশন পাবে প্রমথ। ঘরের ভাড়া, দেহের ভাড়া কত হয়, কত কমিশন দিতে হয়, এসব মল্লিকা খুঁটিয়ে জানবার চেষ্টা করেনি।

এবার হয়তো কিছুই আর অজানা থাকবে না!

ঘর গুছোবার ব্যাপার সামান্য—কীইবা সম্বল আছে গুছোবার! এতদিন ভাল

করে পাত-পা ছড়িয়ে শোবারও জায়গা মেলেনি। ভূষণ আর খোকনের শোয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে এমনভাবে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে সে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে পড়ে যে তৈলহীন রুক্ষ চুলের খোঁপা না থাকলে মাথাটা বোধ হয় তার ফেটে যেত।

ভাবতে গিয়ে তার সর্বাঙ্গ ঘেমে গেছে। একটা লোক একসঙ্গে গাড়ি, ঘর আর মেয়েছেলেদের দেহের ব্যবসা চালাচ্ছে প্রকাশ্যভাবে! একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িয়ে।

কানে শুনে অতটা ধারণা করতে পারেনি। চোখে দেখে তার মাথা ঘুরে গেছে।

খোলা দরজা। কলতলায় দু-তিনটি মেয়েবৌ বাসন মাজছে। ওদিকের কোন ঘর থেকে ভূষণের সমবয়সী একজন বাইরের দিকে যেতে যেতে ডাক শুনে দাঁড়ায়।

'দাদা, কথা শুইনা যাও।'

পায়ের জুতো থেকে ধুতি পাঞ্জাবি মাথার চুলে মলিনতা ঠেকিয়ে একটু ভদ্র ও মানুষের মতো হয়ে রাস্তায় বার হবার প্রাণপণ চেষ্টা এত স্পষ্ট মানুষটার।

কলতলা থেকে একটি মেয়ে উঠে আসে। একটু কালো, ছিপছিপে গড়ন, সাধারণ হিসাবে বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে।

খোলা দরজার সামনে থেকে একটু আড়ালে সরে যায় দু'জনে।

'আবার কই যাও?'

'কই আর যামু, কাজের খোঁজে যাই।'

'বৌদির লেইগা ওষুধ আনবা। কি কষ্ট পায় দ্যাখ না? ওষুধ না পার, বিষ আইনো খানিকটা।'

'তুই আমার পাইছস কি? অ্যাঁ, কি পাইছস আমারে?'

মানুষটার চড়া গলা নয়, বোনের গালে চড় বসিয়ে দেবার আওয়াজটা মল্লিকার কানে বেঁধে।

কয়েক মিনিট চুপচাপ। মেয়েটি কলতলায় ফিরে গেছে। দারোয়ানের সঙ্গে প্রৌঢ়-বয়সী সৌখিন চেহারা ও বেশভূষার একজন উঠানে এসে দাঁড়ায়।

কলতলা থেকে মেয়েটি বলে, 'দাদা বাইরে গেছে।'

নবাগত লোকটি বলে, 'হ্যাঁ, রাস্তায় দেখা হল। একটু শুনে যাও।'

মেয়েটি উঠে আসে। 'আবার ক্যান আইছেন?' লোকটি বলে, তোমার দাদা বলল, দু-চার দিনের মধ্যে ঘর ভাড়া না দিলে প্রমথবাবু ঘাড় ধরে রাস্তায় বার করে দেবেন।'

'আমি কি করুম? দিলে দিব।'

'আজ চল না একটু বেড়িয়ে আসি? দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়।'

'না। আমার বেড়ানের শখ নাই।'

'আমার সঙ্গে যাবে তোমার ভয় কি?'

'না, না, না! আমি কারো লগে যামু না!' মেয়েটি কলতলায় ফিরে যায়।

মল্লিকা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তার দুচোখ জ্বালা করে। মনে মনে বলে, 'হারামজাদি তর বিয়া হয় নাই. তর সোয়ামী নাই, পোলা নাই, কেউ নাই, তাই না তর এত তেজ!'

সেই দিনই ডাক এল প্রমথের। তার সবুর সইছিল না।

প্রমথের গাড়ি আসেনি। ট্যাক্সি নিয়ে রামলোচন এসেছে। সঙ্গে এনেছে কিছু চাল, ডাল, মাছ, তরকারি।

'আজই যাওন লাগব? অখন?'

'বাবু শুধু একটু ডেকেছেন। একটু আলাপ-টালাপ করে চলে আসবেন।'

ভূষণের যথাসময়ে জ্বর এসেছে। শুয়ে শুয়ে সে কোঁকায়। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে।

এ বাড়িতে আসার পর থেকে আশার মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখা যাচ্ছিল। ভীরু নিরীহ মানুষ দোটানায় পড়ে যেমন ছটফট করে। আশা হঠাৎ বলে, 'বৌ, তুই দুগা ভাত রাঁধ, আমি যাই।'

মল্লিকা তার হাত চেপে ধরে বলে, 'তুমি যাইবা ঠাকুরঝি? তুমি কাম করবা? নিরুপায় আমাগো প্রাণ দিবা—আমি তোমারে পুজা করুম।'

রামলোচন জানায়, না, আশা গেলে হবে না। প্রমথ মল্লিকাকেই যেতে বলেছে।

তবে আর কথা কি? যেতে যখন বলেছে যেতে হবে। যে পথেই হোক টানের চোটে চলার জন্য নাকে যখন দড়ি পড়েছেই, থামার উপায় কি!

শহরতলীতে ছোটখাট বাগানযুক্ত ছোট একটি আধুনিক ধরনের সুন্দর বাড়ি। এটা প্রমথর একা থাকার জন্য।

প্রমথ মল্লিকাকে হাসিমুখে ঘরে ডেকে বসায়। 'একটু আলাপ-আলোচনা পরামর্শ করার জন্য ডেকেছি। ভাব যখন হল আমাদের ভাব আরেকটুকু জমুক।'

তা জমুক, মল্লিকার আপত্তি নেই। ঠিক কিরকম কাজে তাকে লাগতে হবে, পাশের ঘরের ওই বৌটির মতো অথবা অন্য রকম, খোলাখুলি জানা গেলে বরং ভালই হয়।

সুন্দর সাজানো ঘরে রঙিন শোফায় মল্লিকার ময়লা কাপড়, রুক্ষ চুল, মাটিতে মলিন চামড়া বড়ই বেমানান দেখাচ্ছিল। প্রমথ যেন বাড়ির ঝিকে ডেকে শোফায় বসিয়েছে আদর করে।

কিন্তু তাহলে কি হবে। মল্লিকা একটু নড়লে চড়লে প্রমথের মনে হয় উপোস দিয়ে দিয়ে রোগা একটা বাঘিনী যেন মেয়ে মানুষের রূপ ধরেছে। মাথা তুলে স্থির দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকাবার ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, বাঘিনীর মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁতে নখে তাকে ছিঁড়ে ফেলবার মতলব ভাঁজছে। সে ভঙ্গি যখন ঝিমিয়ে শান্ত ও নত হয়ে আসে, একটা বাঘিনীকে বশ করার আনন্দ হয় প্রমথের।

সে বলে, 'আমিই তোমাদের সব দায়িত্ব নিলাম। তোমার কোন ভাবনা নেই আর। তোমাকে দিয়ে এমন কাজ করাব না যাতে তোমার স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করার কোন ক্ষতি হয়।'

মল্লিকা ভাবে, ও বাবা, এত দরদ তো ভাল নয়।

প্রথম বলে, 'তুমি আমারি কাছে কাজ করবে।'

মল্লিকা বুঝতে পারে না। ভুরু কুঁচকে বলে, 'আপনার কাম? আপনার কি কাম?'

প্রমথ হেসে বলে, 'আমার কি একটা কাজ? চারিদিকে দশ রকম কাজে জড়িয়ে আছি। যাক, একটু চা-টা খাও। তার আগে এক কাজ কর, শাড়ি ব্লাউজ এনে রেখেছি, বাথরুম থেকে চান করে কাপড় বদলে এসো। তাকে সাবান আছে।'

'আইজ না।'

প্রমথ আদরের সুরে বলে, 'লক্ষ্মীটি কথা শোন, যাও।'

মল্লিকা ঘাড় উঁচু করে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

প্রমথ আবার বলে, 'এই বেশে তোমাকে এখানে দেখলে লোকে বলবে কি?'

সেটা অবশ্য আলাদা কথা। প্রমথ নিজে তাকে বাথরুম দেখিয়ে দেয়। সেই সুগন্ধমথিত আলোয় উজ্জ্বল বাথরুমে সাবান মেখে স্নান করতে করতে কয়েকবার মল্লিকার গা বমিবমি করে। সেটা বোধহয় সারাদিন কিছু না খাওয়ার জন্য। কিন্তু উল্টেপাল্টে হাসি-কান্না ঠেলে আসে কেন মল্লিকা বুঝতে পারে না।

নতুন শাড়ি জামা পরে ফিরে এলে তাকে দেখে প্রমথ খুশী হয়ে বলে, 'বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে!'

চাকর মল্লিকাকে চা আর খাবার দিয়ে যায়। প্রমথকে দিয়ে যায় মদের বোতল, সোডা আর গ্লাস।

মল্লিকা মাতাল দেখেছে, জীবনে আজ প্রথম এত কাছে মুখোমুখি ভরা বোতল থেকে গ্লাসে ঢেলে মানুষকে মদ খেতে দ্যাখে।

মল্লিকার চা খাওয়া হলে গ্লাসে একটা বড় চুমুক দিয়ে প্রমথ তার পাশে বসে। এক হাতে তাকে জড়িয়ে কাছে টেনে আদর ভরা সুরে বলে, 'এমনিভাবে আসবে, কিছুক্ষণ থেকে চলে যাবে—এই শুধু তোমার কাজ?'

মল্লিকার মাথায় হঠাৎ আগুন ধরে যায়। প্রমথ তাকে দিয়ে ব্যবসা করাবে এটা সে মেনেই নিয়েছে কিন্তু গোড়ায় প্রমথ নিজে তাকে কিছুদিন ভোগ করে নিয়ে তারপর ব্যবসায়ে নামাবে এ অপমান তার অসহ্য লাগে। হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে মদের বোতলটা তুলে সে প্রাণপণে প্রমথর মাথায় বসিয়ে দেয়।

বোতলটা ভেঙে যায়। প্রমথ অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ে।

দু'চোখে আগুন মেশানো অসীম বিস্ময় নিয়ে মল্লিকা তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বন্ধ দরজার বাইরে থেকে চাকর বলে, 'বাবু ডেকেছেন?'

মল্লিকা বলে, 'না। তুমি যাও।'

সে ঘরের চারিদিকে তাকায়। শুধু অজ্ঞান হয়ে গেছে, ওটাকে শেষ করা যায় কি করে! একটা বন্দুক আছে ঘরে। কিন্তু সে বন্দুক ছুঁড়তে জানে না।

বন্দুক দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে মাথাটা ভেঙে চুরমার করে দেবে, না গলায় আঁচল জড়িয়ে মারবে?

একটু ভেবে প্রমথের কিনে দেওয়া নতুন শাড়ির আঁচলটা পাকিয়ে প্রমথের

গলায় ফাঁস বাঁধে—সোডার বোতলের মুখটা তাতে ঢুকিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে যতটা ক্ষমতায় কুলায় শক্ত করে এঁটে দেয় ফাঁসটা।

তবু সহজে কি মরে প্রমথ! প্রায় পনের মিনিট ফাঁসটা নিয়ে মল্লিকাকে ধস্তাধস্তি করতে হয়।

তারপর ফাঁস খুলে কাপড় ঠিক করে নিয়ে প্রমথের বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোটের তাড়া বার করে নেয়। সবগুলি না হোক, দুটো চারটে নোট তাকে দেবার জন্যই তো লোকটা তাড়াটা পকেটে রেখেছিল? সবগুলো সে নেবে না কেন! নিজের ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলিটা তুলে নিয়ে মল্লিকা ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা ভেজিয়ে দেয়।

চাকরকে বলে, 'ঘরে যাইও না। বাবু ডাকলে যাইবা।'

চাকর একটু মুচকে হেসে বলে 'আচ্ছা।'

রামলোচন চলে গেছে। আজ রাত্রে মল্লিকাকে ফিরিয়ে নেবার কথা ছিল না। বাইরে দু'জন দারোয়ান, সশস্ত্র। প্রমথর ছিল বড়ই প্রাণের ভয়– অকারণে নয় অবশ্য।

মল্লিকা ট্যাক্সিতে এসেছিল স্মরণ করে একজন দারোয়ান বলে 'ট্যাক্সি বোলা দেগা?'

মল্লিকা বলে, 'না।'

মল্লিকার মূর্তি দেখে আশা ভয় পেয়ে বলে, 'বৌ!'

মল্লিকা একগাল হাসে। 'উপায় পাইছি ঠাকুরঝি, খাসা উপায় খুইজা পাইছি!'

আশা আরও ভয় পেয়ে বলে, 'তুই ক্ষেইপা গেছস বৌ!'

মল্লিকা বড় বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ক্ষেপছি তো হইছে কি, উপায় তো খুইজা পাইছি। আমারে কিনা নিয়া বেচাকেনা করব সহুইরা ডাকাইত? পাইছে কি আমারে! মাইয়ালোক বইলা কি গায়ে আমার জোর নাই?'

'বয় বৌ, বয়। পায়ে ধরি তর, বইয়া ঠাণ্ডা হ।'

মল্লিকা বসে বলে, 'ভাত রাঁধছ ঠাকুরঝি? তোমরা খাইছ? আমারে দাও—ভাতের খিদায় নাড়ি জ্বলে।' বলে সে একগাল হাসে, 'ভাতের কষ্ট পামু না আর। পোলারে চাইরবেলা দুধ খাওয়ামু। ময়লা কাপড়খান পইরা আবার যামু ইষ্টিসানে, আবার ডাকাইতরা আমারে কিনতে আইবো।'

গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'এইবার ছোরা নিয়া যামু লুকাইয়া। বুঝছস ঠাকুরঝি, লুকাইয়া একখান ছোরা নিয়া যামু।'

কোন দিকে

জলের দামে ভিটেমাটি বেচে এসে আগুনের দামে ওঁচা মালে গাঁথা বাড়িটা কিনেছে তারা নিজেরা মাথা গুঁজবার জন্য, কবি ভাবুক ছেলেটা আবার অন্যদের ডেকে আনে সেই বাড়িতে আশ্রয় দেবার জন্য! তবু, দুরবস্থার চাপ এখনো অনুদার করে দিতে পারেনি হৃদয়, সকলে তাই সামনাসামনি অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারে না।

আশ্রয় দাবি করার অধিকার ওদের আছে সন্দেহ নেই। বিধবা মেয়েছেলে, একটি বয়স্কা এবং বছর ন'য়েকের কুমারী মেয়ে আর একটি বাচ্চা ছেলে। এরকম অজ্ঞ অসহায় মানুষদের ফাঁদে ফেলবার জন্য শহরে কত লোক যে ওত পেতে আছে!

সাধনা বলে, 'ওরা এমনি থাকবে না, একখানা ঘরভাড়া নেবে। দশ টাকা করে ভাড়া দেবে।' জামাই সমীর একটু মুচকে হাসে। অন্যেরা মুখে কোন ভাবান্তর ঘটতে দেয় না। তাই দেখে সমীরের মুখের কৌতুকের ভাবটা মুছে যায়। বিমলা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, 'ভদ্রলোকের বাড়ি ঘর পাব আশা করিনি। কোন বদলোকের পাল্লায় গিয়ে পড়ব এই ভয়েই মরছিলাম।'

তার বড় মেয়ে সবিতা বলে, 'তোমার বড় বেশী ভয়।'

পরমেশ্বর হেসে বলে, 'তোমাকে বেশ শক্ত মেয়ে বলে চিনে ফেললাম মা।'

পরমেশ্বর হাসিখুশী মানুষ, বিয়ে করেনি। সংসার তার ছোট ভাই মহেশ্বরের। ছেলেমেয়ের মধ্যে সাধন বড়, তারপর পিঠাপিঠি মেয়ে সুরমা ও প্রতিমা। বিয়ে হয়েছে কেবল সুরমার। আরও চারটি ছেলেমেয়ে মহেশ্বরের।

সাধন বলে, 'সবিতা সুন্দর গাইতে পারে।'

সমীর বলে, 'আমাদের শোনাতে হবে কিন্তু।' পরমেশ্বর বলে, 'এটা তুমি বোকার মতো কথা বললে সমীর। একজন যদি গান জানে, এক বাড়িতে থেকে না শুনিয়ে সে যাবে কোথায়? যখনি গাইবে শুনতে পাবে।'

শ্যামবর্ণা সবিতার সতেজ সজীব লাবণ্য সকলেই বারবার চেয়ে দ্যাখে, সমীরের দেখার ভঙ্গিটা সুরমার পছন্দ হয় না।

আরও কয়েকটা নতুন গুণের মতো এইভাবে মেয়েদের চেয়ে দেখার গুণটাও সে কোথায় পেল কে জানে! এই সেদিনও দেনার দায়ে তার বাবা যখন পর্যন্ত কাবু হয়ে পড়েনি তখন পর্যন্ত কোন মেয়ের দিকে এভাবে তাকানোর কায়দা সমীরের বোধ হয় জানাও ছিল না। তারপর কি যে টাকার নেশায় ধরল তাকে, আজেবাজে লোকের সঙ্গে এলোমেলো কি যে সব ব্যবসা করতে নামল, রেস খেলে রাতারাতি যে তারপর একেবারে বদলে গেছে মানুষটা।

সবিতাদের সঙ্গে জিনিসপত্র ছিল অল্পই, ঘর গুছিয়ে ফেলতে বেশীক্ষণ লাগার কথা নয়। কিন্তু তার আগেই সবিতা দশটা টাকা এনে পরমেশ্বরকে বলে 'ভাড়াটা নিয়ে নিন।'

প্রতিমা বলে, 'দেরি সইল না বুঝি?'

সমীর হেসে বলে, 'তাও বুঝলে না? আটঘাট বেঁধে ফেলছেন। এখন তোমরা তাড়িয়ে দিতে পারতে, ভাড়া দিয়ে ভাড়াটে হয়ে বসলে আর পারবে না!

পরমেশ্বর বলে, 'না, তুমি বুঝলে না সমীর। মা আমার সে ধরনের চতুর মেয়ে নয়।'

সবিতা বলে, 'নিজের বাড়ি থেকে ভাড়াটে তাড়ানো যায় না কেন?'

পরমেশ্বর হেসে সমীরকে বলে, 'শুনলে? মা অন্য কারণে আগে ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছেন। মহেশ্বর, দাও তো মাকে একটা রসিদ কেটে।'

সবিতা বলে, 'রসিদ লাগবে না।'

'লাগবে বৈ কি। ভাড়া দিলেই রসিদ লাগে। দিতেও হয়, নিতেও হয়। এসব তোমায় শিখে নিতে হবে।'

প্রথমে সকলের কম-বেশী খানিকটা অস্বস্তি বোধ ছিল কিন্তু দেখা গেল দু-এক দিনেই সেটা কেটে গেছে। মফঃস্বলের সরল সহজ মানুষ কটাকে, বিশেষত সরল কিন্তু তেজী ও বুদ্ধিমতী ঐ সবিতা মেয়েটাকে ভালই লাগে সকলের।

ভাল বোধ হয় লাগে তার মুখে তাদের কাহিনী আর গান শোনার পর।

সবিতার গানের প্রসঙ্গেই তাদের কাহিনী আসে। সে গান শিখেছে তার বাবার কাছে—তার বাবার নিজের রচিত গান। তার বাবা ছিলেন কাপড়ের ছোট কারবারী আর কবি।

স্বভাব-কবি। লড়ায়ে কবি।

কবি আর গাইয়ে হিসাবে নাম ছিল গোপেশের। গোপেশ গাইবে শুনলে আসরে লোকরণ্য হয়ে যেত। কত সুন্দর গান যে সে বেঁধেছিল! দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় সে মারা যায়।

কোণের ঘরের সামনে বারান্দায় বসে খালি গলায় গান ধরে দেয় সবিতা, একে একে বাড়ির সকল মানুষ এসে হাজির হয়। বিমলা সকলকে পাটি পেতে বসতে দেয়। ঘরের দুয়ারের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে সে মেয়ের মুখে স্বামীর রচিত গান শোনে—চোখ দুটি বন্ধ করে দেয়।

পরপর কয়েকখানা গান করে সবিতা। মনকে উদাস করে দেওয়া শান্ত মধুর ভাবালু গান, অনাচার অত্যাচার অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গান, তীব্র ব্যঙ্গ আর সুগভীর দরদ ভরা গান।

সবিতা গান বন্ধ করলে খানিক্ষণ সকলে চুপ করে থাকে। মেয়েটার কোমল মধুর সতেজ কণ্ঠে সহজ সরল গেঁয়ো ভাষায় গান যে সত্যই তাদের এমনভাবে অবিভূত করে দেবে এটা প্রথমে কেউ কল্পনা করতে পারেনি।

পরমেশ্বর নমিতাকে বলে, 'দিদিকে তোর সামাল দিস্‌! এ মেয়েটাকে টেনে নেবে।'

সুভাষিনী বলে, 'চমৎকার গলা মেয়ের—সুন্দর গায়।'

সমীর বলে, 'ওকে শেখালে খুব নাম করতে পারবে।'

বিমলা বলে, 'বাপের কাছে নিজে নিজে শিখেছে। এ সব গানের কি কদর আছে?'

সাধন বলে, 'আছি বৈ কি? সভায় এ সব গান হলে লোকে মেতে যায়।'

প্রতিমা বলে, 'তুমি গানও এত ভালবাস তা তো জানতাম না দাদা!'

মহেশ্বর বলে, 'শ্যামা-সঙ্গীত জানো মা?'

'দু-একটা জানি,'

'শোনাও না?'

আরেকটা গান করে সবিতা। খালি গলায় গ্রাম্য ঢং-এ গান। শুনে ভাল লাগে না মহেশ্বরের। গান শেষ হলে সকলে নানা বিষয়ে কথা বলে।

এই এলোমেলো আলোচনায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাধন থাকে চুপ করে। চিরদিনই সে চুপচাপ।

পরমেশ্বর সর্বদা হাসিখুশী, চেনা-অচেনা সকল মানুষের সঙ্গে চলে তার অফুরন্ত কথা।

মহেশ্বর গম্ভীর ও ভাবুক কিন্তু বিশেষ ধরনের লোকদের সঙ্গে ধর্ম সম্পর্কে সেও অজস্র কথা বলে।

সাধন হয়েছে বাপ-জ্যাঠার বিপরীত। বোবা হয়ে থাকতে পারলেই সে যেন খুশী হয়। একটি মাত্র কথা সে আজ বলে, সোজাসুজি সবিতাকে জিজ্ঞাসা করে, 'গান শিখবে?'

'শিখব।'

তখন সাধন আর একটি কথাও বলে না। সাধনের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আজ সবিতার সংক্ষিপ্ত জবাব সকলকে চুপ করিয়ে দেয়। একটা মেয়ের গান শেখা তো সহজ ব্যাপার নয়, দু-চারটে শব্দের প্রশ্নোত্তরে এমন একটা গুরুতর ব্যাপারের বোঝাপড়া হয়ে গেল তাদের মধ্যে?

কয়েক দিন পরে তার বন্ধু অসীম গান শেখাতে আসে সবিতাকে। সপ্তাহে দু'দিন গান শেখাতে আসবে। বিনা পয়সায়—নিজের পকেট থেকে নিজের কষ্ট করে রোজগারের পয়সা খরচ করে।

পরমেশ্বর বলে, 'মেয়েটা গেল—শহরের কালচারের পাল্লায় গেল। শহরতলী থেকে প্রথম বনবে অ্যামেচার—তারপর দাঁড়াবে প্রফেশনাল।'

বিমলা প্রায় ভীত মুখে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সাধন বলে, 'আপনি কোন কালচারের কথা বলছেন জ্যাঠামশায়? শহরে কিন্তু দুরকম কালচার আছে—একটা মানুষকে এগিয়ে দেয়, আরেকটা পিছিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।'

পরমেশ্বর বলে, 'তুমি যখন পিছনে লেগেছ হয়তো ভালটার পাল্লাতেই যাবে।

আমি বলছিলাম অন্য কথা। যেটার পাল্লাতেই যাক এ মেয়ে আর এ রকম মেয়ে থাকবে না। এমনি করেই ভগবান উপায় করে দেন।'

শুনে বিমলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সাধন সবিতাদের ঘরে ডেকে আশ্রয় দিয়েছে, সবিতার গান শেখার ব্যবস্থা করেছে। তাদের উপকার করার জন্য সমীরেরও খুব আগ্রহ দেখা যায়।

দরখাস্ত দিয়ে আসা ও রেশন কার্ড জুটিয়ে আনার হাঙ্গামা করার দায়িত্বটা সমীর যেচে নিতে চায়।

সবিতাকে বলে, 'আমি সব ঠিক করে দেব, ভাববেন না।'

সাধন উপস্থিত ছিল। সে বলে, 'তোমার তো নিজের নানা কাজ আছে, অসুবিধা হবে। আমি ব্যবস্থা করে দেব'খন।'

সমীর বলে, 'না না অসুবিধা কিছু নেই।' শুধু রেশন কার্ড যোগাড় করার দায়িত্ব নয়, কেউ তাকে কিছু না বললেও শ্বশুরবাড়ির দৈনিক বাজারের ভারটাও সেদিন সে যেচে গ্রহণ করে।

সকাল সাতটা বাজতে না বাজতে থলি হাতে নীচে নেমে এসে সে বিমলাকে সামনে দেখে বলে, 'আপনাদের বাজার করবার লোক নেই, আমি বাজারে যাচ্ছি, আপনাদেরটাও এনে দিই।'

বিমলার হাতে বাসনের পাঁজা। সে বলে, 'আপনি কেন কষ্ট করবেন? জামাই মানুষ, আপনার বাজারে যাওয়াই উচিত নয়।'

'আজ শখ করে যাচ্ছি। আমাদের জন্য মাছ তরকারি তো কিনতেই হবে—সেই সঙ্গে আপনাদেরটা কিনে আনব। মেয়েদের বাজার করার ঝনঝাট পোয়াতে হবে, ভাবতেও আমার বিশ্রী লাগছে!'

পরমেশ্বর বলে, 'মায়েরা নিজেরাই বাজার পর্যন্ত করতে শুরু করে মস্ত একটা অপরাধ করেছেন দেখছি!'

সমীর জোর দিয়ে বলে, 'মোটেই তা নয়। এক বাড়ি থেকে আমাদের এত লোকের বাজার করতে যাচ্ছি, সবিতাদের বাজারটাও তো করা উচিত।'

বিমলা সবিতাকে ডাকে। সবিতা আসে। কিন্তু আসে একেবারে থলি হাতে!

'কি হয়েছে!'

বিমলা বলে, 'ইনি বাজারে যাচ্ছেন। বলছেন কি আমাদেরও বাজারটা এনে দেবেন।'

সবিতা বলে, 'আমাদের দরকার নেই বাজারের।' বলে সে থলি হাতে বাজার করতেই বেরিয়ে যায়।

সমীর বলে, 'মেয়েটা তো ভারি অহঙ্কারী!'

পরমেশ্বর বলে, 'না না, তুমি ভুল বুঝলে। বেচারা নিজেদের বাঁচাচ্ছে। সাধন ছ'দিন ওদের বাজার করেছে—নিজেদের জন্য দামী দামী মাছ তরকারী যা কিনেছে ওদের জন্যও তাই এনেছে। ওদের কি অত খরচ পোষায়? মেয়েটি বুদ্ধিমতী, নিজে শাকপাতা কিনে আনতে গেছে।'

মাছের বাজারে সবিতার সঙ্গে সমীরের দেখা হয়। 'কি মাছ কিনলে?'

সবিতা একটু হাসে।

'মাছ? কুচো চিংড়ি দু'টাকা সের, মাছ কিনব কি দিয়ে?'

সমীর বুঝি হঠাৎ ভাবের বশে সহজ বুদ্ধি হারায়, আত্মীয়তার অধিকার নিজের ঝোঁকে নিজেই খাড়া করে উৎসাহের সঙ্গে বলে, 'আজ তোমাদের মাছ খাওয়াব।'

মহৎ ভাব। উৎখাত হয়ে এসেছে একটি পুরুষ অভিভাবকহীন পরিবার, একটি অল্পবয়সী মেয়ে ভার নিয়েছে সেই পরিবারটিকে বাঁচিয়ে রেখে নতুন আবেশ পরিবেশ জল মাটিতে শিকড় বসিয়ে স্থায়ী করবার! এ রকম একটি মেয়েকে আত্মীয়তা দিয়ে খাতির করার মহৎ ভাব।

কিন্তু পয়সা নেই বলে যে মাছের বাজার ঘুরে নিরামিষ শাক তরকারির থলি নিয়ে ফিরে যাবে, তাকে এভাবে মাছ খাওয়াতে চাইলে যে দয়া করা হয়, সেটা খেয়াল থাকে না সমীরের।

তাই সবিতার প্রতি প্রশ্নে সে বেসামাল হয়ে পড়ে।

'একটি গরিব মেয়েকে তো দামী মাছ খাওয়াবেন, প্রতিদানে কি চাইবেন?'

বিভ্রান্ত সমীর বলে, 'না না ছি ছি! ওভাবে বলিনি কথাটা, সত্যি বলছি।'

বাজারের মধ্যে গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি করা ভিড়, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই ধরনের কথাবার্তা! সমীরকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে মাঝবয়সী একজন মন্তব্য করে 'বাপ্‌রে বাপ্‌ এরা হাটে বাজারেও প্রেম চালাবে?'

মোটা সোটা ধোপ-দুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোকটার হাতের থলিতে ভরা তরকারির ওপর আস্ত একটা সেরখানেক ওজনের চকচকে গঙ্গার ইলিস দেখে সবিতা হঠাৎ সুর পাল্টায়।

'আচ্ছা, আপনার মাছ খাব। কিনে নিয়ে যান, রান্না করিয়ে পাঠাবেন। ওভাবে খাওয়া যায়, মাছ নেওয়া যায় না।'

মাছ কেনা হয়ে গিয়েছিল সমীরের। আর পোয়াটেক কিনলেই সবিতাদের দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হত। সে এক সের মাছ কিনে বসে—বাজারের সব চেয়ে দামী মাছ।

সুরমা বলে, 'এত মাছ এনেছো? দুরকম মাছ?'

সমীর বলে, 'খাণ্ডা মাছটা রান্না করে সবিতাদের পাঠিয়ে দিও।'

'সবটা? কেন?'

'কেন মানে? আমাদের রান্না মাছ খেতে চেয়েছে!'

'তা তো চাইবেই! কত কি চাইবে।'

পরমেশ্বর বলে, 'অবুঝের মতো কথা বলিস না সুরমা। ও কি চাইবার মেয়ে? আমরা পাছে দয়া করি এটাই বরং ওর ভয়। তুমি নিজেই নিশ্চয় মাছ খাওয়াতে চেয়েছিলে, নেহাত ভদ্রতার খাতিরে রাজী হয়েছে।'

সমীরের মুখ লাল হয়ে যায়।

সমীর একটু ভাব করতে চাওয়ার বেশী কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। বাড়ির অন্য সকলে তাদের সহজভাবে ভালভাবে গ্রহণ করেছে।

তবু সবিতার অস্বস্তি ঘোচে না। সে মাকে বলে, 'এখানে থাকতে ভাল লাগছে না মা।'

বিমলা বলে, 'কেন? ভগবানের দয়া ছিল তাই বদলোকের পাল্লায় না পড়ে এখানে ঠাঁই পেয়েছি। বিপদে-আপদে এরা সহায় হবে।'

'সেই জন্যেই তো। অ্যাকে আমরা গরিব, তায় একেবারে নিঃসহায়। খালি মনে হয় যেন এদের দয়ায়, এদের আশ্রয়ে আছি!'

'অত খুঁতখুঁতে হতে নেই। মেয়েছেলে না তুই?'

'মেয়েছেলের বুঝি মান-সম্মান নেই?'

বিমলা বিরক্ত হয়ে বলে, 'কি জানি বাপু, তোর সাথে তর্ক করে পারি না।'

পাশের বাড়িতে নিশীথ একখানা ঘরের ভাড়াটে। একটু তেরচা ভাবে হলেও সবিতা আর তাদের দুটি ঘরের জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরের খানিকটা দেখা যায়।

নলিনী জানালায় পর্দা দিয়ে রাখে। জানালার তলার দিকে রঙিন কাপড়ের সুন্দর পর্দা তবু দাঁড়ানো মানুষের বুক কাঁধ পর্যন্ত দেখা যায় সবিতাদের ঘর থেকে।

শুধু নিশীথ আর নলিনীর। তাদের তিন বছরের ছেলেটির নয়।

জানালায় দাঁড়িয়ে নলিনী আলাপ করে। তারা কোথা থেকে এল, কেন এল, ক'জন এল ইত্যাদি নানা বৃত্তান্ত জেনে নেয়।

প্রশ্ন করে, 'ঘরটা তোমরা ভাড়া নিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'একখানা ঘর! কত ভাড়া?'

'দশ টাকা।'

শুনে চোখ বড় বড় করে নলিনী বলে, 'সত্যি?'

তার অবাক হবার মানেটা সবিতা বুঝতে পারে কয়েকদিন পরে। নলিনী তাকে তার ঘরে বেড়াতে যাবার আহ্বান জানিয়ে রেখেছিল। সবিতারও কৌতূহল ছিল জানালা দিয়ে আংশিক দেখা ঘরখানা ভাল করে দেখবে।

তাদের ঘরের চেয়ে ছোটই হবে ঘরখানা। আসবাবপত্র খুব বেশী দামী নয় কিন্তু ঘরখানা যেন ছবির মতো সাজানো।

'এসো ভাই, বসো।'

নলিনী তাকে বসতে দেয় ছবি আঁকা সিঙ্গাপুরী মাদুরে—বোঝা যায় মাদুরটি খুবই পুরানো কিন্তু যত্নে রাখায় পুরানো হলেও জীর্ণ হয়নি।

সবিতা বলে, 'আপনারা কদ্দিন এখানে আছেন?'

'বছর খানেক আগে ছিলাম ওই শশধরবাবুর বাড়ি। লোকটা এক একদিন মদ খেয়ে এমন হল্লা করত। কি ভয়ে ভয়ে যে থাকতাম কি বলব তোমাকে' এ ঘরখানা পেয়ে যেন বেঁচেছি।

'কত ভাড়া দেন?'

'লাইট নিয়ে পঁয়ত্রিশ টাকা।'

শুনে এবার সবিতা চোখ বড় বড় করে তাকায়। 'এত ভাড়া? একখানা ঘর পঁয়ত্রিশ টাকা?'

নলিনী হাসে।

'ভাড়া আজকাল এই রকম দাঁড়িয়েছে। দু-পাঁচ টাকা কম-বেশী হবে। তোমরা দশ টাকায় অমন ভাল একখানা ঘর পেয়েছ শুনে তাই তো অবাক হয়ে গেছি। আত্মীয়তা আছে?'

'না। একমাস আগে চেনাও ছিল না। ওরাও বোধ হয় রেট জানে না তাই।'

বাড়ি ফিরেই সে বলে, 'আর এখানে থাকা যায় না মা!'

'কেন?'

'ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়ার ঘরে থাকা আমাদের পোষাবে না!'

'অত কেন? ওরাই তো দশ টাকা ভাড়া বলে দিয়েছে।'

'সে ওরা দয়া করে বলেছে। আমরা দয়া নিতে যাব কেন? একটা কম ভাড়ার ঘর খুঁজে নিতে হবে তাড়াতাড়ি!'

বিমলা চটে বলে, 'তুই বড় বাড়াবাড়ি করিস!'

সবিতা শান্তভাবে বলে, 'বাড়াবাড়ি কিসের? বাবা থাকলে এ রকম দয়া নিতেন? তুমি পরের ঘর থেকে এসেছো, তোমার লাগে না—আমি তো বাবার মেয়ে! এমনি উপকার নিতে পারি, মাসের পর মাস দয়া নিতে পারব না গা পেতে।'

তুলসী ঝি মহেশ্বরদের বাড়ি কাজ করতে এলে সবিতা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের ওদিকে ঘর খালি আছে বলতে পার?'

'কেন গা? ঘর কি হবে?'

'ভাড়া নেব।'

'এখানে রইবে না? এ ঘর কি দোষ করলে গা? ভাড়া বেশী তো নয় মোটে। কপালজোরে দশ টাকায় এমন ঘর পেয়ে গেছ।'

তুলসী পর্যন্ত জেনে গেছে যে, সে এ বাড়ির লোকের দয়ায় সস্তায় ঘর পেয়ে গেছে।

'কপালজোরে কাজ নেই। তুমি যাবার সময় আমায় ডেকে নিয়ে যেও।'

কাজেই তুলসী মারফতে খবরটা জানাজানি হয়ে যায়।

তুলসী সুরমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের ভাড়াটে উঠে যাবে কেন গো? বনিবনা হল নি?'

সাধন চা খাচ্ছিল কাছে বসে। সে বলে, 'তোমায় কে বললে উঠে যাবে?'

'ওই মেয়েই বললে। মোর সাথে ঘর দেখতে যাবে বস্তিতে।'

'তাই নাকি?'

তুলসী কলতলায় চলে গেলে প্রতিমা বলে, 'ব্যাপার কি? এমন সুবিধে ফেলে যেতে চায়?'

'নিশ্চয় কিছু হয়েছে।' বলে সে বিশেষ এক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সাধনের দিকে তাকায়।

সাধন গম্ভীর হয়ে বলে, 'হবে আবার কি? ও তোমাদের সঙ্গে থাকতে চায় না—এই হল ব্যাপার। বড়লোকের মেয়ে তোমরা, কত উদারতা দেখিয়ে গরিব বেচারী-দের ঘরে স্থান দিয়েছ, সারাদিন তাই ভালভাবে একটা কথা কইবার সময় পাও না। এভাবে থাকবে কেন?'

সুরমা বলে, 'দোষটা শেষে হল আমাদের?'

সাধন বলে, 'বাপের পয়সায় দুধ-ঘি খেয়ে ক্রিম-পাউডার মেখে রঙিন শাড়ির আঁচল উড়িয়ে ঘুরে বেড়াও—ওকে তোমরা বুঝবে না। আমার সঙ্গে তোমরা কলকাতা আসতে ভরসা পাও না, আমি যে মোটে একজন ব্যাটাছেলে। তোমাদের আনবার জন্য জ্যাঠামশাইকে লোক পাঠাতে হয়। ওর বাপ নেই, ভাই নেই, একগাদা টাকাও নেই, তবুও একলা ব্যবস্থা করে মা আর ভাই-বোন দুটিকে কলকাতা পার করে এনেছে।'

সুভাষিনী বলে, 'তুই পাগল হলি সাধন? কি যা-তা বকছিস? ওরকম পাকামি করা কি ভাল কোন মেয়ের পক্ষে? সৎ ঘরের, ভাল ঘরের কোন মেয়ে ওরকম করে? বাপ-ভাই না থাক—আর কি কেউ ছিল না, খুড়ো জ্যাঠা মামা মেসো আত্মীয় কুটুম? নরম হয়ে বললে তারা কি সাহায্য করত না? তুই খালি বীরত্ব দেখছিস মেয়েটার। বীরত্ব না ছাই, এ হল পাগলামি মেয়েটার—বদখেয়াল।'

'তুমি বুঝবে না মা।'

'আমি সব বুঝি। গুরুজন কেউ থাকলে বজ্জাতি করার অসুবিধা হবে- তাই নিজেই মস্ত বাহাদুরী করেছেন। এখানে আমরা মায়া করে ঠাঁই দিয়েছি—আমাদের চোখের সামনে যা-খুশী করতে পারছে না। তাই ঝোঁক চেপেছে উঠে যাবার।'

সুরমা চুপ করে থাকে।

প্রতিমা খুশী হয়ে বলে, 'তুমি ঠিক বলেছ মা!'

সাধন নিশ্বাস ফেলে বলে, 'তুমি দুশো বছর পিছিয়ে আছ মা। অ্যারিস্টোক্রাট মেয়েরা স্বাধীন হলে দোষ হয় না, তাকে তোমরা মেনে নিয়েছ। গরিব গেরস্থ ঘরের মেয়ে নিরুপায় হয়ে পুরুষের মতো দায় ঘাড়ে নিলে তোমরা ধরে নাও সেটা বজ্জাতি।'

সবিতাকে সাধন নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে আসে। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও আহত মনে হয় তাকে। বলে, 'বসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'তবেই সেরেছে! একটা কিছু দোষ করেছি নিশ্চয়!'

মোটা মিলের শাড়িতেও তার রোগা ছিপছিপে দেহটিতে যে অপরূপ সৌন্দর্যের আবির্ভাব ঘটা শুরু হয়েছে সেটা চাপতে পারেনি। রঙ তার খুব বেশী উজ্জ্বল নয়, কোমল লাবণ্যে যেন চাপা পড়ে আছে।

মুখখানা শান্ত কোমল। দেখলে মায়া হয়।

দেখে কল্পনাও করা যায় না তার মধ্যে মেয়েলি লাজ্‌কপনার কত অভাব, কত সুদৃঢ় তার আত্মপ্রত্যয়! মেয়ে হয়ে জন্মে কিভাবে ভিতরটা তার এভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে কে জানে।

'কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না?'

সবিতা সরলভাবে হাসে।

'কি ভাবে বলব ভাবছি। সোজাসুজিই বলি। ঘর খুঁজছ কেন?'

'আমিও সোজাসুজি বলি। ঘরের ভাড়া খুব কম ধরেছেন।'

'বাড়িয়ে দেব?'

'সে আপনাদের ইচ্ছা। যত ভাড়া হওয়া উচিত, তত ভাড়া না দিয়ে থাকতে পারব না।'

'কত ভাড়া হওয়া উচিত তুমি ঠিক করলে কি করে?'

'আরও দশ জনে তো এ রকম ঘর ভাড়া নিয়ে আছে।'

সাধন মাথা নাড়ে।

'এ যুক্তি ঠিক নয়। অন্য বাড়িওলা যদি ভাড়াটের গলা কেটে বেশী ভাড়া নেয় আমরা সে অন্যায়টা করব কেন?'

সবিতা হেসে বলে, 'দশ জনে করছে, আপনারা না করলেই তার মানে দাঁড়াবে আমাদের খাতির করছেন।'

'একটু খাতির করলে দোষ কি?'

'অবস্থা বিশেষে দোষ আছে বৈ কি। আমরা গরিব।'

সাধন একটু চুপ করে থাকে।

'তুমি বন্ধুত্ব স্বীকার কর না?'

'করি না! আপনি বন্ধু হলেন কি করে?'

'বন্ধুর মনে কষ্ট দিয়ে কি করে চলে যাবে? শোন তোমায় স্পষ্ট করে বলি—তোমরা গরিব কি বড়লোক আমি জানি না—তোমায় আমার ভাল লেগেছে। তোমরা চলে গেলে সত্যি আমার মনে কষ্ট হবে।'

সবিতা চুপ করে থাকে।

বস্তিতে যে বাড়িতে ডুমুররা থাকে সেই বাড়িতে একখানা ভাল ঘর খালি ছিল ইটের দেয়াল খোলার চালের বাড়ি। এখানকার অর্ধেক বাড়ি এই রকম, বাকি বাড়ির দেয়াল কাঁচা।

পরমেশ্বর সবিতাকে বলে, 'বিদায় নিলে?'

'হ্যাঁ কাছেই যাচ্ছি।'

'কাজটা একটু ছেলেমানুষি হয়ে গেল।'

তার মুখে কৌতুকের হাসি লক্ষ্য করে সবিতা বলে, 'কাছে যাওয়াটা?'

'যাওয়াটাই ছেলেমানুষি হল। তা তুমি ছেলেমানুষ বটেই তো সাংসারিক জ্ঞা

বুদ্ধি পাকেনি। এ অবস্থায় এ রকম একটা আশ্রয় পাওয়া গেলে ছাড়তে আছে? আমি হলে তাড়িয়ে দিলেও যেতাম না'

'বাঃ কোন অধিকারে থাকব?'

'এখানে জায়গা আছে, তোমার থাকার জায়গা নেই—এই অধিকারে।'

সবিতা হেসে বলে, 'জায়গা তো কত বাড়িতেই আছে, থাকবার জায়গাও কত লোকের নেই। তারা সবাই যদি জোর করে—'

পরমেশ্বর তার মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'সাধে কি ছেলেমানুষকে বলি ছেলেমানুষ? একদিকে টনটনে পাকা বুদ্ধি—অন্যদিকে স্রেফ বোকামি। তুমি কি জোর করে ঘর দখল করেছ? বিশেষ অবস্থায় তুমি বিশেষ সুযোগ পেয়েছ, তুমি সেটা নেবে—অন্যদের কথা আলাদা।'

সবিতা মাথা নাড়ে।

'নাঃ, আমার মন চায় না, করব কি?'

'মনকে চাওয়াতে হয়। মনের উপর জোর খাটাতে হয়।'

বস্তির ঘরে বিছানা তুলতে তুলতে সবিতা সকাল বেলাই আকাশ পাতাল ভাবে।

বিমলার জ্বর হয়েছে।

এখনো সে ওঠেনি। কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে এক কোণে।

একটি মাত্র মশারি। তার নীচে বিমলা ছেলেমেয়েদের শোয়ায়। ছোট মশারি, তিনজনকেই গাদাগাদি করে শুতে হয়। বিমলা ভিন্ন শোয়—মশারি ছাড়া।

'তোমায় মশা কামড়াবে না?'

'কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুই না আমি?'

মণ্টু উঠেছে, বাইরে গেছে। নিজেই মুখ হাত ধুয়েছে। অপেক্ষায় আছে কখন খাবার পাবে।

নমিতা উঠে ঘরের মধ্যে ক্ষীণ সুরে কাঁদছে। ওর মুখ ধুইয়ে দিতে হবে, ওকে খেতে দিতে হবে। বিমলার জ্বর বেড়েছে—গায়ে হাত দিয়ে না দেখলে টের পাওয়া যেত না। জ্বর না বাড়লে বিমলা কাঁথা মুড়ি দিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে পারত না—যেন সে মা নয়, তার যেন ছেলেমেয়ে নেই।

শুধু ভাই-বোন নয়, মা'র দায়িত্বটাও আজ পুরো মাত্রায় সবিতার। বিছানা তুলে মণ্টুকে কাছের দোকান থেকে দু পয়সার মুড়ি আনতে পাঠিয়ে দাওয়ায় বসে ধোঁয়ানো উনানটার দিকে চেয়ে সবিতা ভাবে।

আজ তাকে সব ভার বইতে হবে একা। শুধু ভাই-বোন দুটির ভার নয়—মা'র জ্বরের ভার পর্যন্ত।

সকাল বেলাই এত জ্বর, এ জ্বর কত বাড়বে ঠিক নেই।

সে কর্ত্রী সবকিছুর, সে যা করবে তাই হবে। তাই তাকে এদিকে ক্ষিধে মিটিয়ে বেঁচে-বর্তে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে ভাই-বোন দুটির, ওদিকে ডাক্তার এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে মা'র।

এ সব নয় করল। সে জন্য সবিতা ভাবে না। এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম সে নয় না পেল, সে জন্য কিছু আসে যায় না।

সে সব কিছুই সামলে চলতে পারে।

কিন্তু কতদিন পারবে?

হাতের টাকায় যে কটা দিন চলবে শুধু সে কটা দিন।

দুরাশা কিনা জানে না, সে স্থির করেছিল, চারিদিক বুঝে শুনে বিচার-বিবেচনা করে মাস দুয়েকের মধ্যে কোন একটা রোজগারের ব্যবস্থা করে নেবে। যত সামান্যই হোক—নিয়মিত একটা উপার্জনের ব্যবস্থা। শাক-ভাত খেয়ে কোনরকমে গাছতলায় হোগলার চালায় ভাই-বোন-মাকে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা।

কিন্তু উনান ধরিয়ে বাসন মেজে খাদ্য আর পথ্য রেঁধে, ভাই-বোনেদের নাইয়ে খাইয়ে, মার সেবা করে যদি তার দিনটা কেটে যায়—ব্যবস্থা সে করবে কি করে?

ঘরেই যদি সে আটকে থাকে বাইরে না বেরোতে পারে—তার পক্ষে কিছু করা কি সম্ভব?

ধোঁয়াটে উনানের সামনে বাঁধানো রোয়াকে বসে তার মনে হয়, পরমেশ্বর যা বলেছিল প্রণবও যেন আজ তার প্রতিধ্বনি করে গেছে।

একটা মীমাংসা দরকার।

সে তো জানে যে শেষ পর্যন্ত তার দেহটাও বিক্রি করা দরকার হতে পারে।

বিমলা জ্বরের ঘোরে ডাকে, 'সুবি!'

ছোট বোন খিদের কান্নার মধ্যে ডাক চালায় 'দিদি দিদি', মণ্টু সামনে দাঁড়িয়ে থাকে দুর্ভিক্ষপীড়িত বালকের মতো।

সব দায়িত্ব ফেলে সবিতা হঠাৎ বেরিয়ে যায়। তার খেয়ালও থাকে না যে অঘোরদের এবং ভাড়াটেদের মেয়েদের নিয়ম অনুসারে সকাল বেলা গায়ে সায়া ব্লাউজ চড়ায়নি—মৃত বাপের একটা ধুতি দিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছে।

পরমেশ্বর দাওয়ায় বসে চা খাচ্ছিল।

কাপ নামিয়ে রেখে সে বলে, 'মা সকালবেলাই কালী হয়ে এলে? এসো, আমার ঘরে এসো। সুরমা একটা সুজনী বা চাদর এনে দে তো চট করে।'

সবিতা বলে 'ফিরেই যাই তা হলে। একটা পরামর্শ চাইতে এসেছি—সুজনী এনে দে বা চাদর এনে দে! আপনাদের কাছে পরামর্শ চাইতে আসাই বোকামি হয়েছে আমার।'

পরমেশ্বরের মুখের হাসি হঠাৎ মুছে যায়। হাত জোড় করে সে বলে, 'মা, আমায় ক্ষমা কর।'

'ক্ষমা করতে আমি আসিনি।' বলে সবিতা বেরিয়ে যায়।

পরমেশ্বরের মুখ গম্ভীর। গুম খেয়ে বসে সে যেন কি ভাবছে।

সুষমা ভয়ে ভয়ে বলে, 'কি হল জ্যাঠামশায়?'

পরমেশ্বর হঠাৎ হেসে ফেলে।

'কি হল তাই তো বুঝতে পারছি না। একটা যেন অন্যায় করে ফেললাম মনে হচ্ছে। অন্যায়টা কি করলাম বল দিকি?'

তার হাসি দেখে সকলেই স্বস্তি ফিরে পায়। 'ও মেয়েটার কথা বাদ দাও। ও এখন কত রকম কান্ড করবে।'

পরমেশ্বর বলে, 'কেন করবে?'

'এইভাবে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।'

পরমেশ্বর ধীরে ধীরে বলে, 'সত্যি এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার! তোরা যেন সব বুঝে গিয়েছিস্। সব যেন ছকে বাঁধা হয়ে আছে তোদের কাছে। কেউ হাসলেও তার মানে বুঝে যাস, কাঁদলেও তার মানে বুঝতে বাকি থাকে না। মানুষ যেন তোদেরি নিয়মে হাসে-কাঁদে।'

তারা নির্বাক হয়ে থাকে।

চা খেয়ে পরমেশ্বর ধীরে ধীরে বস্তির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে।

সুরমাকে নিয়ে সমীর চলে গেছে।

তার বাবা বিধুভূষণের অবস্থাটা দেনার দায়ে খুব খারাপ দাঁড়িয়েছিল, কিছুদিন পরে এ বাড়ির লোকেরা খবর পায় দেনার দায়ে ঘর-বাড়ি বিক্রি করে বিধুভূষণ তার বড় ভায়ের আশ্রয়ে চলে গেছে, মুখ ম্লান হয়ে যায় সকলের।

তাদের ভবিষ্যৎও অন্ধকার। সামান্য যা-কিছু সম্বল আছে হু হু করে উপে যাচ্ছে —আয়ের কোন ব্যবস্থা নেই।

কে জানে কি অবস্থা দাঁড়াবে তাদের কিছুদিন পরে?

ওদিকে মেয়েটাও পড়ল দারুণ দুরবস্থায়। মহেশ্বর একদিন চিঠি পায় বিধুভূষণের।

শুভ সংবাদ। সুরমার সন্তান হবে জানা গিয়েছে। পরদিন মহেশ্বর মেয়েকে দেখতে যায়। বিধুভূষণকে জানায় যে সুরমাকে কয়েকদিনের জন্য নিয়ে যেতে চায়, বাড়ির মেয়েরা তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

পুজোর সময় অবশ্য সে যাবে। তখন ভারি মাস হবে সুরমার, একেবারে বাপের বাড়িতেই থেকে যাবে। কিন্তু এখন কয়েক দিনের জন্য সুরমা একটু বেড়িয়ে আসবে।

বিধুভূষণ বলে, 'ছেলে বাড়ি আসুক, বলব। ওই গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

'আপিস থেকে কখন ফেরে সমীর?'

'তার কিছু ঠিক নেই। কোনদিন দশটা হয়, কোনদিন এগারটাও বাজে। চাকরিতে ওর মন নেই, ব্যবসা করার ইচ্ছা। ওই সব ব্যাপার নিয়ে মেতে আছে।'

পরদিন সন্ধ্যার পর সমীর আসে। একা। মহেশ্বর বলে, 'সুরমাকে আনলে না?'

'কদিন বাদে আনব। আমি একটু কাজে এসেছি।' তার গম্ভীর অন্যমনস্ক ভাব দেখে মহেশ্বর অস্বস্তি বোধ করে।

'কি কাজ?'

'আপনার সঙ্গে দরকারী কথা আছে।'

শুনে রীতিমতো ভয় হয় মহেশ্বরের।

'চা খেয়ে নাও। খারাপ সংবাদ নয় তো?'

'না।'

চা জলখাবার খেতে খেতে সমীর সুভাষিণীর কথার ছাড়া ছাড়া জবাব দেয়। সাধনের আলাপ করার চেষ্টা তার অন্যমনস্কতার জন্য ভেস্তে যায়।

খাওয়া শেষ হলে মহেশ্বর বলে, 'কি বলছিলে বল। এরা কি চলে যাবে?'

এতক্ষণ সে গড়গড়া টানছিল। এখন নলটা নামিয়ে রাখে।

সমীর বলে, 'কি দরকার। গোপন কথা কিছু নয়।'

মহেশ্বর প্রতীক্ষা করে।

সমীর ধীরে ধীরে বলে, 'আমাকে হাজার দশেক টাকা ঋণ দিতে হবে। এক বছরের মধ্যে শোধ করে দেব।'

ঘরে যেন বজ্রপাত হয়। সবাই নির্বাক হয়ে থাকে।

সমীর বলে, 'আমি অনেক দিন থেকেই ব্যবসা করার কথা ভাবছিলাম। সামান্য মাইনেতে চাকরি করে কোন লাভ নেই। বাবা নিজের দোষে লাখ-খানেক টাকা নষ্ট করে বসেছেন—বাবার আর কিছু নেই। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমাদের আগেকার অবস্থা ফিরিয়ে আনব। কিভাবে কি করব বিচার বিবেচনা করছিলাম। কয়েকটা যোগাযোগ হয়েছে, সুযোগ সুবিধা পেয়েছি। আজকাল কতগুলি ব্যবসা আছে, সাহস করে লাগাতে পারলে এক বছরে লাল হয়ে যাওয়া যায়।'

সমীর দু-এক জন উচ্চপদস্থ লোকের নাম করে। কিভাবে নানা ব্যবসায়ে আজকাল মুনাফার পাহাড় জমানো যায় তার সাধারণ বিবরণ দাখিল করে। বলে, 'টাকা ফিরিয়ে দিতে আমার এক বছরও লাগবে না।'

সাধন বলে, 'তুমি যা বললে তার মানে তো দাঁড়ায় তুমি চোরাকারবারে নামতে চাইছ।'

'আমি পয়সার জন্য কারবার করতে নামব, সেটা চোরাকারবার না খোলা কারবার অত দেখলে চলে না।' সুভাষিণী বলে, 'সে কথা যাক্ গে। কিন্তু আমরা অত টাকা কোথায় পাব বাবা? জলের দরে সব বেচে দিয়ে এসেছি—'

মহেশ্বর বলে, 'এক বছরের মধ্যে ফিরে পাব জানলে দশ হাজার টাকা আমি তোমায় দিতে পারি। কিন্তু চোরাকারবার করার জন্য আমি তো টাকা দেব না বাবা! তুমিই বা এদিকে যাচ্ছ কেন? এ দুর্বুদ্ধি তোমার কেন হল? সৎপথে থেকে শাকভাত খাওয়া ভাল, তবু অসৎ পথে পা দিতে নেই। তোমার ভালর জন্য বলছি, মরীচিকার পিছনে ছুটো না। এভাবে কোটি টাকা করেও জীবনে সুখী হতে পারবে না।'

সমীর বলে, 'চোরাকারবার? আপনার ছেলে বলল বলেই কি আমি চোরাকারবারে নামছি? আপনি গিয়ে খাতাপত্র দেখে আসবেন।'

মহেশ্বর জিজ্ঞাসা করে, 'কি ব্যবসা করবে তুমি?'

সমীর জবাবে বলে, 'আপনি টাকা দিতে পারবেন কি না বলুন?'

মহেশ্বর চুপ করে থাকে।

অন্য কেউ কোন কথা কয় না।

সমীর বিদায় না নিয়েই শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

সাধন বলে, 'মদ খেয়ে এসেছে, গন্ধ পেলাম।'

মহেশ্বর বলে, 'মা! মাগো!'

পরমেশ্বর বলে, 'তোমাদের সবাইকার দেখছি নাড়ীছাড়ার অবস্থা। মদ যদি খেয়েই থাকে—কত বড় আশার কথা, একটি আবোল-তাবোল কথা বলেনি।'

মহেশ্বর কপাল চাপড়ে বলে, 'মদ খেয়েছে, তবু আশার কথা?'

পরমেশ্বর বলে, 'মদ কি ও নিজের ইচ্ছায় খেয়েছে? ওর কি শখ আছে মদ খাবার? বেচারা শুধু টাকা চায়। মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে প্রচার করে টাকা পেলেও বেচারা মাতালদের গালাগালি দিত।'

সুভাষিণী বলে, 'রাগ করে গেল, মেয়েকে আর আসতে দেবে না।'

পরমেশ্বর ভরসা দিয়ে বলে, 'না ওসব করবে না। ও ছেলের প্রতিভা আছে, ও রকম শস্তা চালের দিকে যাবে না।'

দেখা যায়, তার কথাই ঠিক। পরের শনিবার বিকালে সমীর সুরমাকে নিয়ে আসে, বোঝা যায় নিজেও শনি রবি দুদিন থাকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। বলা মাত্র রাজী হয়ে যায়।

টাকা পায়নি বলে রাগ করেছে মনে হয় না তার ব্যবহার দেখে। শুধু একটু বিষণ্ণ ও গম্ভীর হয়ে থাকে।

তার চিন্তিত অন্যমনস্ক ভাব বিচলিত করে দেয় মহেশ্বরকে। জীবনে উন্নতি করবে, নিজের পথে উপরে উঠবে, সেজন্য সাহায্য চেয়েছে জামাই। টাকা দান চায়নি—চেয়েছে ঋণ। এক বছরের মধ্যে ফিরিয়ে দেবে। টাকা না পেয়ে রাগ করেনি, সম্পর্ক তুলে দেয়নি, শুধু অভিমান করে আছে।

বড়ই অস্বস্তি বোধ করে মহেশ্বর। মনে হয়, মেয়ে জামাই দুজনের কাছে সে মস্ত অপরাধ করেছে।

সুরমাকে সে বলে, 'দশ হাজার টাকা কোথায় পাব? ক্ষমতা থাকলে চোখ-কান বুজে দিয়ে দিতাম। এক পয়সা আসল না ঘরে, অথচ খরচের অন্ত নেই।'

সুরমা বলে, 'তুমি এক কাজ করলে তো পার? তোমারও তো আয়ের একটা ব্যবস্থা করতে হবে—তুমিও ওর সঙ্গে ব্যবসা শুরু কর না? টাকা ধার না দিয়ে এভাবে দাও—তুমি থাকলে সামলেসুমলে চলতে পারবে। নিজে হাজার আষ্টেক টাকা যোগাড় করেছে. বাকি টাকা ধার না পেলে একজনকে পার্টনার করে ব্যবসায়ে নামবে। তুমিই নেমে যাও না?'

মহেশ্বর দুঃখ আর দুশ্চিন্তার মধ্যেও হাসে, 'তুই পাগল হয়েছিস সুরমা! এই বয়সে আমার ধাতে কি ওসব পোষায়? সমীরের সঙ্গে ব্যবসায় নামা? দুদিনে আমাদের মধ্যে ফাটাফাটি হয়ে যাবে।'

সাধন বলে, 'আমি নামতে পারি।'

'তোর পড়াশোনা নেই?'

'কি হবে পড়াশোনা করে? এই তো চাকরির বাজার। পাশ-টাশ করে চাকরি যোগাড় করতে তোমার হাতের টাকা যাবে ফুরিয়ে। তার চেয়ে রোজগারের চেষ্টায় নেমে পড়াই ভাল।'

ভবিষ্যতে দৃষ্টি চলে না—কি হবে জানা নেই, সর্ব অন্ধকার। সব সময় চাপ দিচ্ছে এই দুর্ভাবনা। চব্বিশ ঘণ্টা নিদারুণ উৎকণ্ঠার পীড়ন যে একটা কিছু করতেই হবে।

একেবারে দুঃস্থ হয়ে যারা এসেছে তাদের এই দুর্ভাবনার বালাই নেই—নিঃস্ব হয়ে পথে বসার দুশ্চিন্তা আর তাদের করতে হয় না। গাছতলা আশ্রয় যে করেছে তার আর গাছতলা সার করার ভয় কি?

কে জানে, সমীরের সঙ্গে ভাগ্য মেলালে হয়তো তাদের কপাল ফিরেও যেতে পারে। সমীরের উৎসাহ আছে, শেয়ারের কারবারে বাপের অভিজ্ঞতারও সে অংশীদার।

কিন্তু সাধন পড়া ছেড়ে দেবে—এটা ভাবতেও মন খুঁতখুঁত করে।

মহেশ্বর বলে পরমেশ্বরকে, 'সাধন তো পড়া ছেড়ে ব্যবসা করতে চায়—সমীরের সঙ্গে।'

'সে তো চাইবেই। ওর ছিল শখের পড়া—এ অবস্থায় কি আর পড়ায় মন বসে?'

'মনস্থির করতে পারছি না।'

পরমেশ্বর একটা কথা বললেই তার মন স্থির হয়ে যায়—কিন্তু পরমেশ্বর সোজাসুজি কিছুই বলে না।

'পূজা করার ব্যাপার, সংসারের ব্যাপারে তোমার মন স্থির করতে অসুবিধা হয় না—এসব ব্যাপারে কেন হয় জানো? এ সব নতুন ব্যাপার—মনস্থির করার নিয়ম-নীতি জানা নেই, অভ্যাস নেই। ভেবে-চিন্তে বিচার-বিবেচনা করে একটা কিছু ঠিক করে ফেল।'

জামায়ের চরম অনুরোধ রক্ষা করা হবে—টাকাটা একেবারে তার হাতে তুলে না দিয়েও। কোন দিকে আয়ের ব্যবস্থা নেই, সমীরের সঙ্গে ব্যবসায়ে নেমে সাধন হয়তো কিছু আয়ের ব্যবস্থাও করতে পারবে। এই সব হিসাব করে মহেশ্বর টাকা দেওয়াই ঠিক করে।

পুঁজি শেষ হয়ে যায়।

অনভিজ্ঞ সাধনকে পাকা কায়দায় ভাঁওতা দিয়ে টাকাগুলি সমীর উড়িয়ে দিলে তাই আপসোস আরও বেশী হয় মহেশ্বরের।

মহেশ্বর একখানা চিঠি দেয় তার হাতে। খামের চিঠি কিন্তু খুব সংক্ষিপ্ত।

সমীর লিখেছে তার বড়ই বিপদ, অবিলম্বে তার পাঁচশো টাকা চাই। আগের টাকার ব্যবস্থা এখনই করতে না পারলেও, এই টাকাটা সে দু-তিন মাসের মধ্যে শোধ দিয়ে দেবে।

বিশেষ ভনিতা নেই, দশটা অজুহাত খাড়া করবার চেষ্টা নেই, গাম্ভীর্যপূর্ণ সহজ স্পষ্ট দাবি জানিয়ে চিঠিখানা লেখা।

পরমেশ্বর একটু হাসে।

'তুমি আমায় সংসারে জড়িয়ে ছাড়বে।'

'একটু না জড়ালে চলে না আর। একলা আমি—'

'বোঝা কমালেই পার!'

মহেশ্বরের মুখ দেখে পরমেশ্বর হাসিমুখেই আবার বলে, 'যাক্, যাক্। চিঠি পড়লেই বুঝতে পারা যায় বাবাজী বিগড়ে গেছেন। আগে অনেকবার নিয়েছে, না?'

'অনেকবার। আরও অনেকের কাছে ধার করেছে।'

'চিঠি লেখার ধরন থেকে সেটা অনুমান করেছি। এ ব্যবসায়ে বেশ পাকা হয়ে না উঠলে অনেকবার টাকা নেওয়ার পর এ রকম চিঠি লেখার ক্ষমতা হয় না—এ কায়দা সাধারণ লোকের খেয়ালে হবার কথা নয়!'

মহেশ্বর নিশ্বাস ফেলে বলে, 'বিপদের কথাটা মিথ্যা?'

'ঠিক মিথ্যা নয়। টাকার খুব দরকার—এটাই ওর আসল বিপদ—অন্য কোন বিপদ নেই। ভেবে চিন্তে বুদ্ধি খাটিয়ে চিঠি খানা লিখেছে। সাধারণ মানুষ সাধারণ ভাবে হঠাৎ বিপদে পড়লে বাধ্য হয়ে যদি লিখত—সে চিঠিই হত অন্যরকম। লজ্জা দুঃখ ফুটে বেরোত প্রত্যেক লাইনে—পড়লেই বোঝা যেত অনিচ্ছায় লিখেছে।'

'কি করা যায়! এ ভাবে টাকা দিলে তো আরও পেয়ে বসবে?'

'এক কাজ কর, পুজোয় ওদের আসতে লিখেছ—আজ কালের' মধ্যে তুমি নিজেই চলে যাও। বলবে, বিপদের কথা পড়ে ছুটে গিয়েছ—কি বিপদ কিছুই লেখনি, কাজেই খুব ভাবনা হয়েছিল। বিপদের কথা একটা বানিয়ে বলবে—এ সব লোক মিথ্যা বানাতে ওস্তাদ হয়। এবারের মতো টাকাটা দিও, ছেলে আর জামাই গোল্লায় গেলে খানিকটা ঝনঝাট পোয়াতেই হয়। কিন্তু খুব ভাল করে তোমার নিজের বিপদটা বুঝিয়ে দিয়ে এসো—ভবিষ্যতে আর যেন প্রত্যাশা না করে!'

'সুরমাকে নিয়ে আসব তো?'

'আনবে বৈ কি?'

পরদিন মহেশ্বর মেয়েকে আনতে যায়।

বাড়িটা একটু থমথম করে সেদিনটা। পরদিন সে ভাব অনেকটা কেটে যায় বটে কিন্তু আরও গভীর হয়ে ঘনিয়ে আসে মেয়ে আর নাতি নাতনীকে সঙ্গে নিয়ে মহেশ্বর ফিরে এলে।

মহেশ্বরের মুখ শুকনো এবং গম্ভীর: সুরমার মুখ ম্লান এবং বিষন্ন।

সুরমার গালে কালশিটের মতো একটা লম্বা দাগ।

'গালে কিসের দাগ দিদি?'

পরমেশ্বর বলে, 'তা দিয়ে তোমার কি দরকার? ওর শখ হয়েছে কপালে টিপ না পরে গালে দাগ কেটেছে। বোকা মেয়ে কোথাকার।'

প্রতিমা ম্লান মুখে বলে, 'সত্যি আমি বোকা।'

পরমেশ্বর হেসে বলে, 'নিজেকে যে বোকা বলতে পারে সে কিন্তু সত্যি বোকা হয় না।'

সুভাষিণী কাঁদ-কাঁদ মুখে বলে, 'আমি আর মেয়েকে পাঠাব না।'

সাধন নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

পরমেশ্বর বলে, 'আলাপ-আলোচনার ঢের সময় পাওয়া যাবে-- খিদের সময় খেতে পেলে কাজ দেয়।'

জামাই গোল্লায় যাচ্ছে এটা শুধু শোনা কথাই ছিল এতদিন। এই কুৎসিত সত্যটার প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্তির মতো সুরমাকে সামনে উপস্থিত দেখে আর সমস্ত কথাই মন থেকে মুছে গিয়েছিল সকলের। অথচ সোজাসুজি স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করে জানবার সাহসও হচ্ছিল না কারও যে ব্যাপারটা ঠিক কতখানি গড়িয়েছে, কত দূর অধঃপাতে গিয়েছে সমীর।

অনুতাপের সঙ্গে সবিতা চুপি চুপি সুরমাকে বলে, 'আমি সব জেনে ফেলেছি সুরমাদি। না জেনে পারলাম না, কাজটা ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। লাভের মধ্যে হল এই—মনটা খারাপ হয়ে গেল।'

'শুনে ফেলেছ, উপায় কি।'

সংসারে কত রকম অদ্ভুত মানুষ যে থাকে! সুখে থাকতে কোন বাধা নেই, তবু ইচ্ছা করে অসুখী হবে।

বস্তি থেকে ডুমুর মহেশ্বরের বাড়ি দুধ দিয়ে আসে।

গরু আছে কিন্তু দুধ তারা নিজেরা এক ফোঁটাও খায় না। দুধ বেচে সংসার চলে।

অঘোর খরচ দেয়, তাতে তার খরচটা কুলিয়ে গিয়ে হয়তো বা ডুমুরের জন্য সামান্য কিছু বাড়তি থাকে। সংসার চলে না।

দুধ বেচে, ঘুঁটে বেচে আর মায়ে-বৌটিতে তিন বাড়ি ঠিকে কাজ করে কোনমতে তারা দিনপাত করে।

সুরমা আর সবিতা দুজনেই খুব ভাব জমিয়ে ফেলেছে ডুমুরের সঙ্গে।

সুরমা তার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে জানবার জন্য ব্যাকুল।

কতভাবে কতরকম প্রশ্নই যে সে করে ডুমুরকে! বলে, 'তুমি লোকের বাড়ি কাজ কর, স্বামী আপত্তি করে না?'

'করুক না আপত্তি। তবে তো বাঁচাই যেত। যা রোজগার করি দিতে হবে তো আপত্তি করলে—নিজে খেতে-পরতে দেবে না আপত্তি করবে কোন মুখে?'

'তোমাদের ঝগড়া হয়?'

'মাগ-ভাতারে ঝগড়া হবে না?'

'সে ঝগড়া নয় খারাপ ঝগড়া। সত্যি সত্যি যাতে রাগারাগি হয়ে যায়।'

'তাও হয় দু'এক বার। নিজেই মিটিয়ে নেয়।'

'কেন?'

ডুমুর হেসে ফেলে।

'নিজের দোষ তো বোঝে দিদিমণি? হেথা রইবে, বদখেয়ালে পয়সা উড়োবে, বৌকে পুষবে না—ঝগড়া করে শক্ত রবে কিসের জোরে?'

'দোষ বোঝে?'

'বুঝবে না? সবাই বৌকে পোষে, ও পুষছে না। এটা বুঝবে না পুরুষ মানুষ? মোরা খেদিয়ে দিতে পারি অনায়াসে—দিই না সে তো মোদের দয়া।'

ডুমুর মুচকে হাসে, বলে, 'দয়া মানে আর কি, টান তো পড়েছে একটা। ফেলবার তো মানুষ নয়। বাড়াবাড়ি করে না, সামলে সুমলে চলে—কি আর করা যায়, আজ থাক। চলে গেলেও তো জ্বালা!'

সুরমা গম্ভীর হয়ে বলে, 'তা নয় ভাই। উপায় নেই তাই তাড়াতে পার না। স্বামী ছাড়া তো গতি নেই আর—'

ডুমুর আবার মুচকে হাসে।

'সে আপনাদের নেই দিদিমণি। মোদের কতটুকু আসে যায়? মানুষটাকে দূর করে দিয়ে যদি আরেকজনের সাথে থাকি, লোকে একটু উঁ আঁ করবে—বাস্। যেমন আছি তার চেয়ে বেশ ভালই থাকব!'

'ক'দিন থাকবে?'

ডুমুর চুপ করে থাকে।

'ছেলেপিলের কি হবে?'

এবারও ডুমুর চুপ করে থাকে। সে বেশ একটু ভড়কে গিয়েছে মনে হয়।

সুরমা বলে, 'না তোমার হিসেব ঠিক নয়। স্বামীকে নিয়ে থাকা অনেক সুবিধা, নইলে তুমি অনেক আগেই খেদিয়ে দিতে মানুষটাকে। বাড়াবাড়ি করে না, তোমার দিকটাও হিসেব করে চলে, তাই অবশ্য বরদাস্ত করে চলেছ।'

তারপর সুরমা হঠাৎ কথা পাল্টে বলে, 'দুধে এত জল দাও কেন? আমার দুটো বাচ্চা তোমাদের দুধ খাচ্ছে মনে রেখো!'

দায় অনেক, সময় নেই। তবু একটু ফাঁক পেলে ডুমুরের ঘরে গিয়ে বসে সবিতা। অঘোর কাজে যাবার আয়োজন করতে করতে আড়চোখে তাকায়।

ডুমুর মুচকে হেসে বলে, 'সুবিধে হবে না। সে চিজ নয়। দু'-পাঁচ হাজার দিয়ে লোকে চেষ্টা করেছে, পারেনি।'

পিঁড়ি পেতে সবিতাকে বসতে দেয়।

ডোবা পুকুরে ডুব দিয়ে এসে অঘোর মাথা আঁচড়াচ্ছিল, ভাতের থালার সামনের পিঁড়িটাতে উবু হয়ে বসে সযত্নে সস্নেহে ভাত ভাঙতে ভঙতে সে বলে, 'পারবে কি করে? মানুষ কি পয়সায় বিকোয়?'

সবিতা বলে, 'বিকোয় না? মানুষ পয়সায় বিকোয় বলেই তো তাদের এই দুর্দশা। ব্যাপারটা বুঝিনে ভালো, গরিব মানুষ আছে, পয়সাওলা মানুষ আছে। তাই ধাঁধায় পড়ে গেছি। চারটে পা না থেকে হাত পা থাকলে মানুষ হয় এটা বুঝেছি, কিন্তু পয়সা থাকলে কি করে মানুষ হয়, সেটা মাথায় ঢোকে না।'

ডুমুর বলে, 'এই নিয়ে কত বড় বড় মাথা খাটছে, কত মাথা দিনরাত শুধু ঘামছে, মাথায় ঢোকে কি ঢোকে না তা নিয়ে আর মাথা ঘামিও না।'

সবিতা বলে, 'কেন?'

ডুমুর বলে, 'মাথা যারা ঘামায় তারা মাথা ঘামিয়ে পয়সা কামায়। গা ঘামিয়ে পয়সা কামানোর চেয়ে ওটা ওরা একটু উঁচুতে রাখতে চায়—মাথা ঘামিয়ে পয়সা কামানো বড্ড সম্মানের ব্যাপার, বড্ড উঁচুদরের ব্যাপার!'

সবিতা বলে, 'ভাইটার জন্য এক পো দুধ রাখব ভাবি, তা রাখব কি দিয়ে। তুমি তো ভাই দিব্যি নিজে রোজগার করে খাও কাউকে কেয়ার কর না। আমার হয়েছে মুস্কিল।'

'বিয়েই হল না, মুস্কিল কিসের গো?'

'বিয়ে হলে তবু একটা লোক সম্বল থাকত! আমার যে কেউ নেই।'

'বিয়ে বোস না তাড়াতাড়ি?'

'কে করছে বিয়ে।'

'সাধন বাবু—?'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না সবিতা। একি অদ্ভুত খাপছাড়া কথা ডুমুরের মুখে? এমন অনায়াসে এ রকম একটা অসম্ভব ইঙ্গিত তার মুখ দিয়ে কি করে বার হয়, কেন বার হয়?

বদনাম রটেছে তার আর সাধনের নাম জড়িয়ে? কিন্তু কেন? কি জন্য তাদের এমন কলঙ্ক রটল যা এসে বস্তিতে পর্যন্ত পৌঁচেছে?

ডুমুর বলে, 'হবে না বিয়ে? ওই দিদিমণি বললে কিনা, তাই বলছি।'

'কে বললে?'

'ওই তোমাদের ও ঘরের প্রতিমা দিদিমণি। বললে যে সাধন বাবু ওস্তাদ রেখে গান-টান শিখিয়ে তৈরি করে নিচ্ছেন বিয়ে করার জন্য।'

ডুমুর হেসে ফেলে। 'বাবা, বিয়ের আগে বৌকে শিখিয়ে পড়িয়ে বস্তিতে রেখে তৈরি করা! কি যে কাণ্ড বাবুদের!'

পুজোর কয়েকদিন আগে সমীর আসে।

চেহারাটা খারাপ হয়েছে। দেখে মনে হয় কোন অসুখে ভুগছে। এটা ছাড়া আর বেশভূষা কথাবার্তা চালচলন দেখে সহজে বুঝবার উপায় নেই মানুষ হিসাবে সে কতখানি নেমে গেছে।

সহজে বুঝবার উপায় নেই, কিন্তু বোঝা যায়। সাধারণ কথা ব্যবহার তার প্রায় আগের মতোই আছে কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে টের পাওয়া যায় সর্বদাই তার যেন কি একটা অস্বস্তি চাপবার চেষ্টা, সাধারণ স্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনার আড়ালে যেন তার একটা গোপন দুশ্চিন্তা সর্বদা সক্রিয় থেকে চাপ দিচ্ছে।

পরমেশ্বর বলে, 'তুমি ইচ্ছে করলে আর চেষ্টা করলে বড় হতে পারতে—অনেক বড় হতে পারতে।'

সমীর যেন চমকে উঠে!

'অনেকে বড় হতে চায়, হাজার চেষ্টা করেও পেরে ওঠে না। তাদের শুধু ইচ্ছাটাই থাকে—ইচ্ছা পূরণের জন্য যে গুণগুলি দরকার—থাকে না। তোমার সবগুলি গুণ ছিল—বেশী পরিমাণে ছিল। চেষ্টা করলে তুমি যে কোথায় উঠতে পারতে তুমি নিজেও কল্পনা করতে পারবে না।'

সকলে অবাক হয়ে শোনে।

সকলের সামনে সমীরের এমন অকুণ্ঠ প্রশংসা—এক রকম তার গুণকীর্তন তার মতন অসাধারণ গুণের অধিকারী খুব কম লোকই হয়।

সমীর যে অধঃপাতে গেছে সে জন্য কি এতটুকু আপসোস নেই পরমেশ্বরের?

সমীর বলে, 'বড় হতে কে না চায় বলুন?'

পরমেশ্বর হাসিমুখে মাথা নাড়ে, 'সবাই চায় না। অনেকে সুখী হতে চায় না, বড় হতে চাইবে! সংসারে সকলে যাকে সুখ বলে, অনেকের পুরো মাত্রায় সেটা ভোগ করার সুযোগ থাকে! কিন্তু ও রকম সুখ তার ভাল লাগে না। সে ইচ্ছে করে চেষ্টা করে নানা রকম দুঃখ এনে কষ্ট পায়—কষ্ট ছাড়া জীবনটা তার মনে হয় একঘেয়ে আলুনি। তুমি ইচ্ছা করলেই বড় হতে পার, কিন্তু তুমি ঐ ক্ষমতাটা অন্যদিকে লাগাতে চাও। বড় হবার সাধ তোমার নেই।'

সমীর খানিক চুপ করে থাকে।

'কোনদিক দিয়ে বড় হবার কথা বলছেন?'

'টাকা পয়সা, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি। যে ভাবে বড় হওয়াকে সংসারে বড় হওয়া বলে! বড় নেতা হওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত তোমার আছে।'

প্রতিমা ফোঁড়ন কেটে বলে, 'এখনও আছে?'

'এখনও আছে কিন্তু ঐ যে বললাম, যেটা তোমার আসল গুণ সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমার দোষ।'

'কি রকম?'

'তোমার একটু সমাজবিরোধী ঝোঁক আছে, ঠিক বিরোধী ঝোঁক নয়, সমাজ সম্পর্কে উদাসীনতা। যারা বড় হয় সমাজ সম্পর্কে তাদেরও এক ধরনের উদাসীনতা থাকে—সমাজের সাধারণ চলতি নিয়ম নীতি, সংস্কার সম্পর্কে। তারা অন্য মানুষের চেয়ে অনায়াসে ও সবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে, ও সব তুচ্ছ করে দিতে পারে। কিন্তু সমাজ তাদের কাছে তুচ্ছ হয় না, সমাজের কাছে স্বীকৃতি পাওয়াও তুচ্ছ হয় না। সমাজের আচার-নিয়ম-সংস্কার নিয়ে তোমারও বিশেষ মাথা ব্যথা নেই, বাইরের খোলসটা বাদ দিয়ে তুমি আসল ব্যাপারটা চট করে ধরতে পার—কিন্তু মুস্কিল হল, এটা সমাজের দিকে আকর্ষণ না বাড়িয়ে তোমার মধ্যে জন্মিয়েছে অবজ্ঞা। বাজে পচা একটা সমাজ, এ সমাজের জন্য তোমার টানও নেই, সমাজের সম্মান পাওয়ার সাধও নেই।'

প্রতিমা বলে, 'বিশেষ গুণ থাকা দেখছি, মহা বিপদ।'

পরমেশ্বর বলে, 'বিপদ বৈ কি। বিশেষ গুণ থাকা মানেই তাকে আর থাকতে দেবে না—বিশেষ দিকে টানবে, বিশেষ মানুষ করে তুলবে।'

'এর চেয়ে জামাইবাবু, সাধাসিদে সাধারণ মানুষ হলেই বরং ভালো ছিল।'

পরমেশ্বর সমীরের গোমড়া মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলে, 'তা কি জোর করে বলা যায়? কত দিকে গতি নেয় মানুষের জীবন—কত কি ঘটতে পারে। আজ ইচ্ছা নেই—একদিন হয়তো বড় হওয়ার জন্য সমীর পাগল হয়ে উঠবে?'

সাধনের একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে অনেক চেষ্টায়। মাইনে ভালোই—কিন্তু চাকরির জন্য জমা রাখতে হবে হাজার পাঁচেক টাকা।

না, কোন রকম জুয়াচুরি ফন্দি-ফিকিরের ব্যাপার নয়। টাকাটা নষ্ট হবার ভয় নেই।

এই জন্যই সুভাষিণীর তিন ভাগ গয়না বিক্রি করে নগদ টাকাগুলো বাড়িতে এনেছিল মহেশ্বর।

সকালে দেখা যায়, টাকা নেই। সব টাকা চুরি হয়ে গেছে!

বাড়ির লোকেই যে চুরি করেছে তাতেও সন্দেহ করার কোন কারণ থাকে না।

মহেশ্বর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

চুরি নিয়ে হৈ চৈ করার ভরসাও বাড়ির লোকে পায় না। নীচু গলায় শুধু আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে যে এখন কি করা উচিত।

সমীর বাড়িতেই ছিল। আজ ভোরে সে বেড়াতেও বাড়ির বাইরে যায়নি। পরমেশ্বর বলে, 'টাকা বাড়িতেই আছে। তবে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।'

'কি রকম?'

'সন্দেহ প্রকাশ করলে জামাই ভীষণ চটে যাবে। সুটকেস বিছানা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে! গায়ের জোর যদি খাটাতে পারো তাহলেই টাকাটা পাওয়া সম্ভব।'

'তাই কি পারে মানুষ?'

'আমিও তাই বলছি।'

সমীর সেই হিসাব করেছে। শুধু সন্দেহ করে যদি চুপ করে থাক, ভালই। যদি সন্দেহ প্রকাশ কর বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সুযোগ পাবে।

সাধন বলে, 'সার্চ করব?' সুভাষিণী বলে, 'না।'

পরমেশ্বর বলে, 'বিপদ তো এইখানে। টাকা গেলে টাকা আসবে, জামাই গেলে আসবে না।'

সুরমাকে প্রথমে কেউ জানায়নি। বেলা একটু বাড়তে সকলের রকম-সকম দেখে তার মনে লাগে খটকা।

সে জিজ্ঞাসা করে, 'কি হয়েছে।' প্রতিমা বলে, 'বাবার টাকা চুরি গেছে।'

শুনেই মুখ বিবর্ণ হয়ে যায় সুরমার। সে যেন নিজেই চুরি করেছে টাকাগুলি!

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে সে খানিকক্ষণ ভাবে। তারপর ঘরে যায়।

সমীর খাটে হেলান দিয়ে বসে কাগজ পড়ছিল।

'আজ যে তুমি বেরোলে না?'

'বেরোব। মামার সঙ্গে দেখা করতে যাব ভাবছি।'

একান্ত নির্বিকার শান্ত ভাব সমীরের।

গায়ে তার গেঞ্জি; পরনে লুঙ্গি। অতগুলো টাকার নোট গায়ে কোথায়ও গুঁজে রাখা সম্ভব নয়।

সুরমা বলে, 'তোমার সুটকেসের চাবিটা দাও তো?'

'কেন?'

'একটা দরকার আছে।'

'কি দরকার?'

'জামা-কাপড়গুলি গুছিয়ে রাখব।'

'গোছানোই আছে।'

'চাবিটা দাও না তুমি। চাবি দিতে আপত্তি করছ কেন?'

'তোমারই বা সকাল বেলা হঠাৎ আমার সুটকেস খুলবার কি দরকার পড়লো বল না?'

তবু সুরমা শান্তভাবে সুটকেসের চাবিটা আদায় করবার চেষ্টা করে। কিন্তু চাবি সমীর দেয় না!

তখন গম্ভীর হয়ে সুরমা বলে, 'বাবার টাকাটা দিয়ে দাও।'

'কিসের টাকা?'

'তুমি যে টাকা চুরি করেছ।'

দেখা যায়, পরমেশ্বর যা বলেছিল অবিকল সেই ব্যাপার ঘটে! সমীর প্রথমে তামাসা বলে উড়িয়ে দেয় সুরমার কথাটা, তারপর রেগে আগুন হয়ে ওঠে! 'এতবড় আস্পর্ধা তোমাদের! আমায় চোর বল?'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে সে বিছানা বাঁধতে আরম্ভ করে।

সুরমা বলে, 'টাকাটা না দিয়ে যদি যাও, এ জন্মে আমি তোমার মুখ দেখব না। মনে করব আমি বিধবা হয়েছি।'

সমীর কথা কয় না।

সুরমা বলে, 'বেশ। তুমি নাওনি টাকা। আমি ভুল বলছি। তুমি শুধু আমায় সুটকেসটা খুলে দেখতে দাও। টাকা যদি না পাই যে শাস্তি দেবে মাথা পেতে নেব।'

তবু সমীর কথা কয় না।

সুরমা বলে, 'খুলে না দেখালে সুটকেস নিয়ে তোমাকে আমি যেতে দেব না।'

বিছানার বান্ডিল বগলে নিয়ে সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে সে যাবার জন্য প্রস্তুত হলে সুরমা দু'হাতে সুটকেসটা চেপে ধরে।

এত জোরে তাকে ধাক্কা দেয় সমীর যে সে ছিটকিয়ে মেঝেতে পড়ে যায়।

সমীর গট্ গট্ করে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

আঘাতের বেদনা ভুলে সুরমাও বাইরে এসে চেঁচিয়ে বলে, 'সুটকেস নিয়ে যেতে দিও না—কেড়ে নাও সুটকেসটা। দাঁড়িয়ে দেখছো কি তোমরা, কেড়ে নাও!'

সমীর যেতে যেতে দাঁড়ায়। সুটকেসটা কেড়ে নেবার সময় ও সুযোগ দেবার জন্যই যেন খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে।

সাধন এক পা এগোতেই সুভাষিণী হাত চেপে ধরে ধমক দিয়ে বলে, 'সাধন' মাথা-খারাপ করিস না!'

পুতুলের মতো সকলে দাঁড়িয়ে থাকে।

'আমি তবে আসি।' বলে ধীরে ধীরে সমীর বেরিয়ে যায়।

ডোবার মতো পুকুরটির ওপাশের বস্তিতে আশ্বিনের রাত্রি ভোর হবার অনেক আগেই অঘোরের ঘুম ভেঙে যায়।

নরক-যাত্রার তাগিদে।

মিউনিসিপ্যালিটির মেথররা দশদিন ধর্মঘট করেছে। আবছা-আঁধারে দু-একটা ডার্নাপিটে পাখির ডাক শুনতে শুনতে অঘোর ঘাটের দিকে এগোয়, জানা গাছটা থেকে আন্দাজে একটা দাঁতন ভেঙে নেয়।

শুকোতে শুকোতে পুকুরটার জল বর্ষার আগে একেবারে নীচে গিয়ে ঠেকে, তালগাছের গুঁড়ির ঘাটটাও ধাপে ধাপে নেমে যায়—খাড়া ঢাল বেয়ে সাবধানে নামতে হয়।

বর্ষার পর এখন পুকুরটা কানায় কানায় ভরা। এখন তবু পুকুর মনে করা যায় এবং জলটা ব্যবহার করতে ঘেন্না হয় না।

তালের গুঁড়িটার উপরে এসে দাঁড়াতে নতুন একটা দুর্গন্ধ অঘোরের নাকে লাগল। দুর্গন্ধের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কলকাতার গায়ে পাড়ায় তার সাত পুরুষের বসবাস। চারিদিকে কারখানা ঘিরে ফেললেও বহুকাল যা করতে পারেনি, এবারের যুদ্ধের বাজারটা তাই করে দিয়ে গেছে।

পাড়ার এই অংশটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বস্তি। নিজের নাক দিয়ে চেখে চেখে সে জেনেছে জগতে কত রকমারি দুর্গন্ধ আছে—শুকনো, ভ্যাপ্‌সা, নরম গরম, ঘন, পাত্‌লা, ভোঁতা, তীক্ষ্ণ—কতই যে তার বৈচিত্র্য! রকমারিতে সুগন্ধ তার কাছে দাঁড়ায় কোথায়! ফুল, চন্দন, ধূপ, এসেন্স—সব গন্ধই প্রায় এত রকম, একঘেয়ে।

ঘাটের এই দুর্গন্ধটা অদ্ভুত রকমের নতুন, আগে যেন কখনো শোঁকেনি জীবনে। গা-টা কেমন ঘিন ঘিন করে ওঠে। দম-আটকানো অস্বস্তি জাগে।

এই ভাবটাই যেন মনে পড়িয়ে দিতে চায় গন্ধটাকে তার। আরও একবার কি চেনা হয়েছিল তার এই বীভৎস ভারী গন্ধটার সঙ্গে?

তাই বটে, ঠিক! মন্বন্তরের সময় একদিন শহরতলীর স্টেশনের দিকে হেঁটে যাবার সময় ঝাঁটার শলার গরম ঝাপ্‌টার মতো দুর্গন্ধটা তার নাকে লেগেছিল। চেয়ে দেখেছিল পথের ধারে গাছতলায় ফ্যানমাখা মগটা আঁকড়ে ধরে একটা প্রায় পচাগলা দেহ পড়ে আছে মানুষের।

ভালো করে তাকিয়ে অঘোর বুঝতে পারে তালের গুঁড়িটার কাছেই কিছু একটা ভাসছে। অর্ধেক স্থলে, অর্ধেক জলে।

এটাও দেহ, টের পেতে দেরি না। চমক-দেওয়া রাশভারী দুর্গন্ধটাও যে ওটা থেকেই আসছে অনুমান করে নেওয়া যায়।

কষা দাঁতনটা চিবোতে চিবোতে অনিচ্ছুক পদে ফিরে গিয়ে অঘোর তার টর্চটা নিয়ে আসে। আলো ফেলে দেহের মুখটা দেখে বলে, 'রাম রাম!'

মরা মরা জপ করে বাল্মীকি রাম নাম বলতে শিখেছিল। অঘোরের অত চেষ্টা করতে হয় না।

'তোর শেষে এই গতি হলো ছুঁড়ি?' অঘোর নিজেকে শুনিয়ে বলে।

সবার চেনা সেই পাগলী মেয়েটা। পনেরো-ষোল বছরের বেশী বয়স হবে না। হাতপাগুলি কাঠের মতো সরু। কোথা থেকে এসেছিল কেউ জানে না, বছরখানেক এই এলাকায় কুড়িয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়িয়ে যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। আজ এ-পাড়ায় দেখা গেলে কাল ও-পাড়ায় দেখা যেত।

কার ঘরের কাছে মরে পড়ে ছিল। রাতারাতি তুলে ডোবায় এনে ফেলে দিয়ে গিয়েছে দুর্গন্ধ এড়াবার জন্য।

কুকুর বেড়ালের মৃতদেহ যেমন দূরে ফেলে দেয়।

ডোবার জলটা আজ কেউ ব্যবহার করতে পারবে না।

তারপর তাড়াতাড়ি ভোর হয়।

কিন্তু ডোবার ধারে বেশী ভিড় হয় না। সামান্য যেটুকু ভিড় হয় তাও কেটে যায় অন্য কারণে।

একটু বেলা হতেই ভিড় জমে যায় মহেশ্বরের বাড়ির সামনে।

সুরমা রাত্রে গলায় দড়ি দিয়েছে।

কয়েক মাস কেটে যাওয়ার পরেও সাধনের সঙ্গে দেখা হলে সবিতা তার বোনের আত্মহত্যার ব্যাপার নিয়ে একটু আপসোস জানাতেও সাহস পায় না।

খেতে না পেয়ে আগের দিন মরেছিল একটা চাষীর মেয়ে। তার দেহটা এনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল তাদের একমাত্র জলের সম্বল ডোবাটার মধ্যে।

হত্যা আর আত্মহত্যা আবিষ্কৃত হয়েছিল একই রাত্রির প্রভাতে। আত্মহত্যাটা নিজের বোন করে থাক, দুটোকে নিশ্চয় মিলিয়েছে সাধন। কিছু বলতে গেলে, সহানুভূতি দেখাতে চাইলে সে হয়তো ক্ষেপে যাবে।

সবিতা তাই নিজের দুঃখ দুর্দশার কথাই বলে।

'না এভাবে চাল কেড়ে নেবে, ঘুষ আদায় করবে, অপমানের একশেষ করবে—চাল এনে বেচে রোজগার করা চলে না আর।'

সামান্য উপার্জন। কোন মেয়েই বেশী চাল কিনে আনতে পারে না একেবারে।

তীব্র জ্বালার সঙ্গে সবিতা বলে, 'আমার পিছনেই যেন বেশী করে লাগে।'

সাধন বলে, 'লাগবে না? এমন সুন্দর চেহারাটি বাগিয়েছিলে কেন? তোমায় রাজার হালে রেখে পুষবার জন্য কত লোক ওৎ পেতে আছে—তুমি কিনা চাল এনে বেচবে! এ কি লোকের সয়?'

'ওই ব্যবসাই করি এবার। আর তো কোন পথ দেখছি না ঝি-গিরি ছাড়া।'

সাধন নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'তুমি মেয়েমানুষ, তায় মেয়ে—তবুও তো যা হোক কিছু রোজগার করছ, প্রায় তিন বছর চালিয়ে দিলে। আমি খালি লোকসান দিলাম, বাবার টাকাগুলি নষ্ট করলাম।'

সবিতা সখেদে বলে, 'সত্যি! আপনার কথা ভাবলে এমন খারাপ লাগে আমার!'

'যা ধরি তাই যেন ফস্‌কে যায়!' গভীর সমবেদনায় তার হাত চেপে ধরে সবিতা নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সাধন তার চোখে তার মনের ছায়া দেখতে পায়। সাধন বলে, 'হতাশ হয়ে পড়েছি ভাবছ? হতাশা না গো, এ হলো প্রাণের জ্বালা।'

সে একটা বিড়ি ধরায়। 'আর একটা গান লিখেছি, শিখবে?'

'শিখব না?'

সাধন লেখা গানটি সবিতার হাতে দেয়। মোটা গলায় পদগুলির মোটামুটি সুর গেয়ে শোনায়। সবিতা মন দিয়ে শোনে—তারপর সেই পদটি সুরে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে তার গলায়।

ডুমুর এসে চুপ করে দরজার বাইরে বসে। একে একে ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ যারা এসে জোটে তাদের সে হাতের মুখের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় টুঁ শব্দটি করা চলবে না, ইঙ্গিতেই তাদের সে নির্দেশ দেয় চুপ-চাপ বসে পড়ার।

গান অভ্যাস করার ফাঁকে সবিতা বলে, 'এমনি শুনলে হবে না, পয়সা লাগবে। রেশন আনার পয়সা নেই। না খেয়ে শুকনো গলায় গান খোলে না।'

বাইরে থেকে অঘোর বলে, 'পয়সা দিয়ে পচা সিনেমা দেখি, বিনে পয়সায় গান শুনব কেন? চাঁদা আমরা তুলে দিচ্ছি—কিন্তু গান শেখা শুনব শুধু? শেখা গান দু একটা হবে না?'

'হবে বৈকি?'

দরজার কাছে এগিয়ে এসে সবিতা পুরানো গান ধরে। গতর খাটিয়ে ধান ফলিয়ে জিনিস বানিয়ে মানুষের উপোসী থাকার গান।

গল্প পরিচয়

গল্পগুলির সঠিক রচনাকাল জানা খুব কঠিন। যে যে গল্পগ্রন্থ থেকে গল্পগুলি চয়িত হয়েছে তার রচনাকাল দেওয়া হলো।

গল্পের নাম	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থের রচনাকাল
গুপ্তধন, প্যাঁক	সরীসৃপ	আগস্ট, ১৯৩৯
কুষ্ঠরোগীর বৌ	বৌ	১৯৪৩
যে বাঁচায়, বাস	ভেজাল	১৯৪৪
আজ কাল পরশুর গল্প, দুঃশাসনীয়, নমুনা, গোপাল শাসমল, শত্রুমিত্র, রাঘব মালাকর, যাকে ঘুষ দিতে হয়	আজ কাল পরশুর গল্প	জৈষ্ঠ, ১৩৫৩ (ভূমিকায় লেখক লিখেছেন, গল্পগুলি প্রায় সমস্তই গত এক বছরের মধ্যে লেখা)
মাসীপিসী, পেট ব্যথা, শিল্পী, কংক্রীট, প্রাণের গুদাম, ছেঁড়া	পরিস্থিতি	আশ্বিন, ১৩৫৩ ("গল্পগুলি বছরখানেকের মধ্যে লেখা।")
খতিয়ান, ছাঁটাই রহস্য, চক্রান্ত, চালক, টিচার, একান্নবর্তী, ছিনিয়ে খায়নি কেন	খতিয়ান	১৯৪৭
ধান, দীঘি, গায়েন, হারাণের নাতজামাই, ছেলেমানুষি,	ছোট বড়	১৯৪৮
পারিবারিক, ধর্ম, আপদ, বাগদীপাড়া দিয়ে	মাটির মাসুল	আশ্বিন, ১৩৫৫ (ভূমিকায় আছে, "কয়েকটি গল্প কয়েক বছর আগে লেখা। অন্য গল্পগুলি, যেমন আপদ, বাগদীপাড়া দিয়ে ইত্যাদি এই বছরের মধ্যেই লেখা।)
ছোট বকুলপুরের যাত্রী, মেজাজ, প্রাণাধিক, সখী	ছোট বকুলপুরের যাত্রী	১৯৪৯
ফেরিওয়ালা, সংঘাত, মহাকর্কট বটিকা, এক বাড়িতে	ফেরিওয়ালা	মে, ১৯৫৩ ("গত দু'তিন বছর ধরে গল্পগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।") 'এক বাড়িতে' ১৩৫৭ সালের শারদীয় যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।
উপদলীয়, এদিক ওদিক, কলহান্তরিত, চিকিৎসা, মীমাংসা, সুবালা, অসহযোগী, নিরুদ্দেশ, পাষণ্ড	লাজুকলতা	জানুয়ারী, ১৯৫৪ ("এই সংকলনের অধিকাংশ গল্প তিন চার বছরের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।")
বিচার	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প	১৯৫০
রক্ত-নোনতা	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ব-নির্বাচিত গল্প	জুন, ১৯৫৬
কালো বাজারে প্রেমের দর, ঢেউ	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ	১৯৫৭
একটি বকাটে ছেলের কাহিনী, উপায়, কোন দিকে	উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ	নভেম্বর, ১৯৬৩